র

শ

স

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

আশ্বিন।

কার্ত্তিক।

অগ্রহায়ণ।

পৌষ।

মাঘ।

চিত্র-সূচী।

শ্রীনবীন চন্দ্র সেন।

প্রতীত্যসমুৎপাদ।

ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িত চিরাতুর জীবলোকের ব্যাধিপ্রমোচনের জন্য ভগবান্ শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ বৈদ্যরাজের স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মানবজাতির তৃতীয়াংশের অদ্যাপি এইরূপ বিশ্বাস। চিকিৎসকেরা নিদানশাস্ত্রে রোগোৎপত্তির কারণ নির্ণয় করেন। মানবের ব্যাধিপ্রমোচক বৈদ্যরাজ বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমুৎপাদ।

দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই ;—অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, ও জরামরণ।

এই নিদানতত্ত্বের বা প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যা লইয়া বিবিধ মতভেদ প্রচলিত আছে। বৌদ্ধ আচার্য্যেরা সকলে এক মতে ইহার ব্যাখ্যা করেন না। হীনযান সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা মহাযানীদের সহিত ঠিক্ মিলে না। মহাযানীদের মধ্যেও সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যা আছে, বোধ হয় না। বৌদ্ধ আচার্য্যদের বাহিরে অন্যান্য দার্শনিকেরাও ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরাও একটা নির্দ্দিষ্ট মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইউরোপের পণ্ডিতেরা সচরাচর যে ব্যাখ্যা দিয়া থাকেন, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি। আমাদের এটা রীতি। এই প্রচলিত রীতির সমালোচনা এ স্থলে অনাবশ্যক। আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় স্বাধীনচিন্তার সম্বন্ধে নানারূপ আস্ফালন করেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে স্বাধীনচিন্তার অর্থ, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের উপদেশপ্রণোদিত চিন্তা। ইউরোপের পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে ভাল কথা বলেন, কিন্তু তাঁহাদের উক্তিকে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বেদবাক্যের স্থানে বসাইলে [illegible] স্বাধীনতা কত দূর থাকে, বুঝিতে পারি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই [illegible] বেশ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইয়াছে। আমাদের বৈদান্তিক মত ইউরোপে পণ্ডিতসমাজে pantheism নামে পরিচিত হইয়াছে। আমাদের শিক্ষিতগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় সাহেবদের জেহোবার মাথায় [illegible] শিখা পরাইয়া তাঁহাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করিতেছেন।

আমরা পরের জিনিষকে আপনার করিতেছি ; আপনার জিনিষকে ঠিক চিনিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় একটু সাবধানতা আবশ্যক নহে কি ?

বৌদ্ধ নিদানতত্ত্বের অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে, দ্বাদশটি নিদানের অর্থ বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য, নাম কয়টি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দের সুবিহিত সংজ্ঞা না থাকিলে তাহার অর্থগ্রহে সুবিধা হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে এ স্থলে সেইরূপ সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এক একটা শব্দ ঠিক কি মর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়াছে, কতটুকু তাহার ভিতর আছে, কতটুকু নাই, বুঝিয়া উঠা সহজ নহে। ন্যায়শাস্ত্রসম্মত সংজ্ঞার অভাবে উদাহরণাদির সাহায্যে অর্থ বুঝিবার চেষ্টা পাইতে হইবে। এক একটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে এখন আমরা বাঙ্গলা শব্দের অপেক্ষা ইংরাজী শব্দের অর্থ ভাল বুঝি। সেই জন্য হয় ত বর্ত্তমান প্রস্তাবে মাঝে মাঝে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকবর্গ এই সুরুচিবিরুদ্ধ ব্যবহার মার্জ্জনা করিবেন।

১। অবিদ্যা—এই শব্দটি আমাদের দার্শনিক শাস্ত্রে বিশেষরূপে প্রচলিত। কেবল বৌদ্ধগণের একচেটিয়া নহে। অবিদ্যা অর্থে বিদ্যার বা জ্ঞানের অভাব ; অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান মোটের উপর সহজ হইল। কিন্তু অজ্ঞান ও ভ্রান্তজ্ঞানের মধ্যে কতটুকু তফাৎ, স্থির করা একটু দুষ্কর। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বোধ হয় বলেন, জগতের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান আছে, তাহা প্রকৃত সত্য জ্ঞান নহে, তাহা একটা মস্ত ভ্রম। উহা জ্ঞান নহে, উহা ভ্রান্ত জ্ঞান। একালের অজ্ঞেয়বাদী অথবা আগ্নেষ্টিক বলেন, জগতের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানি না, আমাদের জানিবার উপায় নাই, জানিবার চেষ্টা বৃথা, ইত্যাদি। কিন্তু ইহার মধ্যেও আবার একটু মতভেদ আছে। আগ্নেষ্টিকদের মধ্যেও আবার সম্প্রদায়ভেদ আছে। হার্বার্ট স্পেন্সার ও হক্সলি, উভয়েই আগ্নেষ্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী বলিয়া পরিচিত। হক্সলি সাহেবই আগ্নেষ্টিক নামটির সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি আপনাকে কোন প্রচলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ফেলিতে না পারিয়া আপনার জন্য এই নূতন উপাধির উদ্ভাবনা করিয়াছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সারের প্রণীত দর্শনশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থের এক খণ্ডের আরম্ভে The Unknowable বড় হরপে ছাপা আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ে ঠিক এক রকম অজ্ঞেয়বাদী নহেন। স্পেন্সার বলেন, জগতের খানিকটা অংশ, জগতের কতকগুলি সংবাদ, আমাদের সম্প্রতি অজ্ঞাত এবং

চিরকালই অজ্ঞেয় থাকিবে। হক্‌সলী সম্বন্ধে এতটুকু স্বীকার করিবেন না। কোনও সংবাদকে তিনি অজ্ঞেয় বলিবেন কি না সন্দেহ। তবে কোনও কোনও কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, ইহা জ্ঞেয় কি অজ্ঞেয়, তাহা আমি বলিতে পারি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আমি সম্প্রতি ইহার উত্তর জানি না। অপরে যদি জানি বলিয়া স্পর্দ্ধা করে, তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই; তবে এ পর্য্যন্ত যে কোনও দুর্ভাগ্য জীব জ্ঞানের স্পর্দ্ধা করিয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সেই জ্ঞান হক্‌সলীর তীক্ষ্ণ যুক্তির করপত্রে শতধা বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে স্পেন্‌সার অজ্ঞেয়বাদী; হক্‌সলী অজ্ঞানবাদী বা অবিদ্যাবাদী। অজ্ঞেয়বাদ ও অজ্ঞানবাদের মধ্যে সীমানির্ণয় যেমন শক্ত, অজ্ঞানবাদ ও ভ্রান্তিবাদের মধ্যেও প্রভেদ-স্থাপন সেইরূপ কঠিন কাজ। জগৎ কি, আমি জানি না, ইহা অজ্ঞানবাদ; জগতের যে জ্ঞানটুকু আছে, তাহা ভ্রান্ত জ্ঞান, বা মিথ্যাজ্ঞান, ইহা ভ্রান্তি-বাদ। এই দুই বাদের মধ্যে কতটুকু প্রভেদ রহিয়াছে, তাহার বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, বিসংবাদ বাধাইবার সম্প্রতি কোনও প্রয়োজন নাই।

ফলে, উভয়ের মধ্যে যদি কোনও সীমাজ্ঞাপক রেখা টানিতে পারা যায়, সে রেখা এত সূক্ষ্ম যে, সহজে সকলের চোখে পড়িবে না, এবং যে কোনও ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে সেই রেখা লঙ্ঘন করিয়া এপার হইতে ওপার চলিতে কোন ব্যাঘাত বা বিঘ্ন অনুভব করিবেন না। হয় ত একটা হইতে অন্যটাকে তফাত করাই যায় না। প্রকৃত সংবাদ জানি না বলিলেই, যে সংবাদ জানি, তাহা মিথ্যা, এই মীমাংসা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। সুতরাং অবিদ্যাবাদের ও ভ্রান্তিবাদের প্রায় সমার্থকতাই আসিয়া পড়ে।

কৌতূহলী পাঠক মহাশয় যদি জগতের জ্ঞেয়াজ্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নকর্তার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে কতকটা এইরূপ উত্তর দিব। যিনি বলেন, জগতের স্বরূপ একেবারে অজ্ঞেয়, তাঁহার মীমাংসায় আমি সন্দেহ করি। যিনি বলেন, না, জগতের স্বরূপ অজ্ঞেয় নহে, ইহা এইরূপ, তাঁহার বাক্যে আমার আদৌ শ্রদ্ধা নাই।

গল্প আছে, কোনও মুমূর্ষু রাজার স্বাস্থ্যঘটিত প্রকৃত সংবাদ মন্ত্রিবর্গ রাজ-নৈতিক কারণে গোপন রাখিতেছিলেন। কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রকৃত রহস্য জানিবার জন্য দূত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সংবাদ? দূত বলিলেন,—সংবাদ ভাল, কেহ

বুদ্ধে রাজা বলিয়াছেন, কেহ বলে রাজা মরেন নাই। প্রশ্ন—তোমার বিশ্বাস কি? উত্তর—[illegible]হাও বিশ্বাস করি না, উহাও বিশ্বাস করি না। প্রশ্ন—তবে উপায়? উত্তর—কথাটা বড় গুহ্য; আপনি সহজে প্রকাশ করিবেন না। সম্পাদক মহাশয় দূতের আনীত সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, জানি না। কিন্তু আমার উত্তরে পাঠকবর্গ সন্তুষ্ট হইবেন, ভরসা করি।

২। সংস্কার—এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থগ্রহ দুঃসাধ্য। ইউরোপের পণ্ডিতেরা নানা রকমে নানা অর্থ করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনে সংস্কার শব্দের আর এক স্থানে প্রয়োগ আছে। বৌদ্ধদর্শনোক্ত পাঁচটি স্কন্ধের মধ্যে তৃতীয় স্কন্ধের নামও সংস্কার। এই পাঁচ স্কন্ধের বিষয়ে পরে অনেক কথা আসিবে। নিদান মধ্যে গৃহীত সংস্কার ও স্কন্ধ-মধ্যে গৃহীত সংস্কার উভয়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ আছে, বোধ হয় না। সেই সংস্কার কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গোটা কতক উদাহরণ লওয়া যাক্।

সংস্কারের মধ্যে বৌদ্ধাচার্য্যগণের মতে বায়ান্ন প্রকার ভেদ বর্তমান। বায়ান্নটা নামের উল্লেখে দরকার নাই। কতকগুলির উল্লেখ করিলেই, সংস্কার কি, তাহা কতক বুঝা যাইবে। একটা সংস্কার—স্পর্শ, contact; একটা—বেদনা, স্পর্শ হইতে উৎপন্ন অনুভূতি, sensation বা feeling; আর একটা—চেতনা perception-এর কাছাকাছি। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সংস্কার যথা,—স্মৃতি, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মোহ, লোভ, লজ্জা, করুণা, ঈর্ষ্যা ইত্যাদি। ফলে মানসিক ব্যাপারমাত্রই,—মনুষ্যের যে কিছু চিৎবৃত্তি বর্তমান,—elementary sensations, cogations, volitions, emotions, সমস্তই,—সংস্কার। Elementary কথাটি ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়াছি। মনে কর, সহসা আমার সম্মুখে একটা সাপ উপস্থিত। এ স্থলে কি কি মানসিক ব্যাপার ঘটে? একটা দীর্ঘ, চাকচিক্যশালী, বক্রগতিশীল আকৃতি বা রূপ, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত উত্থিত সবেগাহত ফণা হইতে তীব্র পরিচিত ফোঁ শব্দ—এই রূপ ও এই শব্দের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত সর্পস্মৃতি—সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্যবিচার বা বিতর্ক—তার পর পলায়নপ্রয়াসের উদ্বোধক আশঙ্কা, অর্থাৎ একটা মোহ, পরক্ষণেই সবেগে লম্ফপ্রদান ও পলায়ন। ইংরাজিতে বলিলে, প্রথমে রূপের ও শব্দের sensation; তার পর পরিচিত সর্পের স্মৃতি ও কর্তব্যনির্ণয়রূপ বিতর্ক—এই cognitive ব্যাপার, তার পর আশঙ্কারূপ emotion ও পলায়নচেষ্টার প্রবর্তক volition.

এখন এই sensation বা বেদনা হইতে emotion ও volition পর্য্যন্ত যত

কিছু মানসিক ব্যাপার, সমস্তই সংস্কারের অন্তর্গত। রূপ একটা সংস্কার। রস সংস্কার, শব্দ সংস্কার, অনুভূতি, স্মৃতি প্রভৃতি সংস্কার; ভয়, চেষ্টা প্রভৃতিও সংস্কার। এবং এই সকল সংস্কার একত্র যোগে আমার মনঃশরীর। মনঃশরীরকে ব্যবচ্ছেদ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিলে যে সকল টুক্‌রা পাওয়া যায়, তাহার এক একটি এক এক সংস্কার। এই সংস্কারগুলি বাদ দিলে আমার আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না। এই সংস্কারগুলি একত্র গোছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে, আমি পূর্ণ, জাগ্রত, নানা-উপাধি-ভূষিত মহৈশ্বর্য্যময় অহং হইয়া দাঁড়াই।

এক কথায়, রূপ, রস, গন্ধ, শীত, গ্রীষ্ম, জ্বালা, যাতনা, সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি, স্মৃতি, প্রতীতি, ভয়, হর্ষ, লজ্জা, চেষ্টা, প্রয়াস প্রভৃতি সমস্তই সংস্কার। এবং এই সংস্কারসমষ্টি একত্র করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম অহং, আমি, বা এই মানুষ।

কিন্তু ঠিক তাই কি? কেবল সংস্কারগুলিকে একত্র করিয়া সমষ্টি করিলেই কি গোটা মানুষ বা গোটা অহং হয়? বোধ হয়, ঠিক হয় না; আর একটার দরকার, সেটা সংস্কারের অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ, তাহার নাম বিজ্ঞান; ইহাই পরবর্ত্তী তৃতীয় নিদান।

৩। বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের ইংরাজি নাম এক কথায় consciousness, বেদান্তশাস্ত্রে নাম সংবিৎ। সংবিৎ হয় ত বিজ্ঞান ছাড়াইয়া আর একটু উচ্চে উঠে। কিন্তু এ স্থলে বৃথাতর্কপরিহারের জন্য, বিজ্ঞান, সংবিৎ, consciousness একার্থসূচক ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত সংস্কারসমষ্টির সহিত বিজ্ঞানকে যোগ করিলে, তবে অহং পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়; নতুবা হয় না। কেবল সংস্কারসমষ্টিকে অহং বলিলে একটু ভুল হয়। কেন, দেখাইতেছি। আমার মধ্যে যে সকল রূপ রস গন্ধ, বুদ্ধি স্মৃতি প্রতীতি, শোক হর্ষ লজ্জা ভয় প্রভৃতি আছে, তাহারা যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধশূন্য, স্বস্বপ্রধান হইয়া বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমি আমিত্ব লাভ করিতাম কি না সন্দেহ। এ সকলের অতিরিক্ত আর একটা শক্তি বা চিৎপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে, যাহা এই সকলের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনা করে, সকলকে একত্র টানিয়া আনে, জড়াইয়া রাখে, সকলকে যথাস্থানে বিন্যাস করে; সকলকে সাজাইয়া গোছাইয়া পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া আমাকে নির্ম্মাণ করে। অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, মাংসপেশী, শোণিত প্রভৃতি জড় শরীরের উপাদান; এক অর্থে উহাদের সমষ্টি ও সমবায়ের নামই জড় শরীর। কিন্তু ঐ সকল উপাদানকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া

পরস্পরের সুনিয়ত সম্বন্ধস্থাপন আবশ্যক। যেখানে যাহার দরকার, সেখানে তাহাকে রাখিয়া, যাহার যাহা কার্য্য, তাহার উপর তাহার ভার দিলে, তবে শরীরযন্ত্র নির্ম্মিত হইবে। নাপিত যখন যন্ত্রপ্রয়োগে আমার কেশগুলিকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করে, অস্ত্রচিকিৎসক যখন তাঁহার নির্ম্মম ছুরিকাপ্রয়োগে আমার অঙ্গুলি কয়টিকে কাটিয়া লয়েন, তখন সে কেশ আর সে অঙ্গুলি আর আমার থাকে না। তাহাদের প্রতি তখন যতই সস্নেহ-লোচনে চাহিয়া দেখি না কেন, তাহারা আর আমার নয়। এমন কি, আমি যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবয়বকে আর সঞ্চালন করিতে পারি না, তখন সেই অবয়বের সহিতই বোধ হয় আমার প্রভুত্বসম্বন্ধ আর থাকে না। তখন সে আর আমার নহে; আমি তাহার কর্ত্তা নহি। সেইরূপ সংস্কারগুলি আমার মনঃশরীরের, আমার আত্মার, উপাদান হইলেও, তাহারা যতক্ষণ যথাস্থানে বিন্যস্ত ও আপন আপন কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা আমার থাকে না। এই বিন্যাসের, সন্নিবেশের ও যথাবিহিত কার্য্যে বিনিয়োগের ভার যাহার উপর তাহারই নাম বিজ্ঞান। এবং বিজ্ঞান কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপিত সংস্কারসমষ্টি আমি। সাপ দেখিলাম ও সাপের ছোঁ শব্দ শুনিলাম, কেবল তাহাতে চলিবে না। এই রূপের সহিত এই শব্দের সাহচর্য্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক; এবং পূর্ব্বগত তাদৃশ রূপ ও তাদৃশ শব্দের সহিত স্মৃতিসাহায্যে পারম্পর্য্যসম্বন্ধের স্থাপনাও আবশ্যক। তবে আমি জানিব যে, আমিই একটা সাপ দেখিতেছি, এবং এই সর্পদর্শনরূপ মহা ব্যাপারের, অঘটন-ঘটনা-পটীয়ান্ কর্ত্তার নামই consciousness বা বিজ্ঞান।

৪। নামরূপ—এই পারিভাষিক শব্দটির একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমরা সচরাচর জগৎকে দুইটা ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি; একটার নাম বাহ্যজগৎ, অর্থাৎ আমি-ছাড়া জগৎ; আর একটা অন্তর্জগৎ, বা আমার আত্মময় জগৎ, আমার আমি। আমার জড়শরীরটা আমার অন্তঃশরীরের বাহিরে; প্রকৃতপক্ষে ইহা জড় জগতের অন্তর্গত। সুতরাং সমগ্র জগতের দুই ভাগ,—চলিত ভাষায় একটাকে মনোজগৎ, একটাকে জড়জগৎ বলিলে অধিক দোষ হয় না। এই দুইটা জগৎ আমার প্রত্যক্ষ বিষয়; ইহাদিগকে লইয়াই আমার কারবার; এই দুইকে ছাড়িয়া আর তৃতীয় নাই। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় বলিতে গেলেও সমগ্র জগতের দুই ভাগ; একটা 'নাম',—স্থূল কথায় অন্তর্জগৎ, বা মনোজগৎ। একটা 'রূপ',—স্থূল কথায় বাহ্যজগৎ বা জড় জগৎ। নাম ও রূপ উভয় লইয়া সমগ্র প্রত্যক্ষ জগৎ—উভয় ছাড়িয়া আর তৃতীয় বস্তু

অস্তিত্ব নাই। নাম এবং রূপ একত্রযোগে নাম-রূপ বা সমগ্র জগৎ। বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় এই নামরূপ পদার্থ পাঁচটি স্কন্ধের সমষ্টি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি স্কন্ধ একত্রযোগে নাম। আর ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ, এই চারিটি মহাভূতের সমষ্টি পঞ্চমস্কন্ধ রূপ। বেদনা অর্থে feeling ও sensation মাত্র, অর্থাৎ অনুভূতিমাত্র বুঝিতে হইবে। সংজ্ঞা বলিলে বুদ্ধি প্রতীতি প্রভৃতি, অর্থাৎ perception মাত্র বুঝিতে হইবে। তৃতীয় স্কন্ধ সংস্কারের অর্থ উপরেই বলা গিয়াছে। এ স্থলে বেদনা ও সংজ্ঞা, sensation ও perception ব্যতীত অপর সমস্ত মানসিক ব্যাপার, শোক হর্ষ, ঘৃণা লজ্জা, ভয় ক্রোধ, স্মৃতি, বিচার বিতর্ক, চেষ্টা প্রয়াস, ইত্যাদি সমস্ত cognition, volition ও emotion বুঝিতে হইবে। সত্য বটে, উপরে সংস্কার শব্দ আরও একটু বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদনা ও সংজ্ঞা পর্য্যন্ত সংস্কারের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। এ স্থলে সংস্কারকে বেদনা ও সংজ্ঞা হইতে পৃথক্ করিয়া ধরায় একটু ন্যায়শাস্ত্রমতে দোষ ঘটে। কিন্তু সে দোষটুকু ছাড়িয়া দিলে, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার বলিলে, সমুদয় চিত্তবৃত্তির উল্লেখ হইল। ইহাদের সহিত আবার বিজ্ঞান বা consciousness যোগ করিলে, অন্তঃশরীর বা মনোজগৎ নির্ম্মিত হইল। কিন্তু এই প্রকাণ্ড মনোজগৎ, যাহা লইয়া আমাদের এত কারবার, সুষুপ্তির সময়েও আমরা যে জগৎ ছাড়িয়া পলাইতে পারি না, বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় সেই প্রকাণ্ড মনোময় জগৎ একটা নামমাত্র। কেবল একটা নাম; ইহার প্রকৃত স্বরূপ কেমন, ইহার পরও আর জিজ্ঞাসা করিবে কি?

অন্তর্জগৎ ত একটা নামমাত্রে পরিণত হইল। বাহ্যজগৎ বা জড় জগৎটাই বা আবার কি? ক্ষিত্যাদি মহাভূতের সমষ্টিরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, যাহার মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র বালুকাসমান, যাহা মহাকাল ও মহাকাশ ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, যাহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতার সময় আমাদের রসনাপ্রান্তে বাগ্দেবীর আবির্ভাব হয়, সেই প্রকাণ্ড জড়জগৎ বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় একটা রূপমাত্র—একটা প্রতীতিমাত্র;—ইংরাজিতে বলিলে mere appearance বা phenomenon. বৌদ্ধাচার্য্যকে যাহা ইচ্ছা গালি দিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে জড়বাদী বলিতে পারিবে না।

যে সকল সুধীজন একালের বৈজ্ঞানিকগণকে জড়বাদী বলিয়া গালি দেন, তাঁহারা স্বয়ং জড়বাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কি না, গভীর সংশয়ের

বিষয়। যাঁহারা একমুখে বৈজ্ঞানিককে গালি দেন, পরক্ষণেই দেখিতে পাই, তাঁহারা অবিকৃতচিত্তে একটা জড় জগতের বা বাহ্যজগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও সংশয়শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, কৃপার সহিত তাঁহাদিগকে বলিতে বাধ্য যে, তাঁহাদের স্বীকৃত যে জড়জগতের প্রতি তাঁহারা এত ঘৃণা দেখান, সেই জড় জগৎ আদৌ অস্তিত্ববিহীন, তাহা তাঁহাদের একটা কল্পিত বিভীষিকা। তাঁহাদের বিকৃত কল্পনা একটা পিশাচমূর্ত্তির গঠন করিয়া সেই পিশাচের আতঙ্কে কাতর হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছে; জ্ঞানীর চক্ষে সেই পিশাচের অস্তিত্ব নাই, তাঁহাদের নিরর্থক আতঙ্কও কেবল হাস্যরসের ও কৌতুকরসের প্রণোদক। বিজ্ঞান নিশ্চয় জানে, ক্ষিত্যাদি মহাভূত ভূতও নয়, পিশাচও নয়, উঁহা কেবল একটা রূপ বা appearance; বৌদ্ধদর্শনের ও হিন্দুদর্শনের গৌরব যে, ইউরোপের বিজ্ঞান এত দিনে যে ভ্রান্তির অন্ধকার হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সে কত শত বৎসর পূর্ব্বে সেই তামস তিমির নষ্ট করিয়া সম্যক্ দৃষ্টির দ্বারা দর্শন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যিনি মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি জানেন যে, জড় জগৎ বলিয়া আদৌ একটা স্বতন্ত্র জগৎ নাই। উহাকে প্রয়োজনবিশেষে সুবিধার নিমিত্ত আমরা বাহ্যজগৎ বলিয়া ধরিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের বাহিরে নহে, উঁহা একটা রূপ, একটা প্রতীতি-মাত্র; উহা আমাদের অন্তঃশরীরেরই উপাদান। অন্তর্জ্জগৎ ও বাহ্যজগৎ, এই দুই ভাগে সমগ্র জগৎকে বিভক্ত করিলে, সাংসারিক ও ব্যাবহারিক কাজে সুবিধা হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপ ভাবে বিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে; দর্শনশাস্ত্র ঐরূপ বিভাগ স্বীকার করিতে সম্মত হইবে না। বিজ্ঞানবিরোধী জড়বাদী যাহাকে বাহ্য জগৎ বা জড়জগৎ আখ্যা দেন, তাহা আমারই আত্মার একটা অংশ—একটা উপাদান। একটার বেশী দুইটা জগৎ নাই, এবং সেই জগৎ আমি স্বয়ং। তোমরা যতই বল না, আমি বিশ্বমধ্যে এক আমার ভিন্ন অন্য কিছুর ও কাহারও অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। তোমরাও অস্তিত্বহীন, এবং তোমাদের কল্পিত ও অকারণে ঘৃণিত জড়জগৎ, তাহাও আমার নিকট অস্তিত্বহীন। আমি একাকী সম্রাটের মত তোমাদের কল্পিত অনন্ত মহাকাশ ও অনাদি মহাকাল ব্যাপিয়া আছি। এই 'পুদ্গল' পুরুষ একেশ্বর আমিই বা আবার কীদৃশ পদার্থ? না—একটা নামের ও একটা রূপের সমষ্টিমাত্র।

৫। ষড়ায়তন—ষড়ায়তন শব্দের অর্থ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়স্বরূপ

আমাদের শরীর; ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অকস্মাৎ একটি বাড়িয়া গেল কেন, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। চলচরাচর ও লৌকিক ভাষায় জড় শরীর বলিলে যাহা বুঝায়, ষড়ায়তন অর্থে তাহাই বুঝিব।

৬। স্পর্শ—অর্থাৎ ষড়ায়তন বা জড় শরীরের সহিত তোমাদের বাহ্য জগতের স্পর্শ বা সম্বন্ধ।

৭। বেদনা—বেদনা শব্দের অর্থ পূর্ব্বেই কয়েকবার উল্লিখিত হইয়াছে। সহজ ভাষায় বেদনা অর্থে স্পর্শজাত অনুভূতি—রূপ রস গন্ধাদির অনুভূতি অথবা আরও একটু অর্থবিস্তৃতি করিয়া তোমাদের বাহ্য জগতের অনুভূতি। ইংরাজিতে feeling বলা যাইতে পারে।

৮। তৃষ্ণা—তৃষ্ণা অর্থে কল্পিত বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জগতের স্পর্শ ও সম্বন্ধ বজায় রাখিবার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি। ইংরাজিতে এক কথায় desire বা appetite বলা যাইতে পারে।

৯। উপাদান—বৌদ্ধদর্শনের ভাষায় উপাদান অর্থে উপকরণ নহে; উপাদানের অর্থ কতকটা তৃষ্ণারই মত। স্থূল হিসাবে উপাদান বলিলে কতকটা অনুরাগ বা প্রবল আসক্তির ভাব আসে।

১০। ভব—ইংরাজিতে being, becoming, existence; বাঙ্গালায় সত্তা, অস্তিত্ব।

১১। জাতি—জন্ম, উৎপত্তি। সহজবোধ্য।

১২। জরামরণ—ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিদান কয়টির অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম। শাস্ত্রসম্মত ও সর্ব্ববাদিসম্মত অর্থ দিবারও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। পারিভাষিক শব্দার্থ সম্বন্ধে তেমন প্রবল মতভেদ ত বর্ত্তমান নাই। কিন্তু এই নিদানশৃঙ্খলের প্রকৃত তাৎপর্য্য লইয়া যথেষ্ট বিসংবাদ চলিতে পারে। এইখানেই নানা মুনির নানা মত। এখন সেই শৃঙ্খলার গ্রন্থি আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

একটা বিষয়ে সকলের একমত। নিদানের শৃঙ্খলা বা সূত্র একটা অভিব্যক্তির প্রণালীমাত্র, ইহা প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে। অভিব্যক্তি শব্দ ইংরাজি Evolution অর্থে ব্যবহার করিলাম। অভিব্যক্তি বটে, তবে কিসের অভিব্যক্তি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

অভিব্যক্তি জরামরণের। জরামরণ আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই চেষ্টা করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের ধর্ম্মশাস্ত্রেও জরামরণের

উৎপত্তি অর্থাৎ Origin of evil একটা প্রধান সমস্যা। খ্রীষ্টানেরা একটা প্রাচীন উপন্যাসের সাহায্যে এই তত্ত্বের অক্লেশে ও এক নিশ্বাসে মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন তত সহজে মীমাংসা করিতে পারে না। বোধি-দ্রুমমূলে ভগবান্ তথাগত যে মীমাংসার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমার বোধ হয়, তেমন মীমাংসা অন্য কোথাও আর নাই। জরামরণের মূল অবিদ্যা, অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, তাহা হইতে ষড়ায়তন, ইত্যাদি ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত জরামরণ উৎপন্ন। শিকলের এক প্রান্তে অবিদ্যা, অন্য প্রান্তে জরামরণ; মধ্যস্থলে অন্যান্য নিদান। এখন এই সূত্র বা শৃঙ্খল ধরিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে অগ্রসর হইতে হইবে। আচার্য্যেরা ও পণ্ডিতেরা কিরূপ অগ্রসর হয়েন, দেখা যাউক।

ব্রহ্মসূত্রের টীকাকার গোবিন্দনাথের মতে নিদানশৃঙ্খলা মনুষ্যজীবনের ইতিহাসমাত্র।

মাতৃগর্ভে ভ্রূণমধ্যে মনুষ্য-জীবনের আরম্ভ। প্রথম ভ্রূণমধ্যে কতক-গুলি সংস্কার, অর্থাৎ সামান্য চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়; সেইখানেই বোধ হয় তাহার সামান্য সুখদুঃখাদি অনুভূতির সঞ্চার হয়। জীবনসঞ্চারের প্রথম-লক্ষণপ্রকাশের সময়েই ভ্রূণ ক্লেশ ও আরাম এই উভয়ের প্রভেদ করিতে শিখে। কেন শিখে? ক্লেশ ও আরাম কি বাস্তবিক পৃথক্ পদার্থ; বস্তুতই কি সংসারে কতকটা কষ্ট ও কতকটা আরাম পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র হইয়া বর্ত্তমান আছে? না,—এই প্রভেদানুভূতির মূল অবিদ্যা বা অজ্ঞান বা ভ্রান্তি। সুখ দুঃখ অনিত্য, অসৎ, ব্যবহারিক পদার্থ; কেবল অজ্ঞানের বশে বা ভ্রান্তির বশে, ভ্রূণ উভয়ে প্রভেদ দেখে। ক্রমে সংস্কারগুলি কতক পরিস্ফুট হইয়া আসিলে বিজ্ঞানের সঞ্চার; অর্থাৎ পূর্ব্বে সুখ দুঃখ ছিল, কিন্তু ভ্রূণ যেন তাহা জানিয়াও জানিত না, এখন কতকটা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে; ক্রমে তাহার নাম-রূপের বিকাশ। নামরূপ কতকটা যেন সূক্ষ্মশরীর গোছের, সংস্কার ও বিজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ। ক্রমে ষড়ায়তন অর্থাৎ অবয়ববাদিগণের জড় শরীর কতকটা পূর্ণ আকার ধারণ করে, তাহাতে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য আরম্ভ হয়। তার পরেই সেই সূক্ষ্মশরীরের ক্রমে বাহ্যজগতের সহিত 'স্পর্শ' ঘটে; এখনও ভ্রূণ ভূমিষ্ঠ হইয়াছে [illegible] বার প্রয়োজন নাই। মাতৃগর্ভই এখন তাহার বাহ্য জগৎ; সেই জগতের সহিত তাহার স্পর্শে তাহার 'বেদনা' বা নানাবিধ অনু-

ফুটি ফুটিয়া উঠে। বেদনা হইতে তৃষ্ণা অর্থাৎ আরাম উপভোগের ও দুঃখ-পরিহারের আকাঙ্ক্ষা; তাহা হইতে 'উপাদান' অর্থাৎ সুখলাভের ও দুঃখ-পরিহারের জন্য বিবিধ প্রযত্ন, চেষ্টা ও প্রয়াস। এই অবস্থায় উপনীত হইলে 'ভব'; এখন ভ্রূণের মনুষ্যত্ব একরকম পূর্ণতা লাভ করিল। এই সময়েই বোধ করি সে মাতৃগর্ভ হইতে বাহিরে আসিয়া 'জাতি' অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে মনুষ্যজন্ম লাভ করে। বেচারার 'জাতি'-লাভের ফল জরামরণ।

এই ব্যাখ্যাটা নিতান্ত মন্দ শুনায় না। বুদ্ধদেব যেন একটা ফিজিয়লজির তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আধুনিক ফিজিয়লজি বা শরীরবিদ্যা বুদ্ধদেবের উদ্ভাবিত শারীর তত্ত্ব স্বীকার করিবে কি না, জানি না, কিন্তু এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে, এইরূপ শারীর তত্ত্বের আবিষ্কারে শাক্য মহাশয়ের তত দূর শ্রম পাইবার দরকার ছিল না। এই ব্যাখ্যা বৌদ্ধাচার্য্যেরা সকলে স্বীকার করেন না। মহাযানী সম্প্রদায় সকলের মধ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ইউরোপের ওলদেনবর্গ, রিস্ ডেবিডস্, চাইল্ডার্স প্রভৃতি পণ্ডিতেরাও সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বনে নানারূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের কলিকাতার ডাক্তার ওয়াডেল অজন্টাগ্রামে গুহামধ্যে বৌদ্ধগণের ভবচক্রের এক চিত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই ছবিতে বারটি নিদানের পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। ওয়াডেল সাহেব তিব্বত হইতেও ভব-চক্রের ছবি আনিয়াছেন, এবং তিব্বতের লামাগণের প্রদত্ত একটা ব্যাখ্যা শুনিয়া আসিয়াছেন। এই চিত্র উল্লিখিত গোবিন্দদাস-প্রদত্ত ব্যাখ্যারই কতকটা সমর্থন করে। সেই ছবির একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই কতকটা বুঝা যাইবে।

ভবচক্র বা সংসার-চক্রের প্রতিকৃতি একখানি চাকা; চাকার কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ নাভিদেশে কপোত, সর্প ও শূকরের মূর্ত্তি রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেন্দ্রে রাখিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে বারটি ঘরে দ্বাদশ নিদানের রূপকাত্মক মূর্ত্তি মনুষ্যজীবনের ইতিহাস দেখাইতেছে। প্রথম ঘরে এক ব্যক্তি অন্ধ উষ্ট্রকে চালিত করিতেছে; উষ্ট্র অবিদ্যার প্রতিরূপ। চালক স্বয়ং কর্ম্ম। জন্মের আরম্ভে মনুষ্য পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মকর্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের ন্যায় অবিদ্যার ঘোরে ঘুরিয়া বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় ঘরে কুম্ভকাররূপী কর্ম্ম সংস্কার-রূপ মসলার বা কর্দ্দমের অনুভবের অবলম্বনীয়রূপ ঘটের নির্ম্মাণ করিতেছে; তৃতীয় ঘরে বানরমূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যে বিজ্ঞানের [illegible] বুঝাইতেছে। চতুর্থ ঘরে

বৈদ্য রোগীর নাড়ী টিপিতেছেন, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মনুষ্য বা 'নামরূপ' বাহ্যজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্য যেন ব্যাকুল হইয়াছে। পঞ্চম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে দুইটা চোখ উঁকি মারিতেছে, অর্থাৎ 'ষড়ায়তন'-রূপ ইন্দ্রিয়সমষ্টির ভিতর হইতে মনুষ্য বাহ্যজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় ভ্রূণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যের সহিত বাহ্য জগতের কারবার রীতিমত আরম্ভ হইল। ছয়ের ঘরে আলিঙ্গনবদ্ধ দম্পতী মনুষ্যের সহিত জগতের, অন্তর্জগতের সহিত বহির্জগতের স্পর্শ সূচনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা, বা দুঃখাদি অনুভূতির আরম্ভ; সাত চিত্রে বাহির হইতে নিক্ষিপ্ত তীর চক্ষুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই অনুভূতির পরিচয় দিতেছে। আটের ঘরে সুরাপানরত মনুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা বাসনার উৎপত্তিসূচক। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; সংসারের গাছ হইতে আগ্রহের সহিত ও আসক্তির সহিত ফল সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত, সেই জন্য নয় ঘরে ফলাকর্ষী মনুষ্য উপাদান বা সংসারাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি। দশম ঘরে নবোঢ়া বধূর মূর্ত্তি 'ভব' অর্থাৎ মনুষ্যের সংসারে গৃহস্থ-রূপের অস্তিত্বের পরিচায়ক। মানুষ এখন ঘরকন্না পাতিয়া গোটামানুষ হইয়াছে। তারপর একাদশ চিত্র নবপ্রসূত শিশুসহ জননীর মূর্ত্তি। সন্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থ বুঝাইতেছে। সন্তানের জন্মের পর মনুষ্যের আর কোন কাজ নাই। উপসংহারে জরামরণ; দ্বাদশ ঘরে 'বাঁশের দোলার' উপরে শয়ান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্রের এই ব্যাখ্যা অতি প্রাচীন; অজন্টার গুহামধ্যের ভাস্কর কার্য্য সকল বার তের শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। তিব্বতে প্রসিদ্ধি আছে যে, মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা নাগার্জ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই ব্যাখ্যার বয়স প্রায় দুই হাজার বৎসর দাঁড়ায়। একে প্রাচীন, তাহাতে সেকালের ও একালের অনেক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের অনুমোদিত, কাজেই এই ব্যাখ্যার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে শঙ্কা হয়। ব্যাখ্যার মোটের উপর দাঁড়ায় এই। আমরা কথায় কথায় মানুষের দশ দশার উল্লেখ করিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা দশের উপর দুই বাড়াইয়া বলিয়া থাকেন, মানুষের দ্বাদশ দশা; প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। সেক্সপীয়র মনুষ্য-জীবনকে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সহিত একস্থানে তুলিত করিয়াছেন; মানবশিশুর 'mewling and pewling in its mother's arms' অবস্থায় অভিনয়ের আরম্ভ, এবং বার্দ্ধক্যে

"sans eyes, sans teeth" অবস্থায় অভিনয়ের যবনিকাপাত; সেই বৃত্তান্ত যাহারা একবার পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ কবিত্বের জন্য বুদ্ধদেবকে শেক্সপীয়রের অনেক নিম্নে বসাইবেন, এবং বৌদ্ধমন্দিরমধ্যে ইংরাজ কবির মূর্ত্তি কেন বুদ্ধমূর্ত্তির স্থান গ্রহণ না করিবে, তাহার জন্য লঙ্কার কোটি মনুষ্যের কৈফিয়ত চাহিতে পারিবেন।

আমার বিবেচনায় প্রতীত্যসমুৎপাদ ব্যাপারটা মনুষ্যজীবনের ইতিহাস বা অভিব্যক্তি বটে, কিন্তু সেই ইতিহাস ও অভিব্যক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীর। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এবোলুশন থিওরির সহিত মিলাইতে গিয়া মহাগোলে পড়েন। তাঁহাদের একদেশদর্শিতাতেই খোর্ত্ত-বড় পান্ডিত্যভ্রমে পরিণত হইয়াছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রে আজ-কাল অভিব্যক্তিবাদের জয়জয়কার। বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক নানা স্থানে সেই অভিব্যক্তিবাদের সহিত ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। জাগতিক ব্যাপারমাত্রেই অভিব্যক্তিনিরূপণ বিজ্ঞানের প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৌরজগতের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য নীহারিকাবাদ প্রভৃতি বর্ত্তমান; পৃথিবীর গঠনে অভিব্যক্তি বুঝাইতে ভূবিদ্যা ব্যস্ত। জীবকুলে অভিব্যক্তির প্রণালী ডারউইন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যদেহের অভিব্যক্তি বুঝান ফিজিয়লজি শাস্ত্রের একটা প্রধান অঙ্গ এম্ব্রিয়োলজি বা ভ্রূণবিদ্যা। অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি বুঝাইবার জন্য স্পেন্সার সাহেব বড় বড় দুইখণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। মনুষ্যসমাজের অভিব্যক্তি বুঝাইতে বড় বড় দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক প্রভৃতি নিযুক্ত। পাণিনি হইতে মোক্ষমূলর পর্য্যন্ত শাব্দিক পণ্ডিতেরা ভাষার অভিব্যক্তি-আবিষ্কারে নিযুক্ত। এ সমস্তই বিজ্ঞানের বিষয়; এক কথায় এই সকল অভিব্যক্তিকে বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি বা ব্যবহারিক অভিব্যক্তি নাম দিতে পারা যায়। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আর এক রকমের অভিব্যক্তি আছে—তাহাকে দার্শনিক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কেহ যদি পারমার্থিক অভিব্যক্তি বলিতে চাহেন, বলুন; সম্প্রতি নাম লইয়া বিতণ্ডার অবসর নাই। আমাদের হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি এইরূপ দার্শনিক অভিব্যক্তি। সাংখ্যদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে যে অভিব্যক্তি আছে, তাহা এই দার্শনিক অভিব্যক্তি। আমার বোধ হয়, বৌদ্ধদর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদও সেই দার্শনিক অভিব্যক্তিমাত্র; সুতরাং ইহা হিন্দুদর্শনের অভিব্যক্তি হইতে অভিন্ন। ইউরো-

পীয় দর্শনশাস্ত্রে আমার অভিজ্ঞতা নাই। সে সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে গেলে নিতান্ত অনধিকারচর্চ্চা হইবে, হয় ত উপহাস্ত হইয়া পড়িব। কিন্তু আমার যতটুকু ধারণা আছে, তাহাতে বোধ হয়, দেকার্ট, বার্কলি, হিউম, কান্ত প্রভৃতি দার্শনিকেরা অন্তর্জ্জগতের সহিত বাহ্যজগতের সম্বন্ধনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া এই দার্শনিক অভিব্যক্তির আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন [illegible]। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে অনেকটা সেই পথে অগ্রসর হইতে দেখি। হক্সলী ও ক্লিফোর্ড যেন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন। গণিতবিৎ কার্ল পীয়ার্সনের নাম এখনও তত বিখ্যাত নহে; আমার বোধ হয়, তিনি আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া প্রায় খাঁটি বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ মতে পৌঁছিয়াছেন। আমার সন্দেহ হয়, বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সহিত বৌদ্ধদর্শনের তেমন প্রভেদ নাই। অদ্বৈতবাদকে একালের পণ্ডিতসমাজ বড় পছন্দ করেন না। চিরপোষিত সংস্কারগুলির মূলে যাহাতে একবারে কুঠার অর্পণ করিতে চায়, চিরাভ্যস্ত চিন্তাপ্রণালীকে যাহাতে একবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়, তাহার সহিত সম্প্রীতিস্থাপন বড় সহজ কর্ম্ম নহে। এদেশেরও অনেক পণ্ডিত ও সম্প্রদায়স্থাপয়িতা শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বেদান্তের মায়াবাদ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত ও [illegible] শাস্ত্র বলিয়াই নিন্দিত হইয়া থাকে। এ স্থলে সে সকল বিতণ্ডার প্রবেশ [illegible]না। প্রতীত্যসমুৎপাদের অর্থ আমার নিকট যেরূপ বোধ হয়, যথা-[illegible]হিত বিনয়ের সহিত ও আশঙ্কার সহিত তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমরা লৌকিক বা ব্যাবহারিক হিসাবে সমগ্র জগৎকে অন্তর্জ্জগৎ বা মনো-[illegible] বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকি। জড়জগৎ [illegible] ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া আমাদের পুরোভাগে বিস্তৃত ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রচলিত বিশ্বাস। অন্তর্জ্জগৎ তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহার সহিত কারবার ও দেনা লেনা করে। আমার জীবনকাল ব্যাপিয়া এই অন্তর্জ্জগতের সহিত জড় জগতের কারবার ও আদানপ্রদান চলে। বাহ্যজগৎ একটা প্রতীয়মান রূপ লইয়া আমার অন্তর্জ্জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়। জড় পদার্থের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জানি না; কিন্তু বস্তুতঃ জড় পদার্থের যে রূপ আমি দেখিতে পাই, সেই রূপেই জড় আমার নিকট পরিচিত। জড় বলিয়া আমার আত্মা হইতে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট একটা পদার্থ আছে; সেই জড়ের প্রতীয়মান স্বরূপ জড় জগৎ। আমার আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ; আত্মার স্বরূপ

কি, তাহা জানি না ; তবে মনন, চিন্তন, হিংসা, প্রীতি, চেষ্টা প্রভৃতি আত্মার প্রত্যক্ষ স্বভাব।

প্রচলিত মত এইরূপ। মোটের উপর দুইটা পদার্থ ; আমার ভিতরে আত্মা ; আমার বাহিরে জড়। আত্মা কালব্যাপী ; জড় দেশব্যাপী ও কালব্যাপী। উভয়ে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রধান। আত্মা, ভোক্তা, কর্ত্তা, মননশীল, চিন্তনশীল, চেষ্টাপরায়ণ। জড় আত্মার ভোগ্য ; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন থাকিয়া স্বতন্ত্রভাবে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে। যতদিন মনুষ্যের জীবন, ততদিন বোধ হয়, আত্মা ও জড় উভয়ের ভোক্তৃ-ভোগ্য-সম্বন্ধ বজায় থাকে ; মৃত্যুর পর আত্মার সহিত জড়ের কোন সম্বন্ধ থাকে কি না, সে বিষয়ে মতভেদ বর্ত্তমান আছে।

প্রচলিত মত এই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত অন্যরূপ। যুক্তির নিকট জড় রূপরসগন্ধাদির সমবায়মাত্র, এবং রূপ রস গন্ধ আত্মারই একদেশমাত্র। আত্মার একাংশ যেমন সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় হিংসা দ্বেষ মনন চিন্তন, অন্য অংশ সেইরূপ রূপরসাদি। সুখ দুঃখ লজ্জা ভয় মনন চিন্তন রূপ রস সকলের সাধারণ দার্শনিক সংজ্ঞা 'সংস্কার'। এই সংস্কারগুলি একত্র করিয়া যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলেই আত্মা প্রস্তুত হয়। কয়েকখানি কাষ্ঠখণ্ডকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা তাহাদের নেমি, অর, নাভি প্রভৃতি নাম দিয়া থাকি ; এবং [illegible]বেশের পর যে দ্রব্য দাঁড়ায়, তাহাকে রথচক্র আখ্যা দিয়া থাকি। এক একখানা [illegible] রথচক্র বলা যায় না ; কাষ্ঠ কয়খানা একটা নির্দ্দিষ্ট বিধানে সাজাইলে, [illegible] নাম রথচক্র হয়। সেইরূপ সংস্কারগুলি অর্থাৎ মনন চিন্তন, রাগ দ্বেষ, সুখ দুঃখাদি মানসিক ব্যাপারগুলিকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করিলে, সেই সম[illegible] হইয়া দাঁড়ায়। আবার কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে একে একে ছাড়াইয়া ল[illegible] রথচক্র বলিয়া স্বতন্ত্র পদার্থ কিছু অবশিষ্ট থাকে না, সেইরূপ সংস্কারগুলিকে একে একে সরাইয়া ফেলিলেও আত্মার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আত্মা সংস্কার সকলের সমষ্টীকরণে নির্ম্মিত। আবার সেই সমষ্টীকরণ কাজটা কিরূপে সম্পন্ন হয়? উত্তর, বিজ্ঞানের সাহায্যে। বিজ্ঞান কি? প্রত্যুত বিজ্ঞানও একটা সংস্কারমাত্র, একটা চিত্তবৃত্তিমাত্র। কিন্তু ইহার কাজ অন্যান্য সমস্ত সংস্কারকে সাজাইয়া গোছাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশ করিয়া স্থাপন। বিজ্ঞান যদি এই কার্য্য সম্পাদন না করিত, তাহা হইলে সংস্কারগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম্বন্ধশূন্য হইয়া থাকিত, এ উহাকে চিনিত না, ইহার সহিত উহার কোন

পরিচয় বা সম্পর্ক থাকিত না ; মনুষ্যের অন্তর্ভূত মনুষ্যাত্মা বা 'নারায়ণ' অস্তিত্ব-হীন হইত।

মনুষ্যাত্মার বা নারায়ণের একাংশ জড়জগৎ ; কতকগুলি রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের, অর্থাৎ কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টির নাম জড়জগৎ। জড়জগতের অন্য স্বাধীন অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্তু এই রূপরসগন্ধাদির সহিত আবার সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধাদি অন্যান্য সংস্কারের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আগুনের স্পর্শে আমাদের বেদনা ও জ্বালা বোধ হয় ; সূর্য্যালোকে আমাদের চৈতন্যসঞ্চার ও স্ফূর্ত্তি হয় ; বাঘ দেখিলে আমাদের আতঙ্ক ও পলায়নেচ্ছা ঘটে ; সঙ্গীতশ্রবণে আমাদের আনন্দ হয়। রূপশব্দস্পর্শাদির সহিত এই স্থলে চৈতন্য স্ফূর্ত্তি আতঙ্ক আনন্দ প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধের স্থাপনকর্ত্তা বিজ্ঞান ; অথবা যখন এই সম্বন্ধ স্থাপিত দেখি, তখনই বলি, বিজ্ঞানের আবির্ভাব ও বিকাশ হইয়াছে। উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না থাকিলে বিজ্ঞা-নেরও অস্তিত্ব থাকিত না। আত্মার একাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় অন্তর্জগতের সহিত অপরাংশের, অর্থাৎ লৌকিক ভাষায় বাহ্য জড় জগতের এই সম্বন্ধ না থাকিলে, বিজ্ঞান থাকিত না। আবার সেই বাহ্যজগতে বা রূপ রস শব্দাদির মধ্যেও নানাবিধ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ আছে, সূর্য্য চন্দ্রের সহিত আবার পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে ; পৃথিবী সূর্য্য [illegible] সহিত আবার জীব জন্তুর মনুষ্যদেহের সম্বন্ধ আছে। ফুলের [illegible] ও গন্ধ ও স্পর্শ একত্রসম্বন্ধ হইয়া ফুল আখ্যা পায় ; অগ্নির স্পর্শ ও রূপ একত্রসম্বদ্ধ হইয়া অগ্নি আখ্যা পায় ; অম্লজান ও উদজান নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে [illegible] হইয়া জল আখ্যা পায় ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল সম্বন্ধের স্থাপনাও বিজ্ঞানের কাজ। তোমরা যাহাকে প্রাকৃতিক নিয়ম বল, যে সকল নিয়মের বলে জড় জগতের কার্য্য চলিতেছে, সেই সকল নিয়ম বিজ্ঞান কর্ত্তৃকই স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল সংস্কারের রূপ রস গন্ধ একত্র সজ্জিত হইয়া 'জড় জগতের' সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তাহারই নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। এই সম্বন্ধগুলি বর্ত্তমান না থাকিলে প্রাকৃতিক নিয়মও থাকিত না, জড়জগতের অস্তিত্বও অসম্ভব হইত, এবং বিজ্ঞা-নেরও অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা নহে, বিজ্ঞান প্রাকৃতিক নিয়মের স্রষ্টা ও স্থাপয়িতা। মনে রাখিবেন, বিজ্ঞান অর্থে এখানে science নহে ; বিজ্ঞান অর্থে এখানে একটা চিত্তবৃত্তি বা

সংস্কার, সংস্কারের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সংস্কার; ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ consciousness ভিন্ন আর কিছু সম্প্রতি খুঁজিয়া পাইতেছি না।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বিজ্ঞান এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কিরূপে? এই সম্বন্ধ স্থাপন করে কেন? এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে মনুষ্যাত্মার অস্তিত্ব থাকিত না; এবং জগতে মনুষ্যাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নাই, সুতরাং জগতের অস্তিত্ব শূন্যে পর্য্যবসিত হইত, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু এই সম্বন্ধস্থাপনের কারণই বা কি? কিরূপেই বা এই সম্বন্ধ স্থাপিত হয়? এই প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতে গিয়া মনুষ্য পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসে; কখনও বা ঈশ্বরাদি বিভীষিকার কল্পনা করিয়া প্রত্যাসিত হয়। বিজ্ঞান সংস্কারগুলিকে সজ্জিত করিয়া নামরূপের নির্ম্মাণ করিল কেন? কাষ্ঠখণ্ডগুলি সজ্জিত হইয়া রথচক্রে পরিণত হইল কিরূপে? বৌদ্ধদর্শনের উত্তর, এই ব্যাপারের মূলে অবিদ্যা। এই বাক্যের স্পষ্ট অর্থ কি, ঠিক্ বলিতে সাহস করিতেছি না। অবিদ্যা অর্থে হয় অজ্ঞান বা জ্ঞানাভাব; অথবা ভ্রান্ত জ্ঞান। প্রথম অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, কেন হয়, তাহা জানি না; উহা খাঁটি আগ্নষ্টিকের কথা। দ্বিতীয় অর্থ যদি ঠিক্ হয়, তাহা হইলে বৌদ্ধদর্শন বলেন, উহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। সংস্কারগুলি সজ্জিত আছে, তুমি দেখিতেছ; সজ্জিত সংস্কারসমূহ বিজ্ঞানযোগে নামরূপের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও বোধ হইতেছে; কিন্তু সবই মিথ্যা; সবই অলীক কল্পনা। এই অর্থ ঠিক্ হইলে বৌদ্ধদর্শন বৈদান্তিক মায়াবাদ। যাহাই হউক, উপরে বলিয়াছি, অজ্ঞান ও ভ্রান্ত জ্ঞান, উভয়ের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ দুরূহ। মায়াবাদ ও শূন্যবাদ ও অবিদ্যাবাদ, প্রায় একই স্থানে অবস্থিত।

এখন কতকটা কিনারা পাওয়া গেল। মূলে অবিদ্যা; জ্ঞানাভাব বা ভ্রম। অবিদ্যাবলে সংস্কারগুলি বিজ্ঞান কর্ত্তৃক সজ্জিত ও যথাবিন্যস্ত হইয়া নামরূপের অর্থাৎ আত্মার বা জগতের সৃষ্টি করে। আত্মা ছাড়িয়া ভিতরে জগৎ নাই; বিশ্ব আত্মময়। নামরূপের বা জগতের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ষড়ায়তন অর্থাৎ আত্মার অন্তঃশরীর অন্তর্জগৎ, বাহ্যশরীর বাহ্যজগৎ বা জড়জগৎ হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহারা কি বাস্তবিকই স্বতন্ত্র? না, এই স্বাতন্ত্র্যবোধের স্রষ্টা বিজ্ঞান; এই স্বাতন্ত্র্যবোধের হেতু অবিদ্যা, অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তি। এখন বিজ্ঞানের সম্বন্ধস্থাপনা কার্য্য ক্রমেই চলিতে থাকে; অন্তর্জগতের সহিত স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান বাহ্যজগতের আদানপ্রদান ক্রমেই চলিতে থাকে; বিবিধ বিষয়ের আবিষ্কারের সহিত মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ লাভ করে।

এই ব্যাপারটা "স্পর্শ"। স্পর্শ বা বাহ্যজগতের সহিত অন্তর্জগতের সহিত আদান প্রদানে বেদনা, অর্থাৎ বিবিধ অনুভূতিরূপ সংস্কারের নূতন নূতন বিকাশ। জগতে রূপরসগন্ধাদির নূতন নূতন স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাব। তাহার ফলে 'তৃষ্ণার' উদ্গম; বাহ্যজগতের সহিত কারবার বজায় রাখিবার, আদান প্রদান চালাইবার আকাঙ্ক্ষার আবির্ভাব। তাহা হইতে 'উপাদান'—জগতের সহিত আসক্তিস্থাপন। এই সমস্ত ব্যাপারকে ইংরাজিতে differentiation বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বাহ্যজগৎ অন্তর্জগৎ হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে, উভয়ের মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, উভয়ের মধ্যে আসক্তি স্থাপিত হইয়াছে। এখন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও বলিতে পারিতাম না যে, মনুষ্যত্ব পূর্ণ। এখন বলিতে পারিতেছি, মনুষ্যত্ব পূর্ণ; এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির নাম 'ভব'। যেখানে 'ভব', সেইখানেই 'জাতি'—মনুষ্যজন্ম। মনুষ্যজন্মের অপর অর্থ ভগবান্ সিদ্ধার্থের মতে জরামরণ। জরামরণের সহকারী শোক পরিদেবন দুঃখ দৌর্ম্মনস্য।

এই শেষ কথাটা একটু বিচার্য্য। বৌদ্ধদর্শন ও আধুনিক হিন্দুদর্শন একবাক্যে মানবজীবন দুঃখময় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, এবং সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণকেই পরমপুরুষার্থ জানিয়া, তাহার উপায়-অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এইখানেই একদেশদর্শিতা। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ও হিন্দুসম্প্রদায় সকলের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সহিত সনাতন বেদমূলক ব্রাহ্মণরক্ষিত আর্য্যধর্ম্মের এইখানে প্রভেদ। এবং কেবল এই প্রভেদের জন্যই বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুগণের বিবিধ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সমাজদ্রোহে পরিণত হইয়াছে। যে ধর্ম্মে মনুষ্যজীবনের কেবল আঁধারের ভাগটাই দেখে, আলোর ভাগ দেখে না; কোনরূপে জীবনের যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণলাভই পরমপুরুষার্থ বলিয়া উপদেশ দেয়, তাহা সমাজকে [illegible] রাখিতে পারে না; তাহা ধর্ম্ম নহে, অধর্ম্ম। সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণশাসিত হিন্দুসমাজ বুদ্ধদেব ও তাঁহার পথানুবর্ত্তী সংস্কারকগণের প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িক অধর্ম্মকে সম্যক্ প্রশ্রয় দেয় নাই; তাই সহস্র প্রচারক ও সংস্কারকের হস্তে ভগ্ন খণ্ডিত বিদীর্ণ ও বিকৃত হইয়াও এই পরাধীন অধঃপতিত হিন্দুজাতি আপনার জাতীয় অস্তিত্ব অব্যাহত রাখিয়া মনুর সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

একনিষ্ঠ বিবাহ।

একণে যে সকল জাতি পৃথিবীতে সভ্যতম বলিয়া পরিচিত, তাহারা সকলেই একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ, অর্থাৎ এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে দারান্তর গ্রহণ করে না, বা সামাজিক বিধানানুসারে করিতে পায় না। যে সকল সভ্য জাতির সামাজিক নিয়ম বা শাস্ত্রবিধান একাধিকস্ত্রীগ্রহণের প্রতিকূল নহে, তাহারাও প্রায়শঃ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। একনিষ্ঠ বিবাহপ্রণালীই এক্ষণে সমুদায় সভ্য-সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও অবলম্বিত।

সভ্য সমাজ কর্তৃক অবলম্বিত হউক, কিন্তু একনিষ্ঠ বিবাহপ্রণালী সভ্যতার পরিচায়ক নহে।" মানুষ সভ্য হইয়াছে বলিয়া যে আধ্যাত্মিকতার প্রাচুর্য্যবশতঃ একপত্নীমূলক বিবাহপদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। বরং দেখা যায় যে, যে সকল জাতি নিতান্ত অসভ্য, যাহারা মনুষ্যজীবনের প্রাথমিক অবস্থায় অবস্থিত, তাহারা প্রায়শঃ একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। "বহুবিবাহ" প্রবন্ধে প্রসঙ্গাধীন কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। এই স্থলে আরও কতকগুলি দিতেছি।

সিংহল দ্বীপে অরণ্যবাসী 'বেদ্দা' জাতি এত অসভ্য, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি এত হীন যে, ইহাদের ভাষায় সংখ্যাবাচক শব্দ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু ইহারা কখনও একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না। শুধু তাহাই নহে; ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নিকোবার দ্বীপপুঞ্জের কার্ নিকোবার দ্বীপবাসীরা একপত্নী-পরায়ণ, এবং ব্যভিচার ইহাদের মধ্যে মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত। সাঁওতাল-দিগের মধ্যে বহুবিবাহ স্পষ্টতঃ নিষিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু একাধিক পত্নী গ্রহণ করিলে সমাজে এতটাই নিন্দাই ও অপদস্থ হইতে হয় যে, প্রায় কেহই [illegible] করে না। নীলগিরির বাদাগা জাতি, উত্তর আসামের নাগা জাতি, কিসা[illegible] জাতি, ব্রহ্মের কারেন্ জাতি, ইণ্ডোচীন, মলয় উপদ্বীপ এবং ভা[illegible] দ্বীপপু[illegible] অনেক জাতির মধ্যে একাধিকস্ত্রীগ্রহণ হয় বিধিনিষিদ্ধ, [illegible] [illegible] অজ্ঞাত। ইগোরোটী জাতি একপ[illegible] [illegible] [illegible] ব্যভিচারবিষয়ে সমাজশাসন এতই [illegible]ঠোর যে, [illegible] [illegible]কে পূ[illegible] এব[illegible] [illegible] হইতে [illegible]মের মতন বিদূরিত [illegible] [illegible] [illegible] একনিষ্ঠ পদ্ধতি ব্যতী[illegible]

প্রণালী প্রচলি[illegible]পুরানদিগের মধ্যে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, এবং ব্যভিচার ও উপপত্নীরক্ষা একেবারেই নাই। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় অসভ্য মনুষ্যের মধ্যেও এমন দুই একটি সম্প্রদায় আছে, যাহারা সম্পূর্ণরূপে একপত্নীপরায়ণ। আমেরিকার ও আফ্রিকার অনেকানেক অসভ্য জাতির সম্বন্ধেও এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়।

এই স্থলে একটি রহস্যজনক ব্যাপারের উল্লেখ করিতে হইতেছে। দুই একটি এমনও অসভ্য জাতি দেখা যায়, যাহারা পূর্ব্বে একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ ছিল, কিন্তু উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে আসিয়া কতক পরিমাণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। মিনাহাসা প্রদেশের আল্‌ফুরা জাতি পূর্ব্বে একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ ছিল। এক্ষণে ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ কিয়ৎপরিমাণে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার হিক্সন্ সাহেব বলেন যে, মুসলমানের সংস্রবে আসিয়া ইহারা আপনাদের পূর্ব্বতন ও উচ্চতর যৌন নীতি হইতে স্খলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে বিলাসবাসনার বশবর্ত্তী হইতেছে। কর সাহেব বলেন যে, বরিয়া জাতির মধ্যে একাধিকপত্নীগ্রহণ সমাজনিয়মে একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ইয়োরোপীয়-দিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহবিষয়ে না হউক, উচ্চতর সভ্যতার সংস্রবে অন্য বিষয়ে এইরূপ নীতি-ভ্রংশের দুই একটা দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেও দেখা যায়। সাঁওতালেরা সত্যবাদি-তার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ; ইয়োরোপীয় পাদ্রীদিগের সংস্রবে আসিয়া ইহারা এক্ষণে মিথ্যা কথা বলিতে শিখিয়াছে।

সে যাহা হউক, উপরিউদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, একনিষ্ঠ বিবাহ সভ্যতার ফল বা পরিচায়ক নহে। বাস্তবিক কোন সমাজে কিরূপ বিবাহপদ্ধতি অবলম্বিত হইবে, তাহার প্রকৃত নিয়ামক, সামাজিক, আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা—সভ্যতা বা নীতির উৎকর্ষাপকর্ষ নহে। যে সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজনাধীন যে বিবাহপদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক হয়, [illegible]সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া থাকে, এবং অবলম্বন করিতে বাধ্য। [illegible]কা নাই। নীতি বা আদর্শের মুখ চাহিয়া প্রয়োজনকে উপেক্ষা [illegible]না।

[illegible]একনিষ্ঠবিবাহ-পরায়ণ হইবারই কথা। যে অবস্থায় [illegible]র করিয়া জীবন[illegible]নির্ব্বাহ করিতে হয়, সে অবস্থায় [illegible]হাদের প্রতিপা[illegible] আহারের সংস্থান [illegible]

কাহারও পক্ষে সহজ নহে, এবং অনেকের পক্ষেই অ[illegible]। কৃষিকার্য্য উদ্ভাবিত হইলে এই অন্তরায় অনেকটা নিরাকৃত হয় বটে, কিন্তু অসভ্য সমাজে কৃষিকার্য্য প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া, তখন স্ত্রীলোকেরও একটা মূল্য থাকে। যে অবস্থায় স্ত্রীলোক জীবিকা অর্জ্জনের সাহায্য করে না, তখন যেমন ইচ্ছা করিলেই বা চাহিলেই স্ত্রী পাওয়া যায়, স্ত্রীলোকের অর্জ্জনের পথ উদ্ভাবিত হইলে তখন আর তেমন পাওয়া যাইতে পারে না। তখন শারীরিক পরিশ্রম বা উপহারের বিনিময়ে স্ত্রী লাভ করিতে হয়। বহুস্ত্রীগ্রহণের পক্ষে আহার্য্য-সংস্থানাত্মক অন্তরায় তিরোহিত হইলে, মূল্যসংস্থানরূপ আর একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষিকার্য্য প্রচলিত হইলেও এই কারণে অধিকাংশ স্থলেই পুরুষকে একটিমাত্র স্ত্রী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়।

অসভ্য সমাজে স্ত্রীজাতির অবস্থা যার-পর-নাই হীন—তাহারা সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং সম্পত্তিরূপেই ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই পুরুষের অপেক্ষা দুর্ব্বল, সুতরাং সমাজের যেরূপ অবস্থায় মনুষ্যের অধিকার কেবল শক্তিগত, সে অবস্থায় দুর্ব্বল স্ত্রীজাতিকে যে প্রবল পুরুষ জাতির নিতান্ত অধীন হইতে হইবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। অনেক অসভ্য সমাজে স্ত্রীলোকের মৃত্যু ও জীবন পর্য্যন্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন থাকে। এরূপ অবস্থায় পুরুষেরা যে একটিমাত্র পত্নী লইয়া সন্তুষ্ট হয়, সে কেবল প্রয়োজনের দায়ে। কৃষিকার্য্য এবং সম্পত্তি অর্জ্জনের অন্যান্য উপায় প্রবর্ত্তিত হইলে, এই প্রয়োজনের দায় হইতে মানুষ অনেকটা অব্যাহতি পায়। এবং তখন তাহারা আর একনিষ্ঠ-বিবাহপরায়ণ থাকে না—প্রবৃত্তি ও সাধ্যানুসারে যাহার যত ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করে। কিন্তু বহু স্ত্রী গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা ও সম্পত্তি অধিকাংশ লোকের থাকা অসম্ভব। সমাজবিশেষে বহুপরিজনপ্রতিপালনের ক্ষমতা অতি অল্প লোকেরই থাকিতে পারে; সেই জন্য সচরাচরই দেখা যায় যে, যে সকল সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল সমাজেও যাঁহারা সম্পত্তিসম্পন্ন, ক্ষমতাশালী, পদস্থ, বা উচ্চবংশসম্ভূত, কেবল তাঁহারাই বহু স্ত্রীগ্রহণ করে[illegible]ন-সাধারণ বহুবিবাহ করেও না, করিতে পারেও না।—পারে না ব[illegible] না। ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমেরিকা ভূখণ্ডে[illegible] চিরিগোয়ানা প্রভৃতি জাতি এবং কাফির[illegible]র ও ক[illegible]গুলি জাতির মধ্যে দেখা যায় যে, [illegible]নিয়মানুসারে কেবল [illegible] একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে[illegible]র্গের এ অধিকার [illegible]

বহুস্ত্রী-গ্রহণের অধিকার কেবল ...দিগের ছিল। ইয়েসো প্রদেশের আইনো ...দের মধ্যে গ্রামের ... ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। আফ্রিকা খণ্ডেই বহুবিবাহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু এখানেও একনিষ্ঠ বিবাহই সাধারণ নিয়ম, বহুবিবাহ তাহার ব্যতিক্রম-মাত্র। কোরাণের বিধান অনুসারে চারিটি স্ত্রীগ্রহণের অধিকার সকল মুসলমানেরই আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এ অধিকার ব্যবহৃত হয় না। সায়েদ্ আমীর আলি বলেন, প্রয়োজনবশেই হউক, বা বিশ্বাসনিবন্ধনই হউক, ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জনেরও অধিক একনিষ্ঠ-বিবাহ-পরায়ণ। তিনি আরও বলেন যে, সুশিক্ষিত মুসলমানেরা বহুবিবাহকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। কর্ণেল ম্যাক্‌গ্রেগার লিখিয়াছেন যে, পারস্য দেশে শতকরা দুইজনমাত্র বহুবিবাহকারী। কোচীন এবং ... দেশে দেশাচার যদিও বহুবিবাহের বিরোধী নহে, তথাচ এই সকল প্রদেশের অধিবাসিগণ কার্য্যতঃ প্রায়ই একটির অধিক বিবাহ করে না। আমাদিগের শাস্ত্র ও দেশাচার বহুবিবাহের বিরোধী নহে, অথচ হিন্দুজাতি কার্য্যতঃ একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ—বহুবিবাহকারীর সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা না ধরিলেও চলে। অষ্ট্রেলিয়ার এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের সম্বন্ধেও সাধারণতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়। আর বোধ হয় দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত-সকল দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, যে সকল সমাজ কর্তৃক বহুবিবাহ অনুমোদিত, সে সকল সমাজেও অধিকাংশ লোক একবিবাহকারী—একনিষ্ঠ বিবাহই নিয়ম; বহুবিবাহ তাহার ব্যভিচারমাত্র। সম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিরা আপনাপন ইচ্ছানুসারে বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করে বটে, কিন্তু ইহাদিগকেও বাধ্য হইয়া ক্রমে আত্মসংযম করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, যে সমাজের জনসাধারণ একাধিক পত্নী গ্রহণ করে না, সে সমাজের অধিনায়কেরা যদি বহু স্ত্রী আত্মসাৎ করেন, তাহা সাধারণের মতের ও অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধগামী হইয়া করিতে হয়; কেন না, যত অধিক সংখ্যক স্ত্রী তাঁহারা গ্রহণ করেন, সমাজমধ্যে সাধারণের বিবাহযোগ্য স্ত্রীসংখ্যার তত হ্রাস হইয়া যায়। বিশেষ বিশেষ কারণে সমাজবিশেষে জন্মকালে পুত্র ও কন্যার সংখ্যাতারতম্য হয় বটে—কোথাও পুত্র অধিক জন্মে, কোথাও কন্যা অধিক জন্মে—কিন্তু বিশেষ কারণ না থাকিলে সমাজমধ্যে প্রায় স... স্ত্রী ও পুংসন্তান জন্মিবার

দিকেই স্বভাবের গতি। এরূপ অবস্থায় [illegible] কতকগুলি লোক যদি বহু-বিবাহ করে, তাহার অনিবার্য্য ফল এই [illegible] সমাজের আর অনেকগুলি লোককে পত্নীলাভে একেবারে বঞ্চিত হইতে হয়। যাহাদের বিলাসপ্রিয়তা-নিবন্ধন জনসাধারণের স্ত্রীলাভের ব্যাঘাত ঘটে, জনসাধারণ যে তাহাদের এবং তাহাদের অবলম্বিত প্রথার প্রতিকূল হইবে, ইহা স্বাভাবিক। জনসাধারণ যে প্রথার বিরোধী, সে প্রথা যে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইবে, এবং কালে লোপ পাইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। পার্ব্বত্য ডায়াক্ জাতি সাধারণতঃ একনিষ্ঠবিবাহ-পরায়ণ হইলেও, সামাজিকবিধানানুসারে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে; অথচ তাহা-দের কোন অধিনায়ক একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে সমাজমধ্যে তাহার প্রভাব ও প্রভুত্ব একেবারে লোপ পায়। এই কারণে ক্ষমতাশালী সম্পন্ন, ও উচ্চবংশ-সম্ভূত ব্যক্তিদিগকেও ক্রমে একপত্নীমূলক বিবাহই অবলম্বন করিতে হয়।

কিঞ্চিদুন্নত সমাজে যে সকল কারণে পুরুষ বহু স্ত্রী গ্রহণ করে, সমাজ সম-ধিক উন্নত হইলে, সেই সকল কারণের কতকগুলি তিরোহিত হয় [illegible]আর কতকগুলি যদিও বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তন্নিবন্ধন বহুবিবাহের আর প্রয়োজন হয় না। সুসভ্য-সমাজে বহু স্ত্রী শক্তি বা সঙ্গতির পরিচায়ক নহে, পদমর্য্যাদা বা সম্পত্তি অর্জ্জনের উপায়ীভূতও নহে। আভ্যন্তরিক কলহ বিবাদে বা বহিঃশত্রুর আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সুসভ্য মানবকে আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বের উপর নির্ভর করিতে হয় না—সে ভার সমাজ বা রাজশক্তিই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর, রূপযৌবনের আকর্ষণ, ইন্দ্রিয়লালসা, নূতনপ্রিয়তা প্রভৃতি যে সকল কারণে অসভ্যেরা বহুবিবাহ করে, সুসভ্য সমাজে তজ্জন্য [illegible] বিবাহের আবশ্যক হয় না—একমাত্র পত্নী গ্রহণ করিয়াও এই সকল অসংযত বৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় সুসভ্য সমাজে থাকে। এই সকল কারণে সুসভ্য মানব একনিষ্ঠবিবাহপরায়ণ হয়। জীবনসংগ্রামের কঠোরতাও একটা কারণ।

সকল দিক বিবেচনা করিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ একমাত্র স্ত্রী গ্রহণ করে। সভ্যতার পথে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সমাজের শক্তিশালী, সঙ্গতিসম্পন্ন ও পদস্থ ব্যক্তিগণ বহুবিবাহ-পরায়ণ হয়—জনসাধারণকে বাধ্য হইয়াই একটিমাত্র স্ত্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সভ্যতার উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলে মানব আবার সেই প্রাথমিক একপত্নীমূলক বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজ্যাভিষেক।

রাণী ভবানীর পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি রাজকুমারী তারা ও রাজজামাতা রঘুনাথ লাহিড়ীর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিবার আশা করিয়াছিলেন। রঘুনাথ অকালে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় সে আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর রাণী ভবানী অনন্যোপায় হইয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ নামে বঙ্গদেশে বৈরাগ্যের অবতার বলিয়া পরিচিত।

রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কিছু দিন পর্য্যন্ত রাণী ভবানীর হস্তেই রাজসাহীর রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল; তদুপলক্ষে মাতার সহিত পুত্রের কিয়ৎপরিমাণে মনোমালিন্যেরও সূত্রপাত হইয়াছিল। যুবক রামকৃষ্ণ স্বহস্তে রাজ্যকার্য্য পরিচালন করিবার জন্য লালায়িত হইলেও, রাণী ভবানী সহসা রাজ্যভার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন বাঙ্গালী জমিদারগণের পক্ষে মহা সঙ্কটের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; মুসলমানের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নূতন শাসনকৌশল প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। তৎকালে রাজসাহীর ন্যায় বিস্তীর্ণ জনপদের শাসনভার এক জন অপরিণতবয়স্ক বালকের হস্তে সমর্পণ না করিয়া, [illegible]তী রাণী ভবানী স্বহস্তে শাসনক্ষমতা রাখিয়া, রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংসের সময় হইতে তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইতে লাগিল। পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা উত্তরোত্তর বিলুপ্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া রাণী ভবানী গঙ্গাবাস আশ্রয় করিলেন;—তৎসূত্রে রাজসাহীর রাজসম্পৎ মহারাজ রামকৃষ্ণের করতলগত হইল।

রাজসাহীর রাজবংশাবলীর ইতিহাসলেখক স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিয়া গিয়াছেন;—"মহারাণী ভবানীর স্বর্গারোহণের পর রামকান্তের দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন।" * বলা বাহুল্য, ইহার একবর্ণও সত্য নহে। তবে মিত্র মহাশয়ের পুস্তক ইংরাজি ভাষায় লিখিত·

---

* Maharaja Ramkrisna, the adopted son of Ramkanta, succeeded his mother the Maharanee on her death.—[illegible] *Rajas of Rajshahye.*

বলিয়া ইংরাজদিগের নিকট এইরূপ অনেক অলীক কাহিনী ই[illegible] পরিচিত হইয়াছে!

সেকালের লোকের নিকট রামকৃষ্ণ "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি মহ[illegible] রামকৃষ্ণ বাহাদুর" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাদশাহ শাহ আলমের সনন্দবলে তিনি এই গৌরবান্বিত সুদীর্ঘ শূন্যগর্ভ রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথ্বীপতি মহারাজাধিরাজ রামকৃষ্ণ বাহাদুরের রাজ্যাভিনয়সময়েই নাটোর রাজবংশের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়।

সে রাজ্যনাশকাহিনী বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে; [illegible] যুগের ইংরাজ লেখকগণ তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মহারা[illegible] বিষয়-বৈরাগ্যকেই একমাত্র কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের লিখিত কাহিনী কণ্ঠস্থ করিয়া কৃতবিদ্য স্বদেশবাসিগণও তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া রাখিয়াছেন! নাটোর রাজদপ্তরে এবং কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডে এখনও যে সকল কাগজপত্র পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে, এই সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করা যায় না।

রামকৃষ্ণের ইতিহাস প্রাচীন জমিদারবংশের ধ্বংসকাহিনীর করুণক্রন্দনে পরিপূর্ণ। মোগলগৌরবরবি মহাত্মা আকবরশাহের শাসনসময়ে বাঙ্গালী জমিদারদলের যেরূপ পদমর্য্যাদা ও শাসনক্ষমতা বর্ত্তমান ছিল, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজেরা যখন দেওয়ানী সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। * মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে! সেকালের জমিদারগণ কি কৌশলে একালের উপাধি-ব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম!

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনসময়েই বাঙ্গালী জমিদারদিগের শাসনক্ষমতা তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। মোগলরাজ্যে জমিদারগণ কেবলমাত্র করসংগ্রহের

---

* The Zamindars of Bengal were opulent & numerous in the reign of Akber, and they existed when Jafar Khan was appointed to the administration under him and his successors their respective territorial Jurisdiction appeared to have been augmented, and when the English acquired the Diwani, the principal Zamindars exhibited the appearance of opulence and dignity.—*The Fifth Report.*

[illegible] ছিলেন না; দেশের প্রকৃত শাসনভার তাঁহাদের হস্তেই ন্যস্ত [illegible] রাজসরকারে তাঁহাদের পদগৌরব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া- [illegible] হেষ্টিংস [illegible]গকে করসংগ্রহের যন্ত্রমাত্রই মনে করিয়াছিলেন; এবং এক যন্ত্রের পরিবর্ত্তে অন্য যন্ত্র সংস্থাপিত করি[illegible] কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহার্ত অনেক প্রাচীন জমিদারবংশের ভূসম্পত্তি আধুনিক ধনশালী বিষয়বুদ্ধি- হীন ব্যক্তিগণের করতলগত হইয়াছিল; কোন কোন স্থলে রাজ্যরক্ষার্থ পুরাতন [illegible] হেষ্টিংসের কথামত অধিক রাজকর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, [illegible] হইয়াছিলেন।

[illegible] রাজ্যচ্যুতির গতিরোধ করিবার আশায় হেষ্টিংসের প্রস্তাবেই [illegible]ছিলেন। কিন্তু তিনিও রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। কোম্পানী বাহাদুরের কুৎক্ষামোদর পূর্ণ করিতে গিয়া রাজকোষ শূন্য হইল, কিন্তু হেষ্টিংসের প্রবর্তিত রাজস্বনীতি উত্তরোত্তর অধিকতর রাজকর প্রত্যাশা করিতে লাগিল। সুযোগ বুঝিয়া লাভের লোভে অনেক লোকে রাজসাহীর রাজ্য ইজারা লই[illegible] জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিতে লাগিল, এবং অবশেষে কোন কোন স্থলে তাহাদের প্রস্তাব হেষ্টিংসের অনুমোদন প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল।

ইহার জন্য রাজসাহী রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজাবিদ্রোহের সূত্রপাত হইল। কোম্পানী বাহাদুরের বীরবাহু তখন ফৌজ পাঠাইয়া বিদ্রোহদমনের চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রামে গ্রামে হাহাকার উঠাইতে লাগিল। নন্দলাল রায় নামক এ[illegible]কি পরগণা আমরূল ইজারা লইয়াছিল, তাহার প্রার্থনাক্রমে নাটোরে লাপ্টেন্যান্ট কিন্‌লকের অধীনে কোম্পানীর ফৌজ প্রেরিত হইল। *

[illegible]রগণ নানারূপ বাজে জমা আদায় করিতেন; তাহা ক্রমশঃ রহিত [illegible]র আয়ের পথ সংকীর্ণ হইতে লাগিল। ১১৮৯ সালের বৈশাখ [illegible] "ফৌজদারী রেগুলেশন" প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারদলের শাসন- ক্ষমতার মূলেও কুঠারাঘাত করিল। †

---

* Letter to Lieutenant Kinloch, commanding in Nattore, respecting disturbances of the rayats in Pargana Amrul.—

Bengal Mss Records. Vol. 1. 37.

† [illegible]tter to Collectors, informing them that the Fouzdari Regulation is to take effect [illegible]st Baisak 1189.—

[illegible]engal Mss Records. Vol. 1. 44.

এই সময়ে রাজসাহী [illegible]ানী বাহাদুরের পক্ষে ই[illegible] রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাহার সহিত রাণী ভবানীর কলহে[illegible] ইজারদারদিগের সহিত প্রজাবর্গের অকৌশল উপস্থিত [illegible]ইতে দেখিয়া, তিনি রাণীকেই তাহার জন্য অপরাধিনী করিলেন, এবং নূতন শাসন[illegible]বার জন্য পল্টন পাঠাইতে লিখিলেন। * রাজসাহী রাজ্যে পল্টনে[illegible] শীঘ্রই প্রবর্ত্তিত হইল। ইহার ফল প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল না। ই[illegible]ন্ সাহেব বুঝিলেন যে,প্রজাপীড়নমাত্রই সার হইল, রাজকর সংগৃহীত হইল ন[illegible] বাহাদুরের লাভ হইল না; ইজারদারের নিকট অনেক টাকা [illegible] লাগিল! †

ইভলিন্ সাহেব যে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলেন, তাহার ফলে [illegible] সাহীতে কোম্পানীর খাস শাসন ও করসংগ্রহের ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। ¶

রাজসাহী রাজ্যে কোম্পানীর খাস তহশিল প্রবর্ত্তিত হইবার সংবাদ প্রচারি[illegible] হইতে না হইতে অনেক অর্থলোলুপ লোকে ইজারা লইবার জ[illegible] লাল[illegible] হইল; তন্মধ্যে বলরাম শর্ম্মা, জয়নারায়ণ দাস, কমলাকান্ত দাস, [illegible] শর্ম্মা এবং রামকান্ত শর্ম্মা নামক পাঁচ ব্যক্তি একত্র রাজসাহী ইজারা লইবার প্রার্থনা করায়, তাহাদের প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইল। ইহারা আশানুরূপ অর্থশোষণ করিতে পারিল না; অনাবৃষ্টিবশতঃ প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইল না, লোকে অবশ্য-দেয় রাজকর প্রদান করিতেও ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। ইজারদারগণ হাহা-কার করিতে লাগিল। কোম্পানী বাহাদুর তাহাদের করুণক্রন্দনে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, অনাবৃষ্টি জন্য কোনরূপ অনুগ্রহপ্রদর্শনের ব্যবস্থাও করিলেন না।

---

* Letter to Governor General enclosing extract of a letter [illegible]r. Evelyn when at Rajshahye, respecting the obstructions thrown [illegible] the way of the collections by the Zaminder and her officers, and representing the necessity of having a military force, under the command of a European officer, stationed in that province.—*June 18, 1782.*

† Letter from Mr. Evelyn, reporting the existence of heavy balances in Rajshahye, although the cultivators complain of undue exactions, and proposing to make an enquiry into the collections realised by the Amin.—*March 3, 1783. Approved.*

¶ Letter to Mr. John Evelyn d[illegible] to conclude a kha's settlement for Rajshahye for 1190.—[illegible]

গর্জ্জন করিতে ... না। রাজসাহীর কালেক্টার লিখিলেন যে, রাণীর পক্ষে রাজকর পরিশোধ ... অসম্ভব ! *

অতঃপর রাণী ভবানী নানারূপ কাকুতি মিনতি করিয়াও ফললাভ করিতে পারিলেন না ; তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল। রাজসাহীর রাজ্যনাশের পূর্ব্বসূচনা উপলব্ধি করিয়া, তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ দশ সহস্র মুদ্রা "পেশকশ" প্রদান করিয়া রাজস্ব-সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন ! †

মহারাজ রামকৃষ্ণ রাজসাহীর রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু রাজসাহীর জমিদারের সম্পূর্ণ ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন না। মন্বন্তরের সময়ে রাণী ভবানী অন্নপূর্ণার ন্যায় অন্নজল বিতরণ করিয়া রাজকোষের পূর্ব্বসঞ্চিত অগাধ ধনরাশি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন ; রাজসাহী রাজ্যে ইজারদার নিযুক্ত হইয়া পৈতৃক পদগৌরব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল ; নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়া জমিদারের শাসনক্ষমতা খর্ব্ব হইয়াছিল। রামকৃষ্ণের রাজোপাধি যতই সুদীর্ঘ হউক, তাঁহার রাজ্যাভিষেকে ... ধনবল, পদগৌরব ও শাসনক্ষমতা তদনুরূপ সৌভাগ্যবর্দ্ধন করি...

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট।

বিজ্ঞানেশ্বর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম-ভারতে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ ভট্ট। তিনি 'পরমহংস' ও 'পরিব্রাজক' বলিয়া স্বরচিত 'মিতাক্ষরা'র শেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। § মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তিন অধ্যায়ে যে স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন 'মিতাক্ষরা'

---

* Letter from the Collector of Rajshahye, stating his opinion that it is impossible for the Rani to comply with the requisition of the Committee.

† Letter from the Governor General in Council directing Raja Ramkrishna to be invested with the Zamindari of Rajshahye and a demand upon him for Sikka Rupees 10,000 as a fee of investiture (Peshkash).—*August 20, 1798.*

§ "শ্রীপদ্মনাভভট্টোপাধ্যায়াত্মজ-শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজক-বিজ্ঞানেশ্বর-ভট্টাচার্য্য-কৃতৌ ঋজু-মিতাক্ষরায়াং যাজ্ঞবল্ক্যধর্ম্মশাস্ত্রবিবৃতৌ তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।"

তাহারই ভাষ্যরূপে লিখিত হয়। ৩২[illegible]র ([illegible] খৃঃ) লিখিত মিতা-ক্ষরার এক প্রতিলিপি (V. 302) পাওয়া গিয়াছে। যতী বিজ্ঞানেশ্বর ভারদ্বাজ-গোত্রজ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তিনি বিশ্বরূপের শিষ্য। বিশ্বরূপ আচার্য্য 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র যে দুরূহ ও বিস্তীর্ণ ভাষ্য রচনা করেন, বিজ্ঞানেশ্বর তাহাই সং[illegible] করিয়া সরল ও সুখবোধ্য ভাষায় 'প্রমিতাক্ষরায়' লিপিবদ্ধ করেন। ডাক্তার [illegible]ট কোচিনের মহারাজার পুস্তকাগারে বিশ্বরূপের রচিত এক খণ্ড ভাষ্য দর্শন করেন।* বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র মিতাক্ষরার দায়াধিকারতত্ত্ব প[illegible]ত হইয়াছে। সমুদয় ভারতবর্ষ অবনতমস্তকে মিতা-ক্ষরার দায়বি[illegible] করিয়া, বিজ্ঞানেশ্বরের প্রাধান্য ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ডাক্তার জলির মতে 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হয়। ইহার প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় 'গরুড়পুরাণে' অবিকল গৃহীত হইয়াছে। ইহার [illegible] অধ্যায় 'অগ্নিপুরাণে'র একাংশে পরিণত হইয়াছে। বিশ্বরূপ আচার্য্য বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকার। বিজ্ঞানেশ্বরের পর শিলাহারবংশীয় রাজা অপরাদিত্য (অপরাজ) দেব ও দেববোধ যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞানেশ্বরের 'মিতাক্ষরা'র ন্যায় কোনও ভাষ্য সমাদৃত হয় নাই। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে 'মিতাক্ষরা' কলিকাতায় প্রথমতঃ মুদ্রিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে মিতাক্ষরার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞানেশ্বর স্বপ্রণীত 'মিতাক্ষরা'য় অসহায়, মেধাতিথি ভট্ট, জিতেন্দ্রিয়, মৈথিল শ্রীকার, বিশ্বরূপ ও ধারেশ্বর ভোজরাজদেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আপস্তম্বসূত্র মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। ডাক্তার জলির মতে, আপ-স্তম্বের ধর্ম্মসূত্র পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী এই ধর্ম্মসূত্র-রচনার অধস্তনকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৌতমের ধর্ম্মসূত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। গৌতমের পর বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্র প্রণীত হয়। বৌধায়নসূত্রের পর আপস্তম্ব-সূত্র দক্ষিণাপথে রচিত হয়।

শ্রীযুক্ত রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর মতে বিজ্ঞানেশ্বরের উল্লিখিত শ্রীকার মিথিলায় খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর আরম্ভে-প্রাদুর্ভূত হন। এই মৈথিল স্মার্ত্ত মেধাতিথির পরবর্ত্তী। বিশ্বরূপ, বিজ্ঞানেশ্বর ও ধারেশ্বর ভোজদেব, শ্রীকারের পরবর্ত্তী

* Dr. Oppert's "Catalogue of Sanskrit Mss." no. 3010.

স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতা। ব্যবস্থা ও স্মৃতিশাস্ত্রে[illegible]র জন্য যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের সময় হইতে মিথিলা অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ [illegible] যাজ্ঞবল্ক্যের পরবর্ত্তী ও টীকাকারের পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল স্মার্ত্তদিগের নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। মিথিলা স্মৃতি শাস্ত্রের আদিম অনুশীলনস্থল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মেধাতিথির দ্বারা দ্রাবিড়ে স্মৃতি-চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানেশ্বর [illegible]ভূ'ত হইয়া, মহারাষ্ট্র ও বারাণসীতে স্মৃতিশাস্ত্রের অনুশীলন প্রবর্ত্তিত করেন। জীমূতবাহন দ্বারা বঙ্গদেশে স্মৃতির চর্চ্চা আরব্ধ হয়। জীমূতবাহন খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শূলপাণি ও কুল্লুক ভট্টের পূর্ব্বতন গ্রন্থকার। জীমূতবাহন স্বরচিত '[illegible]ভাগে' ভোজরাজ দেব ও গোবিন্দরাজের প্রণীত 'মনুভাষ্য' উদ্ধৃত করিয়া[illegible]জদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ধারা নগরে রাজত্ব ক[illegible] গোবিন্দরাজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 'মনুভাষ্যে'র রচনা করেন।

'মিতাক্ষরা'র ভাষ্য 'সুবোধিনী' খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিশ্বেশ্বর ভট্টের দ্বারা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে নন্দপণ্ডিত দ্বারা মিতাক্ষরার টীকা রচিত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বালকৃষ্ণ (বালম) ভট্ট ও তাঁহার মাতা লক্ষ্মীদেবী নন্দপণ্ডিতের মতের প্রতিবাদ পূর্ব্বক 'মিতাক্ষরা'র তৃতীয় টীকার রচনা করেন। বারাণসীতে লক্ষ্মীদেবীর মিতাক্ষরা-ভাষ্য বিশেষ-ভাবে আদৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানেশ্বর ভট্ট কল্যাণ নগরের চালুক্যবংশীয় মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্যের সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া, 'মিতাক্ষরা'র রচনা করেন। নিজামরাজ্যের রাজধানীর হাইদরাবাদের শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে কল্যাণ নগর অবস্থিত ছিল। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিদ্যাপতি বিহ্লণ দেব এই প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের জীবনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক পদ্যময় ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। ১০৭৬ হইতে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করেন। স্বরচিত 'মিতাক্ষরা' গ্রন্থের শেষভাগে তিনটি শ্লোকে বিজ্ঞানেশ্বর আপনার আশ্রয়দাতা বিক্রমাদিত্য (বিক্রমার্ক) নৃপতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৮৯৫ শকাব্দে (৯৭৩ খৃষ্টাব্দে) "রাষ্ট্রকূটবংশীয় শেষ নরপতি কক্কলকে (কর্ক দ্বিতীয়=অমোঘবর্ষ চতুর্থ) পরাজিত করিয়া, মহারাজ তৈলপ চালুক্যবংশের আধিপত্য দক্ষিণাপথে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহারাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদি[illegible] এই তৈলপরাজের অধস্তন চতুর্থতম বংশধর। তিনি চালুক্যবংশের সর্ব্বপ্রধা[illegible]

নরপতি। তাঁহার অধিকারকালে দক্ষিণাপথের সর্ব্বত্র শান্তিসুখ বিরাজিত ছিল। কল্যাণ নগরে তাঁহার রাজধানী প্র[illegible]ত ছিল। তাঁহার নামাঙ্কিত প্রায় দুই শত শাসনলিপি দক্ষিণাপথের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বর এই মহাপরাক্রান্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ও মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কল্যাণ নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বিজ্ঞানেশ্বরের সময় হইতে মহারাষ্ট্র দেশে ও দক্ষিণাপথে বিশেষভাবে স্মৃতি-শাস্ত্রের চর্চ্চা আরব্ধ হয়। অসহায়, মেধাতিথি ভট্ট, জিতেন্দ্রিয়, শ্রীকার, বিশ্বরূপ ও ভোজ[illegible] পরে আবির্ভূত হইয়া বিজ্ঞানেশ্বর জগদ্বিখ্যাত 'মিতাক্ষরা'র রচনা করেন। [illegible]ত গ্রন্থে তিনি পূর্ব্বোক্ত স্মার্ত্তকারগণের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর ও বিদ্যাপতি বিহ্লণ সমসাময়িক গ্রন্থকার। বিজ্ঞানেশ্বরের পর যে সকল স্মার্ত্ত গ্রন্থকার দক্ষিণাপথে আবির্ভূত হন, তন্মধ্যে রাজা অপরার্ক হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যের নাম অতিপ্রসিদ্ধ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সেক্সপীয়র।

১

মহাকবি সেক্সপীয়রের কবিপ্রতিভার স্বরূপ বুঝিবার জন্য, ঐ প্রতিভার মূলতত্ত্ব নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। 'কালিদাস ও সেক্সপীয়র' প্রবন্ধের মুখবন্ধে * আমি কবিপ্রতিভার মূলতত্ত্ব নির্ণয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, এ স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। 'মহাকবির প্রতিভার অভ্যন্তরে নিরাকার উৎপাদিনী মহাশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রতি বীজে শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন, তাই বৃক্ষ-জগতে এত বৈচিত্র্য। প্রতি প্রতিভায় শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন, তাই কাব্য-জগতে এত বৈচিত্র্য। এই শক্তিই প্রতিভার মূলতত্ত্ব; ইহা লইয়াই কবির স্বাতন্ত্র্য; তাই কালিদাস সেক্সপীয়র নহেন।' আর ঐ মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিবার প্রণালী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলাম। 'সমালোচক প্রথমে ধীরভাবে সমালোচ্য

* সাহিত্য; তৃতীয় বর্ষ; ৮৩—৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কাব্যের সকল লক্ষণ পরীক্ষা করেন—ঘটনাপরম্পরার অনুধাবন করেন। তাহার পর মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে অগ্রসর হয়েন। কারণ ঐ ঘটনাপরম্পরা পরস্পর সম্পৃক্ত, সজীব, একতাবিশিষ্ট। তাহারা এক মূল কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। ঐ মূলতত্ত্ব কি? সকল স্থলেই সমালোচক একটা কল্পনাসিদ্ধান্ত ঐ মূলতত্ত্বরূপে খাড়া করেন। যদি এই কল্পনাসিদ্ধান্তের সহিত সকল ঘটনার সকল সম্বন্ধের সমাবেশ হয়, তবে উহাই সিদ্ধসিদ্ধান্ত, উহাই যথার্থ মূলতত্ত্ব। অন্যথা কল্পনামাত্র।"

কালিদাস ও সেক্‌সপীয়রের মহা প্রতিভারও মূলতত্ত্ব আছে। কারণ, তাঁহাদের প্রতিভাপ্রসূত কাব্যেরও ঘটনাপরম্পরা পরস্পরসংযুক্ত, সজীব, একতাবিশিষ্ট; অর্থাৎ, এক মূল-কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই মূলতত্ত্ব কি?

আমার মনে হয়, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যসৃষ্টি। আর সেক্‌সপীয়র মানুষতার কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।

কালিদাস যে সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব যে অমানুষী সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য 'কালিদাস ও সেক্‌সপীয়র' প্রবন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সে চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। অতঃপর সেক্‌সপীয়রের কবিপ্রতিভার মূলতত্ত্ব বিশ্লেষণ জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

'সেক্‌সপীয়র মানুষতার কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।' এ কথার অর্থ কি? এ কথার প্রমাণই বা কি? প্রমাণ পরে উপস্থিত করিব। সম্প্রতি এ কথার অর্থ কি, তাহাই স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রথম বুঝিতে হইবে, মানুষতা কি? মনুষ্যের স্বরূপ কি?

মনুষ্য সৃষ্টির ললাম, শেষ বিবর্ত্তন, চরম উৎকর্ষ। মনুষ্য ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্, কঠিন হইয়াও কোমল, জড় হইয়াও চেতন, সান্ত হইয়াও অনন্ত, পশু হইয়াও দেবতা। তাহার রহস্য কে বুঝিবে? সে অজ্ঞেয়, অত্যদ্ভুত, অশেষ লীলাময়। শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'ত্রিধারা'য় এই ধরণের কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। 'পৃথিবীর যেমন, মানুষেরও তেমনি দুইটি দিক আছে। একটি ভাল দিক, একটি মন্দ দিক। মানুষের পদতলে পৃথিবী, মানুষের মস্তকোপরি স্বর্গ। তাই বুঝি মানুষ এক দিকে পশু, আর এক দিকে দেবতা। অতএব মানুষকে বুঝিতে হইলে তাহার পশুধর্ম্মও বুঝা চাই, দেবতাধর্ম্মও বুঝা চাই।' সুকবি

অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁহার প্রদীপ গীতিকাব্যে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় এই মানুষের পশুত্ব, দেবত্ব বিবৃত করিয়াছেন।—

"হের, এ প্রণবে, সতি,
স্তম্ভিত ব্রহ্মাণ্ড-গতি ;
দূর বিষ্ণুলোক হ'তে
আশীর্ব্বাদ আসে স্রোতে,
ঝর ঝর সুর-সৃষ্টি ঝরে শিরোপর।
ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয় নর।
কিছু তুচ্ছ নাহি তার,
সে যে দেব-অবতার—
কল্পনায় কুতূহলী,
দর্শনে বিজ্ঞানে বলী,
অদৃষ্টের নিয়ামক, সৃষ্টি-সংস্কারী,
বিশ্ব-প্রভু, গদা-পদ্মধারী।"

ইহা মনুষ্যের দেবভাবের পরিচায়ক। তাহার পশুভাবের পরিচয় এইরূপ—

"সেই উন্মাদনা-স্রোত
আজো প্রাণে ওতপ্রোত ;
আজো তৃপ্তি অবসরে
সে অতৃপ্তি হাহা করে ;
সেই চিত্তে অপ্রসাদ, জীবনে ধিক্কার ;
সর্ব্বগ্রাসী স্বার্থ-হুহুঙ্কার।
আজো সেই পশু-ধর্ম্মে
ভ্রমি লক্ষ্যহীন কর্ম্মে ;
আত্ম-স্থাপনার ছলে
বিশ্ব দিই রসাতলে ;
কামে ক্রোধে লোভে মদে সৃষ্টি শতচুর ;
হাহা, নর সাক্ষাৎ অসুর।"

এই দেবত্ব ও পশুত্বের রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্য। এ সংযোগে দেবভাব ও পশুভাব মিলিয়া মিশিয়া এক অভিনব অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই পদার্থ মানুষ।

মানব-রহস্যবিৎ সেক্‌সপীয়র হ্যামলেটের মুখে মনুষ্যের দেবভাব এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন—

"What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!"

'মানব কি অদ্ভুত রচনা! বিবেকে কি মহান্! শক্তিতে কি অসীম! আচারে ও চেষ্টায় কি বিস্ময়কর! কার্য্যকুশলতায় দেবসদৃশ। বুদ্ধিবৃত্তিতে ঈশ্বরতুল্য। মানব জগতের সুষমা, জীবসৃষ্টির ললাম।'

সেই হ্যামলেটের মুখেই আমরা অন্যত্র শুনিতে পাই—

"Get thee to a nunnery: why wouldst thou be a breeder of sinners? I am myself indifferent honest; but yet I could accuse me of such things, that it were better my mother had not borne me. * * * What should such fellows as I do crawling between earth and heaven. We are arrant knaves, all; believe none of us."

হ্যামলেট ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনী ওফিলিয়াকে বলিতেছেন—

'যোগিনী হইয়া জীবন যাপন কর। কেন পাপিষ্ঠের জননী হইবে বল? দেখ, আমি যে খুব মন্দ লোক, তাহা নহি। তবু আপনাকে আপনি যত বিষয়ে অপরাধী জানি, তাহাতে মনে হয় যে, আমার মাতা আমাকে জঠরে ধারণ না করিলেই ভাল ছিল। আমার মত পাপিষ্ঠেরা ধরাধামে বিচরণ করিলে কি ফল বল? আমরা সকলেই ঘোরতর পাষণ্ড। আমাদের কাহাকেও প্রত্যয় করিও না।'

ইহা মানুষের পশুভাবের পরিচয়। আর সেক্‌সপীয়র প্রপীড়িত লিয়রের মুখে অথবা নির্য্যাতনগ্রস্ত টাইমনের রসনা হইতে যে অভিশাপ-বহ্নির প্রতপ্ত গৈরিক স্রাব উচ্ছ্বসিত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, মানবের পশুত্ব কবি কতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।—

All the stored vengeances of heaven fall
On her ingrateful top! Strike her young bones,
You taking airs, with lameness!
You nimble lightnings, dart your blinding flames
Into her scornful eyes! Infect her beauty,
You fen-suck'd fogs, drawn by the powerful sun,
To fall and blast her pride!

Lear Act II, Sc IV.

'ঈশ্বরের চিরসঞ্চিত প্রতিহিংসা তাহার কৃতঘ্ন শিরে বর্ষিত হউক। সংশোষক বায়ু তাহার নবীন দেহে পঙ্গুতার সঞ্চার করুক। দ্রুতগামী বিদ্যুদগ্নি তাহার চালক নেত্রে অন্ধতা আনয়ন করুক। প্রখরকিরণাকৃষ্ট পঙ্কধূমে তাহার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া যাউক। যেন তাহার গর্ব্ব চিরদিনের জন্য খর্ব্ব হয়।'

Piety, and fear,
Religion to the gods, peace, justice, truth,
Decline to your confounding contraries,
And let confusion live! Plagues, incident to men,
Your potent and infectious fevers heap
On Athens, ripe for stroke!

Lust and liberty
Creep in to the minds and marrows of our youth,
That g'ainst the stream of virtue they may strive,
And drown themselves in riot! Itches, blains,
Sow all the Athenian bosoms; and their crop
Be general leprosy! Breath infect breath,
That their society, as their friendship, may
Be merely poison.

Timon of Athens. Act IV. Sc I.

'শ্রদ্ধা ভয় ধর্ম্ম শান্তি ন্যায় সত্য—সকলই যেন (এথেন্স নগরীতে) স্ব স্ব ধ্বংসকারী বৈপরীত্যে পর্য্যবসিত হইয়া গণ্ডগোলের একাধিপত্য আনয়ন করে। যেন মহামারী প্রবল সংক্রামক জ্বরে ধ্বংসপ্রবণ এথেন্স নগরীকে বিপর্য্যস্ত করে। যুবক যুবতীর মজ্জায় ও মনে যেন কাম ও যথেচ্ছাচার প্রবাহিত হইয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মহীন উচ্ছৃঙ্খলতার বিষম আবর্ত্তে নিমজ্জিত করে। যেন এথেন্সবাসীদিগের দেহ সর্ব্বব্যাপক কুষ্ঠরোগে বিকৃত হইয়া যায়। আর যেন প্রত্যেকের নিশ্বাস দোষযুক্ত হইয়া পরস্পরের সাহচর্য্যে নিরন্তর বিষ বমন করিতে থাকে।'

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'নবজীবনে' শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'জন্তুধর্ম্মী মানব' এই শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধে মানুষের পশুভাব বা পশুত্ব অতি দক্ষতার সহিত প্রতিপাদিত হইয়াছিল। তাঁহার মতে মনুষ্য জন্তু নানাবিধ। পশু পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি নানারূপ মনুষ্য জন্তু আছে। অক্ষয় বাবু তিনটিমাত্র উদাহরণ দিয়া বিচক্ষণ পাঠক পাঠিকাকে জু-বাগানে গিয়া ছকের সহিত আমদানি মিলাইয়া ক্ষোভ মিটাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে সৌখীন ব্যক্তিরা শুকপক্ষিধর্ম্মী। তোষা-

মোদকারীরা বিড়ালধর্ম্মী, এবং খলস্বভাব মনুষ্যেরা সর্পধর্ম্মী। ইহা ছাড়া তাঁহার মতে কাক পেচক কুকুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষিধর্ম্মী মানব আছে। ছাগ মেষ শূন শূকর শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুজাতীয় মানবেরও অভাব নাই। এবং গোধা গিরগিটে ইন্দুর ছুছুন্দরী প্রভৃতি নানারূপ সরীসৃপধর্ম্মী মানবও খুঁজিলেই পাওয়া যায়।

শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অক্ষয় বাবুর চিত্রটি পূর্ণাবয়ব করিবার জন্য দেবধর্ম্মী মানব নামে আর একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে মনুষ্যের দেবভাব বা দেবত্ব অতীব সহৃদয়তার সহিত প্রকটিত হইয়াছিল। চন্দ্রনাথ বাবু দেখাইয়াছিলেন যে, জন্তুধর্ম্মী মানবের ন্যায় দেবধর্ম্মী মানবও নানা শ্রেণীর ও নানা প্রকৃতির। জন্তুপ্রকৃতিও যেমন বহুবিধ, দেবপ্রকৃতিও তেমনি বহুবিধ। উদাহরণস্বরূপ তিনি অন্নপূর্ণাধর্ম্মী, দিকপালধর্ম্মী ও নারায়ণধর্ম্মী মনুষ্যের বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই বর্ণনাগুলি পড়িলে সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও কতটা দেবভাব প্রচ্ছন্ন আছে, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

এই তত্ত্বটি বিবৃত করিবার জন্য প্রাচীনেরা একটি গল্প বলিয়া থাকেন। গল্পটি গল্প হইলেও বড় শিক্ষাপ্রদ। এক দীন দুঃখী ব্রাহ্মণ উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া জঠরজ্বালার অঙ্কুশতাড়নায় সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু কোথাও কিছু মিলিল না দেখিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিল, এবং মনোবেদনায় অধীর হইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাপুরুষকে অনেক গালি পাড়িতে লাগিল। বিধাতাপুরুষ আত্মদোষক্ষালনে উৎসুক হইয়া, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া তাহার সম্মুখীন হইলেন, এবং কথায় কথায় ব্রাহ্মণের ভিক্ষালাভের কথা উঠিলে বলিলেন, 'বাপু! বৃথা কেন ক্ষোভ কর। মানুষেই ত ভিক্ষা দেয়। তুমি ত মনুষ্যের কাছে ভিক্ষার জন্য যাও নাই। তোমার ভিক্ষা মিলিবে কেন?' ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'সে কি ঠাকুর! মানুষের কাছে যাই নাই ত কি পশুর কাছে গিয়াছিলাম না কি?' বিধাতাপুরুষ বলিলেন, 'তা বই কি।' বলিয়া একখান চসমা ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'এই চসমা চক্ষে দিয়া চাহিয়া দেখ দিকি?' ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। দেখিল, বাস্তবিকই মানবদেহধারিমাত্রই মনুষ্য নহে। দেখিল যে, চর্ম্মচক্ষে যাহাদের মানুষ দেখিয়াছিল, তাহারা এক একটি জন্তুই বটে। কেহ ব্যাঘ্র, কেহ ভল্লুক, কেহ সর্প, কেহ মূষিক, কেহ শুক

কেহ বাজপাখী, ইত্যাদি। কদাচিৎ দুই এক জন প্রকৃত মনুষ্য আছে। তখন তাহার চিত্তক্ষোভ দূর হইল। সে বিধাতাপুরুষের স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর উপরি-উক্ত প্রবন্ধের মত এই গল্পটিতেও সত্যের একদেশমাত্র বিবৃত হইয়াছে। মানুষ কেবল পশু নহে; মানুষ দেবতাও বটে। মানুষ পশুত্ব দেবত্বের রাসায়নিক সংযোগ। মানুষ রহস্যময় অত্যদ্ভুত পদার্থ। ইহাই মনুষ্যের স্বরূপ। মানব দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়। আর মানবতা—সেই অদ্ভুত মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তকের প্রকাণ্ড সমষ্টি। সৃষ্টিরহস্যজিজ্ঞাসু হ্যামলেটও মানুষ, ইহকালপর উদরসর্ব্বস্ব ফলস্‌-ষ্ট্যাফও মানুষ। অকারণবৈরী ইয়াগোও মানুষ, আর বৃদ্ধ লিয়রের প্রভুভক্ত সেবক কেণ্টও মানুষ। দানবী রিগনও মানুষ, এবং দেবী কর্‌ডিলিয়াও মানুষ। বিলাসিনী ক্লিওপেটরাও মানুষ, আর পতিদেবতা ইমোজেনও মানুষ। উচ্চতম দেবভাব ও নীচতম পশুভাব, এই উভয়ের মধ্যে কি বিরাট ব্যবধান! কি ব্যাপক ব্যবচ্ছেদ! কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? কে তাহা ধারণায় আনিতে পারে? কে কল্পনার আয়ত্ত করিতে পারে? যদি কেহ কখন পারিয়া থাকে, তবে সে সেক্‌সপীয়র। তিনি পারিয়াছেন, কারণ তিনি অমানুষ; তাঁহার কল্পনাশক্তি অমানুষী ছিল। সেই জন্য তিনি মানবতার কবি। মানবতার বিরাট চিত্র তাঁহারই কল্পনা-দর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল।

এ কথার অর্থ কি, আমরা বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

মঙ্গল গ্রহের জীব।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্পকাল মধ্যে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা গিয়াছে। দূরবীক্ষণ দ্বারা মঙ্গল গ্রহটি পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহার স্থানে স্থানে একপ্রকার কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এবং মেরুদ্বয়ের প্রান্তদেশে উজ্জ্বল শ্বেত আলোক দৃষ্টিগোচর হয়। বৃহৎ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ আরও অনেক ব্যাপার সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষ অভিনিবেশসহকারে পরীক্ষা করিলে, বহুসংখ্যক সরল রেখা দ্বারা সমগ্র গ্রহটি

নানা আকারের ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ প্রভৃতি জ্যামিতিক ক্ষেত্রে বিভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মঙ্গলের এই অদ্ভুত প্রাকৃতিকদৃশ্য ও আকারাদি বিষয়ে অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ অনেক কথা বলিতেছেন ;—মঙ্গলের আধুনিক অবস্থা ও জীববাসোপযোগিতা সম্বন্ধে বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নানা অনুমান, ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেকে জীববাসোপযোগী অনেক পদার্থ মঙ্গল গ্রহে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন ;— পূর্ব্বে যে মঙ্গলগোলকস্থ শ্বেত ও কৃষ্ণ-বর্ণ চিহ্ন গুলির কথা বলা হইয়াছে,—ইঁহাদের মতে,—তাহা নীলবর্ণ জলরাশি ও মেরুদেশস্থ সুবিস্তৃত তুষারস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। গ্রহগোলকব্যাপ্ত উল্লিখিত সরল রেখাগুলির উৎপত্তিতত্ত্বও কয়েক জন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন। ইঁহারা বলেন,—উক্ত সরল রেখাগুলি প্রাকৃতিক কারণে কিছুতেই উৎপন্ন হইতে পারে না ; সুবিন্যস্ত সরলরেখাযোগে এই প্রকার নানাবিধ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের অঙ্কন, প্রকৃতির কোন কার্য্যেই কথনও দৃষ্টিগোচর হয় নাই ; এগুলি নিশ্চয়ই কোনও বিশেষবুদ্ধিসম্পন্ন মঙ্গলবাসী জীবের কীর্ত্তি। মঙ্গলে পৃথিবীর ন্যায় ঝড় বৃষ্টি ও মেঘাদির আধিক্য নাই, সেই জন্য তথায় শস্যাদি উৎপাদনের ও জীবস্থিতির নিমিত্ত কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদির বিশেষ আবশ্যক ; ইঁহাদের মতে, মঙ্গলপৃষ্ঠব্যাপ্ত রেখাগুলি, মঙ্গলবাসিগণের নিখাত সুবিন্যস্ত কৃত্রিম নদী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

জীবের অস্তিত্বজ্ঞাপক এই প্রকার বিবিধ চিহ্নের আবিষ্কার করিয়া,মঙ্গল গ্রহ উৎকৃষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন জীবের বাসস্থান বলিয়া প্রায় সকলেই অনুমান করিতেছেন। মঙ্গলের তাপপরিমাণ প্রায় পৃথিবীর তাপের অনুরূপ ; ইহার মেরুপ্রদেশে যে তুষার-রাশি সঞ্চিত থাকে, এই তাপপ্রভাবে তাহা জলীভূত হইয়া,পরে উক্ত কৃত্রিম নদী ও সমুদ্রাদি দ্বারা সমগ্র গ্রহপৃষ্ঠে সঞ্চারিত হইয়া পড়ে। মঙ্গলের আকাশে বায়ু ইত্যাদিরও অস্তিত্ব আছে, স্থিরীকৃত হইয়াছে ; কিন্তু তাহা পার্থিব বায়ুর ন্যায় ঘন নয়, কাযেই তদ্দারা আকাশের বা ঋতুর কোন বৈচিত্র্য সাধিত হয় না। মঙ্গলে 'একঘেয়ে' চিরবসন্ত সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ঘনত্ব হিসাবে পদার্থের ভার মঙ্গলে বড় অল্প ;—গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক লক্ষ-মণ-ভার-বিশিষ্ট কোনও পার্থিব পদার্থ মঙ্গলে লইয়া গেলে, তাহার ভার তথায় কেবল ৩৭৬ মণ মাত্র হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, মঙ্গলের আয়তনের ক্ষুদ্রতা ও ঘনত্বের অল্পতাই এই ভারবৈষম্যের কারণ। কেবল কৃত্রিম খাল প্রভৃতি দেখিয়া মাঙ্গলিক জীবের

অস্তিত্ব প্রথমতঃ অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই। এখন মঙ্গলের প্রাকৃতিক অবস্থা সকলও জীবস্থিতির সম্পূর্ণ অনুকূল দেখিয়া, মঙ্গল গ্রহে জীবাবাসের সম্ভাব্যতা অধুনা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এই প্রকারে মাঙ্গলিক জীবের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তাহাদের আকার, বুদ্ধি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে নির্ভুল তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য কয়েক জন পণ্ডিত সচেষ্ট রহিয়াছেন। মঙ্গলবাসিগণ যে মনুষ্য অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী জীব, তাহা মঙ্গলপৃষ্ঠস্থ বৃহৎ বৃহৎ কৃত্রিম নদী ও খাল ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পৌরুষাদি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিতগণের এই উন্মত্ত প্রয়াস কত দূর সাফল্য লাভ করিবে, পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন।

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ নানা যন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া, বহু গবেষণা ও গণনায় যাহার আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, আজ কাল ঔপন্যাসিকগণ কেবল কল্পনার সাহায্যে তৎসম্বন্ধে অনেক কথার প্রচার করিতেছেন। এই বৈজ্ঞানিক-উপন্যাসকারগণ, প্রায়ই প্রাকৃতিক শক্তি ও তাহার কার্য্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, উক্ত-শক্তিজাত অলৌকিক ও অদৃষ্টপূর্ব্ব কার্য্যপরম্পরার কল্পনা করিয়া প্রকৃতির অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি 'বর্ডারল্যাণ্ড' নামক একখানি ইংরাজি সাময়িকপত্রে, মঙ্গলবাসিগণের একটি কল্পিত ইতিহাস প্রকটিত হইয়াছে।

'বর্ডারল্যাণ্ডে'র ঔপন্যাসিক লেখক বলেন,—মঙ্গলবাসিগণ বৃহৎমস্তিষ্কশালী জীব; ইহাদের মস্তিষ্কের পরিধি কিছুতেই চারি ফিটের কম নয়। এই প্রকার মস্তিষ্ক ব্যতীত সমগ্র মঙ্গলপৃষ্ঠে সুয়েজখালের ন্যায় দীর্ঘ কোটি কোটি নালার খনন করা কিছুতেই সুসাধ্য হইত না। ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় মস্তকের পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত, এবং শ্বাসকার্য্যটা বৃহৎ চক্ষুযুগলের নিম্নস্থ দুইটি অনতিদীর্ঘ চঞ্চু দ্বারা সম্পন্ন হয়। পার্থিব প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের উদর নাই, এবং পাকক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না; কাযেই ভোজন ব্যাপারটার সহিত মঙ্গলবাসিগণ সম্পূর্ণ অপরিচিত,—আহারের কার্য্যটা নিকৃষ্ট জীববধজাত শোণিত স্ব স্ব ধমনীতে প্রবিষ্ট করাইয়াই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষভেদ নাই। এজন্য মঙ্গল লোকটা চিরশান্তিময়,—বংশবিস্তার কার্য্য উদ্ভিদাদির ন্যায় সম্পন্ন হয়। লেখক বলেন,—মাঙ্গলিক জীবের পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বগুলি কেবল

উপন্যাস-সুলভ কল্পনাকল্পিত নয়;—অভিব্যক্তিসম্বন্ধীয় প্রচলিত মতবাদ সত্য হইলে, মঙ্গলের এই কল্পিত বিবরণ অসত্য ভাবিবার বিশেষ কোনও কারণ নাই। লেখক মঙ্গলবাসিগণকে অসাধারণ প্রতিভাশালী ও বৈজ্ঞানিক জীবরূপে বর্ণনা করিয়াছেন; কি কৌশলে অন্ধ জড়শক্তিকে দৈনন্দিন কার্য্যের উপযোগী করিতে হয়, যে বিষয়ে ইহারা যে কতদূর সিদ্ধহস্ত, তাহার একটি উদাহরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। একটি উপগ্রহ মঙ্গলপৃষ্ঠের অতি নিকট দিয়া, দ্রুতবেগে গ্রহপ্রদক্ষিণ করিয়া থাকে; এই উপগ্রহের গতিতে, ভ্রমণপথের ঠিক্ নিম্নদেশ সর্ব্বদাই মহাঝটিকাসঙ্কুল হইয়া পড়ে,—কোনও মাঙ্গলিক জীবই এই প্রাকৃতিক উৎপাতে উক্ত স্থানে বাস করিতে পারে না। কিন্তু তদ্দ্বারা মঙ্গলবাসিগণের একটা বিশেষ উপকার সাধিত হয়;—গ্রহ ও উপগ্রহের সান্নিধ্যপ্রযুক্ত ইহাদের মধ্যে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা সুব্যবস্থিত যন্ত্র দ্বারা সংযত হইয়া, সমগ্র অধিবাসিবর্গের ব্যবহার্য্য তাপ ও আলোকের অভাব পূরণ করে। পৃথিবী হইতে মঙ্গলের যে লোহিতাভ জ্যোতিঃ দেখা যায়, তাহা কেবল গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে অবিরাম বিদ্যুতের আদানপ্রদানজাত আলোক হইতে উৎপন্ন।

দুই ভাই।

১

সঙ্কীর্ণ গলির উপর একটি বাড়ী; তাহারই দ্বিতলস্থ একটি মধ্যায়তন কক্ষে একজন রমণী মৃত্যু-শয্যায় শয়ানা। বার্দ্ধক্যের কঠোর করস্পর্শ এখনও রমণীর বিগতপ্রায়যৌবনলাবণ্য আননে একটি রেখাও অঙ্কিত করিতে পারে নাই; রোগক্লেশ এখনও সে পাণ্ডুর আননের শেষ রূপচিহ্ন মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বিংশতিবর্ষীয় পুত্র বিপিন শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননীর পাণ্ডুর মুখ পানে চাহিয়া আছে।

অস্তগমনোন্মুখ তপনের লোহিতাভ করজাল পশ্চিমের মুক্ত বাতায়নপথে প্রবেশ করিয়া শয্যার পাদদেশে আসিয়া পড়িল। একটা ক্ষুদ্র বিহগ বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া একবার মধুর কূজন করিল, তাহার পর উড়িয়া গেল—বুঝি সে ভাবিল, এ মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে তাহার আনন্দ-গীতি শোভন হইবে না। মরণোন্মুখ

জননী ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "বিপিন, একবার নলিন আর শেফালিকাকে ডাক।"

বিপিন দুই জনকে ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া পার্শ্বের কক্ষ হইতে একটি শ্যামলবর্ণ দশমবর্ষীয় বালক ও একটি কনকচম্পকদামগৌরী পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; যেন রজনী ও উষা একত্র আসিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া উভয়েরই চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে। নলিন রমণীর পুত্র; শেফালিকা তাঁহার কোনও আত্মীয়ার কন্যা, শৈশবে পিতৃমাতৃহীনা। রমণীর স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার পত্নী বিচার বা বিবেচনার অপেক্ষা না করিয়া স্বামীর ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বামীকে ছাড়িয়া স্ত্রীর কোনও ধর্ম্ম নাই।

দুর্ব্বল হস্তে বালকের ও বালিকার হস্ত ধরিয়া রমণী যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যুবক এতক্ষণ কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়াছিল—এবার কাঁদিয়া ফেলিল। আপনার হস্তে তপ্ত অশ্রুর স্পর্শানুভবমাত্র রমণী বলিলেন, "ছিঃ! বাবা বিপিন তুই এমন অধীর হইলে উহাদের কে দেখিবে? তোর পিতার মৃত্যুর পর হইতে এতদিন তোদের মানুষ করিয়াছি; সংসারের দুঃখ কষ্ট এক দিনের জন্যও জানিতে দিই নাই; ভাবিতাম—তোরা ছেলেমানুষ, তোদের কোনও কষ্ট পাইতে দিব না। আজ তুই বড় হইয়াছিস, আজ ইহাদিগের ভার তোর হাতে দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতেছি—আমি ত সুখেই মরিতেছি! আমার জন্য কান্না কেন বাবা? ইহাদের সকল ভার তোর উপর রহিল।"

জননী পুত্রকে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু অশ্রুর উচ্ছ্বাসে তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

সেই দিন নিশাশেষে রমণীর ক্ষীণজ্যোতিঃ জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

বিপিন ভাবিল—মা যখন নলিনের ও শেফালিকার ভার আমার উপর দিয়া গিয়াছেন, তখন আমি সাধ্যমতে তাহাদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

২

যে দিন বিপিনের হস্তে নলিনের ও শেফালিকার ভার অর্পণ করিয়া রমণী জীবন ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার পর দশ বৎসর বহিয়া গিয়াছে। অনন্তকালের তুলনায় দশটি বৎসর সমুদ্রসৈকতে এক কণা বালুকামাত্র; কিন্তু এই দশ বৎসরকালে সেই যুবকের ও সেই বালক বালিকার কত পরিবর্তন হইয়া

গিয়াছে! বিপিন এখন যৌবনের শেষ সীমায় উপনীত। জানি না, কি গোপন বাসনায়,-কি দারুণ চিন্তায়, কি কঠোর মনঃকষ্টে, তাহার উৎফুল্ল যৌবন-শ্রী-সম্পন্ন আননে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে। যৌবনের উৎসাহ বা উদ্যম, আকুলতা বা আবেগ, কিছুই তাহার নাই। জগতে কে অপরের হৃদয়ের গোপন বেদনা জানিতে পারে? নলিন এখন আর বালক নহে, প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। শেফালিকাও এখন আর সে বালিকা নাই—যৌবনের ঐন্দ্রজালিক কর-স্পর্শে তাহার দেহে মলয়পবনস্পর্শে কাননে বিকশিত কুসুমের শোভার মত অসামান্য রূপরাশি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চাঞ্চল্য এখন গাম্ভীর্য্যে নিমগ্ন হইয়াছে। নলিন এখন এক বড় বণিকের হৌসে খাজাঞ্চি অর্থাৎ "ক্যাশিয়ার"।

আজ বৈশাখের সন্ধ্যায় আপনার কক্ষে বসিয়া বিপিন কি ভাবিতেছে। সম্মুখে টেবিলে কয়খানা পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে; একটা বড় ল্যাম্প কক্ষে উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিতেছে। রাজপথে কোনও পথিকের উচ্চহাস্য বা কোনও শকটের গমনশব্দ শ্রুত হইতেছে; কিন্তু সে সকলে বিপিনের মনোযোগ ছিল না, সে তদগতচিত্তে কি ভাবিতেছিল।

কিছু ক্ষণ ভাবনার পর বিপিন আপনা-আপনি বলিল, "আর বিলম্ব করি কেন? নলিনের ভার মা আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন। যতদিন সে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছিল,ততদিন আপনার সুখের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি। আজ আর সে বালক নহে। এখন সে বড় হইয়াছে,—যে গচ্ছিত ধনের চিন্তায় এতদিন ব্যস্ত ছিলাম, সে চিন্তার কারণ এখন আর নাই। তবে আর কেন আপনার সুখের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকি? জগতে সুখ-লাভের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকে; আমি কেন করিব না? আজ নলিনকে এ কথা বলিব।"

বিপিন এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন বলিল, "কে, নলিন? এস, ভাই, ভিতরে এস।"

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল, বসিয়া বলিল, "দাদা একটা আবশ্যক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

বিপিন বলিল, "আমিও তোমাকে একটা দরকারী কথা বলিব। তুমি কি বলিবে, বল।"

নলিন বলিল, "আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিব।"

বিপিন চমকিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় যেন জলিয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্ত-

মধ্যে সে আত্মসংবরণ করিল। নতদৃষ্টি নলিন তাহার মুখের বেদনাব্যঞ্জক ভাব লক্ষ্য করিতে পারিল না। আত্মসংবরণ করিয়া বিপিন বলিল, "আচ্ছা।"

কিছু ক্ষণ দুই জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর বিপিন বলিল, "তুমি শেফালিকার মত লইয়াছ?"

নলিন বলিল, "হাঁ।"

তাহার পর দুই জনে আবার চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

নলিন উঠিয়া যাইতেছিল, দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "দাদা, তুমি কি বলিতে বসিয়াছিলে?"

বিপিন বলিল, "আজ থাক্। আর এক দিন বলিব।"

নলিন আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে বিবাহে দাদার সম্মতি-সংবাদ শেফালিকাকে বলিতে গেল।

৬

নলিন চলিয়া গেলে বিপিন উঠিয়া কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর চেয়ারে বসিয়া দুই করে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দন কি যাতনাময়,—কি মর্ম্মবেদনাব্যঞ্জক, তাহা কে বলিবে? মর্ম্মব্যথাপীড়িত হৃদয় হইতে অব্যক্ত বেদনা বহিয়া সে অশ্রুরাশি নয়নে ফুটিতে লাগিল।

কিছু ক্ষণ কাঁদিয়া বিপিন ভাবিতে লাগিল, এত দিন আপনার সকল সুখ তুচ্ছ করিয়া যাহার সুখবিধানে চেষ্টিত হইয়াছি, আজ কি আত্মসুখাশায় তাহাকে চিরজীবনের জন্য অসুখী করিব? মৃত্যু-শয্যায় মা আমার হাতে নলিনকে ও শেফালিকাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আজ আমি আপনার সুখের জন্য তাহাদিগকে অসুখী করিব? জীবন কুসুমের মত ক্ষণস্থায়ী,—তাহা প্রভাতে ফুটিয়াছে, সন্ধ্যায় শুকাইয়া যাইবে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য কেন তাহাদের সুখ নষ্ট করিব? আমি তাহাদের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইবার আশা করি, তাহাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই আমার কর্ত্তব্য। নলিন শেফালিকাকে বিবাহ করিয়া সুখী হউক—আমি তাহার সুখের অন্তরায় হইব না। মা আমার আমাদের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আর আমি তাহার কথায় একটা সুখ-আশা বিসর্জ্জন করিতে পারিব না? নলিনের ভার আমার উপর; তাহার সুখের জন্য, যত কষ্ট সহ্য করিতে হয়, করিব।

বিপিন চক্ষু মুছিয়া স্থির হইল। হৃদয়ে কোনও মহৎ সঙ্কল্প উপস্থিত হইলে

বলের অভাব হয় না; তখন বল আপনি আইসে। সঙ্কল্প স্থির হইলে পর বিপিনের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা তপনোদয়ে কুজ্ঝটিকার মত অপসৃত হইয়া গেল।

বিপিন আপনি উদ্যোগ করিয়া শেফালিকার সহিত নলিনের বিবাহ দিল; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ নিভৃত প্রান্তে কোথায় যে কেমন একটু বেদনা তীক্ষ্ণকুশাঙ্কুরের মত বিদ্ধ হইতেছিল, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে পারিল না।

৪

দিন যেমন যায়, তেমনই যাইতে লাগিল। বিবাহের পর প্রথম দিন কতক নলিনের মনে যে অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল, বন্যার জলের মত তাহা শীঘ্রই সরিয়া গেল। তখন দাম্পত্য জীবনের দৈনন্দিন মান অভিমান, আদর সোহাগ, ভ্রূকুটি চুম্বন, যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইতে লাগিল। আনন্দের প্রথম প্লাবন দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না। তবুও যেন নলিনের ও শেফালিকার হৃদয়ে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটু পরিবর্ত্তন আসিল,—সেটা একান্তই স্বাভাবিক; কেন না, বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের একাংশ ত্যাগ করিয়া আর এক অংশে প্রবেশ করিতে হয়;—দুই অংশে প্রভেদ প্রভূত। বিবাহিত-জীবনে একটা দায়িত্ববোধ, একটা গাম্ভীর্য্য আইসে, যাহা অবিবাহিত জীবনে আসিতে পারে না।

বিপিনের পূর্ব্বে যেমন দিন কাটিতেছিল, এখনও তেমনই কাটিতে লাগিল। কেবল তাহার দেহে অকালবার্দ্ধক্যের চিহ্ন সকল ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতে লাগিল,—উন্নত কপালে চিন্তারেখা দৃষ্ট হইল, কেশজাল শ্বেত হইয়া উঠিল, মনের স্ফূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়া গেল। নলিন এক এক দিন জিজ্ঞাসা করিত, "দাদা, তোমার কি কোনও অসুখ হইয়াছে?" বিপিন বলিত, "না।" নলিন বলিত, "তবে দিন দিন এমন হইয়া যাইতেছ কেন?" বিপিন হাসিয়া বলিত, "ও কিছুই নহে। আমি মরিবার পূর্ব্বে তুই জানিতে পারিবি, সে জন্য অত ভাবিয়া কাজ নাই।"

শেষ নলিন জেদ করিয়া দাদাকে দেশভ্রমণে রাজি করিল। আপনি সঙ্গে গিয়া, টিকিট করিয়া, সে দাদাকে কলম্বোযাত্রী ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিল। সেই দিন গৃহে ফিরিয়া নলিন শেফালিকাকে বলিল, "দাদার নিশ্চয়ই কোন অসুখ করিয়াছে; কিন্তু তিনি যে তাঁহার অসুখের কথা, কি অন্য কোন কথা আমার কাছে গোপন করেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। সে কথা

ভা... আমার বড় কষ্ট হয়।" বলিতে বলিতে নলিনের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। শেফালিকা বলিল, "এখন তিনি সারিলেই ভাল। তিনি নিশ্চয়ই সারিয়া আসিবেন।"

*

নিয়মিত সময়ে বিপিন গৃহে ফিরিয়া আসিল; কিন্তু এই ভ্রমণে তাহার দেহের বা মনের কোনও প্রকার উন্নতিই পরিলক্ষিত হইল না।

গৃহে আসিয়া বিপিনের যেন আরও কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। ইতিপূর্ব্বে অভ্যাসহেতু দৈনন্দিন জীবনে তত অভাব অনুভূত হইত না—এবার সে অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তাই অভাব তীব্র বলিয়া বোধ হইত। দেশভ্রমণে বিপিনের বরং এই অপকারই হইয়াছিল—উপকার কিছুমাত্র হয় নাই। যে যাতনা জুড়াইবার নহে, তাহা কি দেশভ্রমণে জুড়ায়? কল্পনা যে ক্ষুদ্র যাতনাকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলে, সে যাতনা অভিনব দৃশ্যের মধ্যে গেলে দূর হইতে পারে সত্য; কিন্তু প্রাণের প্রকৃত যাতনা কিছুতেই জুড়ায় না—হৃদয়ের ক্ষত কিছুতেই মিলায় না।

গৃহে নিতান্তই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হয় দেখিয়া, বিপিন একদিন নলিনকে বলিল, "নলিন, তোর আফিসের কাজ আমাকে শিখাইতে পারিস্?" নলিন জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" বিপিন উত্তর দিল, "কখন কি আবশ্যক হয় কে জানে, —শিখিয়া রাখায় হানি কি?" নলিন বলিল, "তাহা কিছুতেই হইবে না; যত দিন আমি উপার্জ্জন করিতে পারিব, তত দিন কিছুতেই তোমাকে চাকরী করিতে দিব না।" বিপিন হাসিয়া বলিল, "পাগল, আমি কি এখনই চাকরী করিতে যাইতেছি? বাড়ীতে কোন কাজ নাই,—বড় একা একা বোধ হয়, তাই তোর আফিসে যাইয়া বসিব।"

নলিন দাদাকে আফিসে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। বিপিন আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীরই মত প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে আফিসে যাইত; আর নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে গৃহে ফিরিত না। কিন্তু ইহাতে এক বিপদ উপস্থিত হইল। আফিসের কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহ যে আফিসের আয় ব্যয়ের হিসাবাদি দেখিয়া যাইবে, ইহা কর্ত্তাদের অভিপ্রেত ছিল না। কাজেই ভ্রাতাকে খাতাপত্রে হাত দিতে দেওয়ার জন্য নলিন তিরস্কৃত হইল। সে কথা শুনিয়া বিপিন পরদিবস হইতে আফিসে যাওয়া রহিত করিল।

এ কয় দিন আফিসে যাইবার অভ্যাসের পর বিপিন ...—গৃহের নির্জ্জনতা

নিতান্তই অসহনীয়। বিপিন নলিনকে কিছু না বলিয়া একটা চাকরী যোগাড় করিল ; কিন্তু সে সন্ধান পাইয়া শেফালিকা ও নলিন এত দুঃখ করিল ও এমন প্রতিবাদ করিল যে, স্নেহশীল বিপিনের আর চাকরী করা হইল না। নলিন বলিল, "দাদা, তুমি আমার গৃহের দেবদূত—যে গৃহ-দেবতাকে পরিশ্রম করায়, তাহার মঙ্গল নাই। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।" শেফালিকা বলিল, "কি দুঃখে তুমি হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটিতে যাইবে ? তোমার কিসের অভাব ? তোমরা একজনও বাড়ী থাকিবে না,—আর আমি কি একা এই বাড়ীতে থাকিতে পারি ? তুমি কিছুতেই চাকরী করিতে পাইবে না।"

নলিনের ও শেফালিকার স্নেহ দেখিয়া বিপিনের চক্ষে জল আসিল। বিপিনের আর চাকরী করা হইল না।

বিপিন উপন্যাস পাঠ করিয়া হৃদয়ের যাতনা ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু গম্ভীরপ্রকৃতি বেদনাক্লিষ্ট বিপিনের উপন্যাস ভালই লাগিত না। কিছুতেই কিছু ভাল লাগে না দেখিয়া বিপিন শেষে দর্শন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মনের অবস্থা ভাল না থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। অল্পদিনের মধ্যেই বিপিন আবার অধ্যয়ন ছাড়িয়া দিল। নিতান্ত মর্ম্মব্যথায় প্রপীড়িত হইলে বিপিন কেবল একএকবার সেই ভক্তিভরা গানটি স্মরণ করিত,—

"থাক নাথ, থাক মোর সাথে সাথে অনুক্ষণ।
আসিছে সন্ধ্যার ছায়া　　বিস্তারি করাল কায়া,
ছিল যারা, তেয়াগিয়া করিয়াছে পলায়ন ;
সুখ-আশা রাশি রাশি　　সকলি যেতেছে ভাসি'
অনাথের নাথ, তুমি কাছে থেক অনুক্ষণ।"

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

•

ইহার পর বিপিনের আর বড় অধিক দিন কর্ম্মের অভাব রহিল না। শেফালিকার যখন একটি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে হইল, তখন বিপিনের নিকট যেন এক নূতন জগতের দ্বার মুক্ত হইল। বিপিনের হৃদয়ের ঘনান্ধকারের মধ্যে সেই শিশু যেন ভাস্বর শুকতারার মত ফুটিয়া উঠিল। শিশু বুঝি আপনার সঙ্গে স্বর্গের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লইয়া আসে, তাই এই চিরদুঃখময় জগতেও সে সকলের হৃদয়ে আনন্দ [illegible]য়া থাকে। শিশুর ক্ষুদ্র দুইখানি [illegible]নের

নিকট জগতের আর সকল বন্ধন [illegible] বলিয়া বোধ হয় ;—শিশুর অধরে অমল হাসির সম্মুখে জগতের কত কর্ত্তব্য ভাসিয়া যায় ;—হৃদয়ের কঠোর বৈরাগ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নলিনের পুত্র বিপিনের হৃদয়ে নূতন আনন্দ দান করিল। সেই শিশুকে লইয়া বিপিনের সময় কাটিত। শিশুও বিপিনকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, বিপিনও শিশুকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না। প্রৌঢ় জ্যেষ্ঠতাত ও শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে মনের মিলের যে কি কারণ ছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। তবে এক জনকে ছাড়িয়া থাকিতে অপরের কষ্ট হইত। কার্য্যবশতঃ কোথাও গেলে গৃহে ফিরিয়া যতক্ষণ শিশুকে দেখিতে না পাইত, ততক্ষণ বিপিন সুস্থির হইতে পারিত না ; শিশুও কিছুক্ষণ জ্যেষ্ঠতাতকে দেখিতে না পাইলে কাঁদিয়া বাড়ীর সকলকে বিরক্ত করিয়া তুলিত।

দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, ভালবাসা বিরক্তি ল[illegible] দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল। নলিনের পুত্র সুকুমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জেঠামহাশয়ের সমগ্র হৃদয়খানি দখল করিয়া লইল।

৭

পৌষের অপরাহ্ণ। ধূমাচ্ছন্ন পশ্চিম গগনে স্বভাবতঃ অনুজ্জ্বল-কর শীতের তপন হেলিয়া পড়িয়াছে—তাহার ম্লানকরপ্রভায় গৃহ-চূড়া সকল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আপনার কক্ষে বাতায়নসম্মুখে বসিয়া বিপিন পথের দিকে চাহিয়া আছে ; আর তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া নলিনের দুই বৎসরবয়স্ক পুত্র সুকুমার অর্দ্ধস্ফুট কথায় কত-কি বলিয়া যাইতেছে। বিপিনের গৃহের সম্মুখে একটা ছাত্রাবাস হইতে কৃষ্ণ, ধূসর, লোহিতাভকৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণের গরম কোট পরিধান করিয়া একদল ছাত্র বেড়াইতে বাহির হইল। তাহাদিগের যুবজনসুলভ উচ্চহাস্যে সে গলি শব্দমুখর হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে এক জন পকেট হইতে একটা চুরুট বাহির করিতে না করিতে পাঁচ সাত জনে সেটা লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে আরম্ভ করিল,—ফলে সেটা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—এ একটা ভারি মজা!

বিপিন যুবকদিগের কার্য্য লক্ষ্য করিতেছে, এমন সময়ে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নলিন দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিকৃতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "দাদা!"

বিপিন চমকিয়া উঠিল,—বলিল, "কি ভাই ?"

নলিন বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আফিসের হিসাবপত্র আমার হাতে থাকে। আমি মধ্যে মধ্যে চেক জাল করিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা বাহির করিয়া লইতাম। সেই টাকা আমি 'স্পেকুলেশনে' ব্যয় করিতাম। কোনটায় জিতিয়াছি, কোনটায় হারিয়াছি। মোটের উপর হিসাব মত টাকা আবার ব্যাঙ্কে রাখিয়া দিতাম। এবার আমি যাহাতে টাকা দিয়াছি, তাহাতেই হারিয়াছি। জিতিবার আশায় ক্রমাগতই টাকা বাহির করিয়াছি; কিন্তু একবারও জিতিতে পারি নাই।"

নলিন একটু চুপ করিয়া আবার বলিতে লাগিল, "আফিসের কর্ত্তারা এবার সব জানিতে পারিয়াছে। এখনই আমাকে ধরিতে আসিবে।"

ভ্রাতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য বিপিন যেন বজ্রাহতের মত হইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "কত টাকা লইয়াছ?"

নলিন উত্তর করিল, "ত্রিশ হাজার।"

বিপিন বলিল, "এত টাকা তোমারও নাই, আমারও নাই।—[illegible] উপায়?"

নলিনের দৃষ্টি তাহার শিশুর উপর পড়িল। বেদনা-ব্যথিত স্বরে সে বলিল, "তবে কি আমার উদ্ধারের কোনও উপায় নাই?"

সংসার-সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহার ভাগ্যে এখনও সুধা ভিন্ন গরল উঠে নাই, সে কি সহজে সংসার ত্যাগ করিতে চাহে?

সহসা বিপিনের মনে হইল, সে নলিনকে লিখিতে শিখাইয়াছিল—উভয়ের হস্তাক্ষর একরূপ। সে একটা কি স্থির করিল। তাহার পর সে নলিনকে বলিল, "আমি তোমাকে উদ্ধার করিব; কিন্তু শপথ কর—আমি যাহা বলিব, তাহাই করিবে?"

অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথে বাত্যাবিতাড়িত বারিধিবক্ষে [illegible] নাবিক সহসা তরঙ্গে তীরে উপনীত হইলে যেমন আনন্দিত হয়, নলিন তেমনই আনন্দিত হইল। সে বলিল, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

বিপিন বলিল, "তবে আমাকে ছুঁইয়া শপথ কর—আমি যাহা করিব, তুমি তাহার প্রতিবাদ করিবে না। বল,—আমি যাহা বলিব তুমি তাহাই স্বীকার করিবে।"

নলিন স্বীকৃত হইল।

সেই সময় সোপানশ্রেণীতে ক্রুতপদশব্দ শ্রুত হইল। নলিন বলিল, "ওই তাহারা আসিতেছে। আমি কি গৃহের পশ্চাতের দ্বারপথে পলাইব?"

বিপিন বলিল, "তোমাকে কিছু করিতে হইবে না। চুপ করিয়া বসিয়া থাক। যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

পরমুহূর্ত্তেই পুলিশের ইন্‌সপেক্টার ও আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

৮

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী নলিনকে দেখাইয়া পুলিশের ইন্‌সপেক্টারকে বলিলেন, "এই ব্যক্তিই অপরাধী।"

ইন্‌সপেক্টার নলিনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। বিপিন বলিল, "কি অপ-রাধে উহাকে গ্রেপ্তার করিতেছেন?"

আফিসের কর্ম্মচারী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ও আমাদের আফিস হইতে ত্রিশ হাজার টাকা চুরী করিয়াছে।"

স্থিরভাবে বিপিন বলিল, "চুরী ও করে নাই—আমি করিয়াছি।"

শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

বিপিন বলিতে লাগিল, "আপনি জানেন, আমি দিনকতক আপনার আফিসে যাইতাম। সে জন্য আপনি নলিনকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। সেই সময় আমি আফিসের সব দেখিয়া আসি। আমি চেক জাল করিয়া চুরী করিয়াছি। নলিন নির্দ্দোষ।"

আফিসের কর্ম্মচারী বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম—তোমার ভ্রাতা এতদিন কাজ করিয়া এখন সহসা এ দুষ্কর্ম্ম করিল কেন? তুমি নিজ-মুখে দোষ স্বীকার করিতেছ? জান, আমি অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট?"

স্থির স্বরে বিপিন বলিল, "আমি দোষী।"

ইনস্পেক্টার বিপিনকে গ্রেপ্তার করিলেন। বিপিন তাঁহার নিকট হইতে দুই মিনিট সময় লইয়া একখানা পত্র লিখিল—লিখিয়া সে পত্রখানা নলিনকে দিয়া বলিল, "আমি চলিয়া গেলে এই পত্রখানা পড়িয়া দেখিও। পড়িলে সব বুঝিতে পারিবে।"

তাহার পর আফিসের কর্ম্মচারী ও ইনস্পেক্টারের সঙ্গে বিপিন থানায় চলিয়া গেল। যেখানে সুকুমার দাঁড়াইয়াছিল, সে আর সে দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

*　　*　　*　　*　　*

বিপিন যাইতে না যাইতে নলিন তাহার পত্রখানি খুলিয়া পড়িল,—

"ভাই নলিন,

"যে দিন তুমি আমার নিকট শেফালিকাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে—সে দিন আমি তোমাকে একটা আবশ্যক কথা বলিতে যাইতেছিলাম। আমি শেফালিকাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা তোমাকে জানাইব, ভাবিতেছিলাম। তুমি প্রস্তাব করিলে আমি ভাবিলাম—মা মরিবার সময় তোমাকে আমার হাতে দিয়া গিয়াছিলেন, আমি তোমার সুখের অন্তরায় হইব না।

"সে দিন মার কথা স্মরণ করিয়া তোমার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলাম। আর আজ শেফালিকার কথা ভাবিয়া তোমাকে বাঁচাইলাম। আমি জানি, তুমি দণ্ড পাইলে শেফালিকার সকল সুখ নষ্ট হইবে।

"এ কথা শেফালিকাকে বলিও না। শুনিলে সে কষ্ট পাইবে। তদ্ভিন্ন এ কথা শুনিলে যদি তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধাভক্তি দূর হইয়া যায়, তবে তোমাদের উভয়েরই জীবন নরকযন্ত্রণাময় হইয়া উঠিবে। তাই আমার শেষ অনুরোধ,—শেফালিকা যেন এ কথা জানিতে না পায়; সে আমাকেই দোষী বলিয়া জানুক।

"এক জনকে ছাড়িয়া যাইতে আমার কষ্ট হইতেছে—সে সুকুমার। আমার হইয়া তাহাকে একটি স্নেহ-চুম্বন দিও। শিশু সহজেই আমাকে ভুলিয়া যাইবে।

"তোমার চিরশুভার্থী ভ্রাতা বিপিন।"

পত্র পাঠ করিয়া নলিন স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সহসা শিশুর ক্রন্দনে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সুকুমার তখন 'জেঠার কাছে যাবো' বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে।

"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল?"

বাল্যকালে "গঙ্গাফড়িঙ" ধরিয়া কতবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—"গঙ্গা, গঙ্গা, কতখানি জল?" পতঙ্গ একটি পদ উত্তোলন করিয়া জলের গভীরতা জানাইয়াছে। সে সময় তাহাতেই কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি; গঙ্গাফড়িঙ মারিতে নাই, উহা দেবতা বলিয়া ঠাকুরমার নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহার যাথার্থ্য সেই পতঙ্গ-পদ-সঞ্চালনে উপলব্ধি করিয়াছি। বলা বাহুল্য, বয়োবৃদ্ধির সহিত এ বিশ্বাস তিরোহিত হইল; ক্রমে গঙ্গাফড়িঙকেও ভুলিলাম।

বহু দিন পরে, বাল্যের সেই পতঙ্গকে আবার মনে পড়িল; তখন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঠাকুরমার কথা কি সত্য? গঙ্গাফড়িও কি দেবতা?" এই প্রকার সন্দেহের বিশেষ কারণ ছিল। উহা যদি দেবতা কিম্বা দেবতার নিকটবর্ত্তী কিছু না হইবে, তাহা হইলে, কেবল আমাদের দেশে নয়,
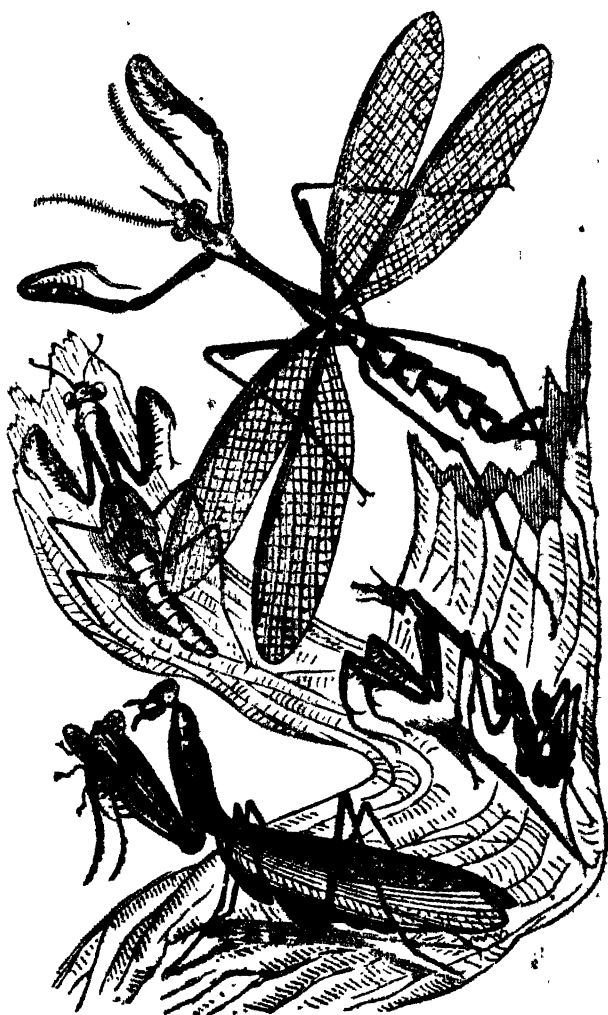
অনেক দেশে উহাকে সেণ্ট, প্রচারক, ঋষি ইত্যাদি শ্রদ্ধাময় নামে অভিহিত করিবে কেন? স্পারমান কহিয়াছেন যে, এই জাতীয় এক পতঙ্গকে হটেণ্টটগণ পূজা করিয়া থাকে। পরিব্রাজক কেলড (Caillaud) বলেন যে, আফ্রিকার কোন

কোন স্থানেও গঙ্গাফড়িং পূজা পাইয়া থাকে। য়ুরোপের অনেক [illegible] ইহাকে ম্যাণ্টিস্ mantis, এবং এই জাতীয় পতঙ্গকুলকে Mantidœ কহে। এই কথা যে গ্রীক ধাতু হইতে উৎপন্ন, তাহার অর্থ ভবিষ্যৎবক্তা। হটেণ্টট্‌গণের ধারণা যে, এই পতঙ্গ যাঁহার গাত্রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপবেশন করিবে, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত। পল্লীবাসী ফরাসীগণের বিশ্বাস এই যে,এই পতঙ্গ পথিকগণকে পথপ্রদর্শন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর জীবতত্ত্ববিৎ মফে (Mouffet) লিখিয়া গিয়াছেন, "পথহারা শিশু ইহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা একটি পদ প্রসারণ করিয়া পথ দেখাইয়া দেয়, এবং তাহাতে কখন ভুল করে না।" কেন এক পতঙ্গের প্রতি ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও এসিয়া—সমগ্র ভূখণ্ডে এত শ্রদ্ধার ভাব উদিত হইল ? তবে কি ঠাকুরমার কথা সত্য ? মনের সন্দেহ অধিক দিবস রহিল না। গঙ্গাফড়িঙ ! অনেক দিন ধরিয়া তুমি সারা সংসারকে প্রবঞ্চনা করিয়া মানবের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উপভোগ করিয়াছ ; এখন আর নয় ; বিড়ালতপস্বী, তুমি এত দিনে ধরা পড়িয়াছ। যাহাদিগকে মহাপুরুষ ইত্যাদি জ্ঞানে সমগ্র জগৎ এখন মান্য করিতেছে, কে জানে, তাহারাও আবার কালে তোমার মত ধরা পড়িবে না ?

গঙ্গাফড়িঙকে দেখিলে মনে হয়, এমন সৎ ও সাধু পতঙ্গ বুঝি আর নাই—ফলপত্রবিদ্ধকারী, তরুত্বগ্‌ভেদী, অশেষ অনিষ্টের আস্পদ, পতঙ্গরূপী দৈত্যকুলে বুঝি বা প্রহ্লাদ ! ইহা আপনার সম্মুখস্থ পা দুইখানি উত্তোলন করিয়া এমনই ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া থাকে যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী একাগ্রচিত্তে পরম পুরুষের ধ্যান করিতেছে। কিন্তু খাদ্য সমীপবর্ত্তী হইলে হয়। সন্ন্যাসী নিমেষে তাহার সংহার সাধন করিয়া আপন উদরপূর্ত্তি করিবে। পেটের জন্য এতই প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করিতে হয় ! গঙ্গাফড়িঙের সম্মুখস্থ পদদ্বয়ে কেমন করাতের দাঁতের মত দাঁত ; ইহার দ্বারা উহারা এক আঘাতে বিপক্ষকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। যাঁহারা ইহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, ইহাদিগের ন্যায় কলহপ্রিয়, নৃশংস, হত্যাকারী পতঙ্গ বিরল। আপনার জাতিকে পর্য্যন্ত ইহারা ভক্ষণ করে। চীনদেশে ইহাদিগের বিদ্যা বহুকাল হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। চীনবালকগণ বংশ-পিঞ্জরে দুই গঙ্গাফড়িঙ রাখিয়া, তাহাদিগের পরস্পরের যুদ্ধ দর্শন করিয়া থাকে ; যে পর্য্যন্ত একটি যোদ্ধা না মরে, সে পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের অবসান হয় না। বিজেতার মৃতদেহ আহার করিয়া জেতা আপনার সমরশ্রম

দূর [illegible] অতি শৈশব কাল হইতে ইহারা মারামারি কাটাকাটি করিতে থাকে। অণ্ড হইতে বাহির হইবার সময় ইহাদের কেবল পক্ষ থাকে না; নতুবা শিশুগণের অবয়ব বয়ঃপ্রাপ্ত পতঙ্গের ন্যায়। ডিম্ব হইতে বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই পক্ষহীন পতঙ্গশিশু মারামারি আরম্ভ করে। বালক

অপেক্ষা বালিকারাই অধিকতর সমরনিপুণা ও বলবতী বলিয়া, এই বাল্য-যুদ্ধে বহু পতঙ্গকুমার মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। এই জন্য ইহাদিগের স্ত্রীজাতির সংখ্যা অধিক; [illegible] স্ত্রীরা বহু স্বামী গ্রহণ করিয়া স্ত্রীধর্ম্ম রক্ষা করে। গ্রীষ্মকালে

শেষভাগে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। তরুশাখার গাত্রে এই [illegible] বৎসর কাল থাকে; তৎপরে তাহা ফুটিয়া শিশু বাহির হয়।

এই জাতীয় কোন কোন পতঙ্গের এমনই আকৃতি ও [illegible] যে, [illegible]দিগকে পতঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কাহারও বর্ণ নবকিসলয়সম স্বর্ণাভ হরিৎ; কাহারও ঘোর ঘনশ্যাম; কাহারও বর্ণ শুষ্ক শীর্ণ পত্রের ন্যায় বাদামী, [illegible] দেহ সূক্ষ্ম-শিরাবিশিষ্ট। বৃক্ষপত্রের রঙে রঙ মিলাইয়া তাহারা অন্য প্রাণীকে ফাঁকি দেয়; অতর্কিত শিকার সমীপে আসিলে তাহাদিগকে বধ করে; এবং আপনাদিগকেও প্রবলতর প্রাণীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া, কৌশলবলে সংসারের ঘোর জীবনসংগ্রামে জয়ী হয়। কাহারও কাহারও পক্ষ হয় না; তাহাদিগকে শুষ্ক পত্রবৃন্ত বা তরুশাখা বলিয়া ভ্রম হয়। এরিমিয়াফিলি (Eremiaphilœ) নামক এই জাতীয় এক পতঙ্গ আফ্রিকা ও আরবের মরুভূমিতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহারা বালুকাবর্ণ; সুতরাং বালুকার উপর পড়িয়া থাকিলে, বিশেষ নিবিষ্ট হইয়া না দেখিলে, চিনিতে পারা যায় না। এই জাতীয় অনেক পতঙ্গ রূপ-বিচিত্রতার নিমিত্ত 'ভ্রাম্যমাণ পত্র', 'জীবন্ত যষ্টি', 'দানবের অশ্ব' ইত্যাদি নানা অদ্ভুত নামে অভিহিত হয়।

বৈজ্ঞানিক সারসংগ্রহ।

তরল জলজান-বাষ্প।

প্রচুর চাপ দিলে ও সঙ্গে সঙ্গে শীতল করিলে, বাষ্পীয় পদার্থমাত্রই তরলাকার প্রাপ্ত হয়; আবার তরল বাষ্পে ক্রমাগত চাপ দিতে থাকিলে, শেষে তাহাও কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়া যায়। পরিজ্ঞাত বাষ্পগুলির মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বেই এখন তরলীকৃত, এবং অনেকগুলিকে কঠিন আকারে পরিণত করা হইয়াছে,—কারবনিক এসিড বাষ্প, এবং অল্প দিন হইল, বায়ুও কঠিন অবস্থায় নীত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ হইতে জলজান (Hydrogen) বাষ্প তরলীভূত করিবার জন্য বহুদিবস হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট শৈত্য ও চাপ প্রদানের কোনও ব্যবস্থা না হওয়ায় কাহারও চেষ্টা এত দিন সফলতা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে জলজান লইয়া পরীক্ষাকালে, চাপযুক্তির জন্য [illegible] স্বচ্ছ বাষ্প টিকে ক্রমে অস্বচ্ছ ও ক্ষুদ্র কটিকাময় হইতে দেখিয়া, যথেষ্ট চাপ প্রদানের ব্যবস্থা করিলে ইহা যে নিশ্চয়ই তরলীভূত হইতে পারে, এ বিষয়ে আর কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কয়েক মাস হইল, অধ্যাপক ডিয়ার ভুবনবিখ্যাত রসায়নবিদ্ লর্ড র‍্যালে প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সমক্ষে জলজান বাষ্প তরলীভূত করিয়াছেন। ডিয়ার সাহেবের পরীক্ষার আমুল বৃত্তান্ত আজও প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু, এই ব্যাপারে নানা পরীক্ষায় বিখ্যাত রসায়নবিদ্গণ এ পর্য্যন্ত যে প্রকার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে, উপস্থিত আবিষ্কারটি যে ডিয়ার সাহেবের এই অধ্যবসায় ও নানাকৌশলপূর্ণ পরীক্ষার ফল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

[illegible] বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিয়া কঠিন তাপ সংযোগ করিলে, পদার্থমাত্রই এক একটি [illegible]পরিমাণ তাপে তরলীভূত হইতে আরম্ভ করে; আবার এই প্রকারে কোনও [illegible] পদার্থ বাষ্পীভূত করিতে হইলে, তাহাতেও একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ তাপপ্রদানের প্রয়োজন হয়। বিশুদ্ধ জল, ১০০ অংশ পরিমিত উত্তপ্ত হইলেই বাষ্পীভূত হইতে থাকে; আবার যখন ইহার শীতলতা তাপমান যন্ত্রের শূন্য-পরিমিত হয়, তখন কঠিন হইয়া বরফে পরিণত হইয়া থাকে। জলের ন্যায় পদার্থমাত্রেরই উক্তপ্রকার এক একটি নির্দ্দিষ্ট তাপপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে, জলজান বাষ্পে শূন্যের নিম্ন ২০০ অংশ-(—২০০°)-পরিমিত তাপ থাকিলেও, তাহা বাষ্পাকারে থাকিয়া যায়;—সুতরাং উক্ত বাষ্প কত শীতল করিলে তরলীভূত হইবে, তাহা পাঠকপাঠিকাগণ অনুমান করুন। তরল জলজানে একটি বায়ুপূর্ণ কাচ-পাত্র আংশিক নিমজ্জিত রাখিলে, পাত্রস্থ বায়ু তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া যায়। এই পরীক্ষা দ্বারা তরল জলজানের শৈত্য-পরিমাণ আরও হৃদয়ঙ্গম হয়। ডিয়ারের আবিষ্কারের পূর্ব্বে, তরল জলজানের গুণাদি সম্বন্ধে রাসায়নিকগণ অনেক কথা কেবল অনুমানবলে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন;—পূর্ব্ব-অনুমিত সিদ্ধান্তগুলি পরীক্ষাসিদ্ধ ফলের অনুযায়ী হয় কি না, এখন পণ্ডিতগণ তাহারই অনুসন্ধান করিতেছেন। তরলাবস্থায় জলজানের গুরুত্ব জলের গুরুত্বের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশ।

জলজান বাষ্প আকাশে মুক্তাবস্থায় প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, এবং আজকাল যে উপায়ে উক্ত বাষ্প প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাও অতীব ব্যয়সাধ্য। সুতরাং তরল বায়ু যে প্রকার নানা কার্য্যে ব্যবহার করিবার উদ্যোগ চলিতেছে, ব্যয়বাহুল্যবশতঃ সম্ভবতঃ জলজান দ্বারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহার অসাধারণ শীতলতার সাহায্যে রসায়ন শাস্ত্রের এক মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ, হেলিয়ম্ (Helium) নামক একটি নবাবিষ্কৃত বাষ্পকে এতদিন কোনও উপায়েই তরলীভূত করিতে পারেন নাই;—শুনা যাইতেছে, তরল জলজানের সাহায্যে সম্প্রতি হেলিয়ম্ বাষ্প তরলীভূত হইয়াছে, এবং ইহার অনেক অজ্ঞাত ধর্ম্মও আবিষ্কৃত হইতেছে।

চিত্রবহ যন্ত্র।

আগামী ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পারিস প্রদর্শনীতে যে সকল নূতন যন্ত্র প্রদর্শিত হইবে, ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিক-সমাজে তাহাদের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। হ্যান্ ক্রেপিক্ নামক একজন যন্ত্রশিল্পী, টেলিলেক্ট্রস্কোপ (Telelectroscope) নামক এক আশ্চর্য্য যন্ত্রের প্রদর্শন করিবেন। এই যন্ত্রের দ্বারা যে কোনও স্থানের দৃশ্য অবিকল যে কোনও স্থানে প্রেরণ করিতে পারা যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রেরিত ছবির বর্ণ ও আকারাদি ঠিক্ আদর্শ চিত্রের অনুরূপ হয়।

যন্ত্রনির্ম্মাতা বলেন,—এই যন্ত্র দ্বারা সচল পদার্থের ছবি সহস্রক্রোশদূরব্যবহিত স্থানে প্রেরণ করিলেও, সেই দূরবর্ত্তী স্থানেও, পদার্থটির প্রকৃতগতিবিশিষ্ট ও বর্ণযুক্ত প্রতিকৃতি তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হইবে। এই আবিষ্কারবার্ত্তা সত্য হইলে, আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের বহুকালের বাসনা চরিতার্থ হইবে।

ইতিমধ্যে যন্ত্রটির গঠনপদ্ধতির এক স্থূল বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নির্ম্মাতা বলেন,—যে ছবিটি দূরস্থানে পাঠাইতে হইবে, তাহা প্রথমতঃ দুইখানি দর্পণের সাহায্যে কতকগুলি বিন্দুতে বিভক্ত করিতে হয়; পরে ছবির অংশীভূত পূর্ব্বোক্ত বিন্দু সকল আর একখানি দর্পণ দ্বারা পুনঃপ্রতিফলিত করিয়া, এবং পরে সেই প্রতিফলিত আলোক বিন্দু

বৈ[illegible] পরিণত করিয়া, চিত্রগঠন সম্পন্ন হয়। সুন্দর উপায়ে ও সুকৌশলে এই বিদ্যুৎপ্র[illegible] উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা আছে। আলোকপাত হইবামাত্র সেলিনিয়ম্ নামক পদার্থে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই প্রবাহের পরিমাণ আলোকমাত্রেই স্থির থাকে না। বর্ণচ্ছত্রস্থ লোহিতাদি আলোক যথাক্রমে সেলিনিয়মে পতিত হইলে, প্রত্যেক জাতীয় বর্ণে এক একটি নির্দ্দিষ্টপরিমাণ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। সেলিনিয়ম কোষে (Cell) টেলিগ্রাফের ন্যায় ধাতব তার আবদ্ধ থাকে; নানাবর্ণের আলোকবিন্দু উল্লিখিত দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া সেলিনিয়মে পড়িলেই বর্ণানুসারে অল্পাধিক বৈদ্যুতিকপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানে নীত হইয়া থাকে। এই প্রকারের বিদ্যুৎপ্রবাহ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলে, তথায় উক্ত প্রবাহের উৎপাদক আদিম বর্ণগুলির পুনর্বিকাশ করিবার সুব্যবস্থা আছে। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় অবগত আছেন, লৌহদণ্ডের উপরিভাগে তার জড়াইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিলে, লৌহদণ্ডটি চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং প্রবাহের [illegible] বর্দ্ধিত করিলে, শক্তির পরিমাণও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রবাহ রুদ্ধ করিলে, [illegible] দণ্ডের আর চৌম্বক শক্তি থাকে না। চিত্রগ্রহ যন্ত্রের তারের প্রান্তদেশ ঐরূপ এক লৌহদণ্ডে মণ্ডিত থাকে, এবং ইহার সম্মুখে একখণ্ড ত্রিকোণ কাচ ও তাহার পশ্চাতে একটি অত্যুজ্জ্বল আলোক সজ্জিত রাখা হয়। প্রেরিত বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ অনুসারে অল্প বা অধিক পরিমাণে চুম্বকশক্তি প্রাপ্ত হইলে, এই লৌহখণ্ড সম্মুখস্থ লম্বমান কাচখণ্ডকে চুম্বকশক্তির অনুপাতে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনের পরিমাণ অনুসারে পশ্চাৎবর্ত্তী আলোক বিশ্লিষ্ট হইলে বিশেষ বিশেষ আলোকের উৎপত্তি হয়। আন্দোলনের মাত্রা প্রবাহের মাত্রার উপর নির্ভর করে; আবার প্রবাহের পরিমাণ তারের অপরপ্রান্তস্থ দৃশ্য বা চিত্রের বর্ণানুসারে নিয়োজিত হয়। সুতরাং যে সকল বর্ণে প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল, এই প্রক্রিয়া দ্বারা আবার সেই সেই বর্ণের বিকাশ হয়। এই প্রকারে আদর্শ পদার্থের অংশভূত বিন্দুর অনুরূপ বিবিধ বর্ণের বিন্দু উৎপন্ন হইলে অপর দুইখানি দর্পণের সাহায্যে ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া দ্বারা পদার্থটির নিখুঁৎ ছবি অঙ্কিত হইয়া থাকে।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

জীবনচরিত।

মীনা বাঈ।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রবিপ্লবকালে যে সকল মনস্বিনী ভারতমহিলা আপনাদিগের দূরদর্শিতা, ধৈর্য্য, রাজকার্য্যপটুতা ও রাজনীতিক চাতুর্য্যগুণে অসংখ্য শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা ও প্রজাগণের সংরক্ষণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্দ্ধন করিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ধারাধিপতি আনন্দরাও পওয়ারের (প্রমারের) বিধবা পত্নী বীরাঙ্গনা মীনা বাঈ তাঁহাদিগের অন্যতম। "মাসিক মনোরঞ্জন" নামক মহারাষ্ট্রীয় মাসিকপত্রের জানুয়ারী মাসের সংখ্যায় এই রমণীরত্নের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার মর্ম্ম পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি।

মুসলমান আক্রমণের প্রবল তরঙ্গমালা রাজপুতভূমির উপর পুনঃ পুনঃ [illegible], তত্রত্য হিন্দুধর্ম্মকে ও তদবলম্বিগণকে জর্জ্জরিত করিলে, মেওয়াড় ও মার[illegible] প্রভৃতি প্রদেশের বহুসংখ্যক রাজপুত পরিবার স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিন্ধ্যগিরির শিখরশ্রেণী উল্লঙ্ঘন করিয়া মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের 'পওয়ার' (প্রমার) উপাধিধারী ক্ষত্রিয়পরিবার পূর্ব্বকথিত কারণে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়কুলাবতংস ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী ভোঁসের চেষ্টায় মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলে, ভোঁসে বংশের সহিত পওয়ার, ঘোরপড়ে, ঢাভাড়ে ও কদম প্রভৃতি মারাঠা ক্ষত্রিয়পরিবারসমূহ ক্রমে ক্রমে দেশ-বিজয় ও করসংগ্রহাদি কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শিবাজীর পৌত্র মহারাজ [illegible]রাজত্বকালে, মালব ও গুজরাট প্রদেশে মহারাষ্ট্রগণের প্রাপ্য চৌথ ও সরদেশমুখী [illegible] স্থাপন পূর্ব্বক করাদান করিবার ভার, 'উদাজী পওয়ার' (উদয়জী প্রমার) [illegible]ক সংস্থ মরাঠা ক্ষত্রিয় সর্দ্দারের প্রতি অর্পিত ও তাঁহাকে ঐ অঞ্চলস্থিত 'ধার' (বিক্রমাদিত্যের কবিবৎসল ভোজরাজের প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ধারা নগরী) নামক প্রদেশের জাইগিরী প্রদত্ত হইয়াছিল। মীনা বাঈ উদাজী পওয়ার কর্ত্তৃক স্থাপিত রাজবংশের কুলবধূ।

বংশপরিচয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর অবসানকালে উদাজীর বংশধর কোওাজী পওয়ার ধার নগরীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক মালব প্রদেশের মারাঠাগণের সত্ত্বরক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র অল্প-বয়স্ক আনন্দ রাওয়ের সহিত গোবিন্দ রাও গায়কওয়াড়ের (তুই কুমারের) পালককন্যা মীনা বাঈয়ের পরিণয় হয়। শৈশবেই আনন্দ রাওয়ের পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, তিনি মাতামহালয়ে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি যখন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেওয়ান রঙ্গরাও উরেকরের হস্ত হইতে পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার পূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যসূত্র নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন শিন্দে (শিন্ধিয়া), হোলকর ও অপর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ধার প্রদেশ দুরবস্থার চরম সীমায় [illegible]পনীত হইয়াছিল। রাজ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ও অবস্থা দর্শনে অতিমাত্র চিন্তাকুল হইয়া [illegible] অচিরকালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

আনন্দ রাও।

[illegible]রা যখন এক দিকে এইরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণে ও লুণ্ঠনাদিতে জর্জ্জরিত ও বিপর্য্যস্ত, অপর দিকে দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণের দুরাকাঙ্ক্ষায় অন্তর্বহ্নি অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আনন্দ রাও পওয়ার তৎপ্রতি-বিধানে অসমর্থ হইয়া দুশ্চিন্তানলে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন [illegible]হার বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র। আনন্দ রাও সত্য সত্যই মীনাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া গিয়াছিলেন। ধার রাজ্যে মীনার হিতকারী কেহ ছিল না। রাজা ও রাজপুরী সেই শোক-তপ্তা অনাথা বালবিধবার পক্ষে শত্রুময় হইয়া উঠিয়াছিল। মুরারি রাও নামক আনন্দ রাওয়ের এক নিকটসম্পর্কীয় আত্মীয় ধার রাজ্যের উত্তরাধিকারলাভের জন্য বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়া, মীনার জীবনও সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অধিকতর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, স্বামীর পরলোকগমনকালে মীনা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। কাজেই পলায়ন ভিন্ন সে সময়ে অবলার আত্মরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না। মীনা বাঈ এক জন বিশ্বাসী রাজনিষ্ঠ মুৎসুদ্দীর হস্তে ধার রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং নির্বিঘ্নে প্রসূত হইবার জন্য, গুজরাথের অন্তর্গত 'মণ্ডু' গ্রামে গমন করিলেন। তথায় অতি [illegible] দিবসের মধ্যে

বিধবার বিপত্তি।

সংযোগ হয়, তাহা হইলে সানন্দচিত্তে অনলে প্রাণ বিসর্জন [illegible]র চিতারোহণের পুণ্যলাভ করিব।' ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ম্যালকম্ সাহেবের সহি[illegible] প্রসঙ্গে মীনা বাঈ স্বমুখে এ কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

[illegible]দিকে রাজপুত্রের দুর্গপ্রবেশের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুরার রাও মীনাকে পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসহ দুর্গাবরোধের জন্য যাত্রা করিল। কারণ, রাজ্যের উত্তরাধিকারীকে বন্দী করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। স্বীয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে মীনা বাঈ মুক্তি লাভ করিয়া আপনার দল পুষ্ট করিতে যত্নবতী হইলেন।

যুদ্ধোদ্যোগ।

তিনি স্বীয় বিপদের ও মুরার রাওয়ের দুর্ব্যবহারের বিষয় বর্ণনা করিয়া, নিকটবর্ত্তী মিত্র-রাজন্যবর্গকে পত্রপ্রেরণ ও তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সে সময়ে, [illegible] বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে, দেশীয় নরপতিগণের রাজ্যে যেরূপ অব্যবস্থা ও অন্তর্বিপ্ল[illegible] প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে কোনও নরপতিই মীনার সাহায্যার্থ সৈন্যপ্রেরণ [illegible] পারিলেন না। কেবল বরোদার গায়কওয়াড় মীনার আত্মীয় ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই বিপৎকালে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বরোদা হইতে বাপু রঘুনাথ নামক জনৈক কর্ম্মচারী এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া মীনা বাঈর সহিত মিলিত হইলেন। তাঁ[illegible]কে লইয়া মীনা মুরার রাওয়ের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মুরারের সৈন্যসংখ্যা অ[illegible]লেও, সে প্রথমে সহজে পরাজিত হইল না। কিন্তু মীনার পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যের দীর্ঘকালব্যাপী অশ্রান্ত চেষ্টায়, পরিশেষে তাহাকে হতবীর্য্য হইয়া ধার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে হইল। ইহার অল্প দিন পরেই [illegible] মুরারের প্রাণবিয়োগ হওয়ায়, মীনা বাঈ নিঃশত্রু হইলেন।

জয়লাভ।

[illegible] রঘুনাথকে বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দেখিয়া, মীনা বাঈ তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মীনা স্বহস্তে সমস্ত রাজ্যসূত্র গ্রহণ করায়, অল্পকালমধ্যে ধার প্রদেশের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হইয়া, সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত ও প্রজাগণ সুখী হইল। কিন্তু বিধাতা মীনার ভাগ্যে সুখ লিখেন নাই। এই কণ্টকপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে নানা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্যই বোধ হয় বিধাতা তাঁহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

পুত্রবিয়োগ।

তাই মীনার দুঃখময় জীবনের এক অঙ্ক শেষ হইতে না হইতে আর এক বিষাদকারুণ্য[illegible]র আবির্ভাব হইল। রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইয়া তাঁহার সুখোদয়ের যে সম্ভাবনা হইয়াছিল, তাহা সহসা তাঁহার একমাত্র পুত্র রামচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুতে সম্পূর্ণ [illegible]ত হইল। তিনি দারুণ শোকে পরিতপ্ত হইয়া রাজকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

[illegible]ময়ে মধ্যভারতে ভয়াবহ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছিল। পেণ্ডারী-(পিণ্ডারী)-গণের [illegible]াচারে সমগ্র মধ্যভারত বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। শিন্দে (সিন্ধিয়া), হোলকর ও অন্যান্য রাজপুত রাজন্যগণ পরস্পরের রাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক দেশের সর্ব্বত্র সমরানল প্রজ্বলিত ও অশান্তির বিস্তার করিতে[illegible] [illegible]নও রাজ্যেই প্রজাগণের ধন প্রাণ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল না। এই কারণে [illegible]কসংবরণপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যাবলীর পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ ও রাজ্যের [illegible]রীভূত করিতে বদ্ধপরিকর হইতে হইল। স্বামীর বংশরক্ষার জন্য তিনি শিন্দে, [illegible] প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া, স্বীয় ভগিনীর এক পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ ও তাহার 'রামচন্দ্র রাও' নামকরণ করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে মধ্যভারতের অরাজকতার মাত্রা বর্দ্ধিত হওয়ায় ধার

রাজ্য 'পরচক্রের' পুনঃপুনঃ আক্রমণে জর্জ্জরীভূত হইতে লাগিল। পেণ্ডারী (পিণ্ডারী) সর্দ্দার করীম খাঁ ধার প্রদেশের একাংশ গ্রাস করিল, শিন্দে সরকারও সে সুযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মীনা বাঈ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও শত্রুর অত্যা[illegible] হইতে প্রজা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলেন। নিকটবর্ত্তী প্রায় [illegible] পরাক্রান্ত ভূপতিই বলপ্রকাশে তাঁহার নিকট হইতে করাদানের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অতএব মীনা বাঈয়ের সমস্ত সঞ্চিত ধন নষ্ট হইয়া তিনি ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। দিন দিন দেশের অবস্থা যেরূপ অশান্তিকর ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল, [illegible] কঠোরমূর্ত্তিধারণ ভিন্ন মীনা বাঈ রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। [illegible] সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। অষ্ট সহস্র সৈন্য সহ বাপু রঘুনাথ বহিঃশত্রুর আক্রমণনিবারণপূর্ব্বক পরদেশলুণ্ঠনের জন্য প্রেরিত হইলেন। মীনা বাঈ দুর্গে অবস্থানপূর্ব্বক শাসনব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

উপায়।

এই নবাবলম্বিত উপায়ের ফলে, মীনার ধনাগম হইতে লাগিল। সৈন্যরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ ও শিন্দে, হোলকর ও পেণ্ডারী প্রভৃতিকে করপ্রদানকার্য্যে সেই অর্থ ব্যয়িত করিয়া, তিনি ঋণজাল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় অন্যান্য নরপতিগণের নিকট তাঁহার সম্মানবৃদ্ধি ও দস্যুদিগের উপদ্রব নিবারিত হইয়া রাজ্যে বহুপরিমাণ শান্তি স্থাপিত হইল। কয়েক বৎসর পরে মধ্যভারতে ইংরাজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হওয়ায়, পেণ্ডারীদিগের দমন হইল, এবং অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া, পূর্ব্ব উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ [illegible] বাধ্য হইলেন; মীনা বাঈও ইংরাজদিগের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের সাহায্যে গতবৈভব ও হস্তচ্যুত প্রদেশসমূহ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। মীনার ব্যবস্থাগুণে অদ্যাপি ধার রাজ্য তাঁহার বংশধরগণের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয় নাই।

রাজ্যে শান্তি।

অবোধ।

১

কে জানে এ কি এ দশা? নিশিদিন অনিবার
আঁখি-কাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার!
প্রেম নাই, প্রীতি নাই, শুধু শুষ্ক ধূলিখেলা,
নিরাশ জীবন-পথে নিরাশ স্বপন-মেলা!
শুনেছি যৌবন-বনে প্রেমের কুসুম ফুটে,
মধুর মিলন-রসে অমিয়-লহরী ছুটে,
চোখে শুধু ভাসে হাসি, কানে শুধু বাজে গান
নাসায় সুরভি শ্বাস, পুলকে আকুল প্রাণ,—
তা' নহে, তা' নহে, এ কি!—নিশিদিন অনিবার
আঁখি-কাটা আঁখিজল, বুক-ফাটা হাহাকার!

২

নিয়ত জ্ঞানের দ্বারে প'ড়ে [illegible] অচেতন,
স্বপনেরে সত্য ভাবি' বিহ্বল [illegible] মন ;
কঠোর সমস্যা ল'য়ে দিন [illegible] যায়,
'বিজ্ঞান'-পিপাসু প্রাণ ব্রহ্মা[illegible] চায় ;
কল্পনারে সাথী করি উঠি দ্রুত মনোরথে
ব্যাকুল বাসনারাশি ছুটিবারে মেঘপথে।
পূর্ণিমাকিরণে বসি' নির্নিমেষ দু' নয়ানে
চাহিয়া থাকিতে শুধু দূর ছায়াপথ পানে।
হাতে ল'য়ে গ্রহরাশি গণিতে অঙ্গুলী-ঘায়,
গাঁথিতে তারার মালা ফুলের কলিকা প্রায়।
দারুণ 'দর্শন' ল'য়ে নিশীথের জাগরণ,
জগতের তত্ত্ব লাগি দেবলোকে বিচরণ ;
অসীমের দ্বারদেশে প্রার্থনার বজ্রনাদ,
হৃদয়ে নিরাশা শেষে কল্পনায় অবসাদ !—
জ্ঞানের ভিখারী আমি এরূপে কাটানু কাল,
আপনাতে জড়াইনু আপনারি ইন্দ্রজাল !

৩

কঠোর শাস্ত্রের পথে কুয়াসা-আঁধার-আলো,
হৃদয় রে ! তাও তোর, তাও তোর ছিল কালো !
মিছে তুই ফিরে এলি তুচ্ছ এ সংসার-ধামে,
প্রেমের মরণে হায়, ডাকিলি প্রেমের নামে।
জীবন-নিদাঘে তোর বৃথায় ফুটালি ফুল,
মরমের পাশ দিয়ে আশা-নদী কুলুকুল।
রোপিলি প্রণয়-তরু, বসিলি বিজন ছায়,
একটিও পাখী এসে গান গাহিল না তা'য়।
ছুটাইলি পরিমল, পরিলি প্রভাতী সাজ ;
বৃথায় আগ্রহ তোর জুটিল না অলিরাজ।
কেন্ধানে ধরিতে কারে বাড়াইলি আলিঙ্গন,
উপহাসি শুধু তোরে ব'হে গেল সমীরণ !

[illegible]

ভালবাসা অন্বেষণে নিয়ে এলি হাহাকার ;
[illegible]সবারে বিলাইয়ে কি ল'য়ে বাঁচিবি আর ?

এখনো এখনো তুই [illegible] দেখ্ দেখ্ মন,
এখনো বৈরাগ্য তো[illegible] দিতে চাহে আলি[illegible]
স্বার্থভরা এ জগৎ,—[illegible]গতে প্রেম নাই ;
সংসার শ্মশানে [illegible] শুধু আছে ছাই।
ভস্মে মলয়জ ভাবি লেপিয়া মরম-তল,
প্রক্ষালিতে পরিণামে দিতে হয় অশ্রুজল।
কবির হৃদয় তোর, তুই চাস কাঁদাহাসি,—
জীবন-নন্দনবনে মন্দার কুসুমরাশি,—
তুই চাস ছুটিবারে স্বর্গের আলোক পানে,
সে তোরে টানিয়া আনে মৃত্তিকার মাঝখানে।
একমাত্র চুম্বনেতে বরষ কাটাবি হায়!
নিঠুর অরুচিবশে সে তোরে ফেলিয়া যায়।
একটু অধিক হ'লে হৃদয়ে সে বাসে লাজ—
প্রাণে যেন ফুটে শেল, শিরে যেন পড়ে বাজ!
হায় রে! দুর্লভ প্রেম, দুর্লভ সে ভালবাসা,
কোথা কোন্ দেশে গিয়ে মিটিবে এ দীর্ঘ আশা?

৫

তাই বলি, এইবার ফিরে চল্, চল্ মন;
আজও ওই ডাকে তোর পুরাতন সখাগণ।
সৃষ্টির হৃদয় হ'তে মুছে ফেল ফুলরাশ,
বিকশিত বালিকার শশিমুখে কচি হাস।
ক্ষুদ্রেরে তাড়ায়ে দিয়ে মহানেরে কোলে ধর;
অন্ধকারে ঢেকে ফেল্ প্রেমের বাসর-ঘর।
যাহার চরণ-তলে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলি,
যাহার সুখের লাগি নিজেরেও বিকাইলি,
সে তোর প্রলাপবাণী শুনিতে না চাহে আর,
বহিতে পারে না তোর দুরন্ত প্রেমের ভার!
তাই বলি, আর কেন? চেয়ে যদি দেখিল না,
বুক-ভরা ভালবাসা বুঝিল না বুঝিল না।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা।

আমাদিগের বঙ্গভাষায় মহিলা কবিদিগের কোনও বিশেষ নাম নাই ; কিন্তু বহু মহিলা কবির মধুর সঙ্গীতে বাঙ্গলা কবিতাকুঞ্জ মুখরিত। ইহা আমাদিগের অল্প আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা নহে যে, বঙ্গসাহিত্যের এই গঠনযুগেই মহিলা লেখকগণ পুরুষ লেখকদিগের সহিত [illegible]ত্যের উন্নতিকল্পে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেছেন। অল্প দিন হইল, ইংরাজ মহি[illegible]বি ক্রিশ্চিনা রসেটির মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি তাঁহার একখানি জীবনচরিত প্রকা[illegible]ত হইয়াছে। সেই পুস্তক হইতে মহিলা-কবি সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

ক্রিশ্চিনা রসেটি যে অসাধারণ প্রতিভার অধীশ্বরী ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। [illegible]শ্চিনার পিতামাতা ইটালীর লোক হইলেও, লণ্ডনের জনকোলাহলময় বক্ষে ক্রিশ্চিনার [illegible]জন্ম ও লণ্ডনেই [illegible] বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কবিতার ভাব ও মাধুরী খাঁটি ইংরাজী। কাজেই তাঁহাকে ইংরাজ কবি বলা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না।

পরিচয়।

ক্রিশ্চিনার পিতা গেব্রিয়েল বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই নাগ্রান[illegible] [illegible]ন ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করেন। সেখানে ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা[illegible] তাঁহার কিছু আয় হইত ; তাহাতেই সংসার চলিত। ক্রিশ্চিনার ভ্রাতা ডাণ্টে গ্রেব্রি[illegible] [illegible]টির নাম এখন ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত ; তাঁর কবিতা রচনা করিয়া [illegible] [illegible]ত করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে ডাণ্টে গেব্রিয়েলের বহুদিন লাগিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা [illegible]কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। জননীর প্রতি তাঁহার অচল অনুরাগ ছিল। ধূলিধূমাকীর্ণ সৌধারণ্য লণ্ডন মহানগরের জনপীড়িত বক্ষে ক্রিশ্চিনার কোলাহলহীন জীবন যাপিত হইয়াছিল। এক জন এ কথাও বলেন যে, ভ্রাতা ডাণ্টে গেব্রিয়েলের চিত্রে মহিলার আননে যে বিষাদময় ভাব চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, ভগিনী ক্রিশ্চিনার রহস্য[illegible] [illegible]লিকাচ্ছন্ন, কোমল, বিষাদভারাক্রান্ত দৃষ্টিই তাহার আদর্শ।

লেখক বলিয়াছেন যে, ক্রিশ্চিনাকে প্রথমবার দেখিয়া তাঁহার মনে যে ভাব উদিত হইয়াছিল, তাহা ভুলিবার নহে। তাঁহাকে দেখিলে একটু দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত ; [illegible] ভ্রূযুগলে যে গাম্ভীর্য্য প্রকটিত হইত, তাঁহার কোনও আলেখ্যেই তাহা সম্যকরূপে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাকে দেখিলেই প্রতিভাশালিনী বলিয়াই বোধ হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর বড় মধুর, বড় মোহন ; কিন্তু তাঁহার আর একটা বিশেষত্ব ছিল, সেটা তাঁহার "Clear cut method of syllebification." তাহা বোধ হয় তাঁহার বিদেশীয় বংশের ফল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে, তাঁহার উচ্চারণে, তাঁহার ভাষায় বা তাঁহার [illegible] তিনি খাঁটি ইংরাজ হইলেও, ক্রিশ্চিনার এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে সহজেই [illegible] হইত যে, তিনি বিদেশিনী। কিসে যে তাহা প্রকাশ পাইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া [illegible] তাঁহার কথা শুনিলে কাহারও [illegible] মনে হইত,—যেন ইংরাজী ভাষায় [illegible] [illegible]বধি সেই ভাষায় [illegible] কোনও বিদেশীয় কথা কহিতে

আকৃতি প্রকৃতি।

ছেন। যে সকল বিবিধ ব্যাপারের সংমিশ্রণে ক্রিশ্চিনার [illegible] হইয়াছিল, তাহার মধ্যে তাঁহার বিদেশিত্ব যে অন্যতম, তাহাতে আর সন্দেহ [illegible]

কবিতা-রচনার যশ অধিকাংশ কবির পক্ষেই দুঃখলব্ধ [illegible] কীট্‌সের জীবিতাবস্থায় তাঁহার ভাগ্যে যশোলাভ হয় নাই, [illegible] করিতে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বহুদিন গিয়াছিল। ক্রিশ্চিনা রসেটির ভাগ্যেও সহজে যশোলাভ হয় নাই। বহুদিন ভারতীসেবার পর, পাঠকের অবহেলার [illegible] ভেদ করিয়া তবে যশের আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন ক্রিশ্চিনা একটা বিদ্যালয়ের কার্য্যে জননীর সহকারিতা করিয়াছিলেন। আর তাঁহার ভগিনী ইটালীয় ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। এমন কি, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দেও মহারাণীর পৌত্র ডিউক অফ্ ক্লারেন্সের মৃত্যুউপলক্ষে কোনও পত্রের জন্য একটা কবিতা রচনা করিয়া ক্রিশ্চিনা তিন গিনি মাত্র পাইয়াছিলেন, এবং তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। অথচ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই তিনি অতি মধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার অষ্টাদশবর্ষবয়ঃক্রমকালে রচিত একটি ক্ষুদ্র গীতিকবিতার অনুবাদ প্রদত্ত হইল,—

কবিতা-রচনা।

আমি যবে মরি যাব প্রিয়,
গাহিও না বিষাদের গীতি;
রোপিও না ঝাউ মোর শিরে,
রচিও না গোলাপের বীথি।

তৃণরাজি জাগিবে সেথায়
ধারাসিক্ত,—শোভিত শিশিরে।
পার মোরে ভুলে যেও সখা,
পার রেখ হৃদয়-মন্দিরে।

আমি কিছু বুঝিব না সখা,
ছায়া আসে, বারিধারা ঝরে,
আমি আর শুনিব না সখা,
পাখী গাহে সুমধুর স্বরে।

চিরব্যাপ্ত সান্ধ্য অন্ধকারে
নেহারিব কত স্বপ্নদল,—
হয় ত—এ সব মনে রবে,
হয় ত বা ভুলিব সকল।

পাঠকসমাজে ক্রিশ্চিনার কবিতার আদর সত্ত্বেও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কবিতা [illegible] বৎসরে তিনি চার বা পাঁচ শত টাকা মাত্র পাইতেন; ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে [illegible] আয় বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এক জন খ্যাতনামা চিত্রকর তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন; ক্রিশ্চিনাও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। কিন্তু চিত্রকর রোম্যানক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ক্রিশ্চিনা এ বিবাহে সম্মত হন নাই।

অন্যান্য কথা।

ক্রিশ্চিনা রসেটির প্রতিভা সম্বন্ধে নানা সমালোচক নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার [illegible] ডানটন্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন। মিষ্টার [illegible] বলেন যে, তাঁহার কবিতায় চেষ্টার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার মিষ্টার [illegible] বলেন যে, ক্রিশ্চিনা রসেটির কবিতা আপনার মাধুর্য্যের কথা আপনি অবগত নহে। এখানে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, সকল রচনা সম্বন্ধেই, সমালোচকদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হওয়া অসম্ভব নহে।

ভ্রাতা উইলিয়ম রসেটি ভগিনী ক্রিশ্চিনার রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তাহাতে চেষ্টা ছিল না, তাহা নির্ঝরের বারিরাশির মত আপনা আপনি প্রবাহিত হইত। ভ্রাতার মতে, রচনার পূর্ব্বে ভগিনী কখনও রচনার বিষয় লইয়া বিশেষ চিন্তা করেন নাই; আবার নিয়ম মত চেষ্টা করিয়া রচনাও তিনি করেন নাই। যখন মনে কোন ভাব [illegible] হইত, তখন ক্রিশ্চিনার রচনা আপনি আসিত। তিনি

ভ্রাতার কথা।

প্রথম বর্ণ [illegible] লিখিয়া যাইতেন; এবং প্রথম বার রচনার পর বিবেচনা করিয়া সং[illegible] ও পরিবর্দ্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার মত এই ছিল যে, কবি[illegible] হইলে স্বাভাবিক ভাবমাধুরীর সঙ্গে সঙ্গে রচনামাধুরীও অত্যাবশ্যক। [illegible] মৃত্যুর পর্য্যন্ত ভ্রাতা ও ভগিনী প্রায় এক গৃহে বাস করিতেন; অথচ ভ্রাতা এক দিনও ভগিনীকে রচনাকার্য্যে ব্যাপৃতা দেখিতে পান নাই। ক্রিশ্চিনা রচনা-সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ বা পরামর্শ লইতেন না। তবে ভগিনীর প্রকাশিত রচনা লইয়া ভ্রাতা ডাণ্টে [illegible] দোষ গুণ বাছিয়া ভগিনীকে তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিয়া শুনাইতেন।

আমরা ক্রিশ্চিনার যে কবিতাটির অনুবাদ প্রদান করিয়াছি, তাহার মধ্যে বিষাদের একটা অন্তঃসলিল প্রবাহ পরিলক্ষিত হইবে। বাস্তবিক তাঁহার একাধিক সুমধুর কবিতায় মৃত্যুর প্রতি এইরূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কবিতার একাংশের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

জীবন মধুর নহে, সে দিন মধুর হ'বে
সেই দিন আসিবে মরণ;
বুঝিব না ফুটে ফুল, উড়ে যায় পাখীকুল,
প্রজাপতি ছুটে অগণন।
বুঝিব না যবে আর এ দেহের চারিধার
জাগিয়া উঠিছে তৃণরাশি।
আর শুনিব না যবে, গাহিয়া মধুর রবে
চাতক যেতেছে মেঘে ভাসি,
চঞ্চল বসন্ত স্মরি, ফেলিব না অশ্রুবারি,
দেখিব না শস্যক্ষেত্র আর।
আর বুঝিবে না প্রাণ, মোদের অজ্ঞাত স্থান,
কে এখন করে অধিকার।

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই ক্রিশ্চিনার শরীর বড় অসুস্থ ছিল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে আরোগ্যলাভাশা বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। অসাধারণ সহিষ্ণুতার সহিত ক্রিশ্চিনা রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন; এত যন্ত্রণাতেও তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য বিনষ্ট হয় নাই।

সমাজনীতি।

জাপানী মহিলা।

আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। য়ুরোপ-ভ্রমণ এখন চর্ব্বিতচর্ব্বণ; আমেরিকায় কর্ম্মের ভিড়ে প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে, কাজেই ভ্রমণকারীকে হয় আফ্রিকায়, নয় ত এসিয়ায় আসিতে হয়। আফ্রিকার যে নিবিড় কাননাভ্যন্তরে ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোক আজ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই, সেই সঙ্কটসঙ্কুল প্রদেশে ভ্রমণ সকলের পক্ষে সহজ নহে; কারণ, সকলেই লিভিংষ্টোন বা ষ্টান্‌লি নহে। তবেই রহিল কেবল এসিয়া; এসিয়ায় চীন ও জাপানই অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত; কিন্তু চীনে ভ্রমণের সুবিধা অত্যল্প; জাপানে সুবিধা অত্যন্ত অধিক; তদ্ভিন্ন জাপান যেন কোনও ঐন্দ্রজালিকের স্পষ্ট মায়াপুরীর মত সহসা আপনার শতসৌধসমুজ্জ্বলিত সমুন্নত শির উত্তোলিত করিয়াছে। কাজেই আজকাল জাপান-ভ্রমণ বড় সখের হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্প্রতি "লেডি" নামক পত্রে কোনও লেখক জাপানী [illegible]গের যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

কবি সার এডুউইন আর্ণল্ড কেবল আপনার রচনায় জা[illegible] মহিলাদিগের প্রশংসা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। পরন্তু বৃদ্ধ বয়সে এক জাপানী যুবতীকে বিবাহ করিয়া, স্বীয় জাপানী প্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার ফরাসী গ্রন্থকার লোটি তাহাদিগের বিশেষ নিন্দা ক[illegible]ন। বোধ করি, উভয়েই ভ্রান্ত। জাপানী মহিলাগণ বড় হৃদয়রঞ্জন; তাহারা শুদ্ধ পুত্তলিকামাত্র নহে। তাহাদের বেশ নয়নবিনোদন, তাহাদের ব্যবহার বড় মধুর, তাহাদের আমোদ আহ্লাদ শোভাসম্পন্ন। কিন্তু তাহাদের চরিত্রে যে গম্ভীরতা আছে, তাহাই সহজে বিদেশীর চক্ষে পড়ে না। গৃহকর্ম্মে জাপানী রমণীর বিশেষ দৃষ্টি; বড় ঘরের গৃহিণী ভৃত্যদিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন, দরিদ্রপত্নী আমোদ আহ্লাদের পূর্ব্বে গৃহকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। জাপানী রমণীকে দেখিলে সদাকার্য্যরত মধুমক্ষিকা ও মোহনদর্শন প্রজাপতির কথা মনে পড়ে। বড় ঘরের গৃহিণীরা পরস্পরের গৃহে সম্মিলিত হইয়া, পোশাকের কথায়, সাহিত্যের কথায় ও সে দিন গৃহপ্রাচীরে যে সকল চিত্র বিলম্বিত থাকে, সে সকলের কথায়, সময় অতিবাহিত করেন; সঙ্গে সঙ্গে অতি ক্ষুদ্র পেয়ালায় চা-পান ও ক্ষুদ্র পাইপে ধূমপান চলে।

জাপানী মহিলারা সময় সময় বান্ধবীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আপনার নূতন পোশাক দেখাইয়া থাকেন। অস্মদ্দেশের মহিলাগণ নিমন্ত্রণসভায় অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া গর্ব্বানুভব করেন। ইতিপূর্ব্বে জাপানী মহিলারা দেশীয় বেশ ত্যাগ করিয়া য়ুরোপীয় বেশ পরিধান করিতেছিলেন। এখন সে স্রোত ফিরিয়াছে, ভালই হইয়াছে; কারণ দেশীয় বর্ণবৈচিত্র্যবহুল বেশ পরিধান করিলে, দেশীয় প্রথায় কেশবিন্যাস করিলে ও দেশীয় মোজা ও জুতা পরিলে যে রমণীকে সুন্দরী দেখায়, বিদেশীয় বেশে তাহাকে নিতান্ত কুরূপ বলিয়া বোধ হয়। সাম্রাজ্ঞীর সহচরীগণ আজও য়ুরোপীয় বেশের ভক্ত। যে জাপানী মহিলা দেশীয় বেশ বাছাই সম্বন্ধে অ[illegible] সুরুচির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, বিদেশীয় বেশ সম্বন্ধে তাঁহার রুচির ও নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। য়ুরোপীয় বেশে জাপানী রমণী যে প্রকার বর্ণবৈষম্য ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে নয়ন ক্লিষ্ট হইয়া উঠে; আর বিদেশীয় বেশের ব্যবহারে লাঞ্ছনার ত সীমা নাই।

বেশরচনা।

এখন একাধিক বালিকাবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইংরাজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইলে জাপানী মহিলাদিগের সহিত বিদেশিনীদিগের অধিক পরিচয় হইবে, এবং হয় ত সমকে উচ্চশ্রেণীর মহিলাগণ অধিক স্বাধীনতা পাইবেন। সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের নারীগণ অনেক মুক্ত স্বাধীনতাসুখ ভোগ করিয়া থাকে। রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিতে, দোকানে দ্রব্যাদি কিনিতে, মন্দিরে উৎসব দেখিতে ও নগরের বা গ্রামের নানা স্থানে নানা নৃত্য ও তামাসা দেখিতে তাহারা সর্ব্বদাই যাইয়া থাকে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর মহিলাদিগের স্বাধীনতা নিতান্ত সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ; তাঁহারা বান্ধবীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনেন ও বান্ধবীদিগের গৃহে গমন করেন, এই পর্য্যন্ত।

দৈনন্দিন জীবন।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা।

জাপানে সকলশ্রেণীর মহিলাদিগের সর্ব্বপ্রধান বিপদ শাশুড়ী। য়ুরোপীয় মহিলাগণও শাশুড়ীর অত্যাচার ভোগ করেন বলিয়া খেদ করেন, কিন্তু জাপানী শাশুড়ী যে কিরূপ বস্তু, তাহা তাঁহারা আদৌ জানেন না। বিবাহের দিন হইতেই নববধূ শাশুড়ীর সকল আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য; বলা বাহুল্য, শাশুড়ী আপনার আন্তরিক শঠতায় অপব্যবহার করিয়া

প্রায়ই পুত্রবধূকে [illegible] থাকেন। যদি কোন য়ুরোপীয়া মহিলা কোনও জাপানী পুরুষকে বিবাহ করেন, [illegible] তাঁহার প্রধান বিপদ শাশুড়ী। কাজেই য়ুরোপীয়া মহিলার [illegible] জাপানী জ্যেষ্ঠ পুত্রের পাণিপীড়ন সুবুদ্ধির কার্য্য নহে; জ্যেষ্ঠ

শাশুড়ী-ভীতি।

পুত্র জননীর সহিত এক পরিবারে বাস করিতে বাধ্য—কনিষ্ঠগণের সম্বন্ধে তেমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। তবে সুখের বিষয়, এরূপ বিবাহ বড় অধিক হয় না। এক জন ইং[illegible] মহিলা এক জন য়ুরোপ-প্রবাসী জাপানীকে বিবাহ করেন। যত দিন দম্পতী য়ুরোপে ছিলেন, তত দিন কোনও গোলযোগই ছিল না; কিন্তু দেশে ফিরিতে না ফিরিতেই শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিন কতক শাশুড়ীর অত্যাচার সহ্য করিয়া পত্নী পতিকে জানাইলেন যে, আর সহ্য করা অসম্ভব। তখন পতি-পত্নী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, শাশুড়ীকে বুঝাইতে হইবে যে, ইংরাজ পুত্রবধূ দাসীমাত্র নহে। এই মৎলব স্থির হইবার পর এক দিন শাশুড়ীর সাক্ষাতেই পুত্রবধূ স্বামীকে হুকুম করিলেন, "আমার বুট জুতা খুলিয়া লও এবং চটি জুতা লইয়া আইস।" স্বামী তৎক্ষণাৎ পত্নীর আজ্ঞা পালন করিলেন। জননী বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে চাহিয়া রহিলেন, কারণ, স্ত্রী যে স্বামীকে হুকুম করিতে পারে, এ বিশ্বাস জাপানী মহিলার নাই। স্বামী জুতা লইয়া হাজির হইতে না হইতেই স্ত্রী স্বামীকে আপনার শাল আনিতে পাঠাইলেন। স্বামী তখনই হুকুম তামিল করিলেন। স্ত্রী বলিলেন, "শাল পরাইয়া দাও।" স্বামী তাহাই করিলেন, শাশুড়ীর ক্রোধের আর সীমা রহিল না। "সে দিন গিয়া"র জন্য তাঁহার খেদও যথেষ্ট হইল, সন্দেহ নাই। যে পুত্র স্ত্রীর দাসমাত্র, সে পুত্রের সহিত তিনি আর বাস করিবেন না বলিয়া জননী পুত্রের গৃহ ত্যাগ করিলেন, দম্পতীও উদ্ধার পাইলেন।

শাশুড়ীর কথা শুনিয়া কেহ এরূপ না ভাবেন যে, জাপানে পত্নীর প্রভাব নাই। সমাজের সকল স্তরেই জাপানী পত্নী স্বামীর ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া, সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ-

পত্নীর প্রভাব।

পরায়ণ হইয়া, নানা মধুর কোমল গুণে স্বামীর উপর যে প্রভাব [illegible] করেন সে প্রভাব পতি-পত্নীর সমঅধিকারপ্রার্থিনী প্রতীচ্য পত্নীর প্রভাব অপেক্ষা [illegible] নহে। জাপানী মহিলা এখনও বেশ ভিন্ন অন্য কোনও বিষয়ে আপনার প্রাচ্য [illegible] বিসর্জ্জন দিয়া প্রতীচ্য আদর্শে আপনাকে গঠিত করেন নাই।

ইতিহাস।

সিপাহী-বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কথা এখনও নিত্য নূতন। সিপাহী বিদ্রোহের একটা বিশেষত্ব এই যে, বিদ্রোহকালে এক জন বা অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ বহু ভারতবাসী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অসীম বীরত্বে বা অসাধারণ কৌশলে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; কেহ বা একক বহু শত্রু নাশ করিয়াছিলেন। একের বা অল্পসংখ্যকের বীরকীর্ত্তির নিকট বহু সেনাদলের যুদ্ধের বীরকাহিনী তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। সৈন্যাধ্যক্ষ সার হিউ গাফ বিদ্রোহকালে এ দেশে সেনাদলে কার্য্য করিতেন।—বিদ্রোহবহ্নিতে তিনি দগ্ধ হয়েন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে সেই কোলাহল অনলশিখার উত্তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে সিপাহী বিদ্রোহের অনেক কথা আছে।

সার হিউ গাফের অনেক কথা ইতিপূর্ব্বে অন্যান্য পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু ঐতিহাসিকের রচনায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত সৈনিকের রচনায় কিছু প্রভেদ থাকি-

বেই। সার হিউ বিদ্রোহকালে Victo[illegible] লাভ করেন। তাঁহার রচনায় সৈনিকজনোচিত সংযম দৃষ্ট হয়। মিরাটেই [illegible] প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, মিরাটেই অনল ভীষণতম হই[illegible] বিদ্রোহের চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সার হিউ মিরাটে ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। মিরাট অতি রম্যস্থান; সেখানে শিকার বা আমোদ কিছুরই অন্ত ছিল না, তদ্ভিন্ন সেনাদল বিশেষ সামাজিক ছিল। আনন্দ-উৎসবের মধ্যে বিদ্রোহের মত একটা আকস্মিক বিপৎপাতের চিন্তা কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তখন পঞ্জাবে স্থির শান্তি বিরাজ করিতেছে, সীমান্ত প্রদেশেও সকল গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে। কাজেই কাহারও মনে কোনও আশঙ্কাই ছিল না।

ঝটিকার পূর্ব্বে।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের বসন্তকাল পর্য্যন্ত কোনও গোলই ছিল না,—তখন হইতে অসন্তোষ-সংবাদ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পুরাতন Brown Bess বন্দুকের পরিবর্ত্তে নূতন বন্দুক ব্যবহারের প্রবর্ত্তনেই যত বিপদ উপস্থিত হইল। প্রথমে দুই একখানা গৃহদাহ, দুই একটা সেনাদলের বিদায়দান ইত্যাদি হইয়া গেল; সকলে ভাবিল, মেঘ কাটিয়া গেল। এই সময় সার হিউ কানপুর ও লক্ষ্ণৌ বেড়াইয়া আসিয়াছিলেন। তখন কয় খানি গৃহদাহ হইয়া গিয়াছে; অধীনস্থগণ তখনও অসন্তুষ্ট ও কর্ত্তৃপুরুষদিগের আজ্ঞাপালনবিমুখ—এ সকল সত্ত্বেও ইংরাজ কোনও বিপদের আশঙ্কা করেন নাই। আপনার অসীম ক্ষমতায় ইংরাজের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল! আপনার ক্ষমতায় এরূপ অন্ধ বিশ্বাস না থাকিলে, হয় ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ রক্তাপ্লুত দৃশ্য অভিনীত হইত না। সার হিউ নানা সাহেবকে শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিলেন। তখন তাঁহার যত্নে ও অতিথিসৎকারে স্থানীয় ইংরাজগণের মুখে তাঁহার প্রশংসা আর ধরিত না।

নূতন টোটা।

সার হিউ তাঁহার পুস্তকে একটা ঘটনার উল্লেখ করেন নাই। এক [illegible] ভ্রমণকারী সে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। কানপুরে ইংরাজ [illegible] আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সংহারের হুকুম দিয়া নানা সাহেব আনন্দোৎফুল্ল [illegible] নয়নরঞ্জন লাস্যলীলা দেখিয়া সারা রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন!

সার হিউর আপনার সেনাদলেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ পঁচাশি জন অপরাধী সৈনিকের সামরিক বিচার করা হয়। বিচারকালে সার হিউ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলে অপরাধীদিগকে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। তাহারা ভূমিতে উপবেশন করিল, সকলে দোষ অস্বীকার করিতে বিলম্ব করিল না। তাহাদের মধ্যে অনেকে বহু দিন ইংরাজ সেনাদলে কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে, অনেকে "মেডেল"ও পাইয়াছে। তাহাদিগের মুখে রোষভাব প্রতিভাত হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী প্রাচ্যজনোচিত স্থিরভাব সকলের মুখেই দৃষ্ট হইতেছিল। অল্পক্ষণমধ্যেই মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। বিচারকালে কেবল একটা গোল হইয়াছিল। "এডজুটান্ট" যখন সাক্ষ্যদান করেন, তখন কয় জন অপরাধী ক্রুদ্ধ ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এডজুটান্ট সাহেব কি ইহা বলিয়াছেন?" কথাগুলি আবার বলা হইলে, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!"

অনল জ্বলিল।

অপরাধীদিগের দণ্ড বড় কর্ত্তার মঞ্জুর হইলে, অপরাধীদিগকে দণ্ড শুনাইতে আনা হইল। দেশীয় সৈনিকদিগের বন্দুক ছিল, কিন্তু গুলি বারুদ কিছুই ছিল না। দণ্ডাজ্ঞা পাঠ করিয়া শুনান হইল। সেনাদলে কে কত দিন কার্য্য করিয়াছে, তদনুসারে দণ্ডদান হইতে

লাগিল, প্রাচীন সেনাগণ কেহ বা যাব[illegible] কেহ বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড পাইল; অবশিষ্ট অপরাধীদিগের কেহ [illegible] কেহ বা পঞ্চদশ, কেহ বা দশ বৎসর কারাবাসের দ[illegible] ইহারও দশ বৎসরের কম কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হইল না। [illegible]কেই তাহাদিগের জুতা খুলাইয়া পায়ে বেড়ী পরান হইল। যখন তাহাদিগকে জেলখানায় লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাহাদিগের কেহ কেহ "কর্ণেল"কে লক্ষ্য করিয়া জুতা ছুঁড়িল; তাহারা হিন্দুস্থানী ভাষায় "কর্ণেল"কে গালি দিতে লাগিল, এবং সঙ্গীদিগকে তাহাদিগের কথা মনে রাখিতে বলিল। সে দিন ইংরাজ সেনাদল সসজ্জ না থাকিলে, বোধ করি, একটা গুরুতর কাণ্ড হইয়া যাইত। সকলে ভাবিল, বুঝি গোল মিটিয়া গেল। তখন কেহই বুঝেন নাই—এই সকল সিপাহীর দণ্ডে অন্য সিপাহীরা বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল।

দণ্ডদান।

সেই দিন অপরাহ্নে অপরাধী সিপাহীরা সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। অন্যান্য সেনানায়কের সহিত সার হিউও তাহাদিগের বেতন চুকাইয়া দিতে কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—সে দৃশ্য ভুলিবার নহে। যদিও লেখক তখন তরুণযুবকমাত্র, তথাপি সে দৃশ্য তাঁহার তরুণ হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহীরা কারাগারের একাংশে আবদ্ধ ছিল। প্রথমে দেখিয়া বোধ হইল, তাহারা তখনও "গরম" রহিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা সকল কথা বুঝিল—বুঝিল যে, এত দিন সম্মানের সহিত যে কার্য্য করিয়াছে, আজ তাহা হইতে বিতাড়িত হইল, তখন তাহাদের এ ভাব আর রহিল না। বিশেষতঃ সিপাহীদিগের মধ্যে সৈনিক-ব্যবসায় তখন কুলক্রমাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সিপাহীর পুত্রও সেনাদলে প্রবেশ করিত। সাময়িক উত্তেজনায় একটা কাজ করা এক কথা, আর সকল বুঝিয়া কাজ করা আর[illegible] কথা। সকল বুঝিতে পারিয়া বহু বৃদ্ধ সিপাহী কাঁদিতে কাঁদিতে সেনানায়কদিগকে তাহাদের উদ্ধার করিতে বলিতে লাগিল। বহু তরুণ সিপাহীও বৃদ্ধদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

কারাগারে।

১০ই মে রবিবারে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। প্রভাত কাটিয়া গেল। সার হিউ ম্যাকনাবের সহিত একত্র গির্জ্জায় গমন করিলেন। হায়! সেই দিনই ম্যাকনাবের জীবন শেষ হয়। ইহার পর সার হিউ ম্যাকনাবের গতপ্রাণ দেহ রাজপথে পতিত দেখিয়াছিলেন। নিয়মমত আপনার এবং এক বন্ধুর অশ্ব [illegible] লইলেন, পালিত অলুক ছুইটি ও চিতা বাঘটির সংবাদ লইলেন; তাহার পর বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সংবাদ আসিল, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদগম আরম্ভ হইয়াছে। সার হিউ বেশ পরিধান করিতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল যে, দেশীয় পদাতিক সৈনিকদিগের বারিকে অগ্নি লাগিয়াছে; বহু বাঙ্গলোও দগ্ধ হইতেছে। তাহার পরেই সংবাদ আসিল যে, সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ নায়কদিগকে সংহার করিতেছে। সার হিউ অশ্বারোহণ করিয়া বাহির হইলেন। সিপাহীদিগের বারিক ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে,—সেই সমাহাস্তমুখ সিপাহীগণ অস্ত্রাদি লইয়া উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, যে দিকে ইচ্ছা গুলি চালাইতেছে!

বিদ্রোহারম্ভ।

উপস্থিত হইয়াই সার হিউ বুঝিলেন, সেখানে থাকা উচিত নহে; সেখানে থাকিলে মৃত্যু নিশ্চিত। সিপাহীরা দেখিয়াছিল, সার হিউ সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিস্মিত হইয়া তিনি অশ্ব থামাইবামাত্র তাহারা তাঁহার সহচরদিগকে সরিয়া যাইতে বলিল ও বন্দুক আওয়াজ করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। দেশীয় সেনানায়কগণ

সার হিউকে পলায়ন করিতে পরাম[illegible] বেগে অশ্ব ছুটাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। সেই সময় সিপাহীরা এ[illegible] আওয়াজ করিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সার হিউ আহত হ[illegible] সার হিউ আপনার সেনাদলমধ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানেও বিষম অশান্তি বিরাজ করিতেছে, সেনাদল অশ্বারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, গৃহাদিতে অগ্নিসংযোগ করিতেছে, অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া অস্ত্রাদি লইতেছে,—তখন আর তাহাদের চর্ব্বিসংযুক্ত টোটা কাটিবার বাধবিচার নাই। সার হিউ সেনাদলকে সকল কথা বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কোনও ফলোদয় হইল না। তবে সুখের বিষয় এই যে, দেশীয় সেনানায়কদিগের চেষ্টায় কেহই তাঁহার জীবননাশের চেষ্টা করে নাই। অল্পক্ষণমধ্যেই সেনাদল আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তখন সেনাদলে "মারো, মারো" রব উঠিতে লাগিল। কয় জন সৈনিক সার হিউকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল; একটা গুলি সার হিউর জিনের একাংশে লাগিল। সেই বিদ্রোহী সেনাসাগরে ইংরাজদিগের মধ্যে সার হিউ একাকী। সেই সময় Quarter-master কানিংহাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—মুক্ততরবারিহস্তে কয় জন সিপাহী তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া সার হিউর সঙ্গীরাও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বাধ্য হইয়া সার হিউ ও কনিংহাম সে স্থান ত্যাগ করিলেন। সিপাহীরা গোলমাল করিতে করিতে কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। সার হিউর বিশ্বাস যে, তাঁহাদের জীবননাশ বা গমনরোধ তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা হইলে তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে পারিতেন না।

জীবনসঙ্কট।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। চৈত্র। "মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ" এক জন অজ্ঞাতনামা লেখকের লিখিত একটি সাময়িক প্রবন্ধ। লেখকের মতের "গবর্মেণ্ট অপর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য বন্ধ করিয়া কেবল দুর্ভিক্ষনিপীড়নে অর্থ ব্যয় করেন নাই বলিয়া বোধ হয়, কেহ অভিযোগ করিবেন না।"—এমন অভিযোগ কেহ করে নাই বটে, কিন্তু গবর্মেণ্ট দুর্ভিক্ষনিবারণের যথোচিত উপায় অবলম্বন করেন নাই, ইহা যে এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত অভিযোগ,—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দুর্ভিক্ষনিবারণকল্পে ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট যাহা করিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য কৃতজ্ঞ। মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষনিবারণচেষ্টার লেখক যে নক্সা আঁকিয়াছেন, তাহাও সুরম্য। কিন্তু তাহাতেই রাজশক্তির পূর্ণ কর্ত্তব্য সম্যক সমাপ্ত হইয়াছে,—আমরা কোনও মতে তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। আমরা প্রজার প্রাণরক্ষা রাজশক্তির অনুগ্রহমাত্র মনে করি না,—রাজশক্তির প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া গণনা করি। দুর্ভিক্ষনিবারণের জন্য যে দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের টাকা মজুদ রাখিবার কথা,—সে টাকার পাহাড় কোন্ অতলতলে ডুবিয়া গিয়াছে, লেখক কি তাহার সন্ধান রাখেন? যখন এক দিকে সহস্র সহস্র প্রজা ক্ষুধার জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া রাজপথে মরণশান্তি লাভ করিতেছে, তখন সীমান্তসমরে কোটি কোটি মুদ্রা আহুতি দিবার ব্যবস্থা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দেখা যায়? যে রাজ্যে প্রজার অনাহারজন্য মৃত্যুনিবারণের ব্যবস্থা করিতে গেলে "অপর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য্য বন্ধ" হইয়া যায়, তাহার শাসন-রক্ষণ-ব্যবস্থা এত বাদশাহী কেন?—সে দেশের রাজশক্তি বিদেশের,—প্রভু দেশের ত্রিকূট তজ্জন্য অর্থভিক্ষা করিতে এত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত কেন?—লেখককে আমরা এ সম্বন্ধে

কংগ্রেসের বিপুল সাহিত্য পাঠ করিব[illegible]দিষ্ট। তিনি যে বিষয়ে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, সে বিষয়ের মূল সূত্রে [illegible] দর্শন নাই। বিষয়টি যেমন গুরুতর এবং বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যার সহিত [illegible] বিজড়িত,—বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এ সম্বন্ধে তেমনই অনভিজ্ঞ,—তেমনই একদেশদর্শী। অনধিকারচর্চ্চার এমন দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "তৃপ্তি" একটি সুন্দর কবিতা;—কিন্তু বিস্তৃতিবশতঃ শেষভাগ শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। "প্রত্যাবর্ত্তন" শ্রীযুক্ত জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণের উপসংহার। এই সংখ্যায় সেই চিরমধুর ভ্রমণকাহিনীর সমাপ্তি। বিচিত্র দৃশ্য, বিবিধ ভাব ও বিচিত্র কাহিনীর স্তরে স্তরে লেখক নিজ হৃদয়ের সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া এত দিন পাঠকের সঙ্গে যে নিভৃত নিগূঢ় প্রিয় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন,—তাহার যেন সমাপ্তি না হয়। হিমালয়ভ্রমণ-লেখকের অদৃষ্টে অন্য পুরস্কার এ দেশে দুর্লভ, কিন্তু বঙ্গীয় লেখক ও পাঠকসম্প্রদায়ের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ তাঁহার প্রাপ্য। "স্বরলিপি" প্রকরণে প্রকাশিত, বসন্তোৎসব-উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা দেবীর রচিত গানটি অতি সুন্দর,—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যকাননের গন্ধামোদে নিষিক্ত,—পুরাতন অতীতের মধুর স্বপ্নজালে জড়িত, বিগত সুখোৎসবের বিদায়ী নিশ্বাসে বিকম্পিত। যাঁহারা পরম "উৎসাহে" এই কুহকস্বপ্নের ভিত্তির উপর বঙ্গরসের উৎসসৃষ্টি করিতে গিয়া বিফল হইয়াছেন, তাঁহারা "রত্নাবলীর" শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া থাকিবেন,—কিন্তু কাব্যকলারসে হায়! তাঁহারা বঞ্চিত। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের "মীর কাসিম" সমাপ্ত হইল। লেখক বলিয়াছেন, উপযুক্ত উপকরণের অভাবে মীরকাসিমের আলেখ্য সম্পূর্ণ হয় নাই। গ্রন্থকারের প্রথম চিত্র "সিরাজদ্দৌলার" তুলনায় মীর কাসিম অঙ্গহীন ও মৃতকল্প;—কিন্তু লেখকের লিপিকৌশলে এই পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনীর নবরাগ দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট। গ্রন্থাকারে দেখা দিলে মীরকাসিমের সহিত পুনঃ সম্ভাষণের ইচ্ছা রহিল। বিপ্রলব্ধ শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায়ের লিখিত একটি চলনসই গল্প। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় "সিনেহর মার্কনী" প্রবন্ধে নবাবিষ্কৃত তারহীন টেলিগ্রাফের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "এ মনে [illegible]" শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর একটি কবিতা।—এই সংখ্যার সম্পাদন করিয়া সম্পাদিকাদ্বয় অন্য হস্তে "ভারতী"র ভার অর্পণ করিয়া বিদায় লইতেছেন। কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময় "ভারতী"র অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি;—আজি এই বিদায়ের দিনে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।—সমালোচনার তুলাদণ্ডে "ভারতী"র পরিমাণ করিতে গিয়া আমরা কখন ভ্রান্ত হইয়াছি; কিন্তু "ভারতী"র প্রভাবে বঙ্গভাষার যে উপকার হইয়াছে, তাহা কখনও বিস্মৃত হই নাই। "ভারতী"র নিকট যাহা পাইয়াছি,—তজ্জন্য আমরা ঋণী,—তাহা কখনও অস্বীকার করি নাই, তথাপি আরও চাহিয়াছি! যখন মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতীর ভার পরিত্যাগ করেন, তখন শ্রীমতী সরলা দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী "ভারতীর" সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়া তাহার লালন পালন করিয়াছেন, এ জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। যে দেশকালপাত্রের সমবায়ে এ দেশে মাসিকপত্র পরিচালন করিতে হয়, আমরা তাহা জানি। সেই বিবিধ বাধা অতিক্রম করিয়া দুই জন মহিলা-সম্পাদক যাহা সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা আত্মগৌরব অনুভব করিতে পারি। আমাদের কার্য্যপ্রণালী বিভিন্ন হইতে [illegible]রে,—কিন্তু মাতৃভাষার উপাসকগণের উদ্দেশ্য এক, সে বিষয়ে বোধ করি কাহারও মতভেদ [illegible] সেই উদ্দেশ্যসাধনের ক্ষেত্রে যদি কখনও প্রতিবাদ বা অপ্রিয়বাদ দ্বারা ভারতীর [illegible] কাহারের অপ্রিয় আচরণ করিয়া থাকি,—আশা করি,—তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

এবার স্থানাভাবে অন্যান্য মাসিকের সমালোচনা প্রকাশিত হইল না।

"[illegible]া রূপেয়া"।
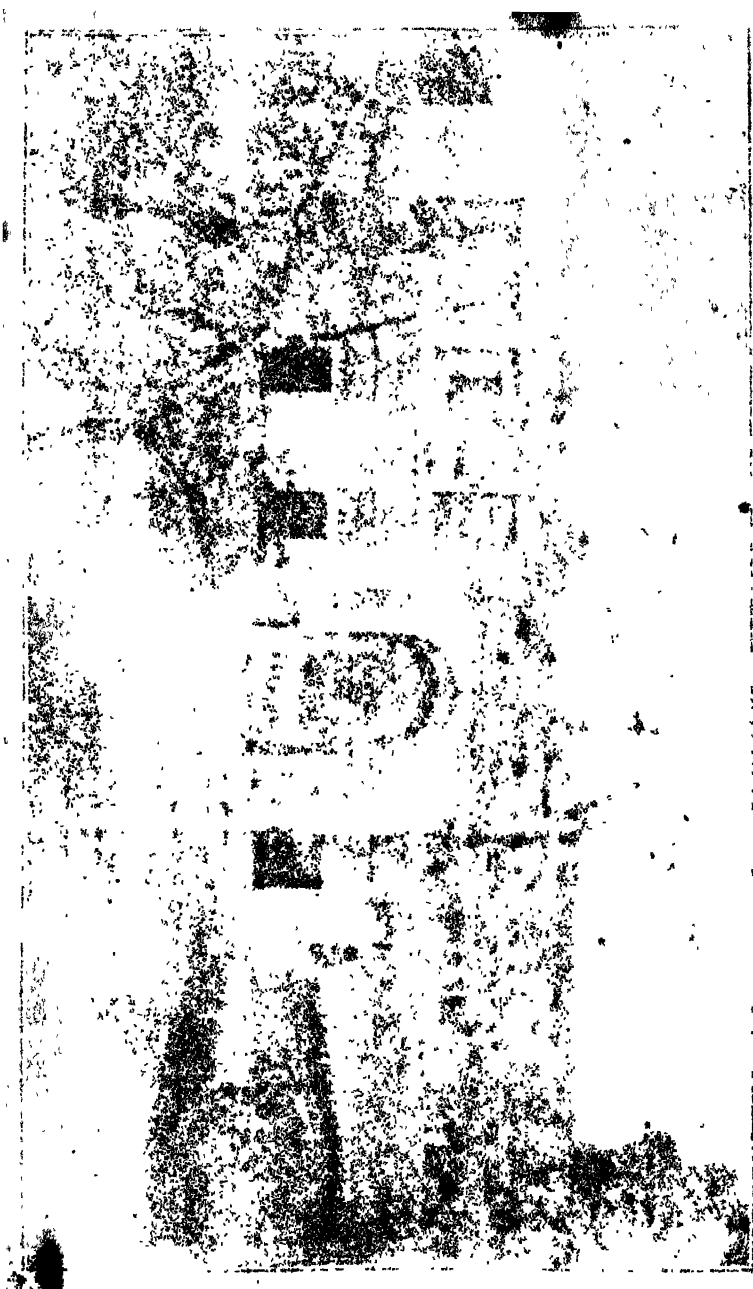
স্তুতি ও সমালোচনা।

'নয়শো রূপেয়া' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ * সম্প্রতি আমাদের সমালোচ্য। ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, পঁচিশ বৎসরেরও বোধ হয় কিছু বেশী পূর্ব্বে। যাঁহারা ২৫।২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাঙ্গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এবং তাহার পর ঈশ্বরেচ্ছায় আয়ুষ্মান হইয়া অদ্যাপি জীবিত আছেন, তাঁহাদের নিকট 'নয়শো রূপেয়ার' পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কিছুই নাই।

কিন্তু ২৫।৩০ বৎসর কাল বড় কম নয়। তা তত বেশীই বা কি? ২৫।৩০ বৎসরের রাত্রি দিনগুলি অনেকেরই চক্ষের উপর দিয়া এই ত দেখিতে দেখিতেই দ্রুত দৌড়াইয়া গেল; 'সে ত এই ক' দিন বই ত নয়!' আমাদেরই অব্যবহিত অতীতের—অতি নৈকট্যের এবং উপস্থিতিরই ত কত আঁচড় কত দাগ তাহাদের গায়ে মাথায় মুখে বুকে এখনও ঐ দেখা যাইতেছে; ২৫।৩০ বৎসর বেশী দিন আর কি! তথাপি পাটীগণিতের গণনামতে ২৫।৩০ বৎসর কাল একটা শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ বা তাহারও বেশী, বিলক্ষণ দীর্ঘকালই বটে। কাজেই সেই কালের কথা এখন পুরাণ কথারই মধ্যে পরিগণিত বলা যাইতে পারে। কল্যকার কথা যখন অদ্যই অতীত ইতিহাস, তখন কে বলিবে; ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বের কথা লুপ্ত উপন্যাসের গুপ্ত কাহিনী নয়, বা তেমনিতর আর একটা কিছু নয়? কাজেই এত দীর্ঘ কাল পরে উহার এই দ্বিতীয় সংস্করণে 'নয়শো রূপেয়া'র পরিচয় নূতন করিয়াই কিছু দেওয়া প্রয়োজন।

'নয়শো রূপেয়া'র প্রথম সংস্করণের সহিত আমাদের এখন বিস্মৃতপ্রায় পূর্ব্বস্মৃতি সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মর্ম্মঘাতিক সত্যমূলক, হাস্য ও করুণরসমূলক সামাজিক নাটক যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং অভিনীত হয়, তখনও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' বঙ্গ সমাজে, বঙ্গ সাহিত্যে এবং বাঙ্গালীর শিক্ষাপ্রণালীতে, ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালিত করিতেছিলেন। তখন বঙ্গধর্ম্মের

* ২ নং, আনন্দ চট্টোপাধ্যায়ের লেন, [illegible] পত্রিকা প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য [illegible]

বসন্ত সৌরভে বঙ্কিম বাবুর স্ফুরন্ত গৌরব [illegible] খেলিতেছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের একত্র-সমবেত অদ্যকার অসংখ্য [illegible]-ও পৃষ্ঠী হইতে অসংখ্য কাঁচ-পোকা ও পিপীলিকায় গঠিত একটা 'একাডমি অফ্ লিটারেচর' প্রতিষ্ঠা করিয়া, সংকল্প করিয়া, সভাসমিতি করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, শত লোকের শত রকমে লেখনী চালাইয়া, রাশি রাশি রেজলিউশন প্রচার করিয়া যে শক্তি সঞ্চালন করিতে সক্ষম হইতেছেন না, যে কার্য্যের প্রায় কিছুই করিতে পারিতেছেন না, নয়শো আশেষার প্রথমপ্রকাশকালে, সেই শক্তি—সাহিত্যের স্বতঃসংবোধিনী শাসনশক্তি এবং সেই কার্য্য—সাহিত্যে স্বাস্থ্য, সুরুচি, সৌন্দর্য্য ও সংযমপ্রদানের কার্য্য, বিনা সংকল্পে, বিনা প্রতিজ্ঞায়, একক এক ব্যক্তি, জীবিকা-অর্জ্জনের অসীম শ্রমের মধ্যে বিরলপ্রাপ্ত অবকাশকালে কথঞ্চিৎ-পরিমাণে লেখনী চালন করিয়া, একখানি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কতিপয় প্রবন্ধ, কতিপয় পংক্তির দ্বারা, যেন এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে অবহেলে সঞ্চালন ও সংসাধন করিতেছিলেন। যখন ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসংগ্রামে ও সাহিত্য-সংস্কারে অসীম শক্তি বিস্তার করিয়া এক বিন্দু বিশ্রাম-অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং অক্ষয়কুমার বাণপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক বালীর বনকুটীরে বসিয়া বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে ও 'উপাসকসম্প্রদায়'-সঙ্কলনে নিযুক্ত, তখন বঙ্কিমচন্দ্র নব্য বাঙ্গালীর নবোত্থিত সাহিত্যের শাসয়িতা সম্রাট, এবং 'বঙ্গদর্শন' সেই সম্রাটের শাসনদণ্ড ও সম্মার্জ্জনী। সম্রাট, সাহিত্যের সৃষ্টি, শাসন ও সম্মার্জ্জন, এ তিনই করিতেছিলেন। শাসন ও সম্মার্জ্জন কেবল সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় নহে, স্বকীয় সুমার্জ্জিত ও সুন্দর সৃষ্টি দ্বারাও করিতেছিলেন। মধুসূদন তখনও জীবিত,—হায়! জীবন্মৃত। 'মেঘনাদ' 'তিলোত্তমা'দি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতিভার প্রভাতসুরভিসমীরে, তখন শিক্ষিত প্রভাবিত [illegible] অশিক্ষিত জাগরিত হইতেছে; সরল, সার্ব্বজনিক ও বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রথম [illegible] সাহিত্যপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশিত হইয়াছে। হেম বাবুর ও নবীন বাবুর নব কবিতা তখন অগ্নিকণা,—উত্তপ্ত মদিরা উদগীরণ করিতেছে; 'বৃত্র', 'পলাশী' ও 'ক্লিওপেট্রা' তখনও বোধ হয় অপূর্ণ পাণ্ডুলিপি,—প্রেসে প্রেরিত হয় নাই। তখন 'সোমপ্রকাশ' রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক সর্ব্বপ্রধান বাঙ্গালা সংবাদপত্র; [illegible] আদরবুদ্ধা 'ভারতী' তখনও ভবসংসার সন্দর্শন করেন নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর দিব্যোজ্জ্বল উপাদেয় কাব্য—[illegible] [illegible] তখনও অশরীরী [illegible] সীমাতিক্রম করিয়া পৃথিবী পরে

প্রচলিত হয় নাই। প্রয়াণের প্রথম ক'টি সর্গ বঙ্গদর্শনের অঙ্ক [illegible] করিয়াছিল। 'প্রয়াণ'-কারের অধিকতর ভাগ্যবান কনিষ্ঠ ও কবি-ভ্রাতা তখন নেহাত 'নাবালক'। বন্ধুত্বপ্রাণ, সর্ব্বজনপ্রিয়, (প্রকৃত) দীনবন্ধুর সুখ্যাতি ও সাহিত্যজ্যোতি তখন বঙ্কিম অপেক্ষাও বেশী। তখনও (জীবনের কখনই বা নয়) প্রথমোক্ত শেষোক্তের সহায় সারথি, সহোদরপ্রতিম। 'নীলদর্পণ', 'লীলাবতী', 'সধবা' প্রভৃতি তাহার বহুপূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যাকাশে নাটকীয় নভোমণ্ডলে দীনবন্ধু তখন সন্তাপহীন দিবাকরবৎ বিচরণ করিতেছিলেন। [illegible] এখন-বিলুপ্ত 'বান্ধব' তখনও বাহির হয় নাই। দেওয়ান রায়বাহাদুর ও রায়বাহাদুর কালী বাবু তখনও কেরাণী-খানার নিষ্কলঙ্ক কুক্ষে বসিয়া বিদ্যালোচনা করিতেছিলেন। চুঁচুড়ার অক্ষয় বাবু তখনও 'শিক্ষানবিশ'। বেঙ্গল দপ্তরের চন্দ্র বাবু বাঙ্গালা ভাষায় উদিত হন নাই। 'উদ্‌ভ্রান্তে'র চন্দ্র বাবু বোধ হয় উদিত হইয়া থাকিবেন; কায়ব্রেজি-য়ান শাস্ত্রী মহাশয় তখনও বোধ হয় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র; ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্রী মহাশয় বাহির হইয়া থাকিবেন। পোষ্ট আপিসের বাঁড়ুয্যে মহাশয় বঙ্গদর্শনে বাহির হইতেছেন; বর্দ্ধমানের বাঁড়ুয্যে মহাশয় তখনও বাহির হন নাই;—আরও অনেক মহাশয়ের মত বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনী সার্টিফিকেটের জন্য সাহিত্য-মন্দিরে স্বাস্তয়ন করিতেছেন। বঙ্কিমী দলের কোনও কোনও ছোকরা—এখন যাঁহাদের কেহ কেহ হয় ত নিজের নিজের একটি একটি ছোটখাট দল বাঁধিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমের সই-মোহরের ছাড় পাইবার তারিখের দিন হইতেই বিখ্যাত। কিন্তু তাঁহারা এখন কেবল বঙ্কি-মের সাহিত্যসংগঠনপ্রণালী নহে, বঙ্কিমের ব্যক্তিত্বও বুঝি বা বিস্মৃত হইয়া-ছেন, অথবা তাহা উপেক্ষা ও আক্রমণ করিতেছেন; নহিলে বুঝি বা বড় লোক হওয়া যায় না। তখন রাজেন্দ্র লালা (পরে রাজা ও ডাক্তার) বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে সরিয়া গিয়াছেন; পালি, প্রাকৃত, বৌদ্ধ ও প্রত্নতত্ত্বে অদ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ ও হেডমাষ্টার ক্ষীরোদ বাবু পাঠ লইতেছেন। তখন সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে শিশির বাবু সমুদীয়মান; তদীয় রাজনৈতিক নবানুরাগ, আকাশ পাতাল ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়াছে; তদীয় স্বাধীনতা ও সাম্যবাদ তখনও বিকৃতকিতে বিভাসিত হয় নাই। 'পত্রিকা' তখনও পুরাপুরি বাঙ্গলাক্ষর-বর্জ্জিত হয় নাই। মিষ্টার রমেশচন্দ্র, স্বামী বন্দ্যোপাধ্যায় ও [illegible] বিরোধী গুপ্তের সহিত তখন বিলাতে 'সার্ভিস'

...ভাগ্য...চন্দ্র দাস বোধ হয় শিশিরী দলে তখন বিচরণ করিতেছেন, ...'শরৎ-সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' তখন বাহির হইয়াছিল, বা ...ছিল, মনে করিয়া বলিতে পারি না। তখন সাহিত্য সাহিত্যই ছিল; ...গলাগরী, দুতীগিরী, দোকানদারী, ঝকমারী হইয়া পড়ে নাই। সমালোচনা তখন নরক-বিড়ম্বনায় ও বিকট বিজ্ঞাপনের ঘোষণায়, কপটতায়, কৃত্রিমতায়, চা...বিতায়, পক্ষপাতিতায় এবং নীচতায় নামিয়া পড়ে নাই। তখন ইতর সাহিত্য একেবারেই না ছিল, এমন নয়; কিন্তু শিক্ষিত জন ও ভদ্রসন্তানগণ ইতর সাহিত্য লিখিতেন না, কচিৎ লিখিলে সমাজচ্যুত হইতেন, চাবুকে চাবুকে অস্থি চর্ম্ম হারাইতেন। তখন সাহিত্যক্ষেত্র জুয়ার আসর ও বঙ্গীয় পাঠক উপহার-খোর হয় নাই। তখন সাহিত্যে পুরাতনের প্রকৃত সম্মান ছিল, পুরাতনের পঙ্কিল পূতিগন্ধের পূজা ছিল না। তখন সাহিত্যে সুযুক্তি, সুবিচার, স্বাধীনতা, সত্যপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধানের প্রয়াস ছিল, সাহিত্যের ও সমাজের কলঙ্ক ও কুসংস্কার কাটিয়া দিবারই চেষ্টা ছিল; কুযুক্তি, কপটতা, অবিচার, ও অন্ধ উগ্রতা দ্বারা তাহার আবরণ, সমর্থন ও সংরক্ষণ করিবার ও পথে পথে ফেরি করিয়া বেড়াইবার ব্যবসা ছিল না। তখন 'হিঁদুয়ানির' হাম্বারব উঠে নাই। কিন্তু দেশ এখনকার মত তখন এত অধিক অহিন্দু হয় নাই। দৃষ্টান্ত দাও—এই দেখ। নম্বশো রূপেয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের সমাজকলঙ্কের চিত্র; সে চিত্রের আসল আজও অক্ষুণ্ণ আছে; তাহার পার্শ্বে আর আসল,—যাহা তখন ছিল না,—এখন হইয়াছে। তখন ডাক-নিলামের মত অত্যুচ্চ হারে, মেয়ে বিক্রয়ের প্রথা থাকিলেও, ছেলে বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হয় নাই। এখন ছেলে মেয়ে, উভয়ই ডাকের দরে, 'হাইয়েষ্ট বিডারে' বিক্রয় হয়। হিঁদুয়ানির হাম্বারব বিক্রেতা ক্রেতা উভয়েরই কাঁধে হাত বুলায়; ক্রয়বিক্রয়ের সাংঘাতিক পাপের প্রশ্রয় দিতে 'পশ্চাৎপদ' হয় না; বড় জোর তাহার জন্ম 'তৈলবট'-প্রত্যাশায় নাসকড়াই ও কাঞ্চনদানের প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করে। তখন, অন্ততঃ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে বৈবাহিক বণিগ্‌বৃত্তি প্রবেশ করে নাই। "আমার মতামত লইয়া আমাকে যে যাহাই বলুক, খৃষ্টানই বলুক আর নাস্তিকই বলুক, আমি শাস্ত্রবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, আজও এত বড় হই নাই যে, বেণে-বাড়ী মেয়ের বিবাহ দিয়া, জাতি কুল নষ্ট করিতে পারি।" কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ উপলক্ষে কোনও কুলীন বরকর্ত্তার নিকট হইতে সোণা রূপা টাকার 'ফর্দ্দ' পাইয়া, শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর ঐ

উক্তি করিয়াছিলেন। সক্রোধে ফর্দ ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া 'পাকা কথা' ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। বরকর্ত্তার ও আত্মীয় বন্ধুবর্গের অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সে কুলে সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই। আপন ইচ্ছায় উক্ত ফর্দ্দ অপেক্ষা আরও অধিক টাকা ব্যয় করিয়া অন্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু, এই বিদ্যাসাগরকে এবং তাঁহার প্রকৃতির শাস্ত্রজ্ঞ ও সদাচারী লোকদিগকে আমরাই বলিয়া থাকি অহিন্দু। হাঁ অহিন্দুই বটে! আর আমরাই এখন কেবল হেঁদু।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক বাহির হইয়াছিল, শিশিরী দল হইতে। কিন্তু তখন এখনকার মত দলাদলির উপর পুস্তকের গুণাগুণ নির্ভর করিত না। এখন যেমন আত্মীয়ের ও আপনার দলের লোকের অতি অপকৃষ্ট ও অপাঠ্য পুস্তকও আপন আপন পত্রিকায়, প্রশংসাবাদের পৌনঃপৌনিক ঢক্কা-নাদে—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রবন্ধে, মস্ত ও স্ফীত করিয়া তোলা হয়, এবং অপরের, অন্য লোকের বা অদোলো লেখকের পুস্তক, অত্যুৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হইলেও, এক-লাইনী সমালোচনা বা নীরব নিন্দার ঘোষণা করা হয়, বা চাপা কয়েকটা কথার চালাকিতে সব গোল চুকাইয়া দেওয়া হয়, তখন এরূপ রীতি, এরূপ নির্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতা বিদ্যমান ছিল না। কাযেই তখন সমালোচনার সাহিত্য-মূল্য ছিল; সমালোচনা বলিতে শাফাই সাক্ষী বা 'সেল সার্টিফিকেট' বুঝাইত না; বেভাঁজ বিজ্ঞাপন বলিয়াও লোকে তাহাকে বুঝিত না। কিন্তু এখন ভদ্রলোকে শতকরা সাড়ে নিরনব্বই খানা সমালোচনাকে ঠিক তাহাই বুঝে। সুতরাং এখনকার সমালোচনার আর যত কিছু মূল্যই থাকুক, সাহিত্য-গত মূল্য নাই, সূচ্যগ্রপরিমাণ সম্মানও নাই। পরন্তু ভাল পুস্তকের ও ভদ্রলোকের পুস্তকের আর এখন আদৌ সমালোচনা হয় না। ভদ্রলোকে এবং যে লোকে একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিতে পারে, লিখিবার শক্তি ধরে, সে ব্যক্তি কখনই এতটা আত্মসম্ভ্রমহীন, অজগর কুষ্মাণ্ড হইতে পারে না যে, আপন পুস্তকটিকে ভাল বলাইবার জন্য, আপন গুণগৌরবের ব্যাখ্যা ও স্তুতিগান করাইবার জন্য সম্পাদক ও সমালোচকদের ধামা ধরিয়া নিকৃষ্ট ও নিম্নস্তরের লেখকদের দ্বারে দ্বারে, দোকানে দোকানে, উমেদারি করিয়া বেড়াইবে। পরন্তু সেরূপ স্তুতিকীর্ত্তন তাঁহাদের তৃপ্তিদায়কও হইতে পারে না। ভাবুকে ও চিন্তাশীলে, চিন্তাশীলতার সমুজই চাহেন; চিন্তাহীনতার ও রসানভিজ্ঞতার অর্চনা আরাধনা কামনা করেন না। বিচক্ষণ ব্যক্তি বুঝিয়া

... বলিলেও তাহা ... কিন্তু অনুরের বেতালা স্তব স্তুতিতেও গায়ে কেমন জ্বর আসে। তাহাতে কেবল প্রশংসকের উপর নহে, প্রশংসিতের প্রতিও অশ্রদ্ধা হয়। এ কারণেও উপযুক্ত লেখক অযোগ্য হস্তের সমালোচনা চাহেন না। তজ্জন্য গুড়ক, গোলাপী খিলি ও গায়ে-পড়া 'আপ্যায়িত' ব্যয় করার ...াই নাই। কাজেই এখন মার্জ্জিত সাহিত্যের—উন্নত শিল্পের সমালোচনা হয় না; অতএব বিক্রয়ও হয় না। উপস্থিত অবস্থায় না হওয়াই শ্রেয় ও সম্মানকর বটে। কিন্তু তখন এমন ছিল না; দলেরই হউক আর বেদলেরই হউক, তখন বই ভাল হইলেই ...ার আদর হইত; মন্দ হইলেই নিন্দা ঘটিত। কাজেই 'নয়শো রূপেয়া' বাহির হইতে হইতেই সমাদৃত হইয়াছিল, সাহিত্য-সমাজে স্বকীয় স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল; কেন না, তখন সে সমাজ বিদ্যমান ছিল। এখন প্রকৃতপ্রস্তাবে সাহিত্য-সমাজ নাই। অতএব আশ্চর্য্য কি যে, পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার-প্রকাশিত আমাদের আলোচ্য এই নাটকের এবার আদর হয় নাই; হইবার সম্ভাবনাও নাই, কথাও নয়। কিন্তু প্রথম সংস্করণে লোকসমাজের ও সাহিত্য-সমাজের সর্ব্বত্রই উহার যথোচিত প্রশংসা ও আলোচনা হইয়াছিল; যতটা মনে পড়ে, তখনকার নব-প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশন্যাল' নাট্যশালায় উহার অভিনয়ও হইয়াছিল। তখনকার সাহিত্য-শাসয়িতা বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম বাবু এক রকম 'নয়শো রূপেয়া' দেখিবামাত্র লুফিয়া লইয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে উহার বিস্তৃত বঙ্কিমী সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। এবং পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের স্মৃতি যদি নেহাত প্রতারণা না করিয়া থাকে, সে সমালোচনা বঙ্গদর্শনের, বঙ্কিমের ও নয়শো রূপেয়ার নিজের উপযুক্তই হইয়াছিল।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' কাহার টাঁকশালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, কোন মস্তিষ্কের মিণ্টে মুদ্রিত হইয়াছিল, তখন জানা যায় নাই। এই নাটকের উপর উহার লেখকের নাম তখনও ছিল না; এখনও নাই। আমাদের অনুমান এ সম্বন্ধে একান্ত অনির্দ্দিষ্ট, অনিশ্চিত। অন্ততঃ এতকাল পরেও, এই লেখ... বাঙ্গালা ভাষার এই একমাত্র নাটকলেখকের নাম প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল; আবশ্যকও ছিল। এই অনাবশ্যক অপ্রকাশে নব্য বঙ্গীয় সমাজের ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় কথা অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। তা যে মস্তিষ্কের মিণ্ট হইতেই 'নয়শো রূপেয়া' নির্গত হউক, সেটি নিশ্চয়ই নাট্যরসের 'রয়াল মিণ্ট' বটে। এবং সে রয়াল মিণ্টের 'রূপেয়া'

খাদহীন খাঁটি রূপার এমন রকম খোদিত হইয়াছে—তাহার মুদ্রণচিহ্ন—অর্থতেজী ছাপ মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। এত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই নয়শো রূপেয়ার নিলামী মুদ্রার এক বিন্দু মোরচে ধরে নাই; ঝন্ ঝন্ ঝক্ ঝক্ করিতেছে; টাঁকশাল হইতে যেন টাটকা তৈয়ার হইয়া আসিল।

সামাজিক চিত্রের হিসাবে 'নয়শো রূপেয়া' একরূপ অতুলনীয় পদার্থ—সে হিসাবে উহা নিত্য-সংঘটিত প্রত্যক্ষ এক অতি সত্য ঘটনার অত্যন্ত সাংঘাতিক মূর্ত্তি। সংস্কার-উদ্দেশে কাব্যে নাটকে, থ্যাটারে ক্যারিকেচারে, যদি সমাজ-কলঙ্ক,—লোক-ব্যবহারের বিষাক্ত ব্যাধি,—মনুষ্যস্বভাবের অত্যন্ত অশৌচ আক্রমণ করিতে হয়, উদ্ঘাটন করিয়া লোকচক্ষুর উপর ধরিতে হয়, তবে তাহা এইরূপেই করিতে হয়, এইরূপেই ধরিতে হয়। এমনতর দেদীপ্যমান দৃশ্য, সত্য সরল উজ্জ্বল ও সফল চিত্র-ফটো, লিপিকরের 'ক্যামেরা'য় খুব কমই উঠে। আলেখ্যের হিসাবে ইহা সফল, অনুকৃত দ্রব্যের অবিকল; পরন্তু উহার মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ সংশোধন সম্বন্ধেও নয়শো রূপেয়ার লাটবন্দী নিলাম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। আমরা যত দূর জানি, উহা কিয়ৎপরিমাণে, প্রত্যক্ষ ফল-প্রসূ হইয়াছিল। কাব্য-চিত্র ও নাট্য-দৃশ্যের দ্বারা কার্য্যগত ততটা ফল প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু নয়শো রূপেয়ার নিদারুণ অঙ্কুশ, কন্যাবিক্রয়-ব্যবসায়ী বেহায়া বড় বামুনের স্থূল চর্ম্ম বিদ্ধ করিয়া ক্ষণেকের জন্যও তাহার পাংশুল চিত্ত বিকল ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। তবে সাহিত্য-শক্তি সমাজের সে স্তরে পঁহুছিবার পথ তখন তত ছিল না বটে, তথাপি, নয়শো রূপেয়ার নিলাম-ডাক যত দূর পঁহুছিতে পারিয়াছিল, তত দূরের বৈবাহিক ক্রয়বিক্রয়ের বিকৃত বিষাক্ত বায়ু যে কিয়ৎপরিমাণে পরিষ্কৃত করিয়াছিল, ইহা বেশ বলা যাইতে পারে।

মধ্য বঙ্গে উক্ত ব্যবসা, বোধ হয়, কিছু মন্দা হইয়া থাকিবে। উত্তর-বঙ্গে কিন্তু এখনও ঐ ট্র্যাফিকের খুব খর তেজ। বহু গৃহস্থ বটু, গৃহিণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণীহীন। উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গে, পদ্মার, মেঘনার ও কর্ণফুলীর কূলে কূলে, পশ্চিম বঙ্গেও বটে,—কোন্ বঙ্গেই বা নয়?—বঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে, বেঙ্গল গবর্মেণ্টের জুরিস্‌ডিক্‌সন্ জুড়িয়া, নয়শো রূপেয়ার বহুল ও বিস্তৃত প্রচার বাঞ্ছনীয় ও অভিনয় ও আবৃত্তি আকাঙ্ক্ষণীয়, অনুবাদ প্রয়োজনীয়। স্বয়ং শিশির বাবু ইহার একটা ইংরাজী অনুবাদ করুন না কেন? [illegible] হিন্দী অনুবাদ করুন, আমাদের বঙ্গবাসী আফিসের [illegible] ও অন্যান্য

বার্তাকুলার পত্র পত্রিকা প্রকাশকের অনুমতি লইয়া, নয়শো রূপেয়া ক্রমশঃ আপন আপন অঙ্গীভূত করুন। 'রূপেয়ার' ইংরেজী অনুবাদ অমৃত পত্রিকাতেই অগ্রে প্রকাশিত হউক না। সিডিসন্ আইনে সকলেরই ত প্রায় 'সে পাঠ' উঠিয়া গিয়াছে; এখন এই পাঠই কিছুকাল চলুক না? ক্রাপির অভাবে অনর্থক আপনাদের মধ্যে কাষড়া-কামড়ি না করিয়া, কুলেখকের কদর্য্য রুচি ও জঘন্য রচনা না ছাপাইয়া, বরং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, নাটক, নভেল—দিদেন পাঁচালী, পীরের গান, ছেপে দেওয়াই শ্রেয়। তাহাতে পুরাতন গ্রাহক রক্ষা ও নূতন গ্রাহকও কিছু কিছু আমদানি হইতে পারে। আমরা সত্যপাঠপূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি, নয়শো রূপেয়ায় নূতন গ্রাহক ও নগদ বিক্রয় নিশ্চয়ই বাড়াইবে।

নয়শো রূপেয়ার উৎপত্তিস্থান মধ্য বঙ্গে, সভ্য ও শিক্ষিত বঙ্গে, নয়শো রূপেয়ার আদান প্রদান অভিনয় বিনিময় বিলক্ষণই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব দূরবঙ্গের বটু বামুন, কায়েত, অশিক্ষিত শূদ্রাদি অসংখ্য হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে ও নিম্নতলে, এখন এই নয়শো রূপেয়া পৌঁছান উচিত। পরন্তু সভ্য ও ভব্য বঙ্গের উপস্থিত ব্যাধির প্রশমনার্থ প্রয়োজন যেরূপ, তাহাতে কিন্তু নয়শো রূপেয়ার অনুরূপ অপর ঔষধও আবশ্যক। সে ক্ষেত্রে, এখন কেবল নয়শো রূপেয়া প্রচুর নয়; 'নয় হাজার রূপেয়া' 'নয় লাখ রূপেয়া' গোছের একটা লাটবন্দী নিলাম চাই। কিন্তু তাহাতেও নির্লজ্জ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লজ্জা হইবে? অশিক্ষিত লোকে অশিক্ষিতার বিবাহ দিয়া বা বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ বাধ্য হইয়াই লইত, বা লয়; যে অর্থের অত্যুচ্চ পরিমাণ 'নয়শো রূপেয়া'। ইহাকে বিবাহ, বিক্রয় বা বিনিময়, যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। কিন্তু ইহার মূলে কেবল বিকৃত সমাজপদ্ধতির নয়, অবিকৃত অর্থনীতির একটি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নিহিত। যে পিতা দুহিতা বিক্রয় করিয়া অর্থ লয়, জানা আবশ্যক যে, সে পিতা অর্থ দিয়া পত্নী ক্রয় করিয়াছিল। সুতরাং পত্নী এ স্থলে Reproductive capital অর্থাৎ উৎ[illegible]সম্ভাব্য মূল ধন। যে ব্যক্তি যথাসর্ব্বস্ব খোয়াইয়া একমাত্র stock in trade পত্নী ক্রয় করিয়াছে, সে সেই পত্নীপ্রসূত কন্যাধন বিনিময় না করিয়া যায় কি, এবং তাহার পত্নীক্রয়ার্থ অর্থের পূরণই বা হয় কিসে? অর্থের সদ্ব্য[illegible] বাণিজ্যেই হয়। বাণিজ্য ব্যতীত যে কিছু অর্থব্যয়, তাহা[illegible] সেই অর্থই সার্থক, যে অ[illegible]

উৎপাদনক্ষম ও যাহা হইতে অর্থাগম হয়। ইহা অর্থনীতির সর্ব্ববাদিসম্মত নিয়ম। অতএব পত্নীক্রয়কারী কর্ত্তৃক কন্যাবিক্রয়ে সমাজনৈতিক নীচতা যতই হউক, উহা অন্ততঃ অর্থনৈতিক ব্যভিচার নহে, এবং অবৈধ ব্যবসাও নহে। যাহা হউক, ইহা অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামাজিক পাপ। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় কি করিতেছেন? যাহা করিতেছেন, সকলেই জানেন; সে জানা যেমন তেমন জানা নয়, মর্ম্মভেদী জানা। শিক্ষিত পিতা, শিক্ষিত পুত্র, দুইই পুত্রা পুণ্যশ্লোক; প্রথম পুণ্যশ্লোক, দ্বিতীয় পুণ্যশ্লোকের পরিণয়-বাণিজ্যে, অর্থ-ব্যবহারের মৌলিক আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যে বিপুল অর্থরাশি আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহার তুলনায় অশিক্ষিতের কন্যা-বিক্রয়ের 'নয়শো রূপেয়া' নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহা পেশো ও বেপেশো বরের বাপের ও বাপের বধূর বাণিজ্য বটে; কিন্তু নেহাত অবৈধ বাণিজ্য। ইহা বিক্রয়ও নয়, বিনিময়ও নয়, খাঁটী প্রতারণা। ইহার পালটাও অবশ্য আছে বটে। না থাকিবে কেন? কিন্তু সেটা শেয়ানায় শেয়ানায় বা শয়তানে শয়তানে কোলাকুলী; সুতরাং সে ক্ষেত্রে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা আরও অধিক চোকাল ও চিকণ চাবুক আবশ্যক।

'নয়শো রূপেয়া' সাহিত্যাংশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতি সরল, সহজ সাদামাটা চলিত কথায়, কথা কহার গন্ধে, ইহার আপাদমস্তক গঠিত। লেখক যেন একই নিশ্বাসে এই নাটকখানি লিখিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতেও হয়, একই নিশ্বাসে; পাঠসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যেন পুনঃ নিশ্বাস গ্রহণ করা যায় না। পাঠসমাপ্তির পরেও ইহা পুনর্ব্বার পাঠ করিতে প্রবৃত্তি হয়। অথচ এই নাটকে এক লাইন কবিতা নাই; একটিও গান নাই; এক বিন্দুও ভাল লেখার ভাণ নাই। ভাষার ও ভাবের রং ফলাইবার চেষ্টামাত্রই নাই। এ সকলের কিছুই ইহাতে নাই; আছে কেবল নাটক, নির্ভাজ নাটক, নাটকীয় রূপ, রস, স্পর্শ, নাটকীয় ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ইহা পূর্ণ। ক্রিয়ার প্রতিরোধক ও ক্রিয়াবিহীন ভাব ও ভাবুকতার প্রতিপোষক একটি বাক্য, একটি বর্ণও প্রায় ইহাতে নাই। ক্রিয়ার, কথার ও ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে নাটকীয় কার্য্যস্রোত অঙ্কে অঙ্কে অবাধগতিতে ছুটিয়া গিয়াছে, এবং কেবল তাহারই সহায়তায় সমগ্র 'প্লট' ও নাট্যক্ষেত্রের কর্ম্মীদিগের প্রকৃতি পরিষ্কার ফুটিয়া উঠিয়াছে। রঙ ফলাইতে, রস নিঙড়াইতে, [illegible] চালাইতে, রূপ রগড়াইতে ও বৃথা বাক্যব্যয় [illegible] লেখ[illegible] [illegible]কের জন্য উপ-

বেষ্টন করেন নাই। এক দৌড়ে গড় গড় করিয়া গন্তব্য স্থানে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গেই যাহা কিছু শুনাইবার, যাহা কিছু দেখাইবার, সবই শুনাইয়াছেন, সবই দেখাইয়াছেন, এবং তদ্দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিয়াছেন, চিত্তবৃত্তি সঞ্চালন করিয়াছেন, শরীরের শিরা ধমনী নাচাইয়াছেন, এবং হাস্যকরুণ-বীভৎসাদি ভাবের উদ্দীপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অত্যল্প স্থানে, নাটকীয় নির্দ্দিষ্ট অত্যল্প সময়ে, এ সবই হইয়াছে; সেই সঙ্গে শ্লেষের সুতীক্ষ্ণ চুম্বন, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের অব্যর্থ বিরেচন এবং চিত্র ও চরিত্রের বিচিত্র অঙ্কন আছে। কবিত্বের কসরত নাই, কল্পনার কচকচি নাই, জল্পনার ইতস্ততঃ নাই, উদ্ভটের অবতারণা নাই; সবই সত্যের—প্রত্যক্ষের প্রতিকৃতি, মানুষমানুষীর রক্ত মাংসের মূর্ত্তি; সবই সত্য, দেদীপ্যমান প্রত্যক্ষবৎ সটান যাইয়া মস্তিষ্ক ও মন স্পর্শ করে। 'নয়শো রূপেয়া' নিশ্চয় সজীব, 'রিয়ালিষ্টিক', অথচ রোমাণ্টিকের রেখা,—অরুণ রেখা উহাতে অলক্ষিত নয়।

আমাদের বিবেচনায় ও আমরা যাহা শুনিয়াছি ও শিখিয়াছি, তাহার আলোচনায়, ঐ গুলিই নাটকের প্রথম উপকরণ ও প্রধান লক্ষণ। এবং সেই কারণেই আমরা বলিয়াছি, 'নয়শো রূপেয়া' নাটক যথার্থই নাটক; নিছক নিরবচ্ছিন্ন নাটক। পুনশ্চ এখন আমরা বলিতে পারি, উহা হয় ত অদ্য তারিখ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার একমাত্র নাটক। কেন না, অমনতর রকমের দ্বিতীয়টি আমরা দেখি নাই। তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমও এ পর্য্যন্ত পাঠ করি নাই।

'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা ভাষায় তত অধিক সংখ্যক নাটক প্রচারিত হয় নাই। যতগুলি হইয়াছিল, তাহার প্রায় সবগুলিই বোধ হয় আমরা দেখিয়াছিলাম। সেই সবগুলির শ্রেষ্ঠতরগুলি, কাব্যাংশে বা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-গুণে 'নয়শো রূপেয়া' অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইতে পারে; শ্রেষ্ঠই বটে; কিন্তু নাটকত্বে একমাত্র 'নীলদর্পণ' ব্যতীত তাহাদের কোনটিই উহার নিকটে পৌঁছে নাই বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু 'নয়শো রূপেয়া' প্রথম প্রকাশের পরে, উহার দ্বিতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকালের মধ্যে, বাঙ্গালা ভাষায় বহু শত নাটক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়াছে; 'রঙ্গালয়ের অনিবার্য্য প্রয়োজনপূরণার্থ' প্রায় নিত্য নিত্য নূতন নাটক [illegible] দিতেছে। এখন প্রতি বৎসর বড় দিনে পাঁচ সাত খানা করিয়া [illegible] প্রকাশিত হয়, ছোট দিনেও সেই

পরিমাণে হয়; যেজো বিনেও যেন না হয়? নিত্য নৈমিত্তিক পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে হয়, সংবাদপত্রের সুর ধরিয়া হয়, আন্দোলনস্রোতের গতি দেখিয়া হয়, থিয়েটারগামীদের মন ও মেজাজ বুঝিয়া হয়, আজব সহরের হুজুক বুঝিয়া হয়, পরন্তু ইংরেজী ও বাঙ্গালা বৎসরের হিসাব ধরিয়া নূতন নূতন নাটক লিখিত, গীত, অভিনীত হইয়া থাকে; "বর্জ্জিত" (?) হইয়া থাকে; পঠিত হয় কি না, জানি না। কিন্তু তখন কোথায় এত হইত? ইহার শতাংশের একাংশও তখন ছিল না। 'নয়শো রূপেয়া' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালায় কেবল সবে মাত্র নূতন সৃষ্টি হইতেছিল। তখন বিডন ষ্ট্রীটে রঙ্গমঞ্চের বাজার বসে নাই; কর্ণওয়ালিসে, মেছোবাজারে, চিতপুরে, বৌবাজারে, নেটিভ কলিকাতার এত পল্লীতে ও অলি-গলিতে পাবলিক ও প্রাইবেট "ষ্টেজ" উত্থিত হয় নাই। কিন্তু এখন সৌভাগ্যক্রমে আর সে দিন নাই। কলিকাতা ত রাজধানী সমগ্র ভারতের মহা মেট্রোপলিস। জিলা ও মহকুমার সদর ত সজ্জিত সহর, বৃহৎ স্থান। এ সকল 'মহস্থুর' মোকামে রঙ্গালয় নাট্যবৈঠক ত হইয়াছেই। অজ পাড়াগায়েও এখন সি-ই-ন উঠে, কনসর্ট ছুটে, করতালি, ক্যাপিটাল, এনকোর আদির আদান প্রদান হইয়া থাকে। যাত্রার দল এখন ফাক থিয়েটার। পল্লীগ্রামের খোকা খুকীদের খেলাঘরেও আজকাল ঝম্প, কম্প, মূর্চ্ছা, পতন ও নেপথ্যাদির বালস্বভাবসুলভ নকল দেখিয়া সুখহাস্য সংবরণ করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি যে, এই সব কচি ছেলেপুলের পিতামহগণ কখনও নাট্যশালা, রঙ্গালয় ও নাটকাভিনয়ের নামও শুনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, এখন তখন অপেক্ষা রঙ্গশালা ও নাট্যকলার কতই বিস্তার, বিকাশ, স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি হইয়াছে। অতএব ইহাতে আশ্চর্য্য আর কি যে, এখন তখন অপেক্ষাও নাটকের সংখ্যা শত গুণেরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ধর্ম্মক্রমের পরিমাণে যে ইহা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই নয়; অবিশ্রান্ত নাটকাভিনয়ের অনুপাতেই নাট্যসাহিত্যের স্রোত বহিতেছে। এখন কেবল থিয়েটারের অধিনেতা, আচার্য্য, অধ্যক্ষ, এক্টর ও ম্যানেজারেরাই নাটক লিখেন না, থিয়েটারের বাজার-সরকার ও বিজ্ঞাপন-বরদারেরাও নাটক লিখিয়া থাকেন, এবং তাহা কার্য্যোপযোগী করিয়া লইয়া অভিনয় করা হয়। নূতনের প্রয়োজনীয়তা এখন এমনি প্রবল যে, রঙ্গগৃহের

পানওয়ালা ও পানীওয়ালারাও ক্রমে 'প্লেরিট' হইতে পারে। তা হউক; ফলতঃ কথা এই যে, ঐ সকল কারণের সমবায়ে সংখ্যার হিসাবে নাটক এখন আমাদের অনেক হইয়াছে, এবং প্রতি বৎসরেই সেই সংখ্যার অঙ্ক স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আমরা এখনকার এত অধিক নাটক পুস্তকের ও নাট্য প্রহসনের উত্তম ও অধম কতকাংশ অবশ্যই কিছু কিছু দেখিয়াছি, শুনিয়াছি ও পড়িয়াছি বটে; কিন্তু তাহাদের বহুসংখ্যকই দেখার, শুনার বা পাঠ করার অবসর ঘটে নাই। কেন না, দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ মনুষ্যজীবনের অবকাশ সেই পরিমাণে বা ততোধিক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ। সুতরাং বাতিকসত্ত্বেও এখনকার বহুসংখ্যক নাটকই আমাদের দেখা ঘটিয়া বা জুটিয়া উঠে নাই। যাহা দেখি নাই, তাহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই বলা চলে না। হইতে পারে, তাহাদের ভিতর সেক্সপীয়র, মোলিয়ার, কালিদাসাদির অমর কীর্ত্তি আছে। কিন্তু সে কীর্ত্তির কথা অদ্যাবধি কাহারও মুখে শুনি নাই। শুনিলে অবশ্য সে কীর্ত্তিগ্রন্থ নাটক কয়েকটি আনাইয়া দেখিতাম, অথবা আপনারাই নিজে যাইয়া তাহাদের 'রসোদগার' দেখিয়া আসিতাম। পক্ষান্তরে, আমরা এখনকার যত নাটক দেখিয়াছি, তাহাদের কতকটিতে নানারকমের কল্পনা, রূপ রসের অবতারণা ও পাকা হাতের রচনা আছে;—তাহাদের কোন কোনটিতে মৌলিকতা ও প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যাংশে, কল্পনাংশে, রচনাংশে, অভিনয়ের ও আমোদপ্রদানের উপযোগিতাংশে, পরন্তু প্লট প্রভৃতির পারিপাট্যে, ঘটনাদির বৈচিত্র্যে, চিত্রাদির অঙ্কনে, গদ্যপদ্যাদি ভাষার সংগঠনে, হইতে পারে,—না হইবেই বা কেন?—এখনকার বহু নাটকই, নয়শো রূপেয়া অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এত দিনের শিক্ষায়, প্রতি রজনীর পরীক্ষায়, শত যুবকের সংঘর্ষণে ও যত্নার্জ্জনে, অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ হইবারই কথা। কিন্তু নাটকাংশে—নাটকীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ও নাটকীয় কার্য্যের নিয়মীকরণের হিসাবে, এখনকার একটি নাটকও 'নয়শো রূপেয়া' নাটকের সমকক্ষ নাটক নহে—নিকটস্থ নাটকও নহে। ইহা আমাদের নিজের অভিমত, অতএব ইহা অভ্রান্ত বা প্রমাদশূন্য, এমন কথা নিশ্চয়ই বলি না। পরন্তু, এই অভিমত অবিসংবাদী হইবে, এমন আশাও করি না। তবে পূর্ব্বাপর বিবেচনা ও যথাসাধ্য বিচার করিয়া, এবং অপক্ষপাত ও নিঃস্বার্থ সাহিত্য সমালোচনার সত্যানুসন্ধানের ঐকান্তিক আবশ্যকতা সর্ব্বথা স্মৃতিপথে রাখিয়া, আমরা ঐ অভিমতে উপনীত

ছি; বিনয়-নম্রতাসহকারে কেবল এইমাত্রই বলিতে পারি। এইমাত্র তে পারি, অতএব সেই জন্যই বলিয়াছি যে, নাট্যাংশে 'নয়শো রুপেয়া' বা একমাত্র বাঙ্গলা নাটক; হায়! সংখ্যাধিক্য সত্বেও বাঙ্গলা নাটকের সংখ্যা এত অল্প;—এবং এত অল্পসংখ্যক নাটক, নাটকের প্রকৃত লক্ষণসমন্বিত ও সে বিষয়ে সমালোচনার সমুচিত বিশ্লেষণ সহ্য করিতে পারে। 'নয়শো রুপেয়া',—যাহার কিঞ্চিৎ নাটকত্ব আমরা স্বীকার করিয়াছি, নিজেও সর্ব্বাংশে সেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সমালোচনা সহ্য করিতে সক্ষম নহে, ইহাও স্থির। তবে উহার অন্যান্য ত্রুটী ও অভাবাদি সত্বেও নাটকত্বের লক্ষণ কিঞ্চিৎ আছে বলিয়াই উহাকে খাঁটি নাটক বলিতেছিলাম; ফল কথা এই যে, অনেক পুস্তক, যাহা নাটক-নামে অভিহিত, নট নটীর কথোপকথনে, কবিতায় ও গীতাদিতে অভিনীত, অলঙ্কারকর্ত্তাদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে বা তাহার ব্যভিচারে অঙ্কে গর্ভাঙ্কে বিভক্ত হইয়া বিরচিত ও গঠিত, তাহা নাটকীয়-শরীরধারী শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সেই শরীর-ধর্ম্ম-লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, নাটকীয় আত্ম-সমন্বিত নহে; সুতরাং আত্মহীন মৃত বা সজীব (কেন না শোণিতে জীবাণু-শক্তি থাকিলে, আত্ম-বিরহিত সজীবতা একবারেই অসম্ভব নয়) শরীরের মত প্রকৃত বা মৌলিক নাটকত্ববিহীন; অতএব নাটক নহে, বা নাটকীয় শরীরমাত্র। কিন্তু এই সকল নাটকাভিধেয় পুস্তকের অনেকানেক পুস্তক নাটক না হইলেও, অন্য রকমের, অর্থাৎ নাটকীয় দেহে নভেল কাব্যাদির আত্মযুক্ত উৎকৃষ্ট রচনা, প্রীতিদায়িনী ও ভাবোদ্দীপনী রচনা; কেন না, তাহাতে শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সজীবতা, এ সবই বিদ্যমান; অবিদ্যমান কেবল নাটকীয় আত্মা। নাটক না হইয়াও রচনা মনোমোহিনী, হৃদয়স্পর্শিনী, নবরসময়ী হইতে পারে; অধুনা স্থলবিশেষে কচিৎ তাহা হইতেছেও বটে। আমাদের পূর্ব্বতন বাঙ্গলা নাটকে সাধারণতঃ নাটকত্ব অপেক্ষা মনোমোহিনী রচনার দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইত; আমাদের অধুনাতন নাটকে, নাটকত্ব অপেক্ষা 'ষ্টেজ এফেক্টে'র দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা হয়। সুতরাং বঙ্কিম বাবু বলিতেন,—সমীচীন সমালোচকমাত্রেই বলেন,—বাঙ্গলা ভাষায় নাটক নাই; অথবা খুব অল্পই আছে। পূর্ব্বতন নাটক চমৎকার পাঠোপযোগী হইত। অধুনাতন নাটক রঙ্গমঞ্চের অভিনয়েই খুলে; পাঠকালে তাহাতে প্রায়ই মন ভুলে না; পাঠোপযোগী তাহা প্রায়ই হয় না; কিন্তু অভিনয়োপযোগী হয়। 'নয়শো রুপেয়া' নাটকে আমরা ইত্যগ্রেই উল্লেখ

করিয়াছি, মনোহারিণী রচনা বা অপূর্ব্ব কোনও গুণপনা নাই; তা প্রতি লক্ষ্যই নাই; কেবল নাটকীয় আত্মা আছে; সাক্ষাৎসম্বন্ধে জিক অতি অপকৃষ্ট প্রচলিত প্রথা অঙ্কিত করিতে গিয়া, উহা যেন লেখকের অজ্ঞাতেই নাটকীয় আত্মায় প্রভাবিত হইয়া উঠিয়াছে।

'নয়শো রূপেয়া' নাটক মিলনান্ত মিষ্টকাহিনী বা সিরিও-কমিক্‌। সুতরাং বলা বাহুল্য, শোকান্তের বা বিয়োগান্তের দারুণ করুণ ছায়া ট্রাজিডির তীব্র আবেগ তাপ, দৃষ্টাদৃষ্টের প্রারব্ধ ও পুরুষকারের সংঘর্ষ সংক্রান্ত এবং তদুপযোগী উচ্চ অঙ্গের নাটকত্ব নয়শো রূপেয়ায় নাই;—তাহার নিজের সজাতীয় অধিকার সীমার মধ্যেও তাহা নয়। সাধারণ মনুষ্যসমাজের 'রিয়ালিষ্টিক' রাজ্যে লোকপ্রচলিত উপ বা অপ-প্রথার নিত্য নৈমিত্তিক প্রত্যহিক ঘটনার বিবৃতি, বর্ণনা ও আলোচনাসূত্রে, যে প্রকৃতির নাটকত্ব উৎপন্ন হইতে পারে,—নাটকে ও প্রহসনে পরস্পর সাক্ষাৎ ও সংমিলন-সূত্রে যে রকমের নাটকত্ব জন্মিতে পারে, 'নয়শো রূপেয়া' সেই শ্রেণীর নাটকত্ব-যুক্ত নাটক। 'রূপেয়ার' অনেকানেক গুণের কথা আমরা বলিয়াছি; উহার দোষের কথা কিছু বলিতে হইলে, মোটের উপর কেবল এই বলা যায় যে, উহা স্থলবিশেষে এবং অবশ্য স্থলবিশেষের উত্তাপাধিক্যের হেতুতেই, একমাত্র অসংযত, একমাত্র অনাবশ্যক অশ্লীল। নাটকেই হউক—সাহিত্যের ও শিল্পের যে অঙ্গেই হউক, অসংযম,—অসংযমজনিত অনাবশ্যক অশ্লীলতা অসমর্থনীয়।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

মোহনলাল।

পলাশী যুদ্ধের মোহনলাল, কবি নবীনচন্দ্রের অমৃতময়ী লেখনীর কল্যাণে আজ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পরিচিত। কবি কয়েকটি ঐতিহাসিক চিত্র বিকৃতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া, আজকাল কিছু গঞ্জনা সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মোহনলালের জন্য মোহনলালের জন্যই—এ বিষয়ে কোনও কঠোর ঐতিহাসিকেরও তাঁহার সহিত মতভেদ

[illegible]। স্বয়ং মুতাক্ষরীণকার গোলাম [illegible] [illegible]র সাক্ষী। মুসলমান [illegible]সিক, বাঙ্গালী বীর মোহনলালের বীরত্বকাহিনীর অপলাপ করেন [illegible] তাঁহার অযথা গর্ব্ব প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াও দক্ষতার উপযুক্ত [illegible] [illegible]রিয়াছেন। আপাততঃ ইতিহাস-সমালোচনায় মোহনলাল আমাদের পর হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার মোহন মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কলঙ্কের ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; সেই জন্যই তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার সময় উপস্থিত।

সিরাজের রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মোহনলালকে দেখিতে পাই। মুতাক্ষরীণ-কার বলিতেছেন, 'মোহনলাল পূর্ব্বে সিরাজ উদ্দৌলার নিজের দেওয়ান ছিলেন।' এ দেওয়ানী সিরাজের যৌবরাজ্য অবস্থায়, স্পষ্টই অনুমিত হয়। সিরাজ নবাব হইয়াই তাঁহাকে 'দেওয়ানই-আলি' অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রিত্ব-পদে উন্নীত করিলেন। রাজকার্য্যপর্য্যালোচনার জন্য সকল বিষয়ের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল। তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও তৎসহ নবাবী প্রথামত সম্মানসূচক ঝাণ্ডা, নকড়া, ঝালরদার পাল্কী প্রদত্ত হইল। সেই অবধি তিনি পাঁচ-হাজারী মনসবদারী ও (সেনানায়কত্ব) প্রাপ্ত হইলেন। (১) কিন্তু মোহনলালের এই উন্নতিই সিরাজ উদ্দৌলার অধঃ-পতনের বীজবপন করিয়া রাখিল। হতভাগ্য সিরাজের প্রতি অনুকম্পার মাত্রা যতই কেন বর্দ্ধিত করা যাউক না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, একে তাঁহার যৌবনসময়োচিত উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে প্রবীণ মন্ত্রিবর্গ পূর্ব্বাবধিই বিরক্ত ছিলেন; তাহার পর সিরাজ উদ্দৌলা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই প্রবীণগণকে উপেক্ষা করিয়া, মীর মদন ও মোহনলালের মত অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ দুই জন ব্যক্তিকে, সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত করিলেন। এইরূপ অবি-মৃশ্যকারিতার সহিত নিজের বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত কর্ম্মচারিগণের পুরস্কারপ্রদান সাধারণের অনুরাগ আকর্ষণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া বোধ হয় না। ইহাই মীর-জাফর, প্রবীণ মন্ত্রী রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি দরবারের প্রধান সদস্যবর্গের অসন্তোষের মূল কারণ। (২) মোহনলাল সহজ বীর, স্বীয় দক্ষতার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; তাহাতে আবার তিনি নবাবী দরবারের মোসাহেব কায়দায় সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত,—প্রবীণগণের মুখ চাহিয়াও কাজ করিতেন না।

[illegible] Mustafa's Mutaqherin vol I. p. 717.

[illegible] Mutagh-Trans vol I, p. 718,

এই জন্যই গোলাম ... ছেন, তাঁহার সগর্ব্ব ব্যবহারই প্রবীণ দলের মনোভঙ্গের প্রথম কারণ।

মুতাক্ষরীণের ইংরাজী অনুবাদক মুস্তাফা নামক জনৈক স্বধর্ম্মত্যাগী ফরাসী মুসলমান, রাজা মোহনলাল সম্বন্ধে প্রবাদমূলক এক অলীক অপবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (৩) তিনি বলেন, 'মোহনলাল সিরাজ উদ্দৌলাকে আপন ভগ্নী উপহার দেন; এই ভগ্নী এ দেশের এক আদর্শ-সুন্দরী; অতি তরুণী।' ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট সাহেব প্রবাদ বলিয়াই এই টীকার সার সংগ্রহ করিয়াছেন; প্রভুর অতিবিশ্বস্ত ও উপকারী ভৃত্য বলিয়াও টীপ্পনীতে এই সঙ্গে মোহনলালের উল্লেখ করা হইয়াছে। (৪) মুতাক্ষরীণ, রিয়াজ-উস্-সালাতিন বা অন্য কোনও দেশীয় ইতিহাসে এ কথা নাই। যদি ভগিনীদানই মোহনলালের উন্নতির কারণ হইত, তাহা হইলে কোনও মুসলমান লেখক যে এ কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন, এমন বোধ হয় না। গোলাম হোসেন সিরাজের চরিত্রবর্ণন বা মোহনলালের কথায় গ্রন্থের অনেকাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের পত্নী বা বাঁদী হইলে, তাঁহার লেখনীতে এ ঘটনা বাদ পড়িত, ইহা সম্ভব নহে। আমাদের বিশ্বাস, সিরাজ ও মোহনলালের পতনের পর, গুজবপ্রিয় মুর্শিদাবাদ সহরের নিম্ন শ্রেণীর কোনও মুসলমানী আড্ডায়, মুস্তাফা এই মূল্যবান গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার অলীকত্ব সম্বন্ধে পরে বিচার করা যাইবে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের রাজসাহীর বন্ধু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁহার নবপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ 'সিরাজদ্দৌলা'য় মোহনলালের উপর অনেকটা নিগ্রহ করিয়াছেন। (৫) তিনি লিখিয়াছেন, "মহারাজ মোহনলালের নাম অনেকের সুপরিচিত। বাঙ্গালী কবি তাঁহার বীরত্ব বর্ণন করিতে গিয়া যে সকল কবিতা প্রসব করিয়াছেন, তাহাও অনেকের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছে। কিন্তু মোহনলাল হিন্দু হইয়াও কি উদ্দেশ্যে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন ও জীবনরক্ষার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কবি তাহার মূলতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই।" এই মুখবন্ধের পর এক জন প্রতিভাশালী

---

(৩) Mutaqh-Note vol I. p. 717.

(৪) Stewart's Bengal p. 309.

(৫) সিরাজদ্দৌলা; ৬৯—৭৪ পৃঃ।

ঐতিহাসিক সে তত্ত্ব হস্তে লইলেন ; কিন্তু ... সুবিচার ... লেন কি না, এখনও অনেকের সন্দেহ রহিয়া গেল। তিনি বলেন, "মোহনলাল এক জন সামান্ত অবস্থার লোক। নবাব সরকারে তাঁহার কোনই পদগৌরব ছিল না। সিরাজদ্দৌলা যখন যৌবনোন্মাদে অন্ধ, সেই সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁহার পার্শ্বচর হইয়াছিল, মোহনলাল তাঁহাদেরই এক জন।" অতঃপর মোহনলালের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভগিনী আসিয়া সিরাজের অন্তঃপুরে উপনীত হইল ; মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইরূপে সিরাজদ্দৌলার উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই, ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহাতে মোহনলালকে যে এক জন 'নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি মানবপশুরূপে প্রদর্শন করা হইল, স্নেহভাজন সিরাজের দিকে একটু টানিতে গিয়া গরীব মোহনলালের মস্তকে যে লগুড়াঘাত করা হইল, আমাদের মিত্র মৈত্র মহাশয় তাহা লক্ষ্যই করিলেন না। যে ব্যক্তি যৌবনে সিরাজের পাপলিপ্সার অবধা সাহায্য করিয়া ভগিনী-উৎসর্গে সেই যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দিল, লোকে তাহাকে কি ভাবের "বীরপুরুষ" বলিয়া ভাবিবে ? সে কিরূপ "সমাদরের" পাত্র, বন্ধুবরই বলিতে পারেন ! কোনও ইতিহাসই তাঁহার এ উক্তির সমর্থন করে না। মোহনলাল অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ; সিরাজের নিজের দেওয়ান ছিলেন, এইমাত্র নির্দ্দেশ আছে। সিরাজের যৌবরাজ্যসময়ে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ যে স্বয়ং মোহনলালকে দেওয়ানী পদে নিয়োগ করিয়া যান নাই, তাহার প্রমাণাভাব। অক্ষয় বাবু পরে রাজা মানসিংহের সহিত মোহনলালের তুলনা করিয়াছেন, এবং টীকায় আমার "নবাবী আমলের হিন্দু কর্ম্মচারী" (সাহিত্য ; ১৩০২) প্রবন্ধে মোহনলালের "অপবাদ" সম্বন্ধে ইঙ্গিত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, "আমরা ইহাকে অপবাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি ; রাজা মানসিংহ এবং মোহনলাল উভয়েই সমাদরের পাত্র। মোগলকে ভগিনী দান করিয়াছেন বলিয়া বীরত্ব গৌরব অবসন্ন হইতে পারে না।" মুসলমানের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিলে গৌরবহানির সম্ভাবনা না থাকিতে পারে ; কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রে কি একরূপই দাঁড়াইতেছে ? যদি বলা যায়, মুতাক্ষরীর "Made a present" মানে বিবাহ দেওয়া হইল; আর কিছু নয়, তাহাতে অক্ষের বড় একটা আপত্তি না হইতে পারে। (ক) কিন্তু বন্ধুবর যে ভাবে এই অপবাদ দেখাইলেন, তাহাতে আর

(ক) সিরাজের ইতিহাসে যে, দুই এক স্থানে আমাদের মতের মিল হয় নাই, সেই

[illegible]র কথা কি [illegible] যাহা হউক, মোহনলালের ভগ্নী সিরাজের বিবাহিতা পত্নী মনে করিয়া লইলে কি হয়, দেখা যাউক। বাঙ্গলা দেশে কিন্তু নবাবী রাজজামাতার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অভাব!

ইতিহাসে আমরা সিরাজ উদ্দৌলার দুই পত্নীর উল্লেখ পাই। ১ম, তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, মির্জা ইরেজ খাঁর দুহিতা। ২য়, লুৎফউন্নেসা, সিরাজের জারিয়া বা ক্রীতদাসী। প্রথমা পত্নীর কথা কেবল বিবাহের সময়েই পাওয়া যায়; নামনির্দ্দেশ নাই। লুৎফউন্নেসাই তাঁহার প্রণয়িনী, জীবন মরণে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী। সিরাজ একবার বৃদ্ধ মাতামহের উপর অভিমান করিয়া যখন বলপূর্ব্বক পাটনা-অধিকারে যাত্রা করেন, তখনও লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী; আবার পলাশী যুদ্ধের পরে পলায়নের সময়েও লুৎফউন্নেসাই তাঁহার অবলম্বন। (৭) উমদৎউন্নেসা নামে সিরাজের আর এক পত্নীর কথা প্রথমে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিভারিজ সাহেব ১৭৯১ সালের নিজামত রেকর্ড হইতে উদ্ধার করেন। (৮) আমরা পরে এ সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা এই :—১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর উমদৎউন্নেসার উকীল মীর ফতে আলি, লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট এক দরখাস্ত করিতেছেন; তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, আমার মক্কেল নিজামত ফণ্ড হইতে ৪৫০ টাকা পেন্সন পান, কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাকী ১১০৯৩।৶০ দাঁড়াইয়াছে, এই টাকা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা হউক। ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধি গবর্ণর ম্যাকফারসন সাহেবের নিকটও এক দরখাস্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৮৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখের এক পত্রের ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ যে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের অনুগ্রহে রেসিডেণ্ট স্পীক সাহেব উমদৎউন্নেসার পেন্সন রীতিমত দিয়া

[illegible]নেই বন্ধুবর অক্ষয় বাবু আমার নামোল্লেখ করিয়াছেন। মোহনলাল সম্বন্ধে পত্র দ্বারা আমার শেষ বক্তব্য জ্ঞাত হইয়াও গ্রন্থ কলেবরে তাঁহার পূর্ব্ব উক্তির পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অবশ্য শেষ নোটে লিখিয়াছেন, "মোহনলালের ভগিনীদানকাহিনী মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ইংরেজের' কিন্তু এ কথা রটনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেকে বলেন, এটি নিতান্তই ইংরেজের রচা কথা।" সমসাময়িক ইংরেজেরা কেহই রটনার ত্রুটি করেন নাই, তাহা হইলে প্রমাণের বাকী কি থাকিল? [illegible] দেখিয়া ষ্টুয়ার্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। আমরা ইংরেজ মহাত্মার [illegible] লক্ষ্য করিয়াছি। "গৌরব অভাবে" বংশের প্রয়োগটা বোধ হয় ভুলই [illegible]

(৭) M[illegible]taqherin—vol I, 614.

(৮) [illegible] Review 1892 (April) p. 341.

আসিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্ব বাকীর দরুণ ৫২৯২ টাকা এখনও পান নাই।" উমদৎউন্নেসা এই পত্রে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে অনুরোধ করিতেছেন, "আমি আমার জায়গীরের বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাটনা যাত্রা করিতেছি, পাটনার জজকে আমার উপর অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে পত্র দিলে কৃতার্থ হইব।" ইহার উত্তরে সেক্রেটরী চেরী সাহেব স্পীক সাহেবকে লিখিতেছেন যে, বেগমের বাকী টাকার প্রার্থনা, নিজামতের দেনা পরিশোধের নিয়ম-অনুযায়ী হইলে, তাঁহাকে ঐ টাকা দেওয়া হয়। (১) ইহার পরে বিভারিজ সাহেবের উল্লিখিত ১৭৯১ সালের আগষ্ট মাসে পেন্সন্-বৃদ্ধির প্রার্থনা। ইহাতে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, পূর্ব্বে বেগম মাসে পাঁচ শত টাকা পাইতেন; হেষ্টিংসের আমলে ৪৫০ হয়, এক্ষণে ৩২৫ দাঁড়াইয়াছে।

উমদৎউন্নেসার জায়গীর ছিল, এই প্রথম দেখা গেল। বিভারিজ সাহেব ইহা জানিলে, অবশ্য উমদৎউন্নেসা ও লুৎফউন্নেসা অভিন্ন হইতে পারেন, এমন অনুমান করিতেন না। পরে মোহনলালের যেরূপ পরিণাম নির্দ্দেশ করা যাইবে, তাহাতে উমদৎউন্নেসা তাঁহার ভগ্নী হইতে পারেন না। শেষ পর্য্যন্ত জায়গীর স্থির থাকাই ইহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ। এই জায়গীর দ্বারা তাঁহাকে আমরা সিরাজের পাটরাণী ইরেজ খাঁর দুহিতা বলিয়া অনুমান করি। ফরষ্টার সাহেব নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে সিরাজের সমাধিমন্দিরে যে বেগমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি উমদৎউন্নেসাও হইতে পারেন। এই সমাধিমন্দিরে (খোষবাগ) সিরাজের দুই স্ত্রীর সমাধি আছে বলিয়া প্রকাশ। একটি লুৎফ-উন্নেসার; অন্যটি উমদৎউন্নেসার হওয়াই বিশেষ সম্ভব।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরের মতে, লুৎফ-উন্নেসাই মোহনলালের ভগ্নী;—বিভারিজ সাহেব তাঁহারই নিকট ঐরূপ শুনিয়াছেন। মুতাক্ষরীণের টীকাই তাঁহার প্রথম বিশ্বাসের মূল। তিনি এই জনশ্রুতি সম্বন্ধে পরে প্রাচীন লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা এই:— "সিরাজ এক দিন সহচরসঙ্গে সহরের দক্ষিণ দিকে (বর্ত্তমান সাহা নগরে) বাঙ্গালীপাড়ার পথে ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দেখিলেন, একটি অট্টালিকার উপরে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা কেশপাশ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। রূপ দেখিয়া চঞ্চলমতি সিরাজ মোহিত হইলেন। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, ঐ কুমারী তাঁহার স্বীয় দেওয়ান মোহনলালের অবিবাহিতা ভগ্নী,

(১) Letter to Mr. speke, Resident. Dated the 6th May 1789.

[illegible]ভাবে বিবাহের প্রস্তাব হইল, তখ তদ্বিতে মোহনলালের কোনও আপত্তি হইল না; শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।* এই জনশ্রুতি মোহনলালের উন্নতির কারণ এইরূপেই স্থির করিয়া দিল। মুস্তাকার মানসী কন্যা যৌবনে এই বেশ ধারণ করিল। আমাদের দেশে অনেক জনশ্রুতিই এই আকারের। কোথাও কিছু লেখা দেখিলেই তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের আর সন্দেহের কারণ থাকে না; ক্রমশঃ লতা পল্লব ফুলফলে তাহার পুষ্টিসাধন করি। বিদ্যা-সুন্দরের সুড়ঙ্গ বাহির করিবার জন্য বর্দ্ধমানে কত মনীষীর মস্তক ঘূর্ণিত হইয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করে? যাহা হউক, নিম্নলিখিত কারণে আমরা লুৎফউন্নেসাকে মোহনলালের ভগ্নী বলিয়া স্বীকার করিতে অসমর্থ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সিরাজের পাটনা যাত্রার সময়ে লুৎফউন্নেসা তাঁহার সঙ্গিনী। মুতা-ক্ষরীণ-কার লিখিয়াছেন, সিরাজ এই সময়ে লুৎফউন্নেসা ও তাঁহার মাতা নিজের এক দ্রুতগামী বলদ-শকটে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং সেই একই রথে যাত্রা করেন। (১০) মোহনলালের মাতাও এই অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে এক শকটে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে হয়। মনে রাখা উচিত, জনশ্রুতি মোহনলালের দেওয়ানী ও অট্টালিকা অস্বীকার করে নাই; তাহাতেই বোধ হয়, তিনি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন না।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত, মুস্তাকা তাঁহার এই গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে এই কথিত শকটের প্রকাণ্ড বলীবর্দ্দ দুইটি দেখিয়াছেন; নিজের মধ্যমাঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা তাহাদের ককুদ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছিলেন, আরও অর্দ্ধ ফুট বাকী থাকে। আমাদের মনটা নাকি বড়ই সন্দিগ্ধ, তাই এই উক্তিটি একটু কেমন কেমন বোধ হয়। মুস্তাকা বলিয়াছেন, দুই বৎসর পরে এই বলদ দুইটি মীরজাফর ওয়াট্‌স্ সাহেবকে দান করেন। মীরজাফর নবাবের বলীবর্দ্দ উপহার দিলেন; অতএব উপহার মীরজাফরের নবাবীপ্রাপ্তির পরেই ঘটা উচিত। অথচ সিরাজের এ পাটনা-যাত্রা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে; কথাটা একটু বড় সঙ্গত বোধ হইতেছে না। আমরা বরাবরই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, মুস্তাকা বড় গুজবপ্রিয় লোক। মুস্তা-কার অনেক কথা বড়ই সাবধানে গ্রহণ করিতে হয়। কুৎসারটনায় তিনি সিদ্ধহস্ত; তাঁহার এ বিষয়ের কাহিনীগুলি অনেক স্থলে এরূপ অশ্লীল ও জঘন্য

---

১০ Mutaqherin vol I. 614-15.

যে, সভ্য ভাষায় তাহার উল্লেখ অসম্ভব। (১১) যাহাই হউক, তাঁহার মন্তব্যে মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ দেখিয়া, লুৎফউন্নেসাকে ঐ ভগ্নী বলিয়া স্থির করিবার কোনও কারণই নাই। লুৎফউন্নেসা পরিণামে খোষবাগে আলিবর্দ্দী ও সিরাজের সমাধিমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শব সিরাজের পদতলে সমাহিত রহিয়াছে।

* আমাদের স্থানীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়, এই মোহনলালের ভগ্নীর প্রসঙ্গে আরও একটু বেশী দূর গিয়াছেন। মুস্তাক্ষা লিখিয়াছেন, ফৈজী বা ফয়জন নামে এক পরমসুন্দরী নর্ত্তকীর রূপের কথা শুনিয়া সিরাজ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে তাহাকে দিল্লী হইতে আনয়ন করেন। সে রূপসী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, অতি ক্ষীণাঙ্গী, ওজনে ২২সের মাত্র; এক কথায় সর্ব্বসৌন্দর্য্যের ললামভূতা। সে পরে সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ মহম্মদের প্রেমে পড়ায় ক্রোধোন্মত্ত সিরাজ তাহাকে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া তাহার চারি দিক অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিন মাস পরে ঐ স্থান হইতে তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট মৃতদেহ বাহির করা হয়। যে দুইটি প্রকাণ্ড টীকায় ফৈজী ও মোহনলালের ভগ্নীর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার অনুবাদ বা নকল দিবার অবসর বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। (১২) এ মাসের "সাহিত্য"ও কেবল এই প্রবন্ধের জন্য নহে। যাহা হউক, বক্ষ্যমাণ টিপ্পনী দুইটির বলে ফৈজীর স্কন্ধে মোহনলালের ভগিনীত্ব আরোপিত করিবার কোনও কারণ নাই। নিখিল বাবু নিজ কাহিনীতে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেন কেন, বুঝা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি ব্যস্ততার সহিত এই অংশটি লিখিয়াছেন। ফৈজী মোহনলালের ভগ্নী, টীকার এই অর্থ হইলে, ষ্টুয়ার্ট বা বিভারিজ তাহা লক্ষ্য করিতেন। টীকাটির অর্থও বিশদ;—মোহনলালের ভগ্নীকে তন্বঙ্গী বলিয়া, এ দেশের লোকের সৌন্দর্য্যবোধের কথায় মুস্তাক্ষা বলিয়াছেন যে, সুন্দরীর বর্ণনায় লোকে সাধারণতঃ বলিবে, এমন সুন্দরী যে পান খাইলে গলায় ভিতর দিয়া রক্তিম রাগ দেখা যায়; এতই ক্ষীণাঙ্গী যে, ওজনে ২২সের মাত্র। এই উক্তির পর স্পষ্টই বলিয়াছেন, ফৈজীর ওজন এই ২২সের ছিল। ষ্টুয়ার্ট সাহেবেরও এই নোট দৃষ্টে মোহনলালের ভগিনীর ওজন দেওয়া সমীচীন হয় নাই। নিখিল বাবুর প্রথম ভ্রম তাঁহার পরবর্ত্তী তর্কগুলিকে এক দিকেই প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। ক্ষমতা ও

(১১) See Notes Mutaqh. p. p. 636, 647, [illegible] &c. &c.
(১২) Vide Mutaqh-Foot note p. p. 614-15, 717.

গুণপনা যতই থাকুক, কৈজীর ভ্রাতা হইলে মোহনলালের উপর সিরাজের কতটুকু আস্থা থাকিতে পারে? মুতাক্ষরীর স্পষ্ট উক্তির পর এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক।

দেখা গেল, এ তিন জনের কেহই মোহনলালের ভগ্নী হইতে পারেন না। সম্বন্ধ স্থির করিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইলে, অন্য কোনও অজ্ঞাত বেগমের অনুসন্ধান আবশ্যক। এত কথার পরেও যদি সিরাজ মোহনলালের ভগিনী-পতি ছিলেন, এই জনশ্রুতি সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাতেও মোহন-লালের বীরপ্রকৃতির বিপক্ষে কিছু বলিবার থাকে না। এক্ষণে তাঁহার কি কৃতিত্ব ছিল, সেই প্রকৃত কথার অনুসরণ করা যাউক। তিনি মোসাহেব ছিলেন না, ইহা নিশ্চিত।

সিংহাসনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সিরাজদ্দৌলা চারি দিকে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তৃত দেখিলেন। এক দিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ঘেসিটী বেগম কৌশলী রাজবল্লভের পরামর্শে সিরাজের মৃত কনিষ্ঠ ভ্রাতার এক অপোগণ্ড শিশু লইয়া উপস্থিত। পক্ষান্তরে প্রবীণ মন্ত্রিদল জগৎ শেঠের সহিত একমত হইয়া পূর্ণিয়ার নবাব, সিরাজের পিতৃব্যপুত্র সওকৎ জঙ্গকে সিংহাসনপ্রদানের অভি-লাষী। এ সময়ে একমাত্র মোহনলালই সিরাজের অবলম্বন। তাঁহারই পরা-মর্শে এই আসন্ন বিপদগুলি জোরকেই নিষ্পিষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইল। ঘেসিটী বেগম মতিঝিল প্রাসাদ হইতে অন্তঃপুরে আনীত হইলেন; বেগমের পাত্রেসমিত অর্থগৃধ্নু সহকারিগণ কার্য্যকালে সরিয়া পড়িল। অতঃপর ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে সওকৎজঙ্গকে শিক্ষা দিবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রা করেন। তিনি স্বয়ং এক দল সৈন্যসহ রাজমহলের দিক্ দিয়া অগ্রসর হইলেন; অপর সৈন্যদল মোহনলালের অধীনে গঙ্গা পার হইয়া সোমদহ, হায়েৎপুর ও বসন্তপুর গোলার দিক হইতে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। (১৩) নবাবগঞ্জ ও মণিহারীর মধ্যস্থলে প্রাকৃতিক

(১৩) মুতাক্ষরীণ (১—৭০৩ পৃঃ) ইয়ার্ট ভ্রমক্রমে 'সরদহ' পড়িয়াছেন। অক্ষয় বাবু সুপরিচিত সরদহের উল্লেখ পাইয়া 'রাণী ভবানীর জমিদারী' যোগ দিয়াছেন; কিন্তু বাস্তবিক মুর্শিদাবাদ হইতে পূর্ণিয়া যাইতে হইলে, রাজশাহীর দক্ষিণ সরদহ পাওয়া যায় না। হিয়াৎপুর ও সোমদহ—মালদহ ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তভাগে। পূর্ব্বে দুইটি স্থানই প্রসিদ্ধ ছিল। স্থানীয় লোকে সোমদহকে 'সমুদ্র' বলে। এখানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান। বসন্তপুর গোলা পূর্ণিয়া নবাবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী।

পরিখাবেষ্টিত এক সুন্দর স্থানে পূর্ণিয়ার প্রবীণ মন্ত্রিগণের পরামর্শে সৈন্য-সংস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। চারি দিকে বিলে পরিবেষ্টিত এক উচ্চভূমি, এক পার্শ্বে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ পথ; সেখানে মুষ্টিমেয় সৈন্যের সাহায্যেই ব্যূহ রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বোধ শওকৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার সৈন্যের উৎকৃষ্ট অংশ ব্যূহের বাহিরে দুই ক্রোশ ব্যবধানে সন্নিবিষ্ট হইল। ১১৭০ হিজিরা সালের ২১শে জমাদিয়স্ সানি বেলা আড়াই প্রহরের সময় মোহন-লালের সৈন্য আবারি ও মণিহারীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। এই স্থানের নাম বলদিয়াবাড়ী। এখান হইতে শওকতের শিবির দুই ক্রোশের অধিক নয়; কিন্তু মধ্যে বিলের অংশবিশেষ ব্যবধান। মোহনলাল সসৈন্যে গজার পাহাড়ের উপর একটি উচ্চস্থানে উপনীত হইলেন। সেনাপতিগণের মধ্যে মীরজাফর খাঁ, দোস্ত মহম্মদ খাঁ, মীর কাসেম খাঁ, এবং প্রসিদ্ধ বীর উমের খাঁর সুযোগ্য পুত্রদ্বয়, দিলির খাঁ ও আসালৎ খাঁ প্রভৃতি বাঙ্গলা সৈন্যের শীর্ষস্থানীয় পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন। (১৪) তাঁহাদের ক্ষুদ্র কামান-গুলি কিছু অগ্রসর হইয়া শত্রুশিবিরে গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করিল, কিন্তু এত দূর হইতে সকল গোলা শিবিরে পৌঁছিল না, অর্দ্ধ পথে পঙ্কসলিলে পতিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃহৎ কামানগুলি আসিয়া উপস্থিত হইল; তখন দুই চারিটি গোলা শওকতের শিবিরে পড়িতে লাগিল। শওকৎ ত্রস্ত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামে এক জন বাঙ্গালী কায়স্থ শওকতের পিতার আমল হইতে পূর্ণিয়ার গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন; ইনি প্রথমে ব্যূহমুখে আপন সৈন্যদল ও কামান সংস্থাপিত করেন। (১৫) কিন্তু শওকৎ জঙ্গের ভয় দেখিয়া, তিনি এই সময়ে আপন কামানগুলির সহিত অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইয়া, শত্রুপক্ষের প্রতি গোলা চালাইতে লাগিলেন।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন স্বয়ং শেষ পর্য্যন্ত এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত

---

(১৪) অক্ষয় বাবুর "মীরজাফর খাঁকে সিরাজ আপন চক্ষে চক্ষে রাখিয়া সঙ্গে লইয়া যান", "যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের সৈন্যদলের সঙ্গে মীরজাফরের সৈন্যদল মিলিত হইল" ইত্যাদি নির্দেশ মুতাক্ষরীণের সহিত একমত হইতেছে না। মোহনলাল এ যুদ্ধে সকল সেনাপতির উপরে কর্ত্তা ছিলেন, দেখা যাইতেছে।

(১৫) "Shiam Sundar, a Bengali Cahet", "The comptroller of the artillery"—(Mutaqh I, 740—42)

ছিলেন। তিনি বলেন, এইরূপ কার্য্যে সাহস ও প্রভুর হিতসাধনে উৎসাহ দেখাইতে গিয়া শ্যামসুন্দরের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুরক্ষিত ব্যূহ হইতে বহির্গত হওয়ায় বিলের ব্যবধানরূপ সুবিধা অন্তর্হিত হইল। (১৬) সম্ভবতঃ বিপুল নবাবসৈন্যের সম্মুখে ব্যূহমধ্য হইতে অগ্রসর হইয়া শ্যামসুন্দর হঠকারিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার "সাবধানের বিনাশ নাই" দলের প্রবীণ লোক; তাঁহার সমালোচনা আবার পরবর্ত্তী কালে গৃহমধ্যে শান্তভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কার্য্যক্ষেত্রে কয় জন লোকে ওয়েলিংটনের মত নিবাত-নিষ্কম্প হইয়া থাকিতে পারে? শ্যামসুন্দরের সে সময়ের অবস্থাও বিবেচ্য। নবাবী বৃহৎ কামানগুলি যখন ভীমনাদে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, ... কং জঙ্গ তখন ভয়বিহ্বল হইয়া নিজের "মাহী" পতাকা নামাইয়া ফেলি... ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক লোক একত্র দেখিয়া শত্রুপক্ষ সেই দিকে কামান দাগিতেছে ভাবিয়া, নিজের অনুচরবর্গকে ধমক দিয়া স্থানান্তরে যাইতে আজ্ঞা দিতেছেন, (১৭) তখন কি গোলন্দাজ সেনাপতির পক্ষে বিরুদ্ধপক্ষের কামানগুলিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে? শওকতের তীব্র ভৎ-সনায় তাঁহার শিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইতে গিয়া যদি মহাপঙ্কে নিপতিত না হইত, তাহা হইলে যুদ্ধে বাঙ্গালী সৈন্যগণের কি অবস্থা হইত, তাহা কে বলিতে পারে? যাহা হউক, দেখা গেল, শ্যামসুন্দর বাঙ্গালী কায়স্থ হইলেও সামান্য "মসীজীবী নহেন; লেখনী ত্যাগ করিয়াই সেনাপতি হন নাই।" (১৮) সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানের নিকট অসি-মসীর দাম্পত্য-সম্বন্ধ বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে শ্যামসুন্দর মোহনলালেরই প্রতি-কৃতি। সুতরাং নবাবী আমলের হিন্দু সেনাপতিগণের মধ্যে ইঁহার আসন বড় নিম্নে নয়। অপদার্থ শওকৎ জঙ্গের নবাবের মর্য্যাদারক্ষায় জন্য ইনিও প্রাণ দিতে অগ্রসর ছিলেন; অতএব, কালে শওকতের সহিত ইঁহারও কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভাগ্যবিড়ম্বনায় বাঙ্গালী জাতি নিজের যে-যৎ-সামান্য গৌরবের নিধি আছে, তাহারও কোনও ইতিবৃত্ত রাখে নাই, নতুবা মোহনলাল ও শ্যামসুন্দরের ন্যায় কত কর্ত্তব্যপরায়ণ অমিততেজা বাঙ্গালী বীরের নাম করিয়া এই হতভাগ্য দেশ রসনা তৃপ্ত করিতে পারিত।

(১৬) Mutaqherin, vol I. 742.

(১৭) Mutaqh. vol I. p. 743.

(১৮) ষ্টুয়ার্ট কায়স্থের অনুবাদে 'Scribe' করিয়া গোল করিয়াছেন; বাঙ্গালী বলিয়া

অত... যুদ্ধে যাহা ঘটিল, অক্ষয়বাবু তাঁহার ... তাহার ... দিয়াছেন। ভয়চকিত শওকতের গঞ্জনায় ... প্রধান সেনাপতি কারগুজার খাঁর অধীন পূর্ণিয়ার শিক্ষিত অশ্বারোহী দল, শত্রুপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া বিলের মধ্যে পড়িয়া ... কামানের লক্ষ্যে পরিণত হইল। যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল, তাহাও বাঙ্গালী অশ্বারোহী সৈন্যের শাণিতকৃপাণমুখে উৎসৃষ্ট হইতে লাগিল। এই সময়েই মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি সেনানায়কগণ সদলে প্রচণ্ডবেগে বিপক্ষসেনার উপর নিপতিত হইয়া তাঁহাদের ধ্বংস সাধন করিলেন। শ্যামসুন্দর আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। গোলাম হোসেন প্রভৃতি সকলে পরামর্শ করিয়া যুদ্ধের ঘনীভূত অবস্থায় সুরাপানে অবশ শওকৎকে ধরাধরি করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহিত করাইবেন; বিপক্ষের এক গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটভেদ ও ভবযন্ত্রণার অবসান করিল।

এই যুদ্ধে আমরা আর দুই জন হিন্দু সেনাপতির উল্লেখ পাই। এক জনের নাম মিতনলাল। ইনি শওকতের শরীররক্ষী সৈন্যদলের অধিনায়ক। দ্বিতীয় লালু হাজারী। অন্যতম পদাতিক গোলন্দাজ সেনানী; শওকতের অসদ্ব্যবহারে বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বেই ইনি সিরাজদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন (১৯) ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টের ওডনেল্ সাহেব ইহাকে শওকতের অশ্বারোহী সেনাপতি বলিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছেন।

উল্লেখও করেন নাই। অক্ষয় বাবু এই অংশ লিখিবার সময় বোধ করি, মুতাক্ষরীণের সাহায্য পান নাই। শ্যামসুন্দর "বাঙ্গালী কায়স্থ" এ উল্লেখ পাইলে, বসুবরের মত স্বজাতিপ্রাণ ঐতিহাসিক কখনই তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞাত মত লিপিবদ্ধ করিতেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। যদ্যপি বাঙ্গালীর ... পড়িতে যদি নিতান্তই ঘৃণা না থাকে, তবে "সিরাজদ্দৌলা"র ন্যায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থের শীঘ্রই দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হইবে। সেই সময়ে মৈত্র মহাশয় আমাদের কথা স্মরণ রাখেন, এই অনুরোধ।

হণ্টার সাহেবের সহযোগী ওডনেল্ পূর্ণিয়ার ষ্ট্যাটিষ্টিকাল্ রিপোর্টে সিয়ার-উল-মুতাক্ষরীণের নবাবগঞ্জ যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ বলেন, সিরাজ মীরজাফরকে অপদস্থ করার পর জাফর এবং পূর্ণিয়ার মির্জা শওকৎ জঙ্গকে উত্তেজিত করেন,—"Hindu scribe Shiam sunder who was probably a kaystha"—"শওকতের অশ্বারোহী সেনা বিভাগ হাজারীলালের অধীনে ছিল"—ইত্যাদি। মুতাক্ষরীণের মোহমন্ত্র না লইয়া কত জনে কত কি বলিয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করে?

(১৯) Mutaqhherin vol I. 742.

যুদ্ধশেষে শান্তিস্থাপন ও সুব্যবস্থার জন্য মহারাজা [illegible] কিছুদিন পূর্ণিয়ায় অপেক্ষা করিলেন। সৈয়দ আহম্মদের সমস্ত স[illegible], [illegible]গণ ও সন্তানাদি মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল। এখানে শওকত[illegible] জননীর কোনও উল্লেখ নাই। পরিশেষে নিজ মনোনীত এক জন দক্ষ লোকের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিয়া মোহনলাল রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পুত্রকে পরে পূর্ণিয়ার নায়েব-নবাবী পদে নিযুক্ত দেখিতে পাই। সিরাজের অধঃপতনের পথ, পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী নায়েবেরা ইঁহাকে বন্দী করিয়া সিংহাসন কাড়িয়া লন। (২০) যাঁহার পুত্র একটা দেশের নবাবী করিবার উপযুক্ত, সেরূপ বয়সের এক জন বিজ্ঞ বীরপ্রকৃতির লোক বালক সিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্মাদের পার্শ্বচর হইতে পারেন কি না, পাঠক বিচার করিবেন।

যুদ্ধবিগ্রহে যে মোহনলাল নেতা, তিনিই আবার রাজকার্য্যপরিচালনের কর্ণধার। প্রবীণ সদস্যদল ভিতরে ভিতরে অসন্তুষ্ট; রাজবিপ্লবের ষড়যন্ত্রে গোপনে লিপ্ত। ইতিহাস বিশদ করিয়া না বলিলেও, মোহনলালের ন্যায় পরিণত মস্তিষ্কের সাহায্য না পাইলে,—সিরাজদ্দৌলার প্রতিভা হাল আইন মতে যতই বাড়াইয়া লওয়া যাউক—এ তরঙ্গে তাঁহার বুদ্ধির হালে পাণি পাইত না, ইহা বেশ বুঝা যায়। এ অবস্থায় সিরাজ ও ইংরাজের মধ্যে যে পত্রাদির আদান প্রদান চলিয়াছিল, (২১) তাহাতে ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ করি, সিরাজের কৃতিত্বের এমন ভক্ত অতি অল্প, যাঁহারা এগুলি তাঁহারই মস্তিষ্কপ্রসূত বলিয়া মানিয়া লইবেন। যৌবনোন্মত্ত সিরাজ বুদ্ধিমান ছিলেন, সন্দেহ নাই; মন্ত্রী মোহনলালের বিজ্ঞতায় বুদ্ধির সহিত ক্রমশঃ ধীরতার সংযোগ হইতেছিল। কিন্তু দেশ বিদেশের কুচক্রী দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফলকাম হওয়া, মোহনলাল কেন, স্বয়ং ম্যাকিয়াভেলীর পক্ষেও সহজ [illegible]ত না। এই জন্যই শেষ অবস্থায় প্রবীণ পক্ষেরই জয় হইল। সিরাজের [illegible] হইতে কখনও ইঁহাকে, কখনও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার বৃথা চেষ্টা [illegible]তে লাগিল। কার্য্যক্ষেত্রে যাহা দাঁড়াইল, সকলেই জানেন। এই কারণেই পলাশী ক্ষেত্রে মহারাজা মোহনলাল উপস্থিত থাকিয়াও নেতা ছিলেন না। রাজা দুর্লভ রায় বৃহৎ এক দল সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দোবস্ত করিবার জন্য

---

(২০) মুতাক্ষরীণ, ২[illegible] পৃষ্ঠা। পর পৃষ্ঠায় দুই স্থানে মোহনলালের পুত্র বলিতে "মোহনলাল" মাত্র ভ্রমক্রমে [illegible] আছে।

(২১) Ives' Voyage and Narrative; ইহাকে Jurnal বলা ঠিক নহে।

প্রেরি[illegible]। তাঁহার সুবন্দোবস্তে নবাবী সেনা নবাবের জন্য অস্ত্রধারণ না করি[illegible]ইয়া রহিল ; রাজার, মীরজাফরের ও ইয়ারলতিফের আজ্ঞায় স্থাপিত সৈন্যদল সমস্ত নবাবী সৈন্যের অষ্টাংশের প্রায় সপ্তাংশ। তাহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় রণপয়োধির লহরীগণনারূপ দুষ্কর কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। অবশিষ্ট সামান্য বিশ্বাসী সৈন্য, মোহনলাল ও মীরমদনের অধীনে দক্ষিণপার্শ্বে ভাগীরথীতীরে সমাবিষ্ট ছিল ; যুদ্ধক্ষেত্রের মোহনলাল বাঙ্গালী কবির কল্যাণে সাধারণের সুপরিচিত। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বিপক্ষ পক্ষের গোলার আঘাতে ভগ্নোরু মীরমদন স্বর্গগত হইলে, মোহনলাল যখন বিপুল বিক্রমে শত্রুদলকে অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছেন, তখনই (২২) মীরজাফর প্রভৃতির পরামর্শে ভয়-চকিত সিরাজের বারংবার অনুরোধে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই নবাবী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ; এইখানেই যুদ্ধকাণ্ডও সমাপ্ত হইল।

পলাশীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহারাজা মোহনলাল মুর্শিদাবাদে ধৃত হন। গোলাম হোসেন বলিতেছেন, যে মন্ত্রীকে সিরাজ এত উচ্চপদে উন্নীত করিয়াছিলেন, যাহার মস্তক গর্ব্বে গগনস্পর্শ করিয়াছিল, এবং অন্যের অসূয়ার ভারবহন করিয়া যে কার্য্যে তিনি যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিয়াছিলেন, রাজা দুর্লভরামের প্রীতিসাধন জন্য তাঁহাকে ধৃত করিয়া তাঁহার হস্তে সমর্পণ করা হয়। রাজা দুর্লভরাম তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন, এবং বস্তুঃ এই সম্পত্তির জন্যই তাঁহার জীবনলীলারও অবসান হয়। (২৩) মুস্তাফা টীকায় এ সম্বন্ধে গুজব দিতেও ভুলেন নাই। তিনি বলেন, কেহ কেহ বলে, মীরজাফর তাঁহার কতকগুলি অনুচর পাঠাইয়া গুপ্তভাবে মোহনলালের

ইহা পরে ভয়বিহ্বল সিরাজ ফিরিবার জন্য জেদ করেন ; মীরজাফর ফিরিবার সংবাদ পাঠান নাই। তিনি এ যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি ছিলেন, মনে করা বিষম ভ্রম। নবাব [illegible] উপস্থিত। প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে আপন আপন দল যুদ্ধে উপস্থিত ছিল।

(২২) By this time Mohanlal who had advanced with Mirmadan was closely engaged with the enemy ; his cannon was served with effect ; and his infantry having availed themselves of some covers and other grounds were pouring a quantity of bullets in the enemy's ranks. It was at this moment he received the order of falling back and of retreating. He answered th[illegible] not the ti[illegible]treat ; that the action was so far

প্রাণবধ করায়। কেহ বা বলে, ড্রেক্ জ্যাম বিষপ্রয়োগে [illegible] করিয়া-
ছিলেন। ড্রেক্ জ্যামকে ছাড়িয়া মীরজাফর বেচারীর স্কন্ধে [illegible] সমী-
চীন নহে। মোহনলালের পুত্র পূর্ণিয়ার কারাগার হইতে কখনও বাহির হইয়া-
ছিলেন কি না, ইতিহাসে তাহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। পলাশী যুদ্ধের
গ্রাম্য কবিতায় "কলিকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী" এই চরণে
তাঁহার এক কন্যার কথাও জানা যাইতেছে। যে সিরাজের অন্ন খাইয়া মোহনলাল
চিরদিন তাঁহার মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, যাঁহার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও
কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার শোচনীয় হত্যার সঙ্গে মোহনলালের পরিণামও
এইরূপে জড়িত। শত্রুদল এইরূপেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল।

মোহনলাল বাঙ্গালী কি না, যাঁহারা এই সন্দেহ উপস্থিত করেন, আমা-
দের মনে হয়,—তিনি যে বাঙ্গালী নন, তাহা প্রমাণিত করিবার ভার তাঁহা-
দেরই উপর। মুর্শিদাবাদের বাঙ্গালী নবাবের তদানীন্তন প্রধান হিন্দু সদস্যবর্গ
সকলকেই বাঙ্গালী দেখিতে পাই। কন্যা অনাথা হইয়া কলিকাতাতেই আশ্রয়
লন; দিল্লী যান নাই। মুসলমানী গ্রন্থে বলে, তিনি কায়স্থ ছিলেন। প্রবাদ
এই, মুর্শিদাবাদেই তাঁহার বাটী। যদি বলা যায়, তিনি মুর্শিদাবাদবাসী লালা
কায়স্থ, তাহা হইলেও তাঁহার বাঙ্গালী হইবার কোনও বাধা দেখি না।
মুর্শিদাবাদের লালা কায়স্থ বাঙ্গালী-পদবাচ্য না হইলে, ভট্টাচার্য্যগণের "ষষ্ঠিতম
মিশ্রগণ" বলিয়া আমাকেও "কাহুজে" বলিয়া লোকের ভ্রম হওয়া সম্ভব।
মোহনলালের খানদান বা বংশাবলীর বিবরণ দিতে পারা যায় না। এই
গুরুতর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে পারা যায়, অন্যান্য বাঙ্গালী কর্মচারী, যশোবন্ত
রায়, বীরদত্ত, রাজারাম সিংহ প্রভৃতি আরও কত জনের খবর কে দিতে
পারেন? বর্ত্তমান প্রস্তাবের শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সন্ধান কেহ বলিতে
পারেন কি? বিপ্লবের পর মোহনলালের প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা
একবার চিন্তা করুন। হতভাগ্য সিরাজের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইয়া বিপ্লবকারী
দলের সহযোগী হইলে, আজ কলিকাতায় তাঁহার নামে একাধিক অর্দ্ধ-

advanced, that whatever might happen would happen now; and that should he turn his head to march back to camp his people would disperse and perhaps abandon themselves to an open flight.—Mutaq[illegible] I. 768.

(২০) Mutaqherin, vol I, [illegible] and he [illegible] [illegible] ঠিক নহে।

ক্রোশব্যাপী প্রাসাদ ও গবর্মেন্টের প্রসাদভোগী তাঁহার বংশাবলীগণকে দেখিয়া অনেকের নয়ন মন তৃপ্ত হইত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় মোহনলালের ভাগ্য-বিধান অন্যরূপ। (২৪)

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাষ্টার মহাশয়।

১

লোকে তাঁহাকে "পাগ্‌লা মাষ্টার" বলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের "বি. এ." উপাধি লাভ করিয়াও অন্য কোনও ভাল চাকরীর, এমন কি, সকল ছাত্রের শেষগতি ওকালতীর চেষ্টাও না করিয়া, কেন যে তিনি মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে সুদূর পল্লীগ্রামে একটা মধ্য-ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, সে রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিত না। সেই জন্য নানা জনে সে সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত করিত। কেহ বলিত, পরিবারের কোনও কুৎসার জন্য তিনি লোকসমাগমবহুল সহরে যাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন; কেন না, সহরে এক জন না এক জন দেশের লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক। কেহ বলিত, প্রথম যৌবনে ভালবাসিয়া হতাশ হইয়া তিনি জনতা হইতে দূরে হৃদয়ক্ষত সারিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। আবার কেহ বলিত, লোকটার মাথা খারাপ, নহিলে কেহ এমন কাজ করে না।

গ্রামে একটা বড় বাজার ছিল। বাজারের পার্শ্বে, বাজারের ঘাট হইতে অনতিদূরে গোটাকতক ঝাউ ও দেবদারু-তরুবেষ্টিত একখানা বড় আটচালা ঘরে স্কুল বসিত। আর সেই আটচালার পশ্চাতে নদীর অনতিউচ্চ পাহাড়ের উপর একখানা ক্ষুদ্র ঘরে হেডমাষ্টার বাস করিতেন। তাঁহার ঘর হইতে সমস্ত দিন বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার উচ্চ কথোপকথন ও কারখানার শ্রমজীবী-দিগের কোলাহল দূরোচ্চারিত কলরবের মত অস্পষ্ট শ্রুত হইত। ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইলে দেখা যাইত, বাজারের ঘাটে বৃহৎ বৃহৎ নৌকা হইতে দ্রব্য

(২৪) এই প্রবন্ধ লিখিতে গিয়া ইতিহাসের অনুরোধে দুই তিন জন হিতকারী মুসলমানকে [illegible] সম্বন্ধে বলিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া অস্থির চিত্তে বিদায়

[illegible]

কয়লা প্রভৃতি পণ্য আমদানী হইতেছে, বা চিটা, চিনি, তিসি প্রভৃতি মাল নৌকায় বোঝাই হইতেছে; সেই ঘাটের এক পার্শ্বে পরিপুষ্ট-উদর দোকানদারদিগের মধ্যে কেহ বা স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নানান্তে মার্জ্জনচিক্কণ পিত্তল-পাত্রে জল লইয়া যাইতেছে।

মাষ্টার মহাশয়ের মাসিক বেতনের পঁচিশ টাকার মধ্যে দশ টাকাতেই তাঁহার আপনার সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। যত দিন মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন মাষ্টার মহাশয় প্রতি মাসে তাঁহাকে দশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিতেন; অবশিষ্ট পাঁচ টাকা দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য ব্যয়িত হইত। মাতার মৃত্যুর পর হইতে সে পনের টাকার সবটাই ছাত্রদিগের কল্যাণে ব্যয়িত হয়। দরিদ্র ছাত্রদিগের পাঠ্যপুস্তকক্রয়, চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহ, কচিৎ কোনও অতি-দরিদ্র ছাত্রের জন্য বর্ষাকালে ছত্র-ক্রয় প্রভৃতিতে সে পনের টাকা শেষ হইয়া যাইত। যেবার হাতের টাকা ফুরাইয়া গেলে কোনও ছাত্রের কোনও প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করা হইয়া উঠিত না, সেই বারই মাষ্টার মহাশয় সত্য সত্য অর্থের অভাব অনুভব করিতেন, নহিলে নহে।

স্কুলের সময় ভিন্ন—প্রভাতে, অপরাহ্ণে বা সায়াহ্নেও মাষ্টার মহাশয়ের বিশ্রাম ছিল না। ছাত্রগণ সকল সময়েই মাষ্টার মহাশয়ের নিকট পাঠ বুঝাইয়া লইতে আসিত। দোকানীরা কেহ বা পত্র লিখাইতে, কেহ বা শিরোনামা লিখাইতে, কেহ বা মকদ্দমার কাগজপত্রের অর্থ করাইয়া লইতে, কেহ বা "সমন্স"এর তারিখ জানিতে, কেহ বা ঘাটের ইজারদার অথবা পোষ্টমাষ্টারের নামে দরখাস্ত লিখিয়া লইতে আসিত। মাষ্টার মহাশয়ের কিছুতেই বিরক্তি ছিল না। তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে দেখে নাই। কেহ কখনও তাঁহার মুখে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিতে পারে নাই। এতভেও মাষ্টার মহাশয়ের কার্য্য শেষ হইত না। কোনও ছাত্রের শরীর অসুস্থ হইলে তাহার গৃহে যাইয়া চিকিৎসার সকল বিষয়ের খোঁজ লওয়া ও আবশ্যক হইলে তাহার ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করা, এমন কি, রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণ পর্য্যন্ত, মাষ্টার মহাশয়ের স্বেচ্ছাকৃত কার্য্যের মধ্যে ছিল। মাষ্টার মহাশয় যেন সকলেরই আপনার লোক ছিলেন। ছাত্রগণ মাষ্টার মহাশয়কে যেমন ভালবাসিত, ছাত্রদিগের অভিভাবকগণও মাষ্টার মহাশয়কে তেমনই ভালবাসিতেন। যে পরকে সত্য সত্যই 'আপনার জন' ভাবে, লোকে সহজেই তাহাকে আপনার ভাবিতে আরম্ভ করে।

মাষ্টার মহাশয়ের অনেকগুলি পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশই জীর্ণ। একটু অবসর পাইলেই, মাষ্টার মহাশয় পুস্তক পাঠে মনোনিবেশ করিতেন; কিন্তু সে অবসরলাভের সৌভাগ্য তাঁহার প্রায়ই হইত না।

২

মাষ্টার মহাশয়ের বড় দুঃখ ছিল যে, তাঁহার ছাত্রগণ প্রায়ই অধিক দিন পাঠ করিতে চাহিত না। তিনি জিদ করিয়া কোন কোন ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে পাঠাইতেন বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর এ পর্য্যন্ত কেহই সহরে গিয়া পাঠ করিতে সম্মত হয় নাই। সাধারণতঃ ব্যবসায়ীদিগের পুত্রগণ দোকানের হিসাব লিখিতে শিখিলেই পাঠ্যপুস্তক ছাড়িয়া দোকানের খাতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িত। এক একটি বুদ্ধিমান ছাত্র স্কুল ত্যাগ করিলে মাষ্টার মহাশয় যেন কোনও ইষ্টবিয়োগজনিত দুঃখ ভোগ করিতেন। সেই জন্য যখন মাধব কর্ম্মকার কেহ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিলে পুত্র বিনোদকে যত দিন ইচ্ছা পড়িতে দিতে স্বীকৃত হইল, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

বিনোদকে সমস্ত দিন পড়াইয়াও মাষ্টার মহাশয়ের তৃপ্তি হইত না। তিনি সন্ধ্যাকাল হইতে আবার তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিতেন; তাহার পর কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, কি বর্ষায়, প্রতিদিন স্বয়ং লণ্ঠন লইয়া মাষ্টার মহাশয় বিনোদকে গৃহে রাখিয়া সুপ্তগ্রামের বিজন পথে গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। মাধবের গৃহের অনতিদূরে গ্রামের চৈত্যক্রমে অসংখ্য খদ্যোত ক্ষণবিলসিত ক্ষণবিলয়িত জ্যোতিঃ বিস্তার করিত, ঝিল্লীধ্বনিমুখরিত প্রান্তরে জম্বুকের চীৎকার শ্রুত হইত, পথোপরি শয়ান কুক্কুর স্তব্ধরাত্রে পথে পদশব্দ শুনিয়া দুই এক বার ডাকিয়া উঠিত; বিনোদের অদূরবর্ত্তিনী সিদ্ধির কথা ভাবিতে ভাবিতে মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইয়া উঠিত। দেখিয়া লোকে বলিত, "মাষ্টারের কাজ দেখিয়া মনে হয়, যেন মাধব কর্ম্মকারের ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যত উপকার মাষ্টারেরই হইবে!"

নিয়মিত সময়ে বিনোদ পরীক্ষা দিয়া আসিল। যতদিন পরীক্ষার ফল বাহির না হইল, ততদিন অসাধারণ উদ্বেগে মাষ্টার মহাশয়ের দিন কাটিতে লাগিল। তাহার পর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইল। সে বিভাগের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে বিনোদ সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। সংবাদ লইয়া মাষ্টার মহাশয় স্বয়ং মাধবের গৃহে উপস্থিত হইলেন। মাষ্টার মহাশয়কে উপস্থিত

দেখিয়া মাধব তাড়াতাড়ি মলিন বস্ত্রে একখানা চৌকী ঝাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিল। মাষ্টার মহাশয় বসিয়া মাধবকে পরীক্ষার ফলের কথা বলিলেন।

অন্যান্য কথার পর মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "মাধব, বিনোদের এখানে পড়া শেষ হইল। এখন উহাকে সহরে পড়িতে পাঠাইতে হইবে।"

মাধব বলিল, "বিনোদের লেখাপড়া যাহা কিছু হইয়াছে, সবই আপনার কৃপায়। আপনার কথার উপর কোনও কথা বলা আমার উচিত হয় না, কিন্তু মাষ্টার মহাশয়, গরিবের ছেলের আর বেশী লেখা পড়ায় কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "দেখ, লেখা পড়া শিখিয়া তোমার ছেলে যদি একটা বড়লোক হয়,—ধর, জেলার হাকিম হয়, তবে কি তোমার আনন্দ হইবে না? সে কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, আমি কাল সকালে আবার আসিব।"

মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

৩

লেখা পড়া শিখিলে ছেলে জেলার হাকিম পর্য্যন্ত হইতে পারে শুনিয়া মাধবের স্ত্রীর নিতান্ত জিদ হইল, যেমন করিয়াই হউক, ছেলেকে সহরে পাঠাইতে হইবে। স্ত্রীর ও পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মাধবও সেই মতে মত দিল।

পর দিন প্রত্যূষে মাষ্টার মহাশয় মাধবের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

মাধব বলিল, "আপনি যদি বিনোদকে সহরে পাঠাইতে চাহেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। বিশেষ বিনোদের নিজের বড় ইচ্ছা, সে সহরে পড়িতে যায়। আমি বিনোদের রোজগারের প্রত্যাশা করি না। আপনাদের আশীর্ব্বাদে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের জন্য আমি ছেলের রোজগারের আশা করি না। তবে ও যদি একটা বড়লোক হয়, তাহার অধিক সুখ আমার আর নাই। কিন্তু সহরে খরচ অনেক; খরচের কি হইবে?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "সে ভার আমার। সে জন্য তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

* * * * *

মাষ্টার মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সহরে যাইয়া পুস্তকাদি কিনিতে ও সব গুছাইয়া লইতে প্রথমেই বিনোদের কিছু অধিক অর্থ আবশ্যক হইবে। তাহার জোগাড় করিয়া তবে তাহাকে সহরে পাঠাইতে হইবে।

মাধবের বাড়ী হইতে মাষ্টার মহাশয় গ্রামের জমীদারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। জমীদার বাবু তখন একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া ধূমপান করিতে-ছিলেন। মোসাহেব নামক পরাঙ্গপুষ্ট জীবদল তখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই।

নমস্কার, প্রতিনমস্কার এবং কুশলাদিজিজ্ঞাসার পর, ক্রমে স্কুলের কথা আসিয়া পড়িল। স্কুলের নানা কথার পর মাষ্টার মহাশয় আসল কথা পাড়িলেন। পরীক্ষায় বিনোদের সাফল্যের কথা বলিয়া তিনি তাহাকে আরও পড়িবার জন্য সহরে পাঠাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। জমীদারের মুখে বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভাব লক্ষিত হইল। তাহার পর মাষ্টার মহাশয় বিনোদের জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। জমীদার বলিলেন যে, কোনরূপ সাহায্য দান করা তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। মাষ্টার মহাশয় বিনোদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিলেন। তখন জমীদার স্পষ্টই বলিলেন, "বাপু! ও সব পাগলামী তোমারই সাজে। আমি দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতে পারিব না। সাহায্য দিয়া গরিবের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাই, আর সে বিদ্যা আমার উপর চালাকী করুক। তোমার চালচুলা নাই, তুমি ও সব করিতে পারিব না।"

এই অন্যায় ও অপমানজনক কথায় মাষ্টার মহাশয়ের আত্মসংযম ব্যথিত হইল। স্নিগ্ধমেঘমধ্যে বিদ্যুদ্বিকাশের মত নিরীহ মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে ক্রোধ জ্বলিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন, "প্রজাপীড়ন করিয়া দরিদ্র প্রজার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনি এই সম্পত্তি করিয়াছেন। আজ এক জন দরিদ্র প্রজার পুত্রের শিক্ষার জন্য সামান্য কিছু ব্যয় করিতে পারেন না। আপনি বুঝেন না যে, দেশের শিক্ষিতগণ দেশের মূল্যবান সম্পত্তি; আপনি সাহায্য করুন আর নাই করুন, আমি বিনোদকে সহরে পাঠাইব।"

ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে জমীদারের দিকে চাহিয়া মাষ্টার মহাশয় দ্রুতপদে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। স্কুলের সামান্য মাষ্টারের ধৃষ্টতা দেখিয়া জমীদার ক্রোধে ও বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে ফুরসীর নল খসিয়া পড়িল।

সেই দিন হইতে গ্রামের স্কুলে জমীদারের বার্ষিক দশ টাকা সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল।

৪

এ দিকে গৃহে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয় মৃতজননীর শেষ অলঙ্কারখানি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন। সেই অলঙ্কারখানিই তাঁহার জননীর শেষ স্মৃতিচিহ্ন, সেখানি বিক্রয় করিতে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল।

তাহার পর আপনার পুস্তকগুলির মধ্যে যে কয়খানি বিনোদের আবশ্যক হইতে পারে, সে কয়খানি লইয়া মাষ্টার মহাশয় ঝাড়িয়া আলাহিদা করিয়া রাখিলেন। বিনোদের মাসিক খরচও তিনি নিজ বেতন হইতে দেওয়া স্থির করিলেন।

মাষ্টার মহাশয় একে একে বিনোদের আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলেন। কয় দিন ধরিয়া সে সকল গোছান হইল। এটা লওয়া আবশ্যক, ওটা লইবার আবশ্যক নাই, এইরূপ নানা তর্ক বিতর্কের পর জিনিষপত্র বাঁধা হইল। ... দিন দেখিয়া জনকজননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া বিনোদ বিদ্যাশিক্ষার্থ গ্রাম ... যাত্রা করিল। মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লইয়া সহরে গমন করিলেন। বিনোদকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া, তাহার বাসস্থান স্থির করিয়া, তাহাকে নানা বিষয়ে আবশ্যক উপদেশ দিয়া, পুত্রের শুভার্থ তাহাকে বিদেশে রাখিয়া ব্যথিতহৃদয় জনকের মত মাষ্টার মহাশয় আবার আপনার পূর্ব্বকার্য্যে ফিরিয়া আসিলেন।

কয় বৎসর বিনোদের শিক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, এখন মাষ্টার মহাশয়ের ... যেন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইত। মাষ্টার মহাশয়েরও অজ্ঞাতে তাঁহার ... সেই শান্ত, বুদ্ধিমান, অধ্যয়নানুরাগী ছাত্রের প্রতি স্নেহবন্ধন উৎপন্ন হইয়া ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। স্নেহ মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। বিশেষ যৌবনের তপ্ত রক্ত যতই শীতল হইয়া আইসে, হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহরাশি ততই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে চাহে। সেই সময় মানব স্নেহের পাত্রের অভাব প্রথম অনুভব করিতে আরম্ভ করে সেই সময় মানব সন্তানের অভাব প্রথম অনুভব করে। বন্ধ্যা নারীর সন্তানলাভাকাঙ্ক্ষা বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল হইয়া উঠে। সেই বয়সে উপযুক্ত পাত্র পাইলে স্বভাবতঃ ... স্নেহ তাহাকেই চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরে, আর সহজে ... ত্যাগ করিতে চাহে না। তাই স্নেহের পাত্র স্নেহের অনুপযুক্ত হইলে ... দূর হয় না।

মাষ্টার মহাশয়ের স্নেহ সেই অত্যন্তপ্রিয় ছাত্রটিকেই বেষ্টন করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাই দুই, চারি দিন বিনোদের সংবাদ না পাইলে মাষ্টার মহাশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন।

৫

বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল। ছুটির সময় বিনোদ যখন বাড়ী আসিত, তখন মাষ্টার মহাশয়ের আর একটুও অবসর থাকিত না। তিনি পরীক্ষার সময় তাহাকে যেমন করিয়া পড়াইতেন, এখনও সে গৃহে আসিলে তাহাকে তেমনই করিয়া না পড়াইলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না।

এমনই করিয়া তিন বৎসর কাটিয়া গেল। পরীক্ষা দিয়া পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে আর সে [illegible] নাই, প্রতিভাদীপ্ত নয়নে এখন ক্লান্তিভাব লক্ষিত হয়। তাহার আকৃতির দেহে মস্তক অসম্ভব বড় বলিয়া বোধ হইতেছে দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় ব্যথিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, অত্যধিক পরিশ্রম করিয়া, দুই বেলা কোনরূপে পেটভরা আহার করিয়া অতিরিক্ত পড়িয়া বিনোদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে; বায়ুসঞ্চালনহীন স্যাঁৎসেঁতে জীর্ণ গৃহের পরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিতে পাইলে, উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার পাইলে, বোধ হয়, এ পরিশ্রম তাহার সহ্য হইত। মাষ্টার মহাশয় অর্থের অভাব এখন যেমন অনুভব করিলেন, পূর্ব্বে আর কখনও তেমন করেন নাই।

পরীক্ষার বিষম শ্রম হইতে বিশ্রাম লইয়া পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যপ্রদ [illegible] বায়ুর প্রভাবে ও জননীর শুশ্রূষাগুণে বিনোদের মৃতপ্রায় দেহ [illegible] সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বিনোদ আবার একটু সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার জননী বা মাষ্টার মহাশয় কেহই বুঝিতে পারেন নাই, বিনোদের স্বাস্থ্য একেবারে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল; সামান্য কারণেই শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে। বিনোদ আপনিও তাহা বুঝিতে পারে নাই।

পরীক্ষার ফল বাহির হইবার সময় বিনোদ কলিকাতায় চলিয়া গেল। মাষ্টার মহাশয় উদ্বিগ্নহৃদয়ে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিতে লাগিলেন।

ইহার পর এক দিন বিনোদের পত্র আসিল, বিনোদ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে।

বিনোদ মাষ্টার মহাশয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছে ও তাঁহার পিতামাতাকে এই সংবাদ জানাইতে অনুরোধ করিয়াছে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আনন্দে মাষ্টার মহাশয়ের চক্ষে জল আসিল। মাষ্টার মহাশয় এক বার, দুই বার, তিন বার পত্রখানি পাঠ করিলেন। তাহার পর তিনি সেখানি হাতে করিয়া, আনন্দোৎফুল্লচিত্তে মাধবকে এই সুসংবাদ প্রদান করিতে গমন করিলেন।

মাধব তখন বাটীর মধ্যে একটা লাউগাছ মাচায় তুলিয়া দিতে ব্যস্ত। মাষ্টার মহাশয় বাহিরের ঘরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া গামোছা স্কন্ধে মাধব তখনই বাহিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। মাষ্টার মহাশয় মাধবকে সুসংবাদ প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসে তাঁহার মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না।

তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া পুত্রের কোনও অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "বিনোদ ভাল আছে ত?"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "বিনোদ ভাল আছে। সে পরীক্ষাতে সকলের উপর হইয়াছে। আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে।"

শুনিয়া কিছুক্ষণ মাধব কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে সে বলিল, "বিনোদের যাহা কিছু লেখা পড়া হইয়াছে, সে আপনারই কৃপায়। তাহাকে সহরে পাঠাইতেও আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না; তাহার মাতা ও আপনিই জিদ করিয়া তাহাকে সহরে পাঠাইয়াছিলেন।"

আনন্দে মাধবের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি আজ আসি। তুমি যাইয়া বিনোদের মাতাকে এ সংবাদ দাও।"

সুদূর পল্লীগ্রাম হইতে গিয়া তাঁহার ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইবে ভাবিয়া, মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয় আনন্দাপ্লুত হইয়া উঠিতে লাগিল।

৬

কলেজ খুলিলে বিনোদ আবার নূতন উদ্যমে পাঠে মনোযোগ দিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদিগের জন্য যে মুখস্থ বিদ্যার বোঝা ব্যবস্থা করেন, সে বোঝা তাহার দুর্ব্বল শরীরের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত হইল। দ্বিতীয় মাসের শেষেই তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তৃতীয় মাসের শেষে বিনোদ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এক জন প্রাচীন চিকিৎসক দেখিয়া বলিলেন, "তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। বিশ্রাম ও স্থানপরিবর্ত্তনই এখন ঔষধ।" সঙ্গে সঙ্গে

চিকিৎসক বলিলেন, "এত গুরু শ্রমে যে শতকরা নিরনব্বই জন ছাত্রের এই দশা হয় না, ইহাই আশ্চর্য্য।"

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুগ্নদেহে বিনোদ গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া স্থান ও জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে প্রথম দুই এক দিন বিনোদ একটু সুস্থ বোধ করিল। কিন্তু সে কেবল প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে শেষ বার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিনোদের পাণ্ডুর আননে আর রক্ত দেখা দিল না, ম্লানজ্যোতি নয়নে আর উজ্জ্বলতা ফিরিল না।

এবার জননীর অবিশ্রান্ত শুশ্রূষাতেও কোনও উপকার দর্শিল না। বিনোদের জীবনস্রোত ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। সে ক্রমেই অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। গ্রামের বৃদ্ধ কবিরাজ আসিয়া দুই দিন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রোগীর নাড়ীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া হতাশ হইলেন। তিনি বলিয়া গেলেন, "রোগীর অবস্থা তত ভাল নহে; সারিবার হয়, আপনি সারিবে; অধিক ঔষধ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই।" কবিরাজ মহাশয়ের কথাতেই মাধব বুঝিল যে, বিনোদের জীবনের আশা অতি অল্প।

মাষ্টার মহাশয়ের চিন্তার আর অবধি রহিল না। উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বেই অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন।

স্কুলে ছেলেরা লক্ষ্য করিত, মাষ্টার মহাশয়ের মুখ শুষ্ক, তিনি অত্যন্ত অন্যমনস্ক, আর যেন কোনও কার্য্যেই তাঁহার মন নাই।

এমনই ভাবে সপ্তাহাধিক কাল কাটিয়া গেল। তাহার পর বিনোদের জ্বর আরও প্রবল হইয়া উঠিল; দুই এক বার রক্তবমনও হইতে লাগিল।

জ্বরের ঘোরে বিনোদ অজ্ঞান হইয়া রহিল। অজ্ঞান অবস্থায় সে কেবল পাঠের কথা ও পরীক্ষার কথা বলিতে লাগিল। তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মাষ্টার মহাশয় আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিন্দু বিন্দু অশ্রু রোগীর গাত্রে পড়িতে লাগিল।

পর দিন প্রভাতে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল; সব ফুরাইল।

৭

পল্লীগ্রামে নিতান্ত লোকাভাব না হইলে নিকট আত্মীয় স্বজাতি [illegible] কাহাকেও মৃতদেহ-বহন করিতে দিবার প্রথা নাই। কিন্তু মাষ্টা[illegible] যখন বিনোদের মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন, ত[illegible] আর তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল না।

...এই শ্মশান। মৃতদেহ লইয়া শববাহিগণ শ্মশানে উপনীত হইলে মাষ্টার মহাশয় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। শ্মশানতরুর কাণ্ডে মস্তক রাখিয়া তিনি বহুক্ষণ স্ত্রীলোকের মত রোদন করিলেন। তাঁহার হৃদয়ের যাতনা কি ভাষায় বর্ণনা করা যায়?

প্রদোষে দেহসৎকারান্তে স্নান করিয়া মাষ্টার মহাশয় যখন শ্রান্তদেহে ব্যথিতহৃদয়ে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার সহিত জমীদারের এক মোসাহেবের সাক্ষাৎ হইল; সে তখন বাবুর বাড়ী যাইতেছিল। মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সে একটু হাসিয়া বলিল, "কি হে মাষ্টার! মাধবের ছেলে-টাকে মারিলে? জান ত—অনভ্যাসের চন্দনের ফোঁটায় কপাল চড়্‌চড়্‌ করে, গরিবের ছেলের অত সহিবে কেন?"

মাষ্টার মহাশয়ের হৃদয়ে একটা কি ছিল, যাহা অন্যায় সহিতে পারিত না; অন্যায় দেখিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠিত। মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "যাহা হই-বার হইয়াছে, সে জন্য আমি কাহাকেও দোষী করিতে চাহি না। কিন্তু যদি কাহারও কোন দোষ থাকে, তবে সে তোমার মনিবের। আমি তাঁহার কাছে সাহায্য চাহিয়াছিলাম। তাঁহার সাহায্য পাইলে, ভাল খাইতে পাইলে, ভাল স্থানে থাকিতে পারিলে, হয় ত বিনোদ মরিত না।"

ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া মাষ্টার মহাশয় চলিয়া গেলেন।

মোসাহেবটিও এই কথা কেমন করিয়া বাড়াইয়া মনিবকে বলিবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে জমীদারের বাড়ীর দিকে গেল।

৮

শ্রান্তদেহে, ব্যথিতহৃদয়ে, মাষ্টার মহাশয় আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। গৃহের চতুর্দ্দিকের দ্রব্যাদির সহিত তাঁহার মৃত ছাত্রের স্মৃতি বিজড়িত। সেই সকল দ্রব্যাদি দেখিয়া মাষ্টার মহাশয়ের শোকাবেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। মাষ্টার মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও শোক সংবরণ করিতে পারিলেন না। আপনার প্রিয়তম সন্তানের মত প্রিয় ছাত্রের মৃত্যুশোক কি [illegible] যায়? আপনার সন্তান থাকিলেও বুঝি মাষ্টার মহাশয় তাহাকে এত [illegible]তে পারিতেন না।

[illegible] রাত্রি হইল, বাজারের কোলাহল থামিয়া গেল। চারি দিকে গভীর [illegible], কেবল জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল অম্বরতলে নদী কলকল করিয়া [illegible]িতে লাগিল। দাওয়া হইতে রুদ্ধকণ্ঠে কে ডাকিল, "মাষ্টার!"

দ্বার মুক্ত করিয়া দাওয়ায় আসিয়া মাষ্টার দেখিলেন, জমীদারের দুই জন পাইক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে ডাকিতেছিলে ?"

চড়া গলায় এক জন উত্তর দিল, "হাঁ, তোমাকে জমীদারের বাড়ীতে যাইতে হইবে।"

মাষ্টার মহাশয় বুঝিলেন, মোসাহেবের মুখে সেই কথা শুনিয়া জমীদার তাঁহাকে ধরিতে পাঠাইয়াছেন; জমীদারের গৃহে যাইলে তাঁহাকে অপমানিত হইতে হইবে। তিনি বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে যাইতে হইবে।"

স্থির স্বরে মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমি যাইব না।"

পাইক উত্তর করিল, "তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম আছে।"

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমার দেহ স্পর্শ করিও না। সাবধান!"

এক জন পাইক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল।

মাষ্টার মহাশয় বলিলেন, "আমাকে ধরিলে ভাল হইবে না।"

"কি হইবে ?" বলিয়া এক জন পাইক অগ্রসর হইয়া মাষ্টার মহাশয়ের গণ্ডে চপেটাঘাত করিল।

উপর্য্যুপরি কয়দিন রোগীর শয্যাপার্শ্বে রাত্রিজাগরণে ও মনঃকষ্টে মাষ্টার মহাশয়ের শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পাইকের চপেটাঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মাষ্টার মহাশয়ের অচেতন দেহ দ্বারের দাওয়া হইতে নদীর নিম্ন পাহাড়ের উপর গড়াইয়া চলিল। সঙ্গে সঙ্গে পাইক দুই জন ঝাঁপাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা ধরিতে পারিবার পূর্ব্বেই সেই জনকোলাহলহীন নিশীথে, সেই চন্দ্রালোকপুলকিত, বীচিভঙ্গচঞ্চল নদীগর্ভে সে দেহ কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

*   *   *   *   *

পর দিন নিয়মিত সময়ে ছাত্রগণ শ্লেট, পেন্সিল ও পুস্তকাদি লইয়া স্কুলে আসিয়া শুনিল, মাষ্টার মহাশয় কোথায় গিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না।

সমাপ্ত।

ভানুমতী।

১—কমলে কামিনী।

শরৎ কাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুল কিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ শস্য-ক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকাননশোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতা মুহুরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির কল্পনা-তীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে কুতুবদিয়া, মহেশখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল মরকতখণ্ডের মত ভাসিতে-ছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেষখালীদ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তূপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা সুবর্ণ দ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীর-সংলগ্ন বজরার ছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণহৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন—

> সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু; সুনীল সলিলরাশি,
> রবির সুবর্ণ করে বিকাশি সুনীল হাসি,
> নাচিতেছে, গাহিতেছে, দিয়া সুখে করতালি
> তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেন পুষ্পমালা ঢালি।
> অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
> কি যেন অনন্ত স্তুতি করিতেছে কাথকিত্ত।
> অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
> সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
> সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
> মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর!

খেলিছে তরঙ্গমালা শিরে ফেনপুষ্পরাশি,
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয় সিন্ধু—তরঙ্গ অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে ভক্তিপ্রপূরিত হৃদয়ে এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎপ্রভাতে এই সমুদ্রশোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গভঙ্গে যে ফেনরাশি উদগীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমল-কানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল; তিনি তখন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সিন্ধু[illegible] মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধু-নিনাদ প্লাবিত করিয়া স্থানীয় [illegible] ৺শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন,—

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উগার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম! এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট—স্পষ্টতরা হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতেছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতেছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন—

কিশোরী বালিকা সোনার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,
হেলিছে দুলিছে উঠিছে পড়িছে
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি!
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরীআগা উঠিল আকাশে
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি,
চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী "পাছা" উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,
পড়িল সরিয়া কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপুটি ধরি।
আরক্ত বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত

উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র অনিলে
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাত লীলাময়ী অলকাস্‌.
শারদ রবির প্রভাত-কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
ফেনরাশিতে হয় নিমজ্জিত
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু শূন্যে তুলি দেখে তার মুখ,
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে বারবার;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী"।

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথ নাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশি বাজিতেছে; কণ্ঠ এত উচ্চ, এমন মধুর, এমন প্রাণস্পর্শী! সকলই সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরী-মূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে, এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে। সাগরা-নিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্ম ফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চার করিয়া-ছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না, কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,

(তা কি তুমি জান না হে?)

আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়-বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় ...তে হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল; ...ন ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপদসঞ্চারিণী এবং মশানে ...কারিণী "কমলে কামিনী"।

২—মুক্তকেশী।

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গা-প্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু'জন দাঁড় টানিতে-ছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামী স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস? অন্ধ কি সাধে! বাতাস যে উত্তর দিক হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না? আর কোথাকার জমিদার যে তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব। লাগা নৌকা দক্ষিণ দিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণ দিকে লাগাইতে-ছিল এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকার উত্তর দিকে লাগাইতে বলিল।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটারে। উঁদের হুকুম মত নৌকা লাগাতে হবে।

"কি, থাক মাগি" বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতে- ছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাকে ইহারা [illegible] দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া [illegible] অন্ধ আর কাহাকে বলে।"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণ দিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ [illegible] ছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি, না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম? [illegible] বলিয়াছিলাম না উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা[illegible]তে [illegible]গিল, এবং বলিতে লাগিল, "এখনও ধর্ম্ম আছে, এখনও চন্দ্র[illegible]। আমি ভাল মানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য [illegible]িল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তির[illegible] ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার [illegible]র সকলের জিহ্বায় অমৃত।"

পালাপোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিক[illegible]ক প্রচণ্ড প্রহার করিল, "লক্ষ্মীছাড়ি! আমার খাস, আমার কথা শুনি[illegible]। আমি বলিলাম, নৌকা উত্তর দিকে লাগা, তুই দক্ষিণ দিকে লাগাইলি কে[illegible]" বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে ক[illegible]তে—যেন [illegible] তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে,—'ছহির' মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। [illegible] মাঝি মাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল। "উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা? গোপাল এখনই খিদের কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেলা করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি; দিন রাত্রি অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না। আমার সোনার শরীর মাটি হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায়' বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার [illegible] করিয়া বলিতেছিলেন, "খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই।—মেয়েটি [illegible] বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়।" [illegible] পরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না। মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল।

[illegible] দাম্পত্য-প্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজরা হইতে [illegible] জন ভৃত্য [illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "হাঁ। হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল, "দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদিনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল, "বাবুর যা[illegible] খুসি [illegible] তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন [illegible] গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "তুই আবার আমার সঙ্গে লাগতে [illegible] তাঁবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, [illegible] ত খেলব।"

অনাথনা[illegible] হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার [illegible] নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট [illegible] লে টাকা [illegible] আরও কোন দিবেন না? তখন সে মধুর [illegible] আমরা আ[illegible] বালয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজ সজ্জা করিতে লা[illegible]

[illegible] মিনিট [illegible] রে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত [illegible] বালিকা দুই রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরা-বাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও

বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যা[illegible] দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দে[illegible] ময়; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। [illegible] একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের [illegible] আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁ[illegible] চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন চরণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু উর্দ্ধে দু[illegible]টার [illegible] দড়ির উপর দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতে[illegible] দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সরাইয়া নাচিতেছে। কখন বা শিশুটিকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিতেছে। অনাথনাথ এত ক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বেদিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাশের উপর উঠি[illegible] এক পা, কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ কক্ষ পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া [illegible] ভাবে দীন নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কখন সে [illegible] দেহলতা-টিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া, এবং বক্ষের উপর [illegible] দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটি হইতে একটি ক্ষুদ্র দুয়ানি গোলা[illegible] অধরোষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখা[illegible] দেখিয়া অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উছলিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব [illegible] করিতেছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতর [illegible] ছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিছুক্ষ[illegible] আঁটি[illegible] [illegible] হইল; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র [illegible] আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে [illegible] [illegible]বির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার ক্ষুরধারির অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বনবিহীনা,
মুদ্রিত নীলাব্জনেত্র বসি শূন্যাসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।

কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
[illegible] ক্ষমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
[illegible] কর পড়ি অযতনে,
যেন অব্জপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।
কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া [illegible] নীল সরসীর নীরে।
[illegible]বেলা, পর্ব্বত, কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন,
[illegible]পূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
[illegible] প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত।
নির[illegible], দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,
[illegible]াসিছে নিশ্চল মুখে সেহ অবসরে,
[illegible] করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে।
[illegible] সে মুখ পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল ছল।

বাজিকর কিছু ক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল, "ভানুমতী!"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ওমার খাইয়াম।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্র এই প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাদের মধ্যে এক জন ধনবান হইলে অপর দুই জনের সহিত সে ধন সমভাবে ভাগ করিয়া লইবে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই তিন জনই কোন না কোন প্রকার খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সর্ব্বপ্রথমে নিজাম উলমুলকের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। তিনি সুলতানের উজীর হইয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। হাসান সাবা তত্রত্য বিশেষবিখ্যাত গুপ্তঘাতকী সম্প্রদায় সংস্থাপিত করেন, এবং পরিশেষে তাঁহারই সম্প্রদায়ের লোক নিজাম উলমুলককে হত্যা করে। এই বন্ধুত্রয়ের মধ্যে তৃতীয় বন্ধুর নাম ওমার খাইয়াম।

ওমারের পিতা তাম্বুনির্ম্মাতার কার্য্য করিতেন। অল্প দিন হইল, প্রতীচ্যে ওমারের কবিতার আদর হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে পারস্যের পঞ্জিকা সংশোধক বলিয়াই তাঁহার খ্যাতি ছিল।

পরিচয়।

প্রতীচ্যে জ্যোতিষী ওমারের খ্যাতি ছিল, কবি ওমারকে কেহ চিনিত না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিট্‌জেরাল্ড প্রথমে ওমারের কতকগুলি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ওমারের কবিতার সহিত বিদেশীদিগের সেই প্রথম পরিচয়। আজ ওমারের কবিতার অসাধারণ আদর;—এখন ওমারের অঙ্কশাস্ত্রবিষয়ক ও জ্যোতিষসম্বন্ধীয় গ্রন্থ অতি অল্প লোকেই পাঠ করিয়া থাকে।

ওমারের কবিতার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদই প্রথম। পুনঃপুনঃ নকলে, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত নানা ভুলে, মূল কবিতাগুলি পূর্ণ

অনুবাদ।

হইয়াছে; তদ্ভিন্ন যে সকল কবিতা ওমারের বলিয়া চলিতেছে, সে সকলই তাঁহার কি না সন্দেহ। প্রাচীন রচনায় এই সকল বিপদের কথা সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগীকে আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ওমারের কবিতার সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, সে সকল কবিতা য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যে ছন্দে ওমারের কবিতা সকল রচিত, সে ছন্দ তাঁহার আপনার নহে, পরন্তু তাহা পারস্যের কবিকুলের প্রায় সকলেই ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার প্রতি শ্লোক চারি ছত্রে সম্পূর্ণ। কিন্তু তাহারই রচনায় এত বৈচিত্র্য আছে যে, রচনা একঘেয়ে বলিয়া মনেই হয় না। দুঃখের বিষয়, ওমারের বহু অনুবাদকের মধ্যে কেহই তাঁহার ছন্দ রাখিয়া অনুবাদ করিবার চেষ্টা করেন নাই; তাই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূলের ভাবাভাসিত্ব বুঝিবার কোনও উপায় নাই। তবে ফিট্‌জেরাল্ড অনুবাদে যে ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও বড় মধুর। অন্য অনুবাদকগণও ফিট্‌জেরাল্ডের পথানুসরণ করিয়াছেন। কোনও য়ুরোপীয় পণ্ডিতের যত্নে যদি ওমারের কবিতার মূলগুলির একটা সংশোধিত সংস্করণ প্রচারিত হয়, এবং ফিট্‌জেরাল্ডের মত অনুবাদে সিদ্ধহস্ত কোনও কবি ওমারের ছন্দ রাখিয়া তাহার অনুবাদ প্রকাশ করেন, তবে মূলের ভাষানভিজ্ঞ পাঠকও ওমারের কবিতার ভাবের ও ভাষার মাধুরী উপভোগের অবসর পাইবেন।

প্রেমের কবিতা।

ওমারের প্রেমের কবিতাগুলি এক হিসাবে জয়দেবের গীতগোবিন্দের মত। এক দল তাহার ভাষাগত সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট, আর নানা দল তাহার নানারূপ "আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিতে ব্যগ্র। ফিট্‌জেরাল্ডের অনুবাদে তিনি সহজ সরল অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন,—"আধ্যাত্মিক" অর্থ বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া আপনি কষ্ট পান নাই, পাঠককেও কষ্ট দান করেন নাই।

[illegible] কবিতাগুলি বড়ই মধুর। ভিন্ন ভাষায় ভাষান্তরিত হইলেও সে সকল অতি [illegible] চিত্ত হই[illegible]। আমেরিকান ক[illegible]য়ের মতে, মৃত্যু যখন সৌন্দর্য্যের সহিত স[illegible] তখনই তাহার কবিত্ব বর্দ্ধিত [illegible] জগতে সর্ব্বত্রই রূপসীর মৃত্যু কবিতার [illegible]মান বিষয়। ওমার সে বিষয় লইয়া [illegible] কবিতা লিখিয়াছেন, হুইন্‌ফিল্ডের কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহার একটি [illegible] প্রদান করিলাম,—

> যেথায় দে[illegible] তুমি গোলা[illegible]
> জানিও— [illegible] সেথা নৃপতির রক্ত ছুটি,
> যথা নিশিগন্ধা মেলে কুসুম-নয়ন তার,—
> সেথা ভূমিত[illegible] আছে রূপসীর দেহভার।

আমে[illegible] কবি গার্ণারের কৃত অনুবাদ হইতে আমরা আর একটি কবিতার অনুবাদ প্রদান ক[illegible]—

> এই যে নদীর তীরে ফুটিয়া উঠেছে ফুল,
> কে জানে অধর কার পরশিছে এর মূল?
> ধীরে ধীরে ফেল পদ শ্যামতৃণ-ভরা কূলে,
> কে জানে কে নিদ্রাগত হেথায় সকল ভুলে?

ওমারের এই সকল মধুর কবিতা পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, জার্ম্মান কবি হায়েনের ক্ষুদ্র কবিতাগুলিই কেবল সৌন্দর্য্যে ওমারের কবিতার সহিত তুলিত হইতে পারে।

প্রেমের কবিতা ব্যতীত ওমার আরও অনেক প্রকার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তবে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সকল কবিতা ওমারের রচিত বলিয়া প্রথিত, সে সকল কবিতাই ওমারের রচিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। এখানে আমরা ওমারের কবিতার হুইন্‌ফিল্ডকৃত অনুবাদ হইতে একটি ভিন্নবিষয়িণী কবিতার অনুবাদ প্রদান করিলাম,—

> অদৃষ্টের অনুজ্ঞায় কত শত হৃদি ভাঙ্গি যায়,
> অর্দ্ধস্ফুট ফুল কত না ফুটিয়া ভূমিতে লুটায়;
> জীবনের, যৌবনের গর্ব্ব তবে করিও না অত,
> না ফুটিতে ঝরি যায় মুকুলেই ফুল কত শত।

ওমারের ধর্ম্মমত লইয়া নানা তর্ক বিতর্ক হইয়া থাকে। তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাঁহাকে ভিন্ন-ভিন্ন-ধর্ম্মমতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমাদিগের বিশ্বাস, তিনি হৃদয়ে অতীন্দ্র-সুন্দরের সত্তা অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তবে ওমারের ভক্তির শুভালোক সময় সময় সন্দেহের ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, আবার তাহা কখনও পূর্ণোজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ওমারের কবিতার অন্যতম অনুবাদক নুগালিয়ে বলেন যে, এক পাত্র মদ্য পান করিয়া ওমার ঈশ্বরের নিন্দা করেন, দ্বিতীয় পাত্র পান শেষ করিয়া ঈশ্বরের গুণগান করেন।

ধর্ম্ম-মত।

এই অসীমরহস্যময় বিশ্বে যখনই জীবন অর্থশূন্য বলিয়া বোধ হয়, যখন জীবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিশ্বাস হয়, যখনই মনে হয়,—ইহলোকের পর আর কিছুই নাই, তখনই বোধ হয়, বর্ত্তমানের প্রতি অখণ্ড মনোযোগ সমর্পণ করাই আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য; তখনই বোধ হয়, বর্ত্তমানে সুখলাভের চেষ্টা করাই উচিত, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় বর্ত্তমানের সুখ অবহেলা করা মূর্খের কার্য্য। যদি সত্যই বর্ত্তমানের পর আর কিছু না থাকে, তবে রোমান কবি হরেস ও পারসীক কবি ওমার যাহা বলেন, তাহা মিথ্যা নহে। হরেস বলেন, "বসন্তের

ফুলফুল চিরদিন সমান সুন্দর থাকে না, চন্দ্রের কররাজও নিত্য [illegible] অন-ন্তের অজ্ঞের চিন্তা লইয়া ব্যস্ত হই[illegible] কেন ?"

ওমার তাঁহার একটি কবিতা[illegible] সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন[illegible]-কৃত অনুবাদ হইতে আমরা তাহা[illegible] প্রদান করিলাম ;—

[illegible] নিরন্তর চলেছি সকলে,
কায়া [illegible] চিত্র যথা যায় দলে দলে।
সূর্য্যালোকে আলোকরা,
শোভে এই বসুন্ধরা,
কভি মোরা চৌদিকে ভ্রমণ—
চলি শুধু যেই পথে বাজিকর চালায় যখন।

এ ত শুধু মুহূর্ত্তের তরে অবস্থান,
প্রান্তরে মুহূর্ত্ত করে প্রাণবারিপান ;
মুহূর্ত্তের পরে সবে
সেথা উপনীত হ'বে—
যেথা কই—কিছু নাই আর !
যেথা হ'তে এসেছিল, সেথা গিয়া মিলিবে আবার।

গৌরবের তরে কেহ ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
কেহ খুঁজে মৃত্যুপারে স্বরগ-আবাস ;—
নগদ যা' কিছু পাও,
তাই সাথে লয়ে যাও,
ধারে কাজ বৃথা বলে গণি,—
কি কাজ শুনিয়া কোথা দূরে উঠে দুন্দুভির ধ্বনি ?

পূর্ণ কর মদ্যপাত্র ; বসন্ত অনলে
অনুতাপ শীতবস্ত্র নিক্ষেপ সকলে ;
এই কথা বুঝি সার—
সময়-বিহঙ্গ আর
করিবে না অধিক গমন,
উড়েছে পবনপথে, দেখ ওই মেলিয়া নয়ন।

এর পরে আছে কিছু এই ভাবি মনে
ত্যজিব কি সব সুখ এ মর জীবনে ?
এই জীবনের পরে
মদ্য পা'ব আশা ক'রে
ভাঙ্গিব কি পানপাত্র মোর—
ভাবি সেই মদ্যপানে পাইব কি মহানন্দ ঘোর ?

স্বরগের আশা আছে, নরকের ভয়,
আমি জানি এ জীবন বেশী দিন নয় ;
এই কথা সত্য জানি

জাপানীদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০ বৎসর হইতে জাপানের ইতিহাস [illegible]য়। কিন্তু অতিপ্রাচীন লিখিত বৃত্তান্ত সকল ও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত ব[illegible] তৎপূর্ব্বে

ইতিহাস ও কল্পনা।

কেবল দেবদেবীর কল্পিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। লেখকের মতে, [illegible] খৃষ্টাব্দ হইতে জাপানের ইতিহাস পাওয়া যায়। জাপানী পুরাণে জগৎসৃষ্টির কোনও বিশেষ বিবরণ নাই। জাপানী পুরাণের মতে সৃষ্টির আদিতে জড় জগৎ বর্ত্তমান ছিল ;—সেই জড়জগৎ হইতে পৃথ্বী ও ব্যোম উদ্ভূত হয়। তাহার পর প্রথমে এক জন ও তৎপরে আর চারি জন স্বয়ম্ভু দেবতার আবির্ভাব হয়। ইঁহারাই জড় জগৎকে কাষ্ঠ, অগ্নি, ধাতু, ভূমি ও জলে বিভক্ত করেন। ইহার পর এই দেবকুলে ইজানাগী ও ইজানামী নামক ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্ম হয়। ইঁহারাই বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জাপানের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ ও অসংখ্য দেবদেবীর জন্ম দান করেন। অগ্নি দেবতাকে প্রসব করিবার সময় ইজানামীর মৃত্যু হয়। শোকার্ত্ত পতি, পত্নীর অনুসন্ধানে পাতালে প্রেতপুরী[illegible] গিয়া পত্নীকে তাঁহার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন। পত্নী স্বীকৃতা হ[illegible] স্থানের দেবকুলের অনুমতি আনিতে গমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনে বিল[illegible] পতি তাঁহার অনুসৃত পথে গিয়া দেখিলেন, পত্নীর মৃতদেহ গলিত শবে পরিণত হ[illegible] আর সেই গলিতশবমধ্যে অষ্টবজ্রদেবতা উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। নিরাশ প[illegible] জাপানে ফিরিয়া কোনও নদীর নির্ম্মল নীরে অবগাহন করিয়া দেহ পবিত্র করেন। অবগাহনকালে তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এমন কি, তাঁহার বস্ত্র হইতেও দেবকুল উদ্ভূত হইলেন। সূর্য্যদেবী তাঁহার বাম চক্ষু হইতে ও চন্দ্রদেব তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু হইতে উৎপন্ন।

জাপানের পৌরাণিকযুগের দেবদেবীগণের বৃত্তান্তের সহিত সম্রাটদিগের বৃত্তান্ত বিজড়িত। জাপানীদিগের মতে, প্রথম সম্রাট খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সাম্রাজ্ঞী

রাজ-শাসন।

জিঙ্গো সেনাদল সংগ্রহ করিয়া মৎস্যকুলের সাহায্যে সেনাদলকে জলবিস্তার উত্তীর্ণ করাইয়া কোরিয়া অধিকার করেন। প্রকৃতপক্ষে বোধ হয় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে মিকাডো কুলের রাজ্য আরব্ধ হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে চীন দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম আনীত হয়। এই সময় হইতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বল মিকাডোগণ নামমাত্র সম্রাট ; দেশশাসনের ভার অভিজাতবংশীয়গণের হস্তেই সমর্পিত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজগণ জাপান দেখে। ইহার পরই জেসুইট ধর্ম্মযাজকদল জাপানে উপনীত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। কোনও প্রাচীনধর্ম্মাবলম্বী জাতির মধ্যে

খৃষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব।

শত-সূক্ষ্ম-নিয়মবদ্ধ কোনও নবধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইলে, প্রথমে অনেক অজ্ঞ লোক নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করে। জাপানেও তাহাই হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সিন্ধুপরপারবাসী পোপের প্রভুতা স্বীকার করিতে হইত। রোমান-ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী স্পেনের তখন প্রাধান্য। স্পেনের কোনও জাহাজের কাপ্তেন একবার জাপানের কোনও অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিকে মানচিত্রে স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য দেখাইতেছিলেন। জাপানী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্পেন রাজ্য এই বৃহৎ সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন ? কাপ্তেন উত্তর করিয়াছিলেন যে, স্পেনরাজ প্রথমে দেশে ধর্ম্মযাজক পাঠাইয়া দেশবাসিগণকে বশ করিয়া লয়েন, পরে সৈন্য প্রেরণ করেন। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশীয়গণ সৈন্যদিগের সাহায্য করিলে দেশ অধিকার করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এই কথায় ও ভিন্ন ভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহে জাপানীদিগের মনেহো

সূত্রপাত [illegible] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হয়। তখন জাপানে [illegible] লক্ষেরও অধিক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিল। যাহারা ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা রক্ষা পাইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই নিহত হইয়াছিল। খৃষ্টানদিগকে খড় জড়াইয়া অঙ্গারস্তূপে ফেলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইত। [illegible] আনিয়া সেই কাষ্ঠেও অনেককে বদ্ধ করা হইয়াছিল। পরিশেষে ত্রিশ সহস্র দেশীয় খৃষ্টান একটি সুবৃহৎ দুর্গে গিয়া আক্রমণরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। চারি মাস আক্রমণরোধের পর তাহারা পরাজিত হইয়া সকলেই নিহত হয়। দেশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম বিতাড়িত হইল। ইহার পর কেবল বিগত চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে বিদেশীয়গণ পদার্পণ করিবার অনুমতি পাইয়াছে। এমন কি, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দেও জাপানের রাজপথপার্শ্বে এই ইস্তাহার দেখিতে পাওয়া যাইত,—

"যত দিন সূর্য্য পৃথিবীকে উত্তপ্ত করিবে, তত দিন যেন কোনও খৃষ্টান জাপানে আসিতে সাহসী না হয়। সকলে এই কথা জানুক যে, যদি স্পেনের রাজা স্বয়ং, বা খৃষ্টানের ঈশ্বর, বা [illegible]র স্বয়ং এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, তবে তাঁহারও শিরশ্ছেদন হইবে।"

[illegible] হউক, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশীয়গণ জাপানে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়, [illegible] ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ যাইয়া দেখেন যে, কোনও কোনও পল্লীগ্রামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন [illegible]স্থায় খৃষ্টধর্ম্ম তখনও বর্ত্তমান।

সিণ্টো ধর্ম্মই রাজ্যের অভিজাতবংশীয়দিগের ধর্ম্ম। সিণ্টো ধর্ম্ম এক প্রকার পূজাপদ্ধতি মাত্র। মিকাডোর আজ্ঞাপালনই ইহার প্রধান লক্ষ্য। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

অন্যান্য ধর্ম্ম।

বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল, এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ প্রভাব। জাপানে কনফুসিয়ানিসমেরও ভক্ত অনেক। আবার গত এক শত বৎসরের মধ্যে টেনরিকিও নামক এক নবধর্ম্ম বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে, জাপানে একধর্ম্মাবলম্বন অর্থে অন্যধর্ম্মত্যাগ নহে। বহু জাপানী [illegible]াধিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, কেহ কেহ প্রচলিত সকল ধর্ম্মেই বিশ্বাস করিয়া থাকে।

জাপানী কায়দায় ভদ্রতার মাত্রাধিক্য দেখিয়া হাস্য সংবরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাহাকেও কোনও উপহার দিতে হইলে বলিতে হয়, "এ জিনিষটা এতই সস্তা ও সামান্য যে,

ভদ্রতার মাত্রাধিক্য।

আপনার সম্মুখে আনিতে লজ্জা করে।" নিমন্ত্রিতদিগকে "উপযুক্ত রাজভোগ" দিয়া বলিতে হয়, "এত সামান্য ও অপরিষ্কার আহার্য্য আপনাদের পাতে দেওয়া অন্যায়। ক্ষমা করিবেন।" দুই জন বন্ধুতে পথে সাক্ষাৎ হইলে টুপি তুলিয়া নমস্কারান্তে কিরূপ আলাপ হয়, তাহার একটা নমুনা এখানে প্রদত্ত হইল,—

ক। আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার সৌভাগ্য আমার বহুদিন হয় নাই।

খ। আপনার সহিত ইহার পূর্ব্ববার যখন আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম।

ক। আমিই রূঢ় ব্যবহার করিয়াছিলাম;—অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।

খ। আপনার মহান্ স্বাস্থ্য এখন কেমন?

ক। খুব ভাল। আপনার সৌজন্যের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

খ। আপনার মহিমান্বিতা পত্নী ভাল আছেন ত?

ক। আপনাকে ধন্যবাদ। বুড়ী [illegible] ভাল আছে।

খ। আপনার মূল্যবান্ সন্তানগুলি কেমন আছে?

ক। আপনার অনুগ্রহের জন্য সহস্র ধন্যবাদ। দুর্গন্ধ অপরিষ্কার হতভাগারা ভালই আছে।

খ। আমি এখন একটা পচা গলিতে বাস করিতেছি। আমার বাটী ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার, আপনি যদি সহ্য করিতে পারেন, তবে এক দিন আমার গৃহে যাইয়া আমাকে সম্মানিত করিয়া বাধিত করিবেন।

ক। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিবার উপযুক্ত ভাষা পাইতেছি না। আমি শীঘ্রই আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, আমার এই অপদার্থ দেহ আপনার সম্মুখে লইয়া উপস্থিত হইব।

রাজপথে শিশুর সহিত কথা কহিতে হইলেও বৃদ্ধ টুপি খুলিয়া তবে কথা কহিবেন। কোনও উচ্চস্থান হইতে কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করা অভদ্রতা; সেই জন্য যে দিন সম্রাট বা কোনও উচ্চপদস্থিত ব্যক্তি পথে গমন করেন, সে দিন অধিবাসীদিগকে গৃহের দ্বিতলস্থ কক্ষ হইতে নামিয়া আসিতে হয়। লেখক ও তাঁহার এক বন্ধু এক দিন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন; সঙ্গে বন্ধুর অল্পবয়স্ক পুত্র। সেই সময় কোনও অভিজাতবংশীয়া মহিলা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বন্ধু পুত্রকে তুলিয়া ধরেন। পাহারাওয়ালা আসিয়া তখনই বালককে নামাইয়া দিতে আদেশ করিল।

জাপানীগণ প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত দুঃখের বাহ্যিক চিহ্নমাত্র কঠোরতার কঠিন আবরণে বিলুপ্ত করিতে চাহে। কেহ সন্তানের মৃত্যুর কথা বলিবার সময় জোর করিয়াও হাসিয়া থাকে। প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত জাপানীগণ জীবনকে ঘৃণা করে, এবং মরণ মঙ্গলাস্পদ বলিয়া মনে করে। ইহার কারণ, জাপানীদিগের মতে কেহ একাকী কিছুই নহে, সমস্ত পরিবার অবশ্য আবশ্যক। আর বৌদ্ধমতে, জীবনই যত অনিষ্টের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান।

কঠোরতা।

জাপানে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০০০ আত্মহত্যা হয়। অতি সামান্য কারণে জাপানীরা আত্মজীবন নষ্ট করে। এমন কি, এক বৎসর অজন্মা হইয়া ধান্য দুর্মূল্য হইলেই লোকে আত্ম-হত্যা করিয়া কষ্টমুক্ত হয়। অধিক কি, শীত গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-হত্যার সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি হয়; অর্থাৎ, গ্রীষ্মাধিক্যের মত সামান্য কারণেও লোকে আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যা।

প্রাচীন নিয়মানুসারে যোদ্ধাদিগকে সাধারণ লোকের মত মৃত্যুদণ্ড করা যাইত না। কিন্তু জাপানীগণ জীবনকে এতই তুচ্ছ বলিয়া মনে করে যে, তাহাদিগকে দণ্ডবিধান করা অতি সহজসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আপনার উদর বিদীর্ণ করিয়া আত্মহত্যা করা অতি সম্মানজনক ও সর্ব্বপাপক্ষয়কর বলিয়া বিবেচিত হইত। এখন এ প্রথা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে কোনও অভিজাতবংশীয় যদি সাম্রাজ্যের অহিতকরণেচ্ছু বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তবে তাঁহাকে একখানি ক্ষুদ্র তরবারি পাঠান হইত। তিনি আহারান্তে মাদুরে বসিয়া উদরের বামপার্শ্বে তরবারি বসাইয়া দক্ষিণ পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অবিলম্বে মৃত্যু না ঘটিলে, এক জন ভৃত্য তরবারির আঘাতে প্রভুর শিরশ্ছেদন করিত।

বিবিধ।

গ্ল্যাডষ্টোনের দৈনন্দিন জীবন।

যে জ্যোতিষ্ক বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপিয়া আপনার ভাস্বর কিরণে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক অম্বর উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, সে জ্যোতিষ্ক আজ চিরান্ধকারে আপনার কিরণজাল সংবৃত করিয়াছে। অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত, পীড়িতের সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ গ্ল্যাডষ্টোন

আর্দ্র মরণের মহাপথে অভিভূত। বিস্তৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মঙ্গলকার্য্যে বহু বর্ষ যাপন করিয়া গ্ল্যাড্‌ষ্টোন আজ মরণের অঙ্কে চিরশান্তি লাভ করিয়াছেন। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চারি দিক হইতে একটা উচ্ছ্বাসভরা দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের বহুবিধকার্য্যময় জীবনের ... কার্য্য সকলের সমালোচনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আমরা তাঁহার কন্যার ... বিবরণ হইতে তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আভাস দিতেছি।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের জীবনের মূলমন্ত্রই ছিল—"অতিরিক্ত অধিক কাজে হাত দিও না,—এক সময়ে একাধিক কাজে করিও না। আবার যে কাজ করিবে, সমস্ত হৃদয় দিয়া তাহা সম্পন্ন করিবে। বাল্যকালে এক দিন গ্ল্যাড্‌ষ্টোন যখন অধ্যয়নরত, সেই সময় এক জন দাসী তাঁহার জন্য ঔষধ আনিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন ঔষধ লইয়া যাও। আমি একেবারে দুই কাজ করিব কেমন করিয়া?"

জীবনের মূলমন্ত্র।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন যে কাজ করিতেন—ভাল করিয়াই করিতেন। সেই জন্য কি ধর্ম্মতত্ত্বে, কি আধ্যাত্মতত্ত্বে, কি রাজনৈতিক তর্কে, যিনি তাঁহার সহিত যে বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছেন, তিনি গ্ল্যাড্‌ষ্টোনকে সেই বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ দিতেন।

গ্ল্যাড্‌ষ্টোন অতি সদালাপী ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে বুঝিতে হইলে, কেবল শ্রোতার ... তাঁহাকে পছন্দ করিতে হইত।

... কোনরূপ বাধা দিলে গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের কাছে কথা অসহ্য হইয়া উঠিত। কিন্তু ... কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে তাঁহার কাছে বসিয়া কথা কহিলেও তিনি তাহা ... শুনিতেন না। তিনি অবলম্বিত কার্য্যে অখণ্ড মনোযোগ দান করিতেন। তাঁহাকে ... কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া তবে উত্তর প্রদান করিতেন। তিনি যেরূপ উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, ক্রীড়াতেও তাঁহার সেইরূপ উৎসাহ ও আগ্রহ লক্ষিত হইত। গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের সকল কার্য্য সুনিয়মে শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত। প্রভাতে ... সময় তিনি পুস্তকালয়ে উপস্থিত থাকিতেন; তাহার পর ... হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে তিন পোয়া পথ দূরস্থ গির্জ্জায় সাড়ে আট ঘটিক... উপস্থিত হইতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি প্রতিদিন উপাসনা করিতেন। ... তিনি কখন গৃহে থাকিতে ... তখন কোনও পুত্র বা কোনও কন্যা পিতার পত্র বাছাই করিতেন। প্রতিদিন নানাবিষয়সম্বন্ধীয় এত পত্র আসিত যে পত্রের একদশমাংশ মাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইত, ইহার মধ্যে তিনি অর্দ্ধাংশের উত্তর দিতেন। তিনি যখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন অবশ্য তাঁহার কর্ম্মচারীরা তাঁহার পত্র বাছাই করিতেন। যেখানেই হউক না কেন, তিনি প্রভাতে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। দুই প্রহরের আহারান্তে তিনি আবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন ও প্রায় একঘণ্টা কাল কাষ্ঠ... বৃক্ষচ্ছেদনে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার মতে, বৃক্ষচ্ছেদনে অতি অল্প সময়ে যথেষ্ট শারীরিক ... করা হয়। জীবনের শেষ দুই তিন বৎসর আর তিনি বৃক্ষচ্ছেদন করিতে পারিতেন না ... সময়টা নবনির্ম্মিত পুস্তকাগারেই কাটাইতেন।

তিনি প্রতিদিনই কতকগুলি প্রকাশকের মূল্যতালিকা দেখিতেন, ও কোন না কোন ... পুস্তক আনিতে পাঠাইতেন। সাধারণতঃ, তিনি এক সময়ে তিন বিষয়ের তিনখানি পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহার আপনার মতে, আরিষ্টটল, সেণ্ট অগষ্টাইন, ডান্টে ও বাট্‌লার, ... এর রচিত গ্রন্থ তাঁহার উপর অদ্ভুত প্রভাব সংস্থাপিত করিয়াছিল।

অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় চা পান করিয়া তিনি আবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। চারি মিনিটেই তাঁহাদের বেশপরিবর্ত্তন সম্পন্ন হইত। সন্ধ্যাকালে আহারান্তে পাঠ আরম্ভ করিতেন। পাঠকালে সময় সময় চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন। একবার শয্যা করিতে পারিলে তিনি সকল ভাবনা দূর [illegible] নিদ্রায় অভিভূত হইতেন। প্রভাতে তাঁহাকে জাগাইয়া [illegible] হইত।

সুনিদ্রা ও শ্রমনাশ।

এমন কি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তারিখে পার্লামেন্টে Home Ru[le] বিলে পরাজিত হইয়াও গৃহে ফিরিয়া তিনি নিয়মমত আট ঘণ্টা ঘুমাইয়াছিলেন। রবিবারে গ্লাডষ্টোন বিশ্রাম করিতেন। সে দিন তিনি কোনও বাজে বই পড়িতেন না। বিশ্রাম[illegible] তিনি কোনও পীড়িত বা শোকতপ্ত বন্ধুর গৃহ ভিন্ন অন্য কোথাও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন[illegible]

সন্ধ্যাকালে গ্লাডষ্টোন প্রায়ই উপন্যাস পাঠ করিতেন। কাজ করিয়া শ্রান্ত হইলে তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া শ্রম দূর করিতেন।

একবার মন্ত্রিদলের গঠনকালে Home Rule সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিতেছিলেন, Psalm সম্বন্ধে কোনও রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে Oriental Congress এ পাঠ করিবার জন্য একটি প্রবন্ধ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের রচনাও চলিতেছিল। রচনাকালে রচনা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, তদ্বিষয়ে গ্ল্যাডষ্টোন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। একবার একটি প্রবন্ধের রচনাকালে [illegible] কয়টি কথার জন্য তিনি দুই ঘণ্টাকাল হিউমের গ্রন্থাবলী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। [illegible] ধীরে পাঠ করিতেন, কিন্তু তাঁহার রচনা দ্রুত সম্পাদিত হইত। প্রথম লি[illegible] বিশেষ সংশোধন আবশ্যক হইত না।

গ্ল্যাডষ্টোন বলিতেন যে, টেনিসনের সহিত তাঁহার প্রণয়ের প্রধান কারণ—উ[illegible] স্বরবিহীন শ্রমশীল জীবন যাপন করিতে ভালবাসিতেন। জীবনের স[illegible] তিনি নব নির্ম্মিত পুস্তকাগারে স্বহস্তে পঞ্চবিংশতি সহস্র পুস্তক বিষয়-বিভাগ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে লর্ড রোজবেরী সত্যই বলিয়াছেন—"যে জাতি হইতে গ্লাডষ্টোনের উৎপত্তি, হয় ত সে জাতি হইতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ জন্মিতে পারেন, কিন্তু [illegible] তাহা না হইতেছে, তত দিন সে জাতি তাঁহার স্মৃতিতে ও তাঁহার [illegible]।" গ্লাডষ্টোন আপনি বলিয়াছেন যে, "উপদেশ মর্ম্মরমূর্ত্তির মত ;—আদর্শ [illegible] সহিত উপমেয়।" জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে একটা দ্রব্যের আদান-প্র[দান] বিগ্রহের সময়েও বন্ধ থাকে না—সে কেবল উচ্চ জীবনের আদর্শের আদান-প্রদান।

দিনেকের শিশু।

মাতৃগর্ভচ্যুত শিশু—বৃন্তচ্যুত ফুল,
শুইল ধরণী-অঙ্কে হ'য়ে নিদ্রাকুল।
বারেক খোলিল আঁখি, ফেলিল নিশ্বাস,
কত জন্ম পরিচয় মুহূর্ত্তে প্রকাশ!

মরণ শিয়রে বসি, স্নেহে মৃদু গান,
আদরে যতনে দিল ঢাকি দু'নয়ান,
শোকে দুখে ভূমে পড়ি মূর্চ্ছিতা জননী
শুনে দূর ধরাপ্রান্তে শিশুপদধ্বনি।

হে মায়াবী, দাঁড়াইয়া বৈতরণী কূলে
কি ভাবিছ মনে মনে আঁখি দুটি তুলে!
আলুথালু মতিচ্ছন্না ছুটে উর্দ্ধশ্বাসে!
কি আশা ভরসা তোর পেয়েছে আকাশে!

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি।

"সুবিচারবলসাগর" পত্রের জুন মাসের সংখ্যায়, শ্রীযুক্ত বাসুদেব রাও আপ্‌টে, বি. এ. মহোদয় "আর্য্যশিক্ষাপদ্ধতি" সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। [illegible] ফেব্রুয়ারি মাসে, মুম্বই (বোম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভ (Convocation) কালে লর্ড ন্যর্থকোট বলিয়াছিলেন,—Under the ancient Hindu System the young Brahmin had to undergo a severe and long continued discipline of the will as well as of the mind before he was permitted to enter upon the duties of a secular life. The ideal it set before itself, with its reverence for teachers and the aged, its rules of self-denial and its minutely prescribed duties show at least that to the men who established it, education meant more than the imparting of knowledge. প্রবন্ধারম্ভে লেখক বলিয়াছেন, লর্ড ন্যর্থকোটের মুখে উল্লিখিত বাণী শ্রবণ করিয়া, প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে [illegible] অনুসন্ধান ও আলোচনা করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হয়। তিনি মনুসংহিতা, [illegible] ভারত, আপস্তম্বসূত্র, আশ্বলায়নসূত্র ও গোভিলসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিয়া [illegible] সমর্থ হন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই একত্র গ্রথিত করিয়াছেন।

[illegible] বলেন, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ। বর্ণব্যবস্থার অপেক্ষা আশ্রমব্যবস্থার সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের শিক্ষাপদ্ধতির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ছিল। আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই প্রথমস্থানীয় ও জ্ঞানোপার্জ্জনের মুখ্যকালরূপে পরিগণিত। বেদের (জ্ঞানের) অপর নাম ব্রহ্ম, এই কারণে বেদের অধ্যয়নকারিগণ (জ্ঞানোপাসকগণ) ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। উপনয়ন না হইলে বেদপাঠের অধিকার জন্মিত না। [illegible] শব্দের অর্থ গুরুগৃহে উপনীত করা। সপ্তম বর্ষে শ্রীকৃষ্ণকুমারের উপনয়নের কাল [illegible] শাস্ত্রকারগণ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। উপনয়নের পূর্ব্বে বেদ [illegible] নিষিদ্ধ হওয়ায়, কোমল বয়সে বিদ্যাভ্যাসের চিন্তা বালকদিগকে সন্তপ্ত ও ক্লিষ্ট করিতে পারিত না। স্পেন্সার প্রভৃতি আধুনিক তত্ত্ববেত্তাদিগের মতও এ বিষয়ে প্রাচীন ঋষিগণের মতের অনুরূপ। শিক্ষারম্ভকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রাদেশপালনে অবহেলা বর্ত্তমান আর্য্যসন্তানগণের দৈহিক অবনতির অন্যতম কারণ। উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ত্রৈবর্ণিক আর্য্য বালকগণ "দ্বিজ" বা পুনর্জ্জন্মপ্রাপ্ত (জ্ঞানরাজ্যে জন্মলাভ) আখ্যায় অভিহিত ও কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে (জ্ঞানোপাসকের ব্রতে) দীক্ষিত হইতেন। উপনয়নের পর বিদ্যাভ্যাসের জন্য দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে থাকিয়া, সে কালের ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ শিক্ষা পাইতেন, তাহাতে [illegible] ও মানসিক উন্নতির সহিত তাঁহাদিগের হৃদয় ও আত্মা মহনীয় [illegible] হইত। এই কারণে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমকে (ছাত্রাবস্থাকে) ঋষিগণ ধর্ম্ম[illegible]রের প্রথম সোপান, সদাচারবৃক্ষের আদিবীজ, জীবিতসাফল্যের মুখ্য সাধন, স্বর্গারোহণের একমাত্র অবলম্বন প্রভৃতি বিবিধ গৌরবব্যঞ্জক রূপকাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণকুমার [illegible] দ্বাবিংশতি ও বৈশ্যপুত্র চতুর্বিংশতি বৎসরের মধ্যে (গুরুগৃহে) উপনীত [illegible] শিষ্টজননিন্দিত "ব্রাত্য" আখ্যা প্রাপ্ত হইত। ব্রাত্যপ্রাপ্তির ভয়ে সে কালে [illegible] (গুরুগৃহে) "উপনয়নসংস্কার" সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। অধুনা

আমাদিগের দেশে উপনয়নসংস্কার গ্রহসনমাত্রে পর্য্যবসিত হওয়ায়, সেকালের জ্ঞানগৌরব ও শক্তি সামর্থ্য উপকথার স্থান অধিকার করিয়াছে।

মনুসংহিতাদি গ্রন্থে ব্রহ্মচারীর যেরূপ নিয়ম, ধর্ম্মপালন ও গুরুগৃহে থাকিয়া যে সকল শ্রমজনক কার্য্য করিবার বিধান আছে, তাহা পাঠ করিলে, সেকালের ঋষিসমাজ শরীরকে সুদৃঢ়, নীরোগ ও উদ্যমশীল করিতে কিরূপ যত্নবান ছিলেন, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। যে সকল বালক ঐ সকল নিয়মপালনে অমনোযোগিতা প্রকাশ করিত, ঋষিগণ তাহাদিগকে বিফলবিদ্য, ব্রহ্মযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজনিত পুণ্যলাভের অযোগ্য ও নিরয়গামী বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

মানসিক শিক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ১ম, বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষা, বা লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ। ২য়, মনোনিগ্রহ বা চিত্তসংযম। বুদ্ধিবিষয়ক শিক্ষাকে আজকাল আমরা যতটা প্রাধান্য দিয়া থাকি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ততটা প্রাধান্য দিতেন না। তাঁহারা চিত্তসংযমকেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। লেখক বলেন, প্রাচীনকালে লেখনকলা অপরিজ্ঞাত থাকায়, প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে লিখন, পঠন ও অঙ্কপাত প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু উক্ত কলা আবিষ্কৃত হইবার পরও যে তাঁহাদিগের, ইংরাজীতে যাহাকে The three R's বলে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

উপনয়নের পর গুরুগৃহে বিদ্যার্থীদিগের শিক্ষাক্রম কিরূপ ছিল, তাহার স্পষ্ট বিস্তারিত উল্লেখ কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইৎসিং নামক চীনদেশীয় বৌদ্ধ ভ্রমণকারী স্বপ্রণীত ভারত-ভ্রমণ-বিষয়ক পুস্তকে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে,— গুরুগৃহে গিয়া "বিদ্যার্থিগণ প্রথম ছয় মাসে ৪৯টি মূল বর্ণ ও ১০০০০ যুক্তাক্ষর শিক্ষা করিত। তাহার পর আট মাসের মধ্যে তাহাদিগকে পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি মুখস্থ করিতে হইত। সূত্রপাঠ শেষ করিয়া বালকেরা "ধাতুরূপ" ও "খিল" নামক পরিশিষ্টত্রয় অভ্যাস করিত। সপরিশিষ্ট ব্যাকরণ শেষ হইলে তাহাদিগের প্রথম ত্রৈবার্ষিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। ইহার পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর শিক্ষার্থীদিগের ব্যাকরণভাষ্য-অধ্যয়নের কাল। এই আট বৎসর কাল ক্রমাগত পাঠ অভ্যাস করিয়া বালকগণের স্মরণশক্তি এরূপ তীব্র হইয়া উঠিত যে, তাহারা বড় বড় গ্রন্থ একবারমাত্র পাঠ করিয়া মুখস্থ বলিতে পারিত।" ইৎসিংএর বর্ণিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে বেদাধ্যয়নের উল্লেখ না থাকিলেও, উহা ইহার পর আরব্ধ হইত, এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কারণ সর্ব্বজ্ঞানের আকরস্বরূপ বেদের অধ্যয়ন ভিন্ন সে কালে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। আট বৎসর ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়া ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ও স্মরণশক্তি প্রখরতা প্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অবশিষ্ট [illegible] বৎসরের মধ্যে বেদাধ্যয়ন শেষ করা অসম্ভব নহে।

ইৎসিং সেকালের ছাত্রগণের স্মরণশক্তির যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তা[illegible] বুদ্ধির সেরূপ প্রশংসা করেন নাই। ইহা হইতে লেখক অনুমান ক[illegible] গণের স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ হইতে পারে, সেকালের শিক্ষাপদ্ধতি[illegible] উপায়-অবলম্বনের ব্যবস্থা ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞানলাভের সহিত বালকেরা [illegible] চিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইতে পারে, তৎপ্রতি প্রাচীন আচার্য্যগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বালকগণকে শ্রদ্ধালু, স্থিরচিত্ত, কষ্টসহিষ্ণু ও শুদ্ধচিত্ত করাই আর্য্য-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য যত দিন অক্ষুণ্ণ ছিল, তত দিন ভারতের গৌরবসূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে বিরাজ করিতেছিলেন। আপস্তম্ব বলেন, কলিযুগের ছাত্রেরা ব্রহ্মচর্য্যাদি কঠোর ব্রত

নিয়মসমূহ যথাযথ পালন করে না বলিয়া, তাহাদিগের মধ্যে কেহ প্রতিভাশালী ঋষি বা বেদমন্ত্রের স্রষ্টা হইতে পারে না। লেখকের মতে, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি গুণশিক্ষার উপারাভাবেই বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণ। রেভারেণ্ড হোয়াইটহেড সাহেব মনে করেন, এই কারণেই প্রাচীন গ্রীক জাতির অধঃপতন হইয়াছিল।

গুরুগৃহে অবস্থানকালে ছাত্রদিগের ভোজনাচ্ছাদনাদির ব্যয়ভার আচার্য্যগণই বহন করিতেন। কদাচিৎ কোনও শিষ্য ভিক্ষান্নসেবী হইলেও, বস্ত্র পাত্রাদি শিক্ষকের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইত। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের সাহায্যে কৃষিকর্ম্ম ও গোসেবা দ্বারা যাহা লাভ করিতেন, তাহাতেই সশিষ্যে সন্তুষ্টচিত্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও কখনও দেশের নরপতিগণের নিকট তাঁহারা অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন।

কোনও ছাত্র শিক্ষার্থীদিগের পালনীয় নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহার প্রতি কি প্রকার কায়িক দণ্ডের বিধান করা হইত, তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায় না। গোতমসূত্রে শিষ্যের প্রতি কঠোর কায়িক দণ্ডের বিধান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। তিনি বলেন, "বাচনিক তিরস্কারে কোনও ফল না হইলে, আচার্য্য সূক্ষ্ম রজ্জু বা ক্ষুদ্র বেত দিয়া তাহাকে স্বয়ং মৃদুভাবে তাড়না করিবেন—অপরের প্রতি প্রহারের ভারার্পণ করিবেন না। এই নিয়মের অপালনে, গুরুপ্রহারে যদি কোনও ছাত্রের অঙ্গহানি প্রভৃতি গুরুতর অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে রাজা আচার্য্যকে অভিযুক্ত করিয়া যথোচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।"

শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে বালকগণের যেরূপ উপনয়নসংস্কার সম্পন্ন হইত, অধ্যয়নের পরিসমাপ্তি হইলেও সেইরূপ একটি সংস্কারের অনুষ্ঠান করিতে হইত। (সেই সংস্কারকে "সমাবর্ত্তন" বলে।) সেই সংস্কার সম্পন্ন করিয়া, যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া, শিষ্য স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। দ্বাদশবর্ষান্তে শিষ্যকে বিদায়প্রদানকালে, আচার্য্য বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদকণ্ঠে শিষ্যকে যে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা, বর্ত্তমান কালের বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবীদানসমারম্ভকালে প্রদত্ত উপদেশের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। এই উপদেশের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ তৈত্তিরীয় উপনিষদের শিক্ষাধ্যায়ের ১১ অনুবাকে হইতে লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসন্তানগণ উপনয়নের পর গুরুগৃহে গিয়া গায়ত্রী ও ব্রতাচরণাদি শিক্ষা করিত। তাহার পর, তাহারা শাস্ত্রাভ্যাসে অধিক সময় অতিবাহিত না করিয়া, স্ব স্ব ব্যবসায়শিক্ষার জন্য যথাস্থানে গমন করিতে পারিত।

সদয়, শুদ্ধচিত্ত, সুবিদ্য ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থাশ্রমীকে আচার্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শাস্ত্রকার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। উক্ত গুণগ্রামসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ না হইলেও আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইতেন। কোনও কোনও ক্ষত্রিয় নরপতি [illegible]গকে উপনিষদ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন, [illegible]র শিক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য রক্ষিত হইত না। পুরুষের [illegible]লোকেরাও গুরুগৃহে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন, এবং পণ্ডিতসভায় উপস্থিত [illegible]রা বিচারে আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিয়া বুধমণ্ডলীকে আশ্চর্য্য ও চমকিত করি[illegible]। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন,—They (women) even had legetimate influnce upon politics and administration (ancient India pp 187) রাজকন্যাগণকে [illegible]খন, পঠন, চিত্রবিদ্যা ও নৃত্যগীতকলাদি শিক্ষা দিবার প্রথা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। [illegible]ষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি প্রস্তরলিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়চূড়ামণি সোমরাজের মহারাষ্ট্রশাসনকালে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শবল দেবী রাজসভায় নানাশাস্ত্র-

কলাপারদর্শী, নৃত্যগীতব্যুৎপন্ন বিদ্বজ্জনসমাজে সঙ্গীতকলার স্বীয় অসাধারণনৈপুণ্য দেখাইয়া সামাজিকদিগকে পরিতুষ্ট ও মহারাষ্ট্রপতির নিকট হইতে নিষ্কর ভূমি পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। (J. A. S. Bom, July 1892.) স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অধুনা আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কারের কত দূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা ইহা হইতে সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

উপসংহারে লেখক নবদ্বীপের সংস্কৃত টোলের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এখনও নদীয়া অঞ্চলে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণে, সংস্কৃত পাঠশালার স্থাপন করিয়া আচার্য্যগণ ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ছাত্রদিগের ব্যবহারের উপর প্রাচীন আচার্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগেরও বিশেষ লক্ষ্য থাকে। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন পূর্ব্বক বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়নে জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করিয়াছেন, এরূপ প্রৌঢ় ছাত্র এখনও ঐ অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্যশিক্ষাপ্রণালীর অনুকরণে স্থাপিত এইরূপ পাঠশালা নদীয়া ভিন্ন ভারতের আর কোথাও বিদ্যমান নাই।

রাণী মা চৌধুরানী।

"মাসিক-মনোরঞ্জনে"র যে মাসের সংখ্যায় দেবী চৌধুরাণীর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক শ্রীযুক্ত হরি পুরুষোত্তম মটক্ষে মহাশয় দেবীকে রাণী মা, গোরী মা ও রাণী মা চৌধুরাণী নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেবীর কাহিনী বলিতে গিয়া ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাই, হোলকার-রাজবধূ অহল্যা বাই ও পাশ্চত্য বীরাঙ্গনা জোয়ান অফ্ আর্কের কথা লেখকের মনে পড়িয়াছে। ভীরুতা ও দুর্ব্বলতার জন্য সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে পূর্ব্বোক্ত বীরাঙ্গনাদিগের সহিত সমকক্ষতা করিবার যোগ্যা মনস্বিনী বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল ভাবিয়া, লেখক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বঙ্গবাসীর কলঙ্কমোচনকারিণী এই মহিলার বীরত্বকাহিনী সাদরে ও সগৌরবে স্বদেশীয় পাঠকগণের করে উপহার দিয়াছেন। আমরাও বঙ্গীয় পাঠককে লেখকের বিবৃত কাহিনীর আভাসে পরিচয় প্রদান করিতেছি।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকালে বৃটিশ সরকারের অনুগ্রহে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সৌভাগ্যশালী নবাব রাজ্যশাসনের নিরর্থক ক্লেশভার ও দুশ্চিন্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন; এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে বৃত্তিগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মানবজীবনের সার্থকতসম্পাদনের প্রচুর অবসর প্রাপ্ত হন। কেবল নবাবকে ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিবার অবসর প্রদান করিলে কোম্পানী বাহাদুরের অপক্ষপাতিতায় দোষস্পর্শ করিতে পারে ভাবিয়া, অথবা নবাবের রাজকার্য্যপরিশ্রান্ত সামন্তবর্গ, ওমরাহ ও সর্দ্দারগণকে জীবনের শেষ কয়টা দিন বিশ্রামসুখে অতিবাহিত করিবার অবসর প্রদান করিবার জন্য, মহামতি ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ তাঁহাদিগকে সমশ্রেণীস্থ করিয়া ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন। কিন্তু নবাব যেরূপ শান্তশীল ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সামন্তগণ সেরূপ সুশীল ছিলেন না। তাঁহারা বিদেশী বণিকের এই অযাচিত উপকার সহ্য করিতে না পারিয়া, ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজনীতি-চতুর ইংরাজ বণিকের বুদ্ধিকৌশলে ও বাহুবলপ্রভাবে পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও, বিদ্রোহিগণ সহজে বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। তাঁহারা কোম্পানীর সৈন্যের সহিত সম্মুখসংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কূট যুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ইংরাজ বণিকেরা নবরাজ্যলাভচেষ্টায় এ দেশে যে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল, সর্দ্দার ও সামন্তগণের বিদ্রোহে তাহা দ্বিগুণ ভীষণভাব ধারণ করিল। দেশময় উৎকট অশান্তি ও

ঘোর অরাজকতার ঘনচ্ছায়া বিস্তৃত হইতে লাগিল। চোর ডাকাতের উপদ্রবে লোকের পথ চলা ভার হইল; বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও লুণ্ঠনপিপাসায় নিরীহ প্রজাকুলের ধন প্রাণ রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। প্রজাগণ কাতরকণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতে লাগিল, কিন্তু তাহা শুনে কে? নবাব তখন দুর্ব্বল ও শক্তিসামর্থ্যহীন, ইংরেজ প্রজার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টিহীন ও ধনোদরপূরণে উন্মত্ত! সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে অচিরকালমধ্যে বঙ্গ দেশের অধিকাংশ বিদ্রোহীদিগের করতলগত হইল।

কিন্তু এই সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে একটি অতি বিস্ময়কর জিনিষ ছিল। একটি রমণী—বিশেষতঃ একটি কোমলশরীরা বাঙ্গালী রমণী, এই বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শৌর্য্যশালিনী বঙ্গীয় অবলার প্রকৃত নাম ধাম বর্ত্তমান লেখকের নিকট যেরূপ সম্যক অপরিজ্ঞাত, তাঁহার অনুবর্ত্তী বিদ্রোহীদিগের নিকটও তাহা সেইরূপ রহস্যাবৃত ছিল। রাণী মা, চৌধুরাণী ও গোসাঁমা প্রভৃতি গৌরবসূচক নামে তিনি জনসমাজে পরিচিতা ছিলেন। সেই বিদ্রোহের পূর্ব্বে কেহই তাঁহার নাম শুনে নাই। তাঁহার সেই বিদ্রোহে যোগ দিবার কারণও কেহ অবগত ছিল না। অজ্ঞ লোকে তাঁহাকে ভূভার-হরণার্থ অবতীর্ণা দেবী বলিয়া মনে করিত। সুতরাং তাঁহার যে কখনও পরাজয় হইতে পারে, এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিত না। চৌধুরাণীর নাম শুনিলে সেকালের সাহসী পুরুষেরও অন্তর ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িত। এই শূর অবলার নামোল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় জননীগণ দুষ্ট বালককে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইতেন।

বিদ্রোহীদিগের নেতৃত্বগ্রহণ করিবার পর, অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই এই কুন্তাস্তোপমা বীর-রমণী প্রায় সমগ্র পশ্চিম বঙ্গে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিলেন। তথাপি সে দিকে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। চৌধুরাণী অচিরে আপনাকে বঙ্গ দেশের রাণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন, এবং দেশের দস্যুদলকে একত্র করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে মহাসমরের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইংরাজদিগকে এই পুণ্যভূমি হইতে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, বঙ্গের অনেক ক্ষুদ্র বড় জমিদার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিলেন। রাণীর প্রবলপ্রতাপের সংবাদ হেষ্টিংসের কর্ণগোচর হইলেও, তিনি রাণীমাকে সামান্য অবলাজ্ঞানে তৎপ্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই রাণীর দস্যুসৈন্যগণ সহসা একদিন কলিকাতায় কোনও সমৃদ্ধ বণিকের কুঠী আক্রমণ করিলে, হেষ্টিংসের ভ্রম দূরীভূত হইল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া রাণীর সৈন্যেরা উপদ্রব করিতেছে দেখিয়া, হেষ্টিংস আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে রাণীর বিরুদ্ধে এক দল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণের আদেশ করিলেন। ইংরাজ সৈন্যের সহিত সম্মুখসমরে বিদ্রোহিগণের নানা স্থানে পরাজয় ও ক্ষতি হইতে লাগিল। একদা বিদ্রোহিসৈন্য ভীষণ বেগে ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিস্তর সৈন্য নিহত হয়; কিন্তু ইংরাজদিগের শিক্ষিত সিপাহী সৈন্যের সমক্ষে তাহারা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে না পারিয়া, একটি সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ইংরাজসৈন্য পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গ অবরোধ করিল। বিদ্রোহী দল বহুক্ষণ গোলা গুলি, শর ও প্রস্তরখণ্ড বর্ষণ করিয়া বাহুবলে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল; ইংরাজসৈন্য তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া, বিপুলবিক্রমসহকারে দুর্গাধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিল। এমন সময় বিদ্রোহীদিগের একদল সৈন্য সহসা নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া ইংরাজদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। ইহাতে ইংরাজসৈন্যের বিশেষ ক্ষতি হইলেও তাহারা হটিল না। প্রায় এক প্রহর কাল এইরূপ ভাবে যুদ্ধ চলিতেছিল।

এ দিকে দুর্গাভ্যন্তর হইতে মধ্যে মধ্যে এক একটি অব্যর্থ গুলি আসিয়া ইংরাজদিগের এক একটি সৈন্যকে ইহলোক হইতে বিদায় করিতেছিল। এই অব্যর্থ অজ্ঞাত গুলিতে ইংরাজ-সৈন্যের যত অনিষ্ট করিয়াছিল, তত অনিষ্ট আর কিছুতেই করিতে পারে নাই। এই কারণে ইংরাজ সেনাপতি ভলণ্টিয়ার দল সঙ্গে লইয়া প্রাণনাশক গুলির নিক্ষেপককে বিনাশ করিয়া স্বীয় সৈন্যের ভয় দূর করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। তিনি সরোষে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলে, আবার উভয় দলের ঘোর সংগ্রাম বাধিল। বিদ্রোহীদিগের একটি সৈনিকও জীবিত অবস্থায় স্বস্থান হইতে অঙ্গুলিমাত্র বিচলিত হইল না—যথাস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে স্বর্গলোকে চলিয়া গেল। সে অব্যর্থ গুলির প্রতিরোধের জন্য ইংরাজ সেনাপতি এত চেষ্টা করিতেছিলেন, পূর্ব্ববৎ অব্যাহতভাবে শত্রুসৈন্যের প্রাণসংহার করিতেছিল। ইংরাজ সেনাপতি দুর্গদ্বার অভিমুখে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন দেখিয়া, বিদ্রোহী পক্ষের এক রাজপুত বীর সহসা উল্লম্ফন পূর্ব্বক সেনাপতিকে আক্রমণ করিলেন। আর এক মুহূর্ত্ত অবকাশ পাইলে রাজপুতের হস্তে সেনাপতির ভবলীলা সাঙ্গ হইত, কিন্তু রাজপুত বীর সলম্ফে ইংরাজ সেনানীর নিকট উপস্থিত হইতে না হইতে এক সাহসী শ্বেত সৈনিক সুতীক্ষ্ণ সঙ্গীন প্রহারে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া স্বীয় প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল। পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, রাজপুতবেশধারিণী চৌধুরাণীর রক্তবিপ্লুত দেহ ভূতলে গড়াগড়ি যাইতেছে।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ২২ ভাগ, বৈশাখ। এই সংখ্যা হইতে প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী"র সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়াছেন। বাইশ বৎসরের পর "ভারতী"কে বালিকা সাধনার বেশ ধারণ করিতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। "ভারতী"র সহসা এ কুজ-ভাব কেন? "দুঃসময়" নামক দুর্ব্বোধ কবিতাটি পড়িয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। ইহাতে কবিত্বপরিচয় আদৌ নাই।—শব্দের দিকে লেখকের যেমন দৃষ্টি, ভাবের অভিব্যক্তির প্রতি তাঁহার তেমনি ঔদাসীন্য। শব্দবিন্যাস ও অনুপ্রাসই যেন রচনাটির লক্ষ্য,—আর সিদ্ধহস্ত প্রবীণ কবির রচনায় mannerism নিতান্তই অসহ্য। "দুরাশা" একটি ক্ষুদ্র গল্প—আখ্যান-বস্তু মনোরম; বর্ণনাকৌশল ও শব্দবিন্যাস অতি সুন্দর। সকলেই জানেন, "কণ্ঠরোধ" নামক প্রবন্ধটি টাউন হলে সিডিশন বিলের প্রতিবাদ-সভায় পঠিত হইয়াছিল। রবীন্দ্র বাবুর এই রাজনৈতিক প্রবন্ধটির ভাষা "কাদম্বরী"কেও পরাজিত করিয়াছে। যুক্তি ও তর্কই রাজ-নৈতিক রচনার প্রাণ,—এবং তাহা সাধারণবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হওয়াই বিধি। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর 'কনককিঙ্কিণীকণিত বাণীর শিঞ্জিতধ্বনি' চটপটকরতালিলাভের অনুকূল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু রাজনৈতিক প্রসঙ্গালোচনার উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। বক্তৃতার একটা বিশেষ ভাষা আছে, এবং থাকাও আবশ্যক;—আমাদের রাজনৈতিক রচনার ভাষাও কি এইরূপ 'জীমূতমন্দ্রবিনিন্দিনী' না করিলে চলিবে না? যাঁহারা শব্দশাস্ত্রের পারগামী, তাঁহাদের জন্য ভাবি না;—কিন্তু যাহারা নহিলে সভা হয় না,—অতঃপর সেই সা[illegible]কুল ও ছাত্রবৃন্দ কি "প্রকৃতিবাদ" অভিধান বগলে করিয়া সভায় ছুটিবে?—তা[illegible] হাত যোড়া থাকে, তাহা হইলে কাহারা করতালি দিবে? মনে করিয়া

দেখুন,—পার্লামেণ্টের একটা বিলের আলোচনার সময় [illegible] কোনও সভ্য কবি সুইনবরণের ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা কেমন শুনায়? [illegible] অনুকরণ বা অনুকরণ-বৃত্তি বড় প্রবল,—তাই এই তুচ্ছ বিষয় লইয়া "সাহিত্যে[illegible] স্থান নষ্ট করিলাম। "কবিতা-হরিণী"-লেখকের কল্পনা দেখুন,—তাঁহার [illegible] হরিণ "নব নব ভাবতৃণ খুঁটিয়া খুঁটিয়া করিছে ভক্ষণ।" "বৃটিশ গায়েনা" একটি ভ্রমণ-বিবরণ; যদিও লেখকের লিপিনৈপুণ্য নাই,—কিন্তু বিষয়গুণে রচনাটি প্রীতিপ্রদ। "দিল্লীর চিত্রশালিকা" প্রবন্ধটিতে লেখক বিবিধ চিত্রের বিচিত্র সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনবাহুল্যে প্রবন্ধটি অত্যন্ত ভারাক্রান্ত,—এবং সেই জন্য ইহার অনেকটা সৌন্দর্য্যহানি হইয়াছে। আর ক্রমাগত "ঈষন্মালিমমুখ আঁতুস্থ লাবণ্যরাশি" ও তত্তুল্য বিবিধ বর্ণনায় পাঠকালে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমরা মনে করিয়াছিলাম, অন্ততঃ বাঙ্গালা গদ্য হইতে "শিহার কদম্বফুল দাড়িম্ব বিদরে" চিরবিদায় লইয়াছে। তাহাকে সভ্যতার সূক্ষ্ম 'ক্রেপে' আপনাকে ঈষদাবৃত করিয়া নানা ভাবে পুনরায় আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আমরা একটু বিরক্ত হইয়াছি। হায়! চিরযৌবনবরপুষ্ট এই মর জগতে শিশিতপিণ্ডপ্রিয় সৌন্দর্য্য-সমালোচকের কি গভীর নিরাশ্বাস,—কি দুঃসহ নিরানন্দ! "শুনঃশেপের বিলাপ" একটি সুরচিত বৈদিক চিত্র। "এবারকার ভারতীর" প্রবন্ধাবলীর মধ্যে "শুনঃশেপের বিলাপ"ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। রচয়িতার বিষয়নির্ব্বাচন, রচনাকৌশল ও আন্তরিকতা সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। আমরা সকলকে প্রবন্ধটির আদ্যোপান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বৈদিক যুগের হোমগন্ধসমাকুল সামগানমুখরিত [illegible] সুখদুঃখগাথা নিশ্চয়ই পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে। "ঐতিহাসিক ম্যালিন" [illegible] সংবাদপত্রবিশেষে প্রকাশিত ম্যালিসনসম্বন্ধীয় একটি সংক্ষিপ্ত উক্তির প্রতিবাদ [illegible]—আমরা ম্যালিসনের একটা মোটা-মুটি নক্সা দেখিবার আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু লেখক আমাদের অত্যন্ত নিরাশ করিয়াছেন। "বঙ্গভাষা" প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ সেনের রচিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" অবলম্বন করিয়া লিখিত। "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ" প্রবন্ধটির বক্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। "প্রসঙ্গকথায়" ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে নিরবচ্ছিন্ন গালাগালি ও অক্ষয় বাবুকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছে। পুষ্পাঞ্জলির সঙ্গে আমাদের দুই চারিটি গন্ধহীন ফুল ডালি দিয়া সুখী হইতে পারি, কিন্তু মহেন্দ্র বাবুর জন্য কল্পিত গালিগুলি যথাপ্রযুক্ত মনে হইতেছে না।

তত্ত্ববোধিনী। বৈশাখ। শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের রচিত "তিব্বতের সাধন প্রণালী" প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য। লেখক এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তিব্বতের ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির একটি স্থূল বিবরণ ও পরিচয় দিয়াছেন।

বামাবোধিনী। চৈত্র। "বামাবোধিনী"র জোয়ার ভাটা নাই,—একই ভাবে চলিতেছে। আমাদের মনে হয় অন্ততঃ আর এক বিন্দু জীবনীশক্তির প্রয়োজন। "লবঙ্গলতা" বঙ্কিম বাবুর "রজনী"র লবঙ্গ-চরিত্রের সমালোচনা। প্রবন্ধটি সুরচিত। "গার্হস্থ্য প্রবন্ধ" উল্লেখযোগ্য। "সাধ্বী কৈলাসকামিনী" প্রবন্ধে প্রকাশ—"বামাবোধিনী সম্পাদকের গুরুতর পীড়া এবং অন্যান্য কারণবশতঃ ১২৮৫ সালে পত্রিকা যখন উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা হয়, তখন ইনি নিজের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়া বামাবোধিনীর পুনরুদ্ধারের সহায়তা করেন। তদবধি ২০ বৎসর কাল ইনি বামাবোধিনীর কার্য্যভার বহন ও প্রকৃত অধ্যক্ষতা করিয়া আসিয়াছেন।" এই পুণ্যবতী মহিলা বামাবোধিনী সম্পাদকের সহধর্ম্মিণী। ভগবান্ সম্পাদককে এই দুর্ব্বহ শোকে শান্তি দান করুন। বৈষম্যপূর্ণ জীবনপথে পতি পত্নীর জীবন[illegible] এমন সাম্য সচরাচর দেখা যায় না।

মীরণের পরিণামরহস্য।

পলাশীযুদ্ধের রহস্যময় অভিনয়ের শেষ হইয়া গেলে, মীরজাফর, নবাব জাফর আলি খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া, বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করিলেন। তাহার পর সেই রাজ্যভ্রষ্ট, সিংহাসনভ্রষ্ট, হতভাগ্য সিরাজের নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ডের অভিনয় আরব্ধ হয়। এই অভিনয় ব্যাপারের প্রধান অভিনেতা মীরণের নাম ইতিহাসপাঠকমাত্রেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। উক্ত অভিনেতার কৃত অভিনয়ব্যাপার রহস্যময় বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারও পরিণাম সেইরূপ রহস্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই রহস্যোদ্ভেদের যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিব।

মীরজাফর সিংহাসনে উপবেশন করিলে, ইংরাজেরা সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের দাবী করিয়া বসিলেন। মীরজাফর প্রকাশ্য রাজকোষ হইতে সমস্ত দাবীর পূরণ করিতে পারিলেন না। সিরাজের গুপ্ত ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া তিনি অনেক ধনরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেগুলিকে হস্তচ্যুত করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। অগত্যা ইংরাজদিগের প্রাপ্য অবশিষ্ট অর্থের জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব ছাড়িয়া দিতে হইল। তিনি শূন্য রাজকোষ লইয়া ও বাঙ্গলার দুইটি প্রধান প্রদেশ হস্তান্তরিত করিয়া অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। ইংরাজদিগকে ইহার কারণ জানিয়া, তাঁহাদের প্রতি ক্রমে তাঁহার বিরক্তির সঞ্চার হইল। এই সময়ে ইংরাজেরাও আপনাদের অযথা ক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন ; তাহাতে নবাবের বিরক্তি দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠের সহিত নবাবের মনোমালিন্য ঘটায়, এবং ইংরাজেরা তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করায়, নবাব বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সিরাজের ন্যায় তাঁহার বিরুদ্ধেও একটি ষড়যন্ত্রের সূচনা হইতেছে।

মীরজাফর কেবলমাত্র স্বীয় পুত্র মীরণকেই বিশ্বাস করিতেন। মীরণ তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন, এবং সকল বিষয়ে তাঁহাকে পরামর্শ প্রদান করিতেন। মীরণ আনুপূর্ব্বিক চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তিনি পি[illegible] বুঝাইয়া দিলেন যে, পরিণামে তাঁহাকেও সিরা[illegible] করিতে[illegible]ই জন্য তিনি বারংবার তাঁহাকে সতর্ক, কা[illegible]

লেন। মীরণের এই সতর্ক হইবার পরামর্শ মীরজাফর একেবারে বিস্মৃত হন নাই। ইংরাজেরা পরিশেষে যখন তাঁহাকে [illegible] সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসিমকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যায় মসনদ প্রদান করেন, সেই সময়ে মীরজাফর দুঃখে কষ্টে অভিভূত হইয়া বলিয়া ফেলেন যে, "আমার পুত্র মীরণ পূর্ব্বেই আমাকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়াছিল।" * মীরণ কেবল পিতাকে সতর্ক করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনি নিজেও ইহার প্রতিকারের উপায়-অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মীরণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, বৃদ্ধ পিতা আর কত দিন জীবিত থাকিবেন, পরিণামে বাঙ্গলার মসনদ তাঁহাকেই আশ্রয় করিবে। পিতাও উপযুক্ত পুত্রের প্রতি একরূপ সমস্ত ভারই প্রদান করিয়াছিলেন। মীরণ অনেক চিন্তা করিয়া ক্রমে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, ইংরাজেরাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, কিন্তু সহসা তাঁহাদের সহিত বিবাদ করা যুক্তিযুক্ত নহে, কাজেই ধীরে ধীরে তাহার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মীরণের মনে হইল যে, ইংরাজেরা ইচ্ছা করিলে আপনারাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিতে পারেন, অথবা আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে যাহারা ইংরাজদিগের ও তাঁহাদের পক্ষীয় দুর্লভরাম প্রভৃতির সহানুভূতি পাইত, তাহাদিগকেই তিনি অগ্রে চিরবিদায় দিতে আরম্ভ করিলেন। সেই জন্য সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা এবং তাঁহার মাতা ও মাতৃস্বসা মীরণের আদেশে নিহত হন। পাছে সিরাজউদ্দৌলার ভ্রাতা সিংহাসন প্রাপ্ত হয়, এই আশঙ্কা মীরণ ও মীরজাফর উভয়েরই মনে বলবতী হইয়াছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণের সহিত যোগ আছে বলিয়া সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসা চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদিত করিতে বাধ্য হন। আরও কতকগুলি পুরাতন কর্ম্মচারী সেই দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা যিনি মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, মীরণ তাঁহার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার ভগিনীপতি ইতিহাসবিখ্যাত মীর কাসিম। মীর কাসিম অনেক দিন হইতে বাঙ্গলার মসনদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; একমাত্র মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আপনার পক্ষকে অবাধ মনে করিতে পারিতেন না। মীরণ যে ইহা বুঝিতেন না, এমন নহে; তবে সহসা ইহার কোনও উপায় করিতে

* [illegible] Meeran forewarned me of all this."—Tore[illegible]pire in

পারেন নাই বলিয়াই অনুমান হয়। ইংরাজদিগকে প্রভূতক্ষমতাশালী মনে করিলেও, মীরণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য তলে তলে আয়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি ধীরে ধীরে রাজ্যের সমস্ত ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন; বিশেষতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সৈনিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত সৈন্য ক্রমে মীরণের যারপরনাই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া উঠিল। মীরণ নিজেও অত্যন্ত সাহসী পুরুষ ছিলেন। প্রায়ই তিনি স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন। মীরণের এইরূপ অসাধারণ সাহস, রাজ্যশাসনে অধ্যবসায়, সুন্দর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্রমে ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা দেখিয়া, কুট-বুদ্ধি ইংরাজ যারপরনাই চিন্তিত হইলেন। প্রচলিত ইতিহাসে মীরণকে একটি গোঁয়ার রূপে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, মীরণের বেশ একটু রাজনৈতিক জ্ঞান ছিল, এবং তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নৃশংস কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। মীরণের এই রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় চতুরপ্রবর ইংরাজ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মীরণ ধীরে ধীরে আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিতেছেন, রাজ্যশাসনে বেশ দক্ষতা দেখাইতেছেন, সৈন্যদিগকে বাধ্য করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং ইংরাজদিগের প্রতি বিদ্বেষদৃষ্টি করিতেও ছাড়িতেছেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, হয় নিজেরাই বাঙ্গলার মসনদ দখল করিয়া বসিবেন, না হয় আর কাহাকেও তাহা প্রদান করিতে হইবে। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী পিটের নিকট লিখিত ক্লাইবের একখানি পত্র হইতে আমরা মীরণের প্রতি ইংরাজদিগের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। উক্ত পত্রে তিনি মীরজাফরের দুর্ব্বল রাজত্বের উল্লেখ করিয়া অতি সহজ ছলে বা কৌশলে নবাব হইতে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। তাহাতে মীরণকে ইংরাজদিগের বৈরী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, এবং মীরণ রাজ্যাধিকার পাইলে, ইংরাজদিগের পক্ষে নিরাপদ হইবে না বলিয়া লিখিত হয়। আরও লিখিত হয় যে, দুই সহস্র ইউরোপীয় চেষ্টা করিলে কোম্পানীকে রাজ্যভার গ্রহণ করাইতে পারে। * ইংরাজেরা আপনাদের

---

* "[illegible] he depicts the weakness of the Nawb's administration; hints th[illegible] could easily find a pretence for breaking with him; describes his [illegible] Meer[illegible] as so inimical to the English that it would be

হস্তে রাজ্যভার লইবার ইচ্ছা করিলেও সহসা তাহা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু মীরজাফর ও মীরণের হস্ত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে মীর কাসেম্ খাঁ মীরণের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বাঙ্গলার মসনদের প্রার্থী ছিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্লাইব ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছিলেন, হলওয়েল তখন কলিকাতার গবর্ণর। মীর কাসেমের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে, যেরূপে হউক, মীরণের ক্ষমতার হ্রাস করিতেই হইবে। কিন্তু এই পরামর্শে মীরণকে এ জগৎ হইতে চিরাপসারিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল কি না, ইহাই এক্ষণে বিবেচ্য। ইতিহাস কিন্তু সে বিষয়ে কতটা সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, আমরা পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা পাইব।

ইংরাজ ও মীরণ উভয়ে উভয়কে অন্য চক্ষে দেখিলেও, কোন একটি রাজনৈতিক কারণের জন্য আপাততঃ উভয়কে মিলিত হইতে হইল। মীর জাফরের রাজত্বে অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় ও বিহার প্রদেশ সাহজাদা আলিগহর (পরে বাদশাহ সাহ আলম) কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সকল বহিঃশত্রুর দমন করা প্রথমে অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয়ের শক্তি পৃথগ্‌ভূত হইলে বিশেষ কোনও ফললাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, 'শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি' হইল। কিন্তু উভয়ে উভয়ের প্রতি উত্তমরূপে লক্ষ্য রাখিলেন। পাটনা, পূর্ণিয়া প্রভৃতির বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তাকে দমন করিয়া, তাঁহারা সাহজাদার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। ক্লাইব ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণেল ক্যালিয়ার্ড ইংরাজ সেনার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মীরণ ও কর্ণেল সাহজাদার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পাটনার নিকট উপস্থিত হন। সেই সময়ে পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা খাদেম হোসেন খাঁ সাহজাদার সহিত যোগ দিবার জন্য বিহারে উপস্থিত হইতেছিলেন। তিনি পাটনার নিকট গঙ্গার পরপারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। মীরণ ও কর্ণেল প্রথমতঃ তাঁহাকেই আক্রমণ করা উচিত মনে করিয়া গঙ্গা পার হইলেন। খাদেম হোসেন জানিতেন যে, এই মিলিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু বর্ষার নদীপ্লাবনের জন্য তিনি পিছু হটিতে অসমর্থ

---

unsafe trusting him with the succession; and that 2000 E[illegible]s would enable the company to take the sovereignty upon themse[illegible] Torrens' Empire in Asia pp. 42—43

হওয়ায় যুদ্ধে সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করিলেন, এবং একেবারে মীরণের সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। মীরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুদ্ধে আহত হওয়ায়, এক্ষণে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, ও কর্ণেলকেও বিপক্ষ পক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতে নিষেধ করিয়া পাঠান। কিন্তু শত্রুকে একেবারে অগ্রসর হইতে দে[খিয়া] অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। খাদেম হোসেন পলায়ন করিয়া একটি জ[ঙ্গলে] আশ্রয় লন। সেইখানে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছিল।

পরদিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, সে সময় বর্ষাকাল। রা[ত্রি] দশটা হইতে মুষলধারে বৃষ্টি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝটিকা আরম্ভ হইয়া প্রলয়ে[র] ন্যায় করিয়া তুলিল। মীরণ একটি বৃহৎ তাম্বুতে ছিলেন। ঝড়বৃষ্টির বেগবৃদ্ধি দেখিয়া তিনি দিলারখানি পাল নামে একটি ক্ষুদ্রাকার তাম্বুতে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুই চারিটি স্ত্রীলোক থাকিত। সেদিন যে স্ত্রীলোকটি ছিল, তাহাকে তিনি অগ্রেই বিদায় দিয়াছিলেন। কেবল একটি-মাত্র ভৃত্য সংবাহনক্রিয়ার জন্য ও এক জন কাহিনীকথক তাঁহার নিদ্রাকর্ষ-ণের জন্য তাম্বুমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ক্রমে ঝড়বৃষ্টির বেগ আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর প্রকৃতি কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিলে দৃষ্ট হইল যে, মীরণ ও তাঁহার অনুচরদ্বয়সহ চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যখন তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তখন বজ্রাঘাত ব্যতী[ত] আর কি হইতে পারে? কাজেই রাষ্ট্র হইল যে, বজ্র[াঘা]তেই মীরণের মৃত্যু হইয়াছে! যে কোনও কারণেই হউক, প্রথমতঃ কি[ন্তু মৃত্যুসংবা]দ গোপন করিয়াই রাখা হয়, পরে বজ্রাঘাত বলিয়া রাষ্ট্র করা হয়। কিন্তু মীরণের পরি-ণাম যে কত দূর রহস্যময়, আমরা পরে তাহা দেখাইতেছি।

মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যুর সহিত আর একটি ঘটনার একটু বিশেষরূপ সম্বন্ধ আছে, এবং সেই জন্য উক্ত বজ্রাঘাতে মৃত্যু সাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সে বিষয়ে অন্যরূপ মনে করিয়া থাকেন। মীর[ণের আ]দেশে যখন তাঁহার অনুচর কর্তৃক সিরাজের মাতা আমিনা ও মাতৃ[ষ্বসা] ঘেসেটী সলিলগর্ভে চিরসমাহিত হন, সেই সময়ে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন বজ্রাঘাতে মীরণের মৃত্যু হয়। * কেহ কেহ বলেন যে, যে দিন তাঁহারা সলিলগর্ভে আশ্রয় লন, সেই রাত্রি-

* আমাদের কবি আবার ইহার উপর আর একটু রঙ্গ চড়াইয়া বলিয়া[ছেন]—"বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে মরিবে মীরণ।" প্রকৃত অভিশাপবাক্যে বিনা মেঘের কথা ন[াই।]

তেই মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার এক মাস পরে মীরণের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অনুসন্ধানে ইহা স্থির হইয়াছে যে, তাঁহাদের মৃত্যুর ৯১০ দিন পরে মীরণ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের [illegible] অভিশাপবাক্য মীরণের মৃত্যু ব্যাপারের সঙ্গে মিশাইয়া সাধারণের মনে বজ্রাঘাতেই মৃত্যু বলিয়া বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং মীরণের রহস্যময় পরিণাম গোপন করিবার এই একটি উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তৎকালে অনেকের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, ইংরাজগণের মন্ত্রণায় মীরণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়; বস্তুতঃ বজ্রাঘাতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে নাই। মীরণের মনে ইংরাজবিদ্বেষ বদ্ধমূল হওয়ায় ও তাঁহার স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী থাকায়, ইংরাজেরা তাঁহাকে চিরাপসারিত করিবার জন্য এইরূপ কাণ্ডের অবতারণা করিয়াছিলেন। এই সময় মীর কাসেমের সহিত তাঁহাদের গোপনে সন্ধি হয়, এবং মীর কাসেমও যে এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, ইহাও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ক্রমে ইংরাজদিগের ও মীর কাসেমের এই গুপ্ত মন্ত্রণা [illegible] মীর কাসেমেরই স্কন্ধে পড়িয়া যায়। কারণ ইংরাজ [illegible] গাহিতে বড়ই দক্ষ। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুধাবন [illegible] কতদূর [illegible] পাইবার যোগ্য, তাহা [illegible] কতকগুলি যুক্তি [illegible] বলিয়া [illegible] বার প্রয়াস [illegible] তাহার যুক্তিগুলি [illegible] পরে দেখাইব। [illegible] লিখিতে বাধা [illegible] কি. ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন [illegible] জনক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। [illegible] মানার অভিশাপবাক্য মীরণের [illegible] মাস পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল [illegible] আশ্চর্য্য হইলেও ইহা সত্য যে, [illegible] গবর্মেণ্টের মন্ত্রণানুসারে ঘটিয়াছিল [illegible] বাক্যে ও কার্য্যে স্বাধীনতার ভাব [illegible] ঈর্ষাপরবশ ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এইরূপ স্থির হয় যে, মীর কাসেম খাঁ সেই সময় হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে ইংরাজ গবর্ণর হলওয়েলের সহিত সন্ধিসূত্রে আ[illegible]ছিলেন। যত দিন মীরণ জীবিত থাকিতেন, তত দিন পর্য্যন্ত

পর অনুবাদক মহাশয় ইহাকে যথার্থতঃ বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। আমরা পরে তাঁহার যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া তাহাদের [illegible]দানে চেষ্টা পাইব। এক্ষণে সাধারণে বিচার করিয়া দেখুন যে, অনুবাদক মহাশয়েরই লিখিত [illegible]দ্ধৃত অংশ হইতে মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হয় কি না? [illegible]শেষতঃ ইংরাজদিগের কর্ণেল, কাপ্তেন প্রভৃতিও যখন এ বিষয়ে সে[illegible] করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে এক [illegible]ন্যা বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন, তখন সাধারণে যে ইহাতে সন্দিহান হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অনুবাদক, ইংরাজ অর্থে এখানে ইংরাজ গবর্মেণ্ট, অর্থাৎ গবর্ণর ও তাঁহার সঙ্গীদিগের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন; কারণ ইংরাজ কাপ্তেন, কর্ণেল প্রভৃতি এই চক্রান্তের বিষয় জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস; নতুবা তাঁহাদের এ বিষয়ে সন্দেহ ও অনুসন্ধানের কথা তিনি উল্লেখ করিবেন কেন? ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে যে, ইংরাজ কর্ণেল ও কাপ্তেনের অজ্ঞাতে এই চক্রান্তের আয়োজন হইয়াছিল। অন্ততঃ তাঁহাদের উক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান ও সন্দেহ হইতে ইহাই বিবেচিত হয়। কিন্তু পরিশেষে সকলে মিলিয়া যে ব্যাপারটিকে চাপিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও কতকটা সত্য। ফলতঃ এ বিষয়ে যখন প্রধান প্রধান ইংরেজেরাও সন্দিহান হইয়াছিলেন, তখন আমরা অনুবাদক মহাশয়ের ন্যায় ঘটনাটিকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া বজ্রাঘাতের সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। এ বিষয়ে আমরা আরও প্রমাণ দিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীরণের সহিত এক জন ভৃত্য ও জনৈক কাহিনীকথক শিবিরমধ্যে ছিল এবং তাহারাও মীরণের দশা প্রাপ্ত হ[illegible]। মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, সে রাত্রির ঝড়বৃষ্টি কিছু ক্ষণ পরে শান্তভাব ধারণ করিলে, যে সকল ভৃত্য বাহিরের প্যাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা পূর্ব্বোক্ত ভৃত্যদ্বয়কে বিশ্রাম দিবার জন্য তাম্বুমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, মীরণ ও তাঁহার সেই অনুচরদ্বয় চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন। তাহারা সেই দৃশ্য দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইলেও কোনরূপ গোলযোগ না করিয়া কয়েক-

[illegible]wledge, keen geninus. and much information spoke in strong terms of what they called this dark affair"—Mutakherin, English Translation, pp. 32-33. Translator's note.)

জন কর্ম্মচারীকে জাগরিত করেন। তাহারা সকলে নিঃশব্দে তাম্বুমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মীরণের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, তাঁহার মস্তকে অনেকগুলি ছিদ্র রহিয়াছে। সেগুলি ৫।৬ টির কম [illegible] না। উদরে ও পৃষ্ঠেও ৬।৭টি দাগ দেখিতে পায়, সেগুলি [illegible] প্রায়। সে কালের সংস্কারানুসারে উপদেবতাগণের [illegible] জন্য মস্তকের নীচে যে একখানি অস্ত্র রক্ষিত হইত, [illegible] ছিদ্র লক্ষিত হয়। কিন্তু মস্তকের নিকটস্থ শয্যার কা[illegible] [illegible] বারে দোষ হইয়াছিল।*
মুতাক্ষরীণকার ইহাকে বজ্রাঘাতের চিহ্ন বলিয়াই [illegible] করিয়াছেন, তাঁহার লিখনভঙ্গীতে ইহাই বোধ হয়। কিন্তু তাঁহার [illegible] পাঠ করিলে বুদ্ধিমানের সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, বজ্র[illegible] কখনও নিঃশব্দে হয় না, নতুবা বহিঃস্থ ভৃত্যেরা তাহা জানিতে পারে নাই কেন। জানিতে পারিলে তাহারা পূর্ব্বেই কি ইহার অনুসন্ধান করিত না, এবং তাহা লইয়া কি শিবিরমধ্যে কোনও গোলযোগ হইত না? [illegible] নিঃশব্দে [illegible] মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা [illegible] কি না [illegible] হইতে অগ্নিদাহের কোনও চিহ্নই দেখিতে পায় নাই, মুতাক্ষরীণে [illegible] কোনও উল্লেখ নাই। বজ্রপাতে নিশ্চয় অগ্নিদাহ হইবার কথা, কিন্তু [illegible] বাহির হইতেও অগ্নি জ্বলিতে দেখে নাই, নতুবা নিঃশব্দে [illegible] প্রবেশ করিবে কেন? এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াও তাহার [illegible] চিহ্নই দেখিতে

* "The rain and storm having closed [illegible], the servants [illegible] wached without, and whose turn it was [illegible] two others that were on duty, came into the tent, and found Miran with the two unfortunate youths, plunged in the endless sleep [illegible] and although such a sight did much surprise and frighten them, they recollected their minds enough to awaken some officers and some other persons, without tumult and noise. These getting [illegible] to the tent, examined the body, found that it had no fewer than five or six holes on the head, with six or seven streaks on the belly and back; and these last looked like so many strokes, inflicted by an angry whip. On the sabre, which was close to his pillow, they discovered two or three holes, where the metal seemed to have run; but the wood of his bed towards his head was entirely rotten."—Mutaqherin, Translation, pp 127 28.

পায় নাই। অনুবাদক যে তাবুদাহের কথা লিখিয়াছেন, মূল মুতাক্ষরীণের সহিত তাহার সামঞ্জস্য হয় না। সুতরাং তাবুদাহের কথা যে কত দূর সন্দেহ-জনক, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারিতেছেন। তাহার পর মৃতদেহের ছিদ্রের কথা। কত লোক বজ্রাঘাতে মরিয়াছে, কিন্তু কাহারও মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র হইতে আমরা দেখি নাই, বা শুনি নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কো[illegible]বনাই নাই। বৈদ্যুতিক শক্তি নূতন ছিদ্র করিয়া কখনও কোন পদা[illegible]ধ্যে প্রবিষ্ট হয় না। সুতরাং মীরণের মস্তকের ছিদ্র কোথা হইতে আসিল? মুতাক্ষরীণকার বজ্রাঘাতে মৃত্যু বিশ্বাস করিয়া, মস্তক ও তন্নিম্নস্থ অস্ত্রে সাধারণ সংস্কারানুসারে ধাতুনির্ম্মিত বজ্র কর্ত্তৃক ছিদ্র হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ যে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল, তাহারও উল্লেখ করিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বিশ্বাস যাহাই থাকুক, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা কি আমাদের পক্ষ সমর্থন করি-তেছে না? এক্ষণে আমরা বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মুতাক্ষরীণ-কারের বর্ণনা হইতে মীরণের মৃত্যু কি প্রকারে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়? বজ্রাঘাতে, না বন্দুকের গুলিতে, অথবা আর কোনও আঘাতে? অনেকে বলিতে পারেন যে, বজ্রাঘাত যেমন নিঃশব্দে হয় নাই, বন্দুক-চালনাও ত সেইরূপ হইতে পারে। তবে ইহাও বিবেচ্য যে, একটা সৈন্যশিবিরে কত কারণে কত দিকে বন্দুকের শব্দ হয়, তাহা সকলে লক্ষ্য করে না; এবং তাহা তাদৃশ কৌতূহলের বিষয়ও নহে। বিশেষতঃ, ঝড়বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বন্দুকের শব্দ লীন হইতেও পারে, কিন্তু বজ্রাঘাতের শব্দ সকল শব্দকে অতিক্রম করিবেই করিবে। বৈজ্ঞানিকেরা যখন প্রমাণ দিতেছেন যে, বজ্রপাতে মস্তকে ছিদ্র হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, এবং মীরণের মস্তকে ৫।৬টি ছিদ্র ছিল, এবং অন্যান্য যথেষ্ট সন্দেহের কারণ দেখা যাইতেছে, তখন মীরণের হত্যাব্যাপার যে একেবারে ভিত্তিহীন নহে, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তৎকালীন প্রধান প্রধান ইংরাজ সেনানীর সন্দেহ এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও মীর কাসেমের গুপ্ত পরামর্শে মীরণের অনুচরদিগের মধ্যে কোনও বিশ্বাসঘাতকের দ্বারাই হউক, অথবা কোনও [illegible]রের দ্বারাই হউক, এই নৃশংস ব্যাপার যে সম্পাদিত হইয়াছিল, এরূপ [illegible]ান অসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে ইংরাজ ও মীর কাসেম উভয়েই যে [illegible] ছিলেন, সে সময়ে লোকের মনে এইরূপ সংস্কার [illegible]ছিল।

কেবল মীর কাসেম কর্ত্তৃক এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির সময় ইংরাজ তাঁহাকে দোষী করিতে কদাচ বিরত হইতেন না, এবং তাহা লইয়া বিলক্ষণ হুলস্থূল বাধাইতেন। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া কোনরূপ উচ্চবাচ্য হয় নাই, এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু রাষ্ট্র করিয়া, তাহাই বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করা হয়।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুতাক্ষরীণের অনুবাদক মহাশয় কতকগুলি যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া উহাকে বজ্রাঘাত প্রমাণ করিবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা তাঁহার সেই যুক্তিগুলির উল্লেখ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার যুক্তিগুলি এই ;—(১) বজ্রপাত ঘটার বিশেষ সম্ভব। (২) যে কেহ হত ও দগ্ধ হয়, তাহার দেহ বজ্রাহত দেহ হইতে দেখিতে বিভিন্নপ্রকার। (৩) তিন জন একইরূপে আহত হয়, এবং তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ যাহা দেখিয়াছিল বা শুনিয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিত। (৪) দেহটাকে সমস্ত দিন হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হয়, এবং সাধারণে মস্তক, পদদ্বয় ও সমস্ত দেহই দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল। (৫) কৌতূহল ও অনুসন্ধাননিবৃত্তির জন্য মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ সমাহিত করা হয় নাই, কিন্তু ছয় দিনের পরে (অর্থাৎ পাটনা হইতে রাজমহলে প্রেরিত হইয়া) বহু লোকের চক্ষের সমক্ষে মুসলমান-শাস্ত্রানুযায়ী কুড়ি ত্রিশ প্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সমাহিত করা হইয়াছিল। (৬) মীর কাসেম এই চক্রান্তের জন্য পরিশেষে, এমন কি, তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পরও নিন্দিত হন নাই। (৭) এই জনপ্রবাদ ক্রমশঃ লয় পাইয়াছিল। ইংরাজদিগের প্রভুত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া এইরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। উপরে তাঁহার যুক্তিগুলির মর্ম্মার্থ প্রদত্ত হইল। কিন্তু এগুলি কত দূর সারপূর্ণ, তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। তাঁহার প্রথম যুক্তি অনুমানমাত্র। রাত্রিতে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল, অতএব বজ্রপাতেরই সম্ভব। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বাহিরের ভৃত্যগণ বজ্রপাতের শব্দও শুনিতে পায় নাই, তাম্বুদাহও দেখিতে পায় নাই। বজ্রপাত হইলে শিবিরের অন্যান্য লোকেরাও জানিতে পারিত। নিঃশব্দে কখনও বজ্রপাত হয় না, ঝড়বৃষ্টি কেবল বজ্রপাতের সহায়ক নহে, হত্যারও [illegible]য়ক ; কারণ ঐরূপ রজনীতে ঐ প্রকার তামসব্যাপার ঘটিবার বিশেষ [illegible]যোগ। দ্বিতীয় যুক্তিরও উত্তর আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি যে, মীরণের দেহের চি[illegible] [illegible]হত দেহের চিহ্ন হইতে পৃথক। বজ্রাহত ব্যক্তির [illegible] পাঁচ ছয়টি ছি[illegible]

থাকিতে পারে না ; কিন্তু মীরণের মস্তকে বস্তুতঃ তাহাই ছিল। তৃতীয় যুক্তিতে তিনি বলিতেছেন যে, তিন জন একইরূপে আহত হইয়াছিল ; হত্যা হইলে কি তাহা হইতে পারে না ? আর তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা যে প্রকাশ করে নাই, এ কথাই বা কে বলিল ? তাহা না হইলে এই ঘটনা সন্দেহজনক বলিয়া লোকের মনে ধারণা হইবে কি প্রকারে ? অবশ্য কোনও না কোনও প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম যুক্তির উত্তর আমরা এক সঙ্গে প্রদান করিতেছি। উক্ত দুই যুক্তির মর্ম্ম এই যে, মৃতদেহ সমস্ত দিন হস্তি-পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া রাখিয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল। এবং পাটনা হইতে রাজমহলে আনীত হইয়া তাহা বহুলোকের চক্ষের সমক্ষে সমাহিত হয়। হত্যা হইলে অবশ্য মৃতদেহ গোপনের চেষ্টা হইত। বোধ হয়, তাঁহার যুক্তির ভাবার্থ এই, সাধারণ লোকে দেখিয়া তাহাকে হত্যা বলিয়া সন্দেহও করে নাই। অনুবাদক যাহা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রকৃত নহে। মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে ঝুলাইয়া সাধারণকে পরীক্ষা করিবার অবকাশ দেওয়া হয় নাই। বরঞ্চ ইহা মৃতদেহ নহে, কিন্তু রোগীর দেহ, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। মীরণের মৃত্যুসংবাদে পাছে সৈন্যদিগের মধ্যে গোলযোগ ঘটে, এই আশঙ্কা করিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশে মৃতদেহ হইতে নাড়ী প্রভৃতি বাহির করিয়া রোগীর দেহের ন্যায় ঝুলাইয়া রাখা হয়, কিন্তু পরিশেষে লোকে মৃতদেহ বলিয়া বুঝিতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি যে, নাড়ী সকল বাহির করিবার পর সে দেহ পূর্ব্বদেহ হইতে কি কিছু পরিবর্ত্তিত হয় নাই ? ঐরূপ একটি ক্রিয়া করিলে নিশ্চয়ই তাহার পরিবর্ত্তন সম্ভব। সুতরাং দেহে পূর্ব্ব রাত্রিতে যে চিহ্ন ছিল, ঠিক সেইরূপ চিহ্ন কি লোকে দেখিতে পাইয়াছিল ? তদ্ভিন্ন প্রথমতঃ তাহাদিগকে মৃতদেহ বলিয়া বিশ্বাস করিবারই অবকাশ দেওয়া হয় নাই। তাহার পর যখন রাজমহলে নানাপ্রকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়, তখন সে দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, এবং তজ্জন্যই তাহা রাজমহলে সমাহিত করা হয়। নতুবা সম্ভবতঃ তাহা মুর্শিদাবাদে আনীত হইত। গলিত দুর্গন্ধ দেহ দেখিয়া কেহ কি তাহার মৃত্যুচিহ্ন কেবল চক্ষুর দ্বারা বুঝিতে পারে ? ঐ মৃতদেহকে, রোগীর দেহের ন্যায় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ও দুর্গন্ধের জন্য রাজমহলে সমাহিত করা, মুতাক্ষরীণে স্পষ্টরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে। * সুতরাং অনুবাদক

* "He (colonel) immediately adopted the opinion that this de[illegible]

কের উক্ত যুক্তি কত দূর সুসঙ্গত; সাধারণে তাহার বিচার করিবেন। ষষ্ঠ যুক্তির উত্তরও পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। ইংরেজরাও সেই চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া কেবলই মীর কাসেমের নিন্দা হয় নাই। আর এ সম্বন্ধে যে কোন প্রকার কথাবার্ত্তাই হয় নাই, ইহাই বা কে বলিল? অনুবাদক মহাশয় ২৮।২৯ বৎসর পরে সে কথা নিজ গ্রন্থে উল্লেখই বা কি করিয়া করিলেন? নানা চেষ্টায় ইহাকে বজ্রাঘাত সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই অভিশাপবাক্যের সহিত মিলাইয়া, লোকের মনে বজ্রপাতের ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাজেই পরিণামে মীর কাসেম ও ইংরাজ অব্যাহতি পাইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সপ্তম যুক্তিতে ক্রমশঃ প্রবাদটি যে লয় পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, তাহারও উত্তর একই। বজ্রপাতের ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়ায় কাজেই তাহা ধীরে ধীরে লয় পাইয়াছিল। অবশ্য ইংরাজের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া কোন কোন প্রবাদের সৃষ্টি হইবার সম্ভব বটে, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ক্ষমতাশালী, অন্ততঃ একটু কারণও না থাকিলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন একটি প্রবাদের সৃষ্টি করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। অনুবাদক মহাশয় যতই কেন বলুন না, ইংরাজদিগের প্রতি এ সন্দেহ কদাচ একেবারে দূর হইতে পারে না। সিরাজদ্দৌলার মাতা ও মাতৃস্বসার অভিশাপবাক্যের আবরণে তাহাকে বজ্রপাতে পরিণত করা হই-

---

ought to be kept secret; and he ordered the entrails and other parts to be taken out of the body, and buried; but the body itself to be carried about, as if Miren kad been only sick. Next day he beat the general and marched off, the body being carried' stretched on the hoodah of an elephant. The feet hanging outwards, as those of a sick man, but that very moment it became public that it was only a dead body stretched on an elephant." * * *

"meanwhile Miren's body having been put into a coffin was carried rapidly upon chair-men's shoulders to the Ganges, where it was put in a boat, and carrid down the river, as far as Radge-Mahal, where the abominable stench that exhuled from it obliged the messengers to land it immediately and it was buried in a spot which now goes by the name of his mohnment,—(Mutaqherin p. 123) ইহা অনুবাদক মহাশয়ের নিজেরই অনুবাদ। এগুলিও অন্ততঃ তিনি নিজে বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিতেন।

আছে। সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত একেবারে অমূলক কি না? মীরণের বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মৃতদেহ আর দেখিতে পান নাই। দেহ মুর্শিদাবাদে আনীত হয় নাই; বিকৃত হওয়ায় রাজমহলে সমাহিত করা হয়। অদ্যাপি রাজমহলের সরিফা-বাজারে অসংস্কৃত অবস্থায় তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। মীরণের মৃত্যুতে মীরজাফর আপনাকে দক্ষিণহস্তশূন্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; ইহার কিছু দিন পরে ইংরাজেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীর কাসেমকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ প্রদান করিলেন। অনেক দিন হইল, মীরণ এ জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়াছেন। কিন্তু আজিও মুর্শিদাবাদের নবাব-প্রাসাদে বাজপক্ষী হস্তে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি, সেই রহস্যময় পরিণামের কথা স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দেয়।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

বৃষ্টি-রহস্য।

কুহেলিকা ও মেঘ, গঠন ও উপাদানে এক; তবে কুহেলিকা ভূপৃষ্ঠের নিকটে সমুদ্ভূতা হন, তপনতাপে বাতাসের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অদৃশ্য হন। আর মেঘ দূরগগনে বায়ুর স্রোতে নানা রঙ্গে নাচিতে নাচিতে কখন শৈলমালার রচনা করে; কখন তাহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গিরি-উপত্যকা কন্দর কান্তারে পরিণত করে; আদিত্যের আলোক মাখিয়া উত্তালতরঙ্গভঙ্গে ধরার জলধিকে উপহাস করে। কিন্তু জলধরের এ বাহাদুরী কত ক্ষণ? পরিশেষে সেই সাগরে আসিয়াই ত আশ্রয় লইতে হয়।

মেঘবাহী বায়ু আপন অপেক্ষা শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে বা অন্য কারণে কথঞ্চিৎ উত্তাপ হারাইলে, উহা আর মেঘ বহন করিতে পারে না। তখন মেঘকণিকা [illegible] মিশ্রিত হইতে থাকে। এই মেশামিশি ও ঘেঁসা-ঘেঁসির [illegible] আকার ধারণ করিলে, উহা বায়ুস্তরের বাধা অতি-ক্রম ক[illegible] হয়। ইহাই বৃষ্টি।

আর একরকম করিয়া বলি। ধরাতলের জলরাশি আর্দ্র ভূখণ্ড, জীবশরীর ও উদ্ভিজ্জ হইতে বারিবাষ্পাকারে বাতাসে মিশিতেছে। জলের বাষ্প দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন বাতাসে অনেক উত্তাপ থাকে, তখন উত্তপ্ত

বায়ু বাষ্পাকারে পরিণত জলরাশিকে আপনার দেহে মিশাইয়া লইয়া আকাশ পানে উঠিতে থাকে। আকাশের উপরের বায়ু অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটস্থ বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত, এবং সেই জন্য "হাল্কা" বলিয়া উহা শীতলতর ও গুরুতর বায়ুস্তর ভেদ করিয়া, তৈলের জলস্তর ভেদপূর্ব্বক উত্থানের ন্যায়, উপরে উঠিতে থাকে। কিন্তু উঠিতে উঠিতে শীতলতর বায়ুর সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে আপন উত্তাপ হারায়। কারণ, উত্তাপ সকল বস্তুতে সমতা রাখিবার জন্য সতত ব্যাকুল। উষ্ণদুগ্ধপূর্ণ এক পাত্রকে শীতলজলপূর্ণ পাত্রে নিমজ্জিত করিলে, দুগ্ধ শীতল হয়, এবং জল উষ্ণ হইয়া থাকে। উত্তাপ কমিয়া গেলে বায়ু জলীয়বাষ্প ধরিয়া রাখিতে অক্ষম হয়। তখন জলীয়বাষ্প ক্ষুদ্র কণিকার আকার ধারণ করিয়া মেঘ হইয়া বায়ুভরে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে। বায়ু অধিকতর শীতল হইলে মেঘও বহন করিতে পারে না; তখন মেঘের কণা সকল একত্র মিশিয়া পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। নিপতিত হইতে হইতে ঐ কণা যদি উষ্ণ বায়ু স্পর্শ করে, তবে আবার জলীয়বাষ্প কিংবা মেঘ হইয়া যায়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, শীতলতর বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া যখন জলীয়বাষ্পবাহী উষ্ণতর বায়ু শীতল হইতে থাকে ও জলীয়বাষ্প মেঘ কিম্বা বারিকণায় পরিণত হয়, তখন ঐ শীতলতর বায়ুও উত্তপ্ত হইতে থাকে; তবে কেন জলীয়বাষ্প সেই নবোত্তপ্ত বায়ুর আশ্রয় গ্রহণ করে না? কিন্তু নিয়মের ও নয়ামর বিধির বিধান অন্যরূপ। পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন ক নামক বায়ুতে যদি ম পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, এবং পরিমিতউত্তাপসম্পন্ন খ নামক বায়ুতে যদি প পরিমিত জলীয়বাষ্প থাকে, তবে ক ও খ বায়ুর সংমিশ্রণে যে বায়ুরাশি হইবে, তাহার উত্তাপের পরিমাণ ত হইবে বটে, কিন্তু ক [illegible] মিত উত্তাপসম্পন্ন বায়ু ম+প পরিমিত জলীয়বাষ্প ধারণ করিতে সক্ষম হইবে না। বায়ুর উত্তাপ ২, ৫, ৮, ১১ ইত্যাদি পাটীগণিতিক অনুপাতে হ্রাস হয়; কিন্তু বায়ুর জলীয়বাষ্পধারণশক্তি ২, ৮, ৩২, ১২৮ ইত্যাদি জ্যামিতিক অনুপাতে কমিতে থাকে। এক ঘনফুট বায়ুর যখন [illegible] ডিগ্রি, তখন উহাতে ৪·১ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে, ঐ বায়ুর উ [illegible] তখন উহাতে ৮ গ্রেণ জলীয়বাষ্প থাকে। এই উভয় বায়ু [illegible] তাহার উত্তাপ ৬০ ডিগ্রি হইবে; কিন্তু বিমিশ্রিত বায়ুর প্রতি ঘনফুটে ৫·৮ গ্রেণের অধিক জলীয়বাষ্প বিরাজ করিতে পারে না; সুতরাং এ দুই বায়ুর সংমিশ্রণে প্রতি ঘনফুটে ·২৫ গ্রেণ পরিমিত জলীয়বাষ্প মেঘরূপে পরিণত হইবে।

শীতলতর বায়ুর সহিত মিশিয়াই যে বায়ু শীতল হইয়া জলীয়বাষ্পধারণ-শক্তি হারাইয়া থাকে, তাহা নহে। তাড়িতশক্তিবলে অথবা শীতল শৈলমালা ও তজ্জাত অরণ্যের সংস্পর্শেও উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে থাকে। এই জন্য পর্ব্বতের গাত্রে দূর হইতে মেঘ লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। বোধ হয়, এই জন্য আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, মেঘ সকল পাহাড়ে শালপাতা খাইতে যায়।

ভূপঞ্জরের ও ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক অসামঞ্জস্য, সমীরস্রোতের পরিবর্ত্তন ইত্যাদি বিবিধ কারণে পৃথিবীর সকল স্থানে সমান বৃষ্টি হয় না, এবং এক স্থানেও বৎসরের সকল সময় সমান বারিপাত হয় না। মিশর দেশ, শাহারার মরুভূমি, পারস্যের ও মঙ্গোলিয়ার মালভূমি, আরবের পার্ব্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি অনেক স্থানে আদৌ বৃষ্টি হয় না। উত্তর ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বারিপাতের অত্যধিক অসামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হয়। খাসিয়া পর্ব্বতস্থিত চেরাপুঞ্জিতে প্রতি বৎসর পাঁচ শত হইতে ছয় শত ইঞ্চি বারিপাত হইয়া থাকে; আবার পশ্চিমে জাকোবাবাদের বার্ষিক বারিপাত সাড়ে চারি ইঞ্চির অধিক নহে। তথায় কোন কোন বৎসর কেবলমাত্র এক ইঞ্চিও জল হইয়া থাকে। দক্ষিণ ভারতেও বারিপাতপরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি সামান্য নহে। পশ্চিমঘাটের বৌরাদুর্গে ২৫১ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়; এবং তথা হইতে কেবলমাত্র ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী গোকাকে ২২ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া থাকে। এক স্থানে প্রতিবৎসরই যে সমান বৃষ্টি হয়, তাহা নহে। দেখিয়া শুনিয়া যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে প্রদেশের বার্ষিক বারিপাত সমধিক, তথায় প্রায় প্রতি বৎসর সমপরিমিত বৃষ্টিই হইয়া থাকে. এবং যেখানে বারিপাত স্বল্প, তথায় বৎসর বৎসর বারিবর্ষণপরিমাণের বিলক্ষণ ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। দক্ষিণ মহাসাগরের জলীয়বাষ্প হিমগিরির পরপার তিব্বতে কদাচিৎ যাইতে পারে; হিমালয়ের গ্রেট রঙ্গিৎ উপত্যকা ও তাহার কিছু উত্তরবর্ত্তী স্থানে প্রায় এক শত ফুট জল হয়। নেপাল উপত্যকায় কাটামুণ্ডু নগরের বার্ষিক বারিপাত ৫৭ ইঞ্চি; [illegible] নামক স্থানে আড়াই ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না।

গ্রী[illegible]বাহ ভারতের অধিকাংশ জল আনয়ন করে। জুন হইতে [illegible] কয়েক মাসই বোম্বাই প্রদেশে বৃষ্টির মত বৃষ্টি হয়। বঙ্গদেশ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, পঞ্জাব, রাজপুতানা, হাইদ্রাবাদ, ডেকান, বেরার, গুজরাট, দক্ষিণ-ভারতের পশ্চিমোপকূল প্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে এই সময় অধিক বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণপূর্ব্বভাগ, কর্ণাট,

পূর্ব্বঘাট শৈল ও সিংহলের পূর্ব্বার্দ্ধে সে সময় বারিপাত হয় না। তথায় বর্ষাকাল অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর পর্যান্ত; সেই কয়েক মাস বঙ্গোপসাগরের উত্তরপশ্চিমাংশে উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে, এবং উত্তর-পূর্ব্ব মনস্থুন সমীর মন্দ মন্দ গতিতে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণার্দ্ধ ও কর্ণাট দেশে গিয়া উপনীত হয়। এ সময় বর্ষা দক্ষিণাভিমুখে গমন করে; অবশেষে ডিসেম্বর মাসের শেষে, যেখানে চিরবর্ষা বিরাজমানা, সেই বিষুব রেখার দুই পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে গিয়া মিশিয়া যায়।

ভারত গবর্মেণ্টের হাওয়া আপিস (Meteorological Department) নানা স্থানে যন্ত্র বসাইয়া জল ও বায়ুর গতি-ক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেই সকল স্থানের দর্শনফল প্রত্যহ তারযোগে বিজ্ঞানবিৎ সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীর নিকট যাইতেছে। তিনি তাহা অনুধাবন করিয়া তাঁহার দর্শনফল সাধারণ্যে প্রচার করিতেছেন। তাহাতে নাবিকগণের যে পরিমাণ উপকার হইতেছে, কৃষককুলের সেরূপ হইতেছে না। তাহার কারণ এই যে, জলবায়ুব বিজ্ঞানের এখনও কিশোরকাল। বৎসরে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, কোন মাসে কিরূপ বৃষ্টি হইবে, তাহা অনেকটা দৃঢ়রূপে জানুয়ারি মাসে বলিবার ক্ষমতা এখনও এই বিজ্ঞানের হয় নাই। অধ্যাপক ইলিয়ট ও পেডলার প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণ বিজ্ঞানের পুষ্টির জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন; এবং দশ বৎসর পূর্ব্বে যে অন্ধকার ছিল, কিয়ৎপরিমাণে তাহার অপনয়ন করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু বৃষ্টিপাতের মোটামুটি নিয়ম ভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহের এখনও কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বহুকালের অধ্যবসায় ও পর্য্যবেক্ষণ ভিন্ন তাহা সাধিত হইতে পারে না।

আমাদের দেশে বৃষ্টিসংক্রান্ত নানাবিধ প্রবাদ আছে। পৌষ মাসের বাতাস দেখিয়া কৃষকেরা আগামী বর্ষের বৃষ্টি কিরূপ হইবে, তাহার একটা অনুমান করিয়া লয়। পশ্চিম বঙ্গে ইহাকে "মাস শোধা" বলে। ইহা ব্যতীত খনা ও ডাকপুরুষের বচন বলিয়া অনেক পদাবলী লোকমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। একটি,—

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গায়, খশুরকে বল বাঁধতে আল,
আউলে বাউলে দিচ্চে বায়। আজ না হয় হবে কাল।

১২৯৪ সালে "হিন্দুরঞ্জিকা" পত্রে পরাশরের একটি বচন প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা এই,—

আষাঢ়চন্দ্র সিতে পক্ষে নবম্যাং যদি বর্ষতি।
বর্ষত্যেব সদা দেবস্তদাদ্যাষ্টৌ কুতো ফলং॥
শুক্লাষাঢ়নবম্যামুদয়গিরিবিতটীনিষ্কলঙ্কে প্রদোষে
ক্ষীরং কালঃ বিধত্তে ধবলকরকিরণো মণ্ডলাকারমুগ্রং।
শীতাংশুস্তর্কবিদ্ধোঽথবা যদি ভবতি ন পূর্ণমাসানোঽস্তশৈলে
তাবৎ পাতু ক্রমেব প্রনদতি জলদো [illegible] তুলাদ্রাঃ॥

এই পরাশরীয় শ্লোকের যে অনুবাদ লোকমুখে বিচরণ করিতেছে, তাহাও উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। যথা,—

আষাঢ় নবমী শুকুল পাখা,
তাতে আছে জলের লেখা॥
[illegible] উমি ঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥
[illegible] ঢাকে জল ঝণা।
পক্ষে লাগে সমুদ্রের ফেনা।
যদি বহে মুষল ধারে,
মধ্য সমুদ্রে বগুলা চরে॥
যদি সূর্য্য ডুবে বসে পাটে।
চাষার গরু বিকায় হাটে॥

এরূপ অনেক বচন আছে। মিহিরা খনা অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার শ্লোক সকল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কোথায়, তাহার স্থির নাই। পরাশর ও খনা কোন প্রদেশের জন্য তাঁহাদিগের শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ, জগতের প্রাকৃতিক বৈষম্যে বারিপাতের প্রভূত ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পশ্চিম গগনে মেঘের উদয় হইলে বৃষ্টি আনয়ন করে; কিন্তু ঐ সময়ে জলপাই-গুড়িতে পূর্ব্বাকাশের মেঘই বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। বৃষ্টিসংক্রান্ত দেশীয় প্রবাদ ও শ্লোক সংগ্রহ করিয়া তাহার তথ্যানির্ণয় অধ্যবসায়সাপেক্ষ। আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও বিজ্ঞানজ্ঞ গ্রাজুয়েট কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন না?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল বারিবৃষ্টির কথা কহিলাম। কিন্তু সময় সময় যে বারি ভিন্ন অন্যান্য পদার্থ আকাশ হইতে ভূপতিত হয়, তাহার আলোচনা করা গেল না। মৎস্যবৃষ্টি, ভেকবৃষ্টি, প্রস্তরবৃষ্টি, রক্তবৃষ্টি, ইত্যাদি আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক ঘটনার বিষয় বারান্তরে বিবৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ভাষা ও সাহিত্য।

ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমাজের উন্নতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। কোন দেশের জাতীয় প্রকৃতি কি, তাহা বুঝিতে হইলে, অগ্রে জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা উচিত। সমাজের যখন যে অবস্থা ঘটে, জাতীয় সাহিত্য তখন সেই অবস্থার অনুরূপ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। ইংলণ্ড যখন বিলাসতরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল, বিষয়বাসনার পঙ্কিলভাবে ইংলণ্ডবাসিগণ যখন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন ইংলণ্ডে দূষণীয় নাটক ও সঙ্গীত প্রভৃতির কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। রাজসভায় এই কুপ্রবৃত্তিমূলক বিষয়ের আন্দোলন হইত; নাট্যশালায় এই কুচরিত্র ও কুদৃশ্যের আবির্ভাবে দর্শকগণ নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিত; প্রকাশ্য পথে, লোকালয়ে, বা বিপণীতে এই পাপাচার ও পাপময়ী কথা স্বকীয় আধিপত্য অক্ষুণ্ণভাবে রাখিত। সাহিত্যক্ষেত্রের কর্ম্মবীরগণের অসামান্য সাধুভাবে ও মহীয়সী প্রতিভায় এই প্রবৃত্তিস্রোত ক্রমে সঙ্কুচিত হয়। ইঁহাদের প্রতিপত্তিতে, ইঁহাদের গৌরবে, ইংলণ্ডের সাহিত্য প্রতিপত্তিশালী ও গৌরবান্বিত হইয়া রহিয়াছে।

এক সময়ে আমাদের সাহিত্যেও এইরূপ পঙ্কিলভাব পরিলক্ষ হইয়াছিল। যাঁহাদের ক্ষমতায় উহা অপসারিত হইয়াছে, তাঁহারা অনন্তকীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহাদের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। এখন যাঁহারা তাঁহাদের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতেছেন, তাঁহাদের একাগ্রতা ও উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু তাদৃশ ধীরতা ও গাম্ভীর্য্য নাই। উত্তম পুরুষের প্রাধান্যে আত্মহারা হইলে যে সকল কুফলের উৎপত্তি হয়, এখন তৎসমুদায় প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। যাহা হউক, এই অহংজ্ঞানী লেখকগণ কখনও সাহিত্যক্ষেত্রের অধিনায়ক হইতে পারিবেন না। ইঁহারা যে সকল বিষয় রাখিয়া যাইবেন, তৎসমুদয় সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনের সহায় হইবে কি না, ভবিষ্যদর্শিগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, কখনও তাহার বিনাশ হয় না। নবীন লেখকগণের সমর্পিত বিষয়গুলি কালে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবে।

যাহা হউক, বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। এখন যে ভাবে সাহিত্যের গতি হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, উহার উন্নতির জন্ত কতকগুলি অভাবের পূরণ করা উচিত। বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে যেরূপ অলঙ্কৃত, ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে সেরূপ গৌরবযুক্ত নয়, ইহা অনেক দিন হইতে অনেকেই বলিয়া আসিতেছেন। এখন এই অভাব পূর্ণ করিবার জন্ত ইচ্ছা হইতেছে বটে, কিন্তু চেষ্টার ফল পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাঁহারা উক্ত অভাবের উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহারা অভাবপূরণের প্রতিকূল বিষয়ের নির্দ্দেশ করিতেছেন না। কোন দুঃসাধ্য ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, অনেক প্রতিকূল বিষয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। জাতীয় ভাষার পরিপুষ্টি ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি-সাধন নিঃসন্দেহ দুঃসাধ্য ব্যাপার। সহজে ঈদৃশী সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধনার পথে যে সকল প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হয়, তৎসমুদায় দূর করিতে হইলে, যথোচিত ধীরতা, অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

যে ঘটনাপ্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক লিখিত হয়, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে বিষয়বিশেষে পরস্পর সামঞ্জস্য থাকা উচিত। ইতিহাস লিখিতে হইলে, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক নামের উচ্চারণগত প্রকৃতি অনুসারে অক্ষরান্তর এবং ইতিহাসরচনার প্রণালী প্রভৃতি একরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সকল বিষয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের মধ্যে বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের একটা বন্ধন থাকে না। নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে মূর্ত্তির অবয়বসংস্থান না হইলে, উহা মূর্ত্তি বলিয়াই গ্রাহ্য হয় না, এবং লোকেও উহা দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। হস্তের স্থলে যদি পদের সমাবেশ হয়, এবং পদ যদি হস্তের স্থান পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে ঐ দৃশ্য যেমন অপ্রীতিকর হয়, প্রণালীবিরুদ্ধ বিষয়ও সেইরূপ অশ্রদ্ধেয় ও অবজ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে ভাষায় এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয় থাকে, সে ভাষাও অপরের সমাদৃত হয় না। কোনও কোনও স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা মার্জ্জনীয় হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতা অমার্জ্জনীয়। এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার সংযমন আবশ্যক। দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিত হয়, তৎসমুদয়ের পরিভাষা একরূপ হওয়া উচিত। কি প্রণালীতে দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি লিখিতে হয়, তাহার নির্দ্ধারণ করা বিধেয়। এ বিষয়েও স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া বিধেয় নহে।

ব্যক্তিসমষ্টির একীভূত চেষ্টায় এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কোনও বিষয়ের আবিষ্কার বা কোনও বিষয়ে গ্রন্থপ্রণয়ন করা ব্যক্তিগত-চেষ্টাসাধ্য। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত ও সুশৃঙ্খল করা ব্যক্তিগত চেষ্টার সাধ্য নহে। এরূপ স্থলে ব্যক্তিসমষ্টির সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। ভাষার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য শব্দতত্ত্বের নির্ণয় করা, পরিভাষা প্রভৃতি স্থির করা, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ লিখিবার বিশেষ বিশেষ প্রণালী নির্দ্ধারণ করা প্রভৃতি কার্য্য দূরদর্শী অভিজ্ঞ লোকের সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন হইতে পারে। ইউরোপের "একাডেমিগুলি" এ বিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ইউরোপে বিশেষ বিশেষ বিষয়ের আলোচনার জন্য বিশেষ বিশেষ "একাডেমি" রহিয়াছে। এক "ফ্রেঞ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্" কয়েক ভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগ এক এক "একাডেমি" নামে প্রসিদ্ধ। এক "একাডেমি" ভাষা ও সাহিত্যের, অন্য "একাডেমি" ইতিহাসের, অপর "একাডেমি" বিজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকেন। ভাষা ও সাহিত্যের "একাডেমি" দ্বারা ফরাসী ভাষা কিরূপ পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়াছে, তাহা সহৃদয়সমাজের অবিদিত নাই। এইরূপ একাডেমি থাকাতেই, ফরাসী, ইংরেজী, জর্ম্মান প্রভৃতি ভাষাগুলি খরবেগে উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতেছে।

আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ "একাডেমির" একান্ত অভাব। এ পর্য্যন্ত বিদ্বন্মণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় কোনও বিষয় প্রণালীবদ্ধ হয় নাই। আমাদের সাহিত্যসেবকগণ নিভৃত প্রকোষ্ঠে বসিয়া যে জ্ঞানগরিমার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে ভাষা গৌরবান্বিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পরস্পরের একীভূত চেষ্টায় যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, তদনুরূপ কোনও কার্য্য এ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে সম্পন্ন হয় নাই। প্রধানতঃ এই কারণে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য সর্ব্বথা উচ্ছৃঙ্খলভাব প্রকাশ করিতেছে। তরণী কর্ণধারশূন্য হইলে যেমন ইতস্ততঃ বিঘূর্ণিত হয়, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যও সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত গতির পরিচয় দিতেছে। স্বদেশে যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের অধিনায়ক, তাঁহারা যদি স্বদেশীয় লেখকদিগকে অভিমত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানের সার্থকতা থাকে না। ইউরোপীয় পণ্ডিতসমাজ এ বিষয়ে যেরূপ সচেষ্ট রহিয়াছেন, অস্মদ্দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী সেইরূপ নিশ্চেষ্ট ভাব দেখাইতেছেন। ইহার ফল এই হইতেছে যে, ইউরোপীয় ভাষা উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়া, জগতে প্রাধান্য লাভ করিতেছে; আমাদের ভাষা শিশুর হস্তে কর্দ্দমের ন্যায় শিথিল অবস্থায় রহিয়াছে। শিশু যেমন কর্দ্দম দ্বারা যাহা

ইচ্ছা তাহাই গড়িয়া ক্রীড়াসুখের অনুভব করে, আমাদের মাতৃভাষাও এখন লেখকদিগের সেইরূপ ক্রীড়ার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

যাঁহারা জ্ঞানবিস্তারের সহিত ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি এক সূত্রে নিবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহারা, বোধ হয়, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে তাদৃশ প্রয়াসী নহেন। জ্ঞানের বিস্তার এবং ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন, পৃথক্‌ভাবে এই দুইটি বিষয়ের বিচার করা উচিত। জ্ঞানের বিস্তার যে কোনও ভাষায় হইলেই পৃথিবীর উপকার হইতে পারে। নিউটন আপনার গবেষণার ফল লাতিন ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে কেবল লাতিন পাঠকদিগের মধ্যেই সেই অপরিমেয় জ্ঞানরাশি আবদ্ধ থাকে নাই। পৃথিবীর যাবতীয় সভ্যসমাজ সেই জ্ঞানরত্নে আপনাকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং যাবতীয় সভ্যসমাজের ভাষাতে সেই জ্ঞানের বিষয় আলোচিত হইতেছে। চীনের চিরপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্‌থসঙ্গ স্বদেশীয় ভাষায় আপনার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বিবরণ লিখিয়া গেলেও, উহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যসমাজের অপরিজ্ঞাত থাকে নাই। সেই জন্যই বলিতেছি, জ্ঞানবিস্তার যে কোনও ভাষাতেই হউক না কেন, জ্ঞানপিপাসুদিগের পিপাসার কখনও অপরিতৃপ্তি হয় না। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশের হিতকামনা করেন, অগ্রে তাঁহাদের স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির নাম করিয়া, জ্ঞান বিস্তারের দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাঁহারা ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া কেবল উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীর শৃঙ্খলা থাকে না। তাঁহারা যেমন ভাষা ও সাহিত্যকে সুনিয়মিত করিতে পারেন না, সেইরূপ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানবিস্তারেও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। দুই নৌকায় পা দিলে মানুষের যে দশা ঘটে, তাঁহাদের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। দুই দিক্ রক্ষণ করিতে গিয়া, তাঁহারা তরঙ্গময় জলে আত্মবিসর্জ্জন করেন। যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানবিস্তারের প্রয়াসী, ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন তাঁহাদের লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য হয় না। স্যার উইলিয়ম্ জোন্স যখন এসিয়াটিক্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন, তখন জ্ঞানবিস্তারই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। এসিয়াটিক্ রিসার্চ্চেস্ দ্বারা যে ইংরেজী ভাষা ও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহা বোধ হয়, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। ভাষা ও সাহিত্যের শৃঙ্খলাসম্পাদন যে উক্ত সভার উদ্দেশ্য নয়, তাহা উহার নামেই পরিব্যক্ত হইতেছে।

আমরা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অপেক্ষা অধিকতর কর্ম্মক্ষম নই; অভিজ্ঞতা-তেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সমকক্ষ নই; তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখিয়াছেন; একটি বিষয়ের সহিত আর একটি বিষয়ের সংযোগ করিয়া, তাঁহারা কোনরূপ গোলযোগের সূত্রপাত করেন নাই। ইহাতে তাঁহাদের কর্ম্মনৈপুণ্য ও কর্ম্মক্ষমতা উভয়ই পরিস্ফুট হইতেছে। আমরা দীর্ঘকাল তাঁহাদের শিষ্যশ্রেণীতে নিবেশিত থাকিয়াও যে এইরূপ কর্ম্মপ্রবণতায় অভ্যস্ত হইতে পারিলাম না, ইহা অল্প ক্ষোভের বিষয় নহে।

এখন ভাষা ও সাহিত্যকে সুশৃঙ্খল ও সুনিয়মিত করা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া যথোচিত উদ্যম ও উৎসাহ-সহকারে যত্ন না করিলে, এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিষদ এখন নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে মেদভারাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায়, বোধ হয়, পরিষদের কিয়দংশে বলক্ষয় হইয়াছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন, পরিষদের সেই শক্তি আছে কি না, এখন তাহা সহৃদয়গণের বিবেচ্য।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সেকালের 'কলিকাতা গেজেট'।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে "কলিকাতা গেজেটে"র জন্ম হয়। মিঃ এফ্. গ্ল্যাডুইন নামক জনৈক ইংরেজ সম্পাদক, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতশাসন-কর্ত্তার অনুমতি গ্রহণ করিয়া, এই সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু এখনকার মত সেকালের কলিকাতা গেজেটে কেবলমাত্র সরকারী সংবাদ পুঞ্জীকৃত হইত না। অন্যান্য সংবাদপত্রের ন্যায় ইহাতে নানাবিধ বিজ্ঞাপন ও পদ্যগদ্যময় সম্পাদকীয় ও পত্রপ্রেরকলিখিত বিবিধ প্রবন্ধ প্রকটিত হইত; তৎসঙ্গে অবশ্য অনেক জ্ঞাতব্য সরকারী সংবাদও দেখিতে পাওয়া যাইত।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা সচরাচর-প্রচলিত ইতিহাসে সম্যক জানিতে পারা যায় না। সেই জন্য ইতিহাসপাঠকদিগের নিকট পুরাতন কলিকাতা গেজেট বহুমূল্য বলিয়া সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন গেজেটের খণ্ডশঃ-প্রকাশিত সংখ্যাগুলি এখন আর সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার সারসংগ্রহ করিয়া সিটনকার সাহেব যে পুস্তক প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিতান্ত দুর্লভ নহে। অবসরসময়ে তাহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে, অনেক পুরাকাহিনীর সন্ধানলাভ করা সম্ভব। এই প্রবন্ধে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইতেছে।

কলিকাতা গেজেটের সম্পাদকের স্বাধীনতা ছিল। তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও স্বাধীন মতামত প্রদান করিতে পারিতেন; কিন্তু সেকালের নিয়মানুসারে তাঁহাকে ইংরেজসরকারের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে হইত। প্রথম প্রথম সম্পাদকীয় স্তম্ভে কেবল সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবেরই বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যাইত; কিন্তু কালক্রমে সকল প্রকার বিষয়েই সম্পাদক মহাশয় অবাধিত হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

সেকালে এখনকার মত পথঘাটের সুব্যবস্থা না থাকায় ডাকঘরের সুবন্দোবস্তও ছিল না; কলিকাতার সঙ্গে মফস্বলের অল্প কয়েক স্থানের সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও বর্ষাসমাগমে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। এই সকল কারণে মফস্বলে পত্রপ্রেরণ করা বা মফস্বল হইতে প্রত্যুত্তর পাওয়া সকল সময়ে ঘটিয়া উঠিত না, এবং যখন ঘটিত, তখনও কোনও নিশ্চয় ছিল না। ডাকমাশুলের হার কিছু অধিক ছিল, এবং ছোট চিঠি ভিন্ন বড় বড় কাগজ বা পুলিন্দা পাঠাইতে হইলে, সপ্তাহে দুই এক দিন মাত্র বাঙ্গীডাকে তাহা পাঠাইতে পারা যাইত। চিঠির ডাকে ২॥০ + ৪ ইঞ্চি আয়তনের চিঠি পর্য্যন্তই গৃহীত হইত. আয়তন তাহার অপেক্ষা বড় হইলে সোমবার ও বৃহস্পতিবারে বাঙ্গীডাকে প্রেরণ করিতে হইত। ২৷৷০ তোলা পর্য্যন্ত এক মাশুল, ৩॥০ তোলা পর্য্যন্ত তাহার দ্বিগুণ, ৪॥০ তোলা পর্য্যন্ত ত্রিগুণ, ৫॥০ তোলা পর্য্যন্ত চারিগুণ—এইরূপ হারে মাশুল নির্দ্দিষ্ট হইত, এবং স্থানের দূরত্ব-অনুসারে মাশুলের তারতম্য হইত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে যে যে স্থানে ডাকঘর ছিল, তাহার নাম,—বারাকপুর, হুগলী, চন্দননগর, [illegible], পাটনা, বক্সার, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, ভাগলপুর, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কলী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, কটক এবং গঞ্জাম।

২॥০ তোলার চিঠি কলিকাতা হইতে পাঠাইতে হইলে, বারাকপুর, হুগলী ও চন্দননগরের জন্য এক আনা, বর্দ্ধমান ও মুরসিদাবাদের জন্য দুই আনা, রাজমহল ও ভাগলপুরের জন্য তিন আনা, দিনাজপুর ও মুঙ্গেরের জন্য চারি আনা, পাটনার জন্য পাঁচ আনা, বক্সারের জন্য ছয় আনা, এইরূপ হারে মাশুল দিতে হইত।

এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে হইলে অসুবিধার অন্ত ছিল না; কিন্তু পুলিশের নিকট আবেদন করিলে তাহারা ডাকের নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া দিত। একখানি আট-দাঁড়ী বজরার দৈনিক ভাড়া দুই টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং তাহাতে কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ গমন করিতে হইলে পঁচিশ দিনের ভাড়া গণিয়া দিতে হইত।

কলিকাতার পুলিশের উপর নগররক্ষার ও অন্যান্য কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল। তজ্জন্য সহরে একত্রিশটি থানা সংস্থাপিত ছিল। থানাগুলির নাম,—আরমানী গির্জ্জা, পুরাণা কেল্লা, চাঁদপালঘাট, লালদীঘী, ধর্ম্মতলা, ওল্ডকোর্ট-হাউস, ডোমতলা, আমড়াগলী-পঞ্চাননতলা, চীনাবাজার, চাঁদনী চক, টুরুলবাজার, ঝামাপুকুর, চকডাঙ্গা, সিমলাবাজার, লললক্কা বাজার, মলঙ্গা-পটলডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, বৈঠকখানা, শ্যামপুকুর, শ্যামবাজার, পদ্মপুকুর, কুমারটুলী, যোড়াসাঁকো, মেছোবাজার, জানবাজার, ডিঙ্গাভাঙ্গা, সুতানটি-হাটখোলা, দয়েহাটা, হাঁসপুকুরিয়া, কলিঙ্গা ও জোড়াবাগান। প্রতি থানায় এক জন থানাদার ও এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিবার ব্যবস্থা ছিল; ইহারা সকলেই বাঙ্গালী। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের তালিকায় দেখা যায়, থানাদার-দিগের মধ্যে ১৮ জন হিন্দু এবং সুপারিণ্টেণ্ডদিগের মধ্যে ৮ জন হিন্দু; অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান। এখনকার মত তখন থানায় ইংরেজ কর্ম্মচারীর বাহুল্য ছিল না।

সহরে ইংরেজদিগেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁহারা সকলেই ক্ষুদ্র নবাবের মত সাজসারঞ্জামে কালাতিপাত করিতেন। ইংরাজগৃহে যতগুলি দাস দাসী নিযুক্ত হইত, তাহার সংখ্যা গণনা করিলে এখনকার সাহেবেরাও বিস্মিত হইবেন। ইহাদের বেতন নিতান্ত অল্প ছিল না। ইংরাজেরা একবার ইহাদের বেতন কমাইবার জন্য কমিটি করিয়াছিলেন।

সেকালের ইংরাজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের লোকের মত কত-গুলি আচার ব্যবহার অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে ধূমপানের কথাটাই

সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। একালের সাহেবেরাও ধূমপানে কম মজবুত নহেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ধূমপানপ্রথার বড়ই বিরোধী। সেকালে ইহার বিপরীত ছিল। ইংরেজ ধূমপায়িগণ আমাদের মতই হুঁকার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু কেহ কাহারও হুঁকায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। তজ্জন্য তাঁহারা বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময়ে আপন-আপন হুঁকা কলিকা বাঁধিয়া রওনা হইতেন। কেবল গবর্মেণ্ট হাউসের ভোজে হুঁকা প্রবেশ করিতে পারিত না, এবং কোন কোন প্রকাশ্য নাচ তামাসায় বা সভা সমিতিতে হুঁকা কলিকা নীচের তলায় রাখিয়া আসিতে হইত।

বিলাতী জিনিসের আমদানী অল্প ছিল। সময়ে সময়ে বিলাতী জিনিসের আমদানী হইত, এবং তখন তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কলিকাতা প্রবাসী এক জন ইংরেজ মহিলা কবিতাচ্ছলে ইহার একটি সুন্দর বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন,—

"But stay, let me res[illegible] my rhyme,
To shew you how I spend my time.
[illegible] a sultry restless night
Tormented with [illegible] and bite
Of [illegible]
That here [illegible] midnight slumber,
I rose [illegible]
Yet [illegible]
Away [illegible] with our [illegible]
To [illegible] Europe-shops
And when of Caps and Gauze we hear
Oh how we scramble for a share!"

ইংরেজদিগকে দায়ে পড়িয়া এ দেশের শিল্পজাত দ্রব্য লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। সেকালে এ দেশে যে সকল পট্টবস্ত্র ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহা বিলাতেও বহুমূল্য বলিয়া পরিচিত থাকায়, এতদ্দেশবাসী ইংরাজ নরনারী তাহাকে হতাদর করিতে পারিতেন না। তদ্ভিন্ন ইংরাজদিগের ব্যবহারোপযোগী অনেক জিনিস এ দেশেও প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

সেকালের বাঙ্গালীরা শিল্পকৌশলের জন্য সর্ব্বত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে ওলন্দাজ বা ইংরাজ নাবিকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে

এ দেশের শিল্পজাত [illegible] অধিকপরিমাণে লইয়া যাইতেন যে, তাহা নিবারণ করিবার [illegible] প্রচার করা আবশ্যক হইত।

ইংরেজেরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্যব্যবসায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেন, এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট ধনোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিলাসবিভ্রমের পরিচয় দিবার জন্য এ দেশের কৃষ্ণকায় ভৃত্যবর্গকে বিলাতে টানিয়া লইয়া যাইতেন। কিছু দিন পরে তাহারা কর্ম্মচ্যুত হইয়া পথে পথে রোদন করিয়া বেড়াইত; অর্থাভাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। ইহার গতিরোধ করিবার জন্য কোর্ট অব ডিরেক্টার নিয়ম করিয়াছিলেন যে, কেহ কৃষ্ণকায় ভৃত্য সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে চাহিলে, কোম্পানীর তহবিলে পাঁচ শত টাকা জমা দিতে হইবে। সেই হইতে হতভাগ্য বাঙ্গালী ভৃত্যবর্গের বিড়ম্বনা দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালী ভৃত্য ভিন্ন ইংরাজদিগের বাটীতে মালয়দেশজ কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসও থাকিত; তাহারা সময়ে সময়ে পলায়ন করায়, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে হইত।

ইংরাজেরা যেখানে পদার্পণ করেন, সেইখানেই ভজনালয় এবং নাট্যশালার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টির প্রতি সেকালের ইংরাজদিগের অধিকতর অনুরাগ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু সেকালে কলিকাতায় ভজনালয়ের ন্যায় নাট্যশালারও যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, পুরাতন কলিকাতা গেজেটে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাট্যশালায় সাময়িক বৃত্তান্তমূলক নাটক ভিন্ন সেক্সপিয়র-প্রমুখ বিখ্যাত নাটকাদিরও অভিনয় হইত, এবং তদুপলক্ষে কলিকাতার ইংরাজ-মহলে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইত।

পুরাতন কলিকাতা গেজেটে দুই চারিটি মামলা মকদ্দমার সংবাদও জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে একটি মকদ্দমা কিছু কৌতুকাবহ ও তাহার সহিত আমাদের ইতিহাসের সংস্রব আছে। মীর কাসিমকে সিংহাসন দান করিবার সময়ে তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ ইংরাজ সদস্যগণকে যে পুরস্কারবিতরণে প্রতিশ্রুত হন, কালক্রমে সেই পুরস্কারের অংশনির্ণয় লইয়া ইংরাজদিগের মধ্যে গৃহকলহ উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ণেল প্রিস্কো, মিঃ পেট্রি, মেজর বেকার্ এবং আণ্টনি গ্রোয়াম সাহেবের আড্‌মিনিস্‌ট্রেটার মিঃ জন মিলার বাদী হইয়া, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে

উক্ত পারিতোষিকের অংশনির্ধার্থ ... রেন। উভয় পক্ষেই সুযোগ্য কৌন্সলী তর্ক বিতর্ক করি ... সুপ্রিম কোর্টের বিচারের বাদিগণ ডিক্রী প্রাপ্ত হন।

বিজ্ঞাপনস্তম্ভে যে সকল বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইত, তন্মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক রহস্য নিহিত রহিয়াছে। একটি বিজ্ঞাপন এইরূপ,—

Thursday, June 15th, 1786. For sale by Moore, Sanders, and Lacey, the Baugvat-Geeta, or Dialogues of Kreeshna and Arjoon translated from the original Sanskreet, by Charles Wilkins, price one Gold Mohur.

চার্লস উইলকিন্স নামক জনৈক ইংরেজ ভগবদ্গীতার ইংরাজি অনুবাদ করেন। কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভাপতি স্মিথ সাহেব উহা বিলাতে মুদ্রিত করিয়া এক মোহর মূল্যে বিক্রয়ার্থ এ দেশে পাঠাইয়া দেন। গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের অনুরোধে কোম্পানীর ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, এবং লভ্যাংশ ও গ্রন্থসত্ব অনুবাদককে প্রদত্ত হইয়াছিল।

ইংরাজেরা যেমন এক দিকে গীতার অনুবাদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অন্য দিকে অতি সামান্য কথা লইয়া পরস্পর দ্বন্দযুদ্ধ করিতেন; এবং তাহাতে অনেকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেন।

ইংরাজের নামের প্রবল প্রতাপ এত দূর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, ইংরাজের নামের দোহাই দিয়া দেশের লোকেও দেশের উপর অত্যাচার করিতে ছাড়িতেন না। ইংরাজদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া কলিকাতার অনেক বাঙ্গালী নানা উপায়ে ধনশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সুযোগ্য বংশধরগণ এখন দেশে গণ্যমান্য ও প্রতাপশালী হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া পূর্ব্বকাহিনীর অনুসরণ করা প্রীতিপ্রদ নহে। ইঁহারা নিজ নিজ বরকন্দাজগণকে কোম্পানীর সিপাহী ও লস্করের পোষাক পরাইয়া দেশের লোকের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। তাহার নিবারণ করিবার জন্য নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয়।

"The Honorable the Governor General and Council having received information that a practice has gradually crept in amongst the Banians and other natives of Calcutta, of dressing some of their servants in, or nearly in, uniform of the Ho'nble Company's Sepoys and Lascars, and that in this dress they became the terror of the common people, and often com-

mit most oppressiv[illegible] the Honorable Companys Sepoys and Lascars hear[illegible]

Notice is hereb[illegible]eby given that the honorable the Governor General and council forbid this practice in future.

By command of the Hon'ble Board.

Fort William. April 7th, 1786. } W. Bruere Secretary."

বাঙ্গালীরা কোম্পানীর সরকারে কেরাণীগিরি প্রাপ্ত হইয়া প্রথম হইতেই কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী সেরেস্তায় প্রথম প্রথম বাঙ্গালীগণ উচ্চ পদও প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহারা জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিত রীত্যনুসারে প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত প্রায় অষ্ট প্রহরই প্রভুর কার্য্য সরবরাহ করিতেন। সুতরাং পার্ব্বোপলক্ষে ছুটির জন্য এখনকার মত এত ধুমধাম ছিল না। রায় রাইয়ানের অনুরোধক্রমে ১১৯৪ সালের যে ছুটির তালিকা বাহির হয়, তাহা সবিশেষ কৌতুকাবহ;—অনেক বিষয়ে সেকালের হিন্দুসমাজের আচারব্যবহারাদির পরিচায়ক। উক্ত তালিকাটি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

পর্ব্বদিন	তারিখ	যত দিন ছুটি
রথযাত্রা	৫ আষাঢ়	১
উল্টা রথযাত্রা	১৩ আষাঢ়	১
রাখি পৌর্ণমাসী	১৪ ভাদ্র	১
জন্মাষ্টমী	২২।২৩ ভাদ্র	২
দুর্গাষ্টমী	৫।৬ আশ্বিন	২
মহালয়া	৭ আশ্বিন	১
দুর্গোৎসব	৩রা হইতে ৭ই কার্ত্তিক	৫
দেওয়ালী	২৬।২৭।২৮শে কার্ত্তিক	৩
উত্থান একাদশী	৮ অগ্রহায়ণ	১
পৌষসংক্রান্তি	পৌষের শেষদিন	১
বাসন্তী পঞ্চমী	৩ ফাল্গুন	১
শিবরাত্রি	২৬।২৭ ঐ	২
হোলী	১০ই হইতে ১৪ই চৈত্র	৫
বারুণী	৫ চৈত্র	১
চড়কপূজা	চৈত্রসংক্রান্তি	১
রামনবমী	১৪ বৈশাখ ১১৯৫	১
		মোট ২৯ দিন

সে কালের ছুটির তালিকাতে [illegible] পিসাদি বন্ধের যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, তদনুসারে দুর্গোৎসব, হো[illegible] প্রাধান্য সূচিত হয়। জনশ্রুতিও ইহার অনুমোদন করে। সেকালে কাহারও সৌভাগ্যগর্ব্বের পরিচয় দিতে হইলে, লোকে বলিত, অমুক "দোল দুর্গোৎসব" করিয়া থাকে। এই তিনটি উৎসবে সামাজিক সৌভাগ্যের পরিচয় প্রকাশিত হইত বলিয়া, লোকের টাকা হইলেই ইহার অনুষ্ঠান করিত, এবং ধনশালী জমীদারগণকে দোলমঞ্চ নামক অত্যুন্নত মন্দিরনির্ম্মাণে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা প্রদর্শন করিতে দেখা যাইত। পর্ব্বোপলক্ষে কলিকাতার ধনকুবেরগণ যে সাহেবসেবা করিয়া থাকেন, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে; সেকালেও দুর্গোৎসবে সাহেব সুবাব নিমন্ত্রণ হইত, এবং তাঁহারা দুর্গোৎসবোপলক্ষে হিন্দুগৃহে যে সকল নাচ তামাসা দর্শন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বিলাতের বন্ধুজনকে বিস্মিত করিতেন। এই সকল মজলিসে যে সকল বাইজী নৃত্যগীতে কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিত, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান রমণী। এক বার মহরম ও দুর্গোৎসব একই সময়ে সমুপস্থিত হওয়ায়, সে বৎসর মুসলমান বাইজীগণ হিন্দুগৃহে প্রতিমার সম্মুখে মহরমের পুণ্যতিথিতে নৃত্যগীত করিতে অসম্মত হয়; অনেক অর্থপ্রলোভনেও তাহারা স্বধর্ম্মের শাসন লঙ্ঘন করিতে সম্মত হয় নাই। সেবার দুর্গোৎসবে নৃত্যগীত তেমন জমাট বাঁধে নাই। ইংরাজেরা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া এই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ রামকৃষ্ণ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ;—মাতা ও পুত্র।

ইংরাজদিগের বিশ্বাস, মাতার ধর্ম্মজীবনের আদর্শে চরিত্রগঠন করিতে গিয়া রামকৃষ্ণ বিষয়বুদ্ধিহীন জড়ভরতে পরিণত হইয়াছিলেন; এবং তজ্জন্যই তাঁহার রাজ্যনাশ সংঘটিত হইয়াছিল! এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাঁহারা আর ঐতিহাসিকতত্ত্বানুসন্ধানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই।

রাণী ভবানীর ধর্ম্মজীবন ও রামকৃষ্ণের ধর্ম্মজীবন এক শ্রেণীর হইলেও, একরূপ ছিল না। মাতা আড়ম্বরহীন কর্ত্তব্যপালনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি একদিনের জন্যও রাজকার্য্যে অবহেলা করিতেন

না। পুত্র ধ্যান ধারণা পুরশ্চরণাদি আত্মোন্নতির শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সময়ে সময়ে সংসারে থাকিয়াও শ্মশানবাসী সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্ব্বকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেন।

মাতার জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি যেন পরের জন্যই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;—পরের জন্য ভাবিতে, পরের জন্য খাটিতে, পরের জন্য প্রাণপণ করিতেই তাঁহার পুণ্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। পুত্রের জীবনকাহিনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যেন আত্মোন্নতি ও মুক্তিলাভের জন্যই নিরন্তর লালায়িত।

মাতা পুত্রের উভয়ের জীবনেই ধর্ম্মের জন্য ঐকান্তিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত, তথাপি উভয়ের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু পার্থক্য থাকিলেও, উভয়ের জীবনেই রাজ্যরক্ষার্থ প্রজাহিতৈষণার অভাব ছিল না।

রামকৃষ্ণ যোগী, বিষয়বিরাগী, আত্মত্যাগী; হিন্দু সমাজের পূজনীয় মহাপুরুষ। রাণী ভবানী রাজান্তঃপুরবাসিনী, অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী রাণী, অথচ নিয়ত পরহিতব্রতধারিণী, কল্যাণরূপিণী, দীনজননী মহাদেবী ;—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহই তাঁহার কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

রাণী ভবানী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় বহু দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল; রামকৃষ্ণ যখন রাজসাহীর রাজ্যভার গ্রহণ করেন, তখন ভারতবর্ষে এক অশ্রুতপূর্ব্ব নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সে যুগের প্রবলাবর্ত্তে পড়িয়া ভারতবর্ষের লোকের বহুযুগার্জ্জিত শাসনপ্রতিভা ভাসিয়া গিয়াছিল। রামকৃষ্ণ বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী না হইয়া সংসারকীট হইলেও, রাজ্যরক্ষা করিতে সক্ষম হইতেন না।

তথাপি রামকৃষ্ণ বীরের ন্যায় প্রতিকূল ঘটনাবলীর সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করিতে ত্রুটি করেন নাই। রাজ্যরক্ষার জন্য, প্রজারক্ষার জন্য, নাটোর রাজবংশের গৌরবরক্ষার জন্য, তিনি নবাগত ইংরাজ রাজের সঙ্গে [illegible] বিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে জড়ভরত বলিয়া পরি[illegible] না। বরং মনে হয়, রাজ্যরক্ষার্থ প্রাণপণ করিয়াও কৃতকার্য্য [illegible] পারিয়া, রামকৃষ্ণ নিতান্ত ভগ্নহৃদয়ে বিষয়বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া সদগতিকামনায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা রক্ষক, রামকৃষ্ণের পক্ষে তাঁহারাই ভক্ষক [illegible] উঠিয়াছিলেন। এক [illegible] তাঁহার অন্নে আজন্মপ্রতিপালিত ভৃত্যবর্গ, অপর দিকে তাঁহার

আশা ভরসা ও আশ্রয়ের আধার কোম্পানীর ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী,—দুই দিক হইতে এই দুই প্রবল শক্তি প্রচণ্ডবিক্রমে মুষলাঘাত করিয়া রামকৃষ্ণের রাজশ্রীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মহারাজ রামজীবন ও মহারাণী ভবানীর সময়ে নাটোর রাজবংশের রাজ্যোন্নতি, তাহার ইতিহাসের সহিত মুসলমান নবাব ও নাটোর রাজমন্ত্রী দয়ারাম রায়ের নাম চিরসংযুক্ত; মহারাজ রামকৃষ্ণের সময়ে রাজ্যনাশ,—তাহার ইতিহাসের সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও নাটোর রাজমন্ত্রী কালীশঙ্করের নাম চিরসংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

কালীশঙ্কর দত্ত যশোহর প্রদেশের এক জন দরিদ্র কায়স্থসন্তান, প্রতিভাবলে নাটোরের রাজমন্ত্রী হইয়া উত্তরকালে নড়াল জমীদারবংশের ভিত্তিমূল সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের ইতিহাসে কালীশঙ্কর দস্যু-নামেই পরিচিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন কালীশঙ্কর ও তাঁহার ভ্রাতা নন্দ দত্ত একখানি নৌকা লুঠ করিয়া নাবিকগণকে আহত করেন। যশোহরের কালেক্টার হেঙ্কেল সাহেব কালীশঙ্করকে ধরিয়া আনিবার জন্য কুতবুল্ল্যা পদাতিকের অধীনে এক দল সিপাহী পাঠাইয়াছিলেন। কালীশঙ্কর ১৫০০ লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য যুদ্ধে হেঙ্কেলের সিপাহীদলকে পরাজিত করেন। ইংরাজ পক্ষে দুই জন ধৃত ও ১৫ জন আহত হয়। কালক্রমে নন্দ দত্ত ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু নাটোর রাজবংশের মন্ত্রিপদে আসীন থাকায়, কালীশঙ্করকে কেহ সহজে ধরিতে পারিল না। কিছু কাল পরে কালীশঙ্কর ধরা পড়িয়াও ধনবলে সহজেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

হেঙ্কেল, রামকৃষ্ণ বা কালীশঙ্কর কাহাকেও শ্রদ্ধা করিতেন না। তিনি লিখিলেন,—"নাটোরের [illegible] ভূষণা থানার শাসনকার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শন করিতেছেন, দস্যু [illegible] হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা থানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া [illegible] লুনাইয়া করিয়া পলায়ন করিতেছে!" এই হেঙ্কেল [illegible] অক্টোবর হইতে রাজসাহীর জজ ও কালেক্টার হইয়া [illegible]মন করায়, সেই সময় হইতেই রামকৃষ্ণের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত

[illegible]

[illegible] বৎসর ব[illegible]ন কর ধার্য্য হইত বলিয়া, রাজা প্রজা [illegible] সম্পত্তির অধিকারিগণ অল্পদিনেই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া [illegible] ছিলেন, তাঁহারাও পতনোন্মুখ হইয়াছিলেন। অনেক ইংরাজ লেখক বলেন, "এই সময়ে কোম্পানী [illegible]

শোষণকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া জমীদারদলকে প্রজাপালন বা উন্নতিসাধনের জন্য কিছুমাত্র উৎসাহদান করিতেন না।" * ইহাতে প্রাচীন জমীদারবংশ ক্রমশঃ উৎসন্ন হইতে লাগিল। দোষ কাহার? তৎসম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ লেখক স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজের দোষেই এই সকল সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছিল। †

এইরূপ অবস্থাবিড়ম্বনায় নিপতিত হইয়াও রামকৃষ্ণ যেরূপ ভাবে রাজ্য ও রাজসম্মান রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে, তাঁহার অলীক কলঙ্কে আস্থাস্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা ক্রমশঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা করিয়া, তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

রোগ-শয্যায়।

১

প্রথম ফাল্গুনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাত। বনস্থাপনে নবকিশলয়দলশোভিত তরুরাজির মধ্য দিয়া নদীর তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণ সোহাগস্পর্শের মত বহিয়া যাইতেছে। খিদিরপুরের পোতাশ্রয়ে একখানা ইংলণ্ডগামী ষ্টীমারে বিদায় লইবার ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

যাঁহারা আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব... বিদায় দিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলে... ...ত বাষ্পোদ্গীরণের গম্ভীর শব্দ উত্থিত হইল। অদূরে যে ফিরিঙ্গি... ...বসিয়াছিল, সে তখন কেবল ছিপে টান দিয়াছে। ...

* Government had, it must be acknowledged, given little encouragement to rely on its generosity ... had acted ... on the character of landlord determined ... the utmost ...

† But the truth is that the English ... cisely those elements which ... ness to seize any opportunity for new ... and ... enforce the ... as they made.

চাহিয়া বালক সদ্যোপ্রসূত বৎসটিকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। জাহাজ ছাড়িয়া দিল। তীরে একখানি গাড়ীতে কয়টি বঙ্গরমণী ছিলেন;—তাঁহাদিগের নয়ন হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। মাতা, কন্যা, শ্বশ্রূ, পুত্রবধূ পরস্পরের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুরুষ অভিভাবকগণ আসিয়া অন্য এক-খানি গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে এ গাড়ীখানিও গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিল।

জাহাজের ডেকে দুইটি বাঙ্গালী যুবক দাঁড়াইয়া ছিল। এক জন গম্ভীর, তাহার স্বভবতঃ গম্ভীর মুখ আজ দুশ্চিন্তার ছায়াপাতে গম্ভীরতর হইয়াছে; দ্বিতীয় জন হাস্যপ্রফুল্লমুখ, চপল।

জাহাজ কূল ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দ্বিতীয় যুবক প্রথম যুবকের পৃষ্ঠে একটি অনতিতীব্র চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে! চল, কামরায় যাই।"

দ্বিতীয় যুবক কোনও উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি সেই গৃহাভিমুখগামী শকটে নিবদ্ধ ছিল। তাহার সমস্ত হৃদয় যেন তাহার দৃষ্টিতে আসিয়া সেই শকটখানির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

প্রথম যুবক বলিল, "ইহার মধ্যেই এত ভাবনা! তুমি কেমন করিয়া তিন বৎসর বিদেশে থাকিবে! আমিও ত বিদেশে যাইতেছি। কই আমার ত কোনরূপ কষ্ট হইতেছে না!"

দ্বিতীয় যুবক গম্ভীরভাবে বলিল, "তোমার অবস্থায় আর আমার অবস্থায় অনেক প্রভেদ।"

"তুমি যে স্ত্রীলোকের অধিক করিলে! যদি এখনই এত ভাবনা হয়, তবে তোমার পক্ষে ইংলণ্ডে না যাওয়াই উচিত ছিল। 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন'; এখন আর ভাবিয়া কি হইবে!"

[illegible] পোতাশ্রয় হইতে বাহির হইতেছিল। পোতাশ্রয়ের [illegible] সেই শকটখানি অদৃশ্য হইয়া গেল।

[illegible] যুবক বলিল, "আমি যে কিছু না ভাবিয়াই বিদেশে যাইতেছি, [illegible] কে বলিল! পূর্ব্বে আমার ভাবা উচিত ছিল সত্য, কিন্তু [illegible] আমাকে ভাবিবার একটু অবসর না দেওয়াই কি তোমার [illegible] উচিত!"

[illegible] বিরক্ত ও অপমানিত হইয়া, জানুক [illegible]

চলিয়া গেল। ভগিনীপতি সুকুমার সেই ডেকের উপর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল।

প্রিয়ভূমি কলিকাতার শেষ সীমারেখা যতই অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল, সুকুমারের হৃদয়ে পত্নী লাবণ্যময়ীর ও শিশুপুত্র বিনয়ের স্মৃতি ততই অধিক সমুজ্জল হইয়া উঠিতে লাগিল। একটা অব্যক্ত যাতনা তাহার সমস্ত হৃদয় বেদনাচঞ্চল করিয়া তুলিল। যুবক কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিল।

শ্যালক ও ভগিনীপতি ব্যারিষ্টার হইবার আশায় একত্র দেশ ছাড়িয়া সুদূর ইংলণ্ডে যাইতেছিল। শ্যালক ললিতমোহন অবিবাহিত। ভগিনীপতি সুকুমার, পত্নী ও একবৎসরবয়স্ক পুত্র রাখিয়া বিদেশে যাইতেছিল।

সেই ডেকের উপর বসিয়া সুকুমার নানা কথা ভাবিতে লাগিল। তখন তাহার শ্যালক ললিতমোহন স্মোকিং-কামরায় একটা চুরুট ধরাইয়া সুকুমারের রূঢ় ব্যবহারে আহত আত্মসম্মানহানিজনিত মনোবেদনার লাঘব করিতেছিল।

ক্রমে কলিকাতার শেষ সীমারেখাও অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্যামশোভাময় তটযুগশালিনী ভাগিরথীর বক্ষে জাহাজ ধূমোদ্গার করিতে করিতে চলিতে লাগিল।

২

ইংলণ্ডে যাইয়া নূতন দেশে নূতন সভ্যতা, নূতন সমাজ ও নূতন সঙ্গীর মধ্যে যুবক দুই জনের দিনগুলা যেন অনুকুল পবনে পালের নৌকার মত বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই সুদূর প্রবাসে ললিতমোহন যে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। সুকুমার বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনস্রোত হইতে ফিরাইতে পারে নাই। সুকুমার তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইত; কিন্তু দূরগৃহে তাহার পিতামাতাকে উৎকণ্ঠিত করা উচিত মনে করিত না,—তাই তাঁহাদের এ কথা কিছু লিখিত না।

এক এক দিন সুকুমার অধিক তিরস্কার করিলে ললিতমোহন বলিত, "তোমাতে আর আমাতে অনেক প্রভেদ। তোমার স্ত্রী পুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তোমাদের সকল কাজ ভাবিয়া করা আবশ্যক। আমার সে সব কিছু নাই। আমার পক্ষে একটু আনন্দ-উপভোগের চেষ্টা আদৌ অন্যায় নহে।"

সুকুমার বলিত, "স্ত্রী পুত্রের প্রতি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই সত্য; কিন্তু আপনার সম্বন্ধেও কি তোমার কোনও কর্ত্তব্য নাই!"

ললিতমোহন হাসিয়া বলিত, "সব জিনিসেরই দুইটা দিক আছে, জীবনেরও দুইটা দিক আছে। গম্ভীর দিকটা তোমার মত দার্শনিক পেচকের হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্তচিত্তে অপর দিকটা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি।"

চুরুট ধরাইয়া ললিতমোহন বেড়াইতে বাহির হইত। ব্যথিতহৃদয় সুকুমার আপনার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিত।

এক এক দিন ললিতমোহন সুকুমারকে দলে টানিতে চেষ্টা করিত। অকৃতকার্য্য হইয়া সে বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "বিবাহিত লোক যেন জিয়ল মাছ; যে একবার বঁড়শী গিলাইতে পারে, তাহার হাত হইতে আর উদ্ধার পায় না; কিন্তু আর কেহ ধরিতে গেলেই সরিয়া যায়—এমনই পিচ্ছিল; জান ত—'বেঁধেছি লম্বা দড়ায়, ঘুরে ফিরে সেই খুঁটার গোড়ায়।' তোমাদের বন্ধনরজ্জু যতই দীর্ঘ হউক না কেন, খুঁটাটি ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।"

সুকুমার বলিত, "তোমার মত লোক দেখিয়াই ত সেক্‌স্‌পীয়ার লিখিয়াছেন,—

'ত্যজিও না দীর্ঘশ্বাস রমণীরা আর,
চিরদিন প্রবঞ্চক পুরুষনিচয়,
একপদ জলে, স্থলে অন্যপদ তার,
একে কভু স্থির নহে পুরুষ-হৃদয়।'

মধুকর-বৃত্তিটা ভাল নহে।"

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল; তৃতীয় বৎসরও শেষ হইয়া আসিল। শেষ পরীক্ষার সময় সুকুমার পীড়িত হইয়া পড়িল। ললিতমোহন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইল।

যেদিন ললিতমোহন দেশে যাইবার জন্য যাত্রা করিল, সেদিন সুকুমার তাহার শূন্য কক্ষে একাকী বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিল। অদৃষ্টের কি দারুণ উপহাস! সেই দেশে ফিরিবার জন্য অধিক ব্যগ্র হইয়াছিল; আর আজ তাহাকেই বিদেশে পড়িয়া থাকিতে হইল! এখানে তাহার পীড়ার সময় শুশ্রূষা করিবার কেহ নাই, শোকে সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, মৃত্যুশয্যায় তৃষ্ণার্ত্ত হইলে মুখে একবিন্দু জল দিবার কেহ নাই। এতদিনে বিনয় কত বড় হইয়াছে, লাবণ্যের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তাহাদের যেমন রাখিয়া [illegible]ছিল, যাইয়া আর তেমন দেখিতে পাইবে না। বিদায়কালে লাবণ্য-

ময়ীর অশ্রুবিপ্লুত মুখখানি তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সুকুমার না কাঁদিয়া থাকিতে পারিল না।

৩

...জে অন্য কোনও কাজ ছিল না; কাজেই ললিতমোহন সময় সময় আপনার কথা ভাবিত। একটু চিন্তা করিয়াই ললিতমোহন বুঝিল যে, বিদেশে সে যে টাকাটা অপব্যয় করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া তাহাকে তাহার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। সে আরও বুঝিল যে, দেশে ফিরিয়া অদৃষ্ট-লক্ষ্মী যত দিন সুপ্রসন্ন না হয়েন, তত দিনও পৈত্রিক অর্থ ধ্বংস করিতে হইবে; সুতরাং পিতার প্রিয় হওয়াটা নিতান্তই আবশ্যক। বোম্বাই বন্দরে আসিয়াই সে "বেটী" "নেলি" প্রভৃতির প্রেমপত্রগুলা সাগরসলিলে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর বোম্বাই পৌঁছিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধুতি পরিল। কলি-কাতায় পৌঁছিয়া যখন সে পিতা মাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি লইল, তখন সকলেই বলিল যে, বিলাতফেরত ছেলের এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। জনকজননীর নিকট ললিতমোহন দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

পিতা সুকুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ললিতমোহন কৃত্রিম ব্যথিত-ভাবে বলিল, "তাহার কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। কুসঙ্গীর দলে পড়িয়া সে একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে সৎপথে আনিতে পারি নাই। আমার যে এত অধিক ব্যয় হইত, সে কেবল তাহারই জন্য। সে একটা বিপদে পড়িলে তখন আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিতাম না; যেমন করিয়াই হউক, তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতে হইত।"

ভগিনী লাবণ্যময়ী সেখানেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া ললিত-মোহন বলিল, "লাবণ্যের অদৃষ্টে যে কি আছে, বলিতে পারি না। এত করিয়াও সুকুমারকে ফিরাইয়া আনিতে পারিলাম না। পাছে আমার সঙ্গে দেশে ফিরিয়া আসিতে হয়, এই ভয়ে এবার সে পরীক্ষাও দিল না।"

এমন বিনয়ী পুত্র যে কোনও কারণে মিথ্যা কথা কহিতে পারে, পিতা মাতার মনে এ বিশ্বাস ছিল না। কাজেই তাঁহারা পুত্রের কথায় বিশ্বাস করিলেন।

লাবণ্যময়ী ছল ছল নেত্রে আপনার কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল। পুত্র বিনয়কুমার তখন হর্ম্ম্যতলে বসিয়া একটা কাঠের ঘোড়া লইয়া খেলা করি...

ছিল। ব্যথিতা জননী তাহাকে বক্ষে লইয়া আবেগভরে তাহার মুখচুম্বন করিল; তাহার পর শয্যায় পড়িয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। জননীর অভিনব ভাব দেখিয়া পুত্র খেলা ভুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাঁদিয়া লাবণ্যময়ী উঠিয়া বাক্স খুলিয়া স্বামীর পত্রগুলা বাহির করিল। সে এক একখানা করিয়া পত্রগুলা পাঠ করিতে লাগিল, আর তাহার ভাসা চক্ষু হইতে টপ টপ করিয়া পত্রের উপর চোখের জল পড়িতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, এ সব কি মিথ্যা কথা? ভালবাসা না থাকিলে কি কেহ এমন করিয়া লিখিতে পারে? সে আবার ভাবিল, দাদাই বা মিথ্যা কথা কহিবেন কেন?

লাবণ্যময়ী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না। সে এত দিন যাহাকে হৃদয়সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছে, আজ সহসা তাহাকে বেদীচ্যুত করিতে পারিল না। কেবল আত্মঘৃণায়, অভিমানে, বেদনায়, সেই কোমল হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। * *

সুকুমার স্থির করিয়াছিল, এবার পীড়া হইলেও পরীক্ষা দিতে হইবে। সে পরীক্ষার পাঠ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত ছিল। সময় সময় সে বাটীতে নিয়মমত পত্র লিখিবারও অবকাশ পাইত না। সুকুমারের পত্র আসিতে এই বিলম্বে লাবণ্যময়ীর হৃদয়ে সন্দেহাগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বেদনায় অভিমানে তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। যেখানে আত্মসমর্পণ যত সম্পূর্ণ, সেখানে সামান্য কারণে বেদনাও তত অধিক; সেখানে সামান্য কারণে অভিমানও তত অধিক।

৪

পর বৎসর যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া, পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, সুকুমার দেশে ফিরিল। কিন্তু সে গৃহে ফিরিলে যে আনন্দোৎসব দেখিতে পাইবে আশা করিয়াছিল, আসিয়া তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। ললিতমোহনের কথা শুনিয়া তাহার পিতা তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাহার জন্য তিনি যেন অন্য পুত্রদিগের নিকট অপরাধী ছিলেন। তাহার জন্য অধিক অর্থব্যয় হয় বলিয়া, সুকুমারের ভ্রাতারা পূর্ব্ব হইতেই অসন্তোষ প্রকাশ করিত। ললিতমোহনের নিকট তাহার কথা শুনিবার পর হইতে, তাহাদের অসন্তোষগুঞ্জন ক্রমে কর্ণবধিরকর উচ্চনিনাদে পরিণত হইয়াছিল।

সুকুমার পিতার নিকট বা ভ্রাতাদিগের নিকট প্রত্যাশিত আদর পাইল না। তখন সে মনে করিল, আর যে যাহাই করুক, তাহাকে পাইয়া লাবণ্যময়ীর আনন্দের আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু হায়, মানুষের সকল আশা পূর্ণ হয় না। সাক্ষাতের সময় লাবণ্যময়ী কুশলজিজ্ঞাসার উত্তরে কুশলজিজ্ঞাসা ভিন্ন অন্য কোনও কথা খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমার বড় আশায় [illegible] হইল। কি অভিমানে যে তাহার প্রেমময়ী পত্নী তাহার সহিত এই দীর্ঘ চারি বৎসরের সুখদুঃখের কথা কহিবার প্রলোভন সংবরণ করিল, কি দুঃখে যে সে তাহাকে প্রেমসম্ভাষণ করিবার ও তাহার প্রেমসম্ভাষণ পাইবার প্রবল বাসনা মনেই রুদ্ধ করিল, কি বেদনায় যে সে স্পর্শলোলুপ অধরখানিকে সংযত করিল, সুকুমার তাহা বুঝিল না। কাজেই পত্নীর ব্যবহারে সে বড় ব্যথিত হইল।

ইহার পরদিবস সুকুমারের কোনও বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা কি সুন্দর দেখিলে?" সুকুমার উত্তর করিল, "ইংলণ্ডে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর—পথের শোভা—কনককেশিনী, নীলনয়না পান্থরমণী, আর গৃহের শোভা—বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা গৃহিণী।"

লাবণ্যময়ী পার্শ্বের কক্ষেই ছিল। সুকুমারের কথা শুনিয়া তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না। সে মনে মনে ভাবিল, "যাহারা ইংরাজ-রমণীর মত হয় না, তাহারা জন্মে কেন?"

কয় দিন সুকুমার পত্নীর সহিত নানা কথা পাড়িল, কিন্তু লাবণ্যময়ীর অটলগাম্ভীর্য্য কিছুতেই দূর হইল না। সুকুমার লাবণ্যময়ীর এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। লাবণ্যময়ী কারণ বলিতে পারিল না, বলিবে মনে করিতেই, দুঃখে অভিমানে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সুকুমার ভাবিল, তাহার অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের মত তাহার পত্নীও তাহাকে উপেক্ষা করিতেছে। অথচ সে উপেক্ষিত হইবার কোনও উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। সুকুমারের হৃদয়বেদনা ক্রোধে পরিণত হইল।

শেষে এক দিন সুকুমার পত্নীকে বলিল, "আমি আসিয়া অবধি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, আমার সহিত একত্রবাস তোমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি তোমার নিকট এরূপ ব্যবহার কখনও প্রত্যাশা করি নাই। আমার উপর যদি তোমার ভালবাসা না থাকে, তবে আমার

সহিত একত্রবাস যন্ত্রণাকর বটে। যদি তাহাই হয়, তবে তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়া থাক, আমিও অন্যত্র যাই। তোমার যখন যে ব্যয়ের আবশ্যক হইবে, আমাকে জানাইও, আমি পাঠাইয়া দিব।"

শুনিয়া লাবণ্যময়ী ভাবিল, "তুমি দোষ করিলে, তুমিই আবার আমাকে তিরস্কার করিবে? আমি কি এমনই হেয়!" উচ্ছ্বসিত অভিমানে সে [illegible] "তবে তাহাই হউক।"

পত্নীর কথা শুনিয়া সুকুমারের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। [illegible] বেদনায়, কি যাতনায়, তাহার পত্নী এই কথা বলিল, ঘটনাচক্রের কি আ[illegible]র্ত্তনে তাহার মুখ দিয়া এমন কঠোর কথা বাহির হইল, সুকুমার তাহা বুঝিবার অবকাশ পাইল না।

পরদিবস একটা গৃহের দুইটা ঘর ভাড়া করিয়া, সুকুমার দ্রব্যাদি লইয়া সেখানে চলিয়া গেল। যাইবার সময় পুত্র বিনয়কুমার বলিল, "বাবা! আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" সুকুমার তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, তাহার পর তাহাকে নামাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী চালাইতে বলিল,—পাছে কেহ তাহার নয়নে অশ্রু দেখিতে পায়। এই অনাদর উপেক্ষার মধ্যে তাহার বালক পুত্রই কেবল তাহাকে সমস্ত আদর দিয়াছিল। কি স্বাভাবিক আকর্ষণে যে বালক পিতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা বলা অসম্ভব; কিন্তু পিতাকে পাইয়া বালকের আনন্দের আর অবধি ছিল না। সে সমবয়স্কদিগের সহিত খেলা করিবার প্রলোভনেও পিতার নিকট হইতে যাইতে চাহিত না।

সুকুমার চলিয়া গেলে, লাবণ্যময়ী আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া রোদন করিল। তাহার পর উঠিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, "আমার দোষ কি?"

৫

সুকুমার একটি গৃহের দুইটিমাত্র কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সবই সম্পন্ন হইত। বাটীর অবশিষ্ট অংশ আর এক জন বিলাতফেরতের দখলে ছিল। প্রথমে দিনকতক অর্থকষ্টে সুকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। সুকুমারের প্রতিজ্ঞা ছিল, সে একটা "বড়লোক" হইবে; যাহাতে বিনয় তাহার পুত্র বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, এমন একটা

কিছু হইবে। সে বুঝিয়াছিল, তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে যশোলাভের প্রথম সোপান, আপনার ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ। যেই জন্ত সে আপনার ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল।

সুকুমার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল যে, বিনয় সপ্তাহে এক দিন ...ার নিকট যাইবে। রবিবারে বিনয় পিতার নিকটে যাইত। সে দিন ...ল হইতে দ্রব্যাদি গুছান, সাজান প্রভৃতি কার্য্যে সুকুমারের আর অবসর ...ত না; যেন কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার গৃহ দেখিতে আসিবেন।

বিনয় আসিলে সুকুমারের আনন্দের আর সীমা থাকিত না। অন্ত স্বজনগণের প্রতি তাহার স্নেহ ভালবাসা যতই বিদূরিত হইতেছিল, এই বালকের প্রতি তাহার স্নেহ ততই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল। এই বালকই তাহার সমগ্র স্নেহরাশি অধিকার করিয়া বসিতেছিল।

৬

সুকুমারকে অধিক দিন দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিতে হইল না। তাহার এক পিতৃব্য পশ্চিমপ্রদেশে ওকালতি করিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও সন্তান ছিল না। ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের মধ্যে সুকুমারেরই জ্ঞানার্জনস্পৃহা প্রবল দেখিয়া, তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সুকুমারকে দান করিয়া গেলেন। দারিদ্র্যদুঃখ হইতে সুকুমার সহসা ঐশ্বর্য্যপ্রাচুর্য্যে উপনীত হইল।

সুকুমার দেখিল, উদরান্নের জন্ত তাহাকে আর পরিশ্রম করিতে হইবে না। সে মনে করিল, একটা কোন মহদনুষ্ঠানের জন্তই সে ব্যবসায়ের দাসত্বদশা হইতে মুক্তি পাইল।

সুকুমার উপবনবেষ্টিত একখানি রম্যগৃহ ও রাশি রাশি পুস্তক ক্রয় করিল। কিন্তু আপনার নূতন গৃহে গিয়া সুকুমার দেখিল, সংসারের জ্বালা অনেক প্রকার; সংসারের বাজার-খরচের হিসাব-পরীক্ষা হইতে বাগানের মালীর কার্য্যের তত্ত্বাবধান পর্য্যন্ত এমন অনেকগুলা খুঁটিনাটি কাজ আছে, যাহা করিতে বিরক্তি জন্মে, কিন্তু না করিলেও চলে না। এই সকল কার্য্যের জন্ত সে তাহার এক পিতৃস্বসৃপুত্রকে আপনার নিকটে আনিয়া রাখিল। তিনিই সংসারের সকল কার্য্য দেখিতেন, সুকুমার আপনার অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। অল্পদিনের মধ্যে সুকুমার ... হইয়াও সর্ব্বতোভাবে পিতৃস্বসৃপুত্র বিজয়চন্দ্রের অধীন হইয়া পড়িল, আর বিজয়চন্দ্র

কর্ম্মচারী হইয়াও গৃহকর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইল। সুকুমারের সকল কার্য্যেই বিজয়-চন্দ্র হুকুম চালাইত, এবং সুকুমারও নির্ব্বিবাদে তাহার হুকুম পালন করিত। বিজয়চন্দ্র তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে অধ্যয়ন ও চিন্তা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার অবসর দিয়াছে, সুকুমার তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত।

যে দিন বিনয় তাহার গৃহে আসিত, সেই দিন কেবল সুকুমার আপনার বিষাদময় গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিত। সে দিন যেন তাহার হৃদয়ে উৎসাহ জাগিয়া উঠিত। সে দিন বালকের সহিত মিশিয়া সে আবার বালক হইত। পিতাপুত্রে কত কথা, কত খেলা হইত। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বিনয় জননীর কাছে ফিরিয়া যাইত। শূন্যগৃহের বিজনতা তখন সুকুমারের নিকট যেন দ্বিগুণ কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হইত। সুসজ্জিত গৃহের নানা দ্রব্যের মধ্যে বিনয় যে দিন যাহা চাহিত, সুকুমার তখনই তাহাকে তাহা দিত। এক দিন সুকুমার পুত্রকে গৃহের ছাতে লইয়া গেল। সেখান হইতে কলিকাতার শতসৌধছাদ দেখিয়া বিনয়কুমার কেবল "ওবাড়ীটা কাহার, ওটা কোন গির্জ্জা, ও গম্বুজটা কোন্ বাড়ীর" ইত্যাদি প্রশ্ন করিতে লাগিল। অদূরে একটা গৃহের ছাদে একঝাঁক গৃহপারাবত দেখিয়া বিনয় বলিল, "আমাকে গোটাকতক পায়রা কিনিয়া দিবে?" সুকুমার বলিল, "কাল আসিয়া দেখিবে, আমি তোমার জন্ম পায়রা কিনিয়া রাখিয়াছি। সকাল করিয়া আসিয়া পায়রা লইয়া খেলা করিবে।"

পর দিন সুকুমার আপনি যাইয়া বাছিয়া কতকগুলি সুন্দর পারাবত কিনিয়া আনিল। বিনয়ের জিনিস আর কাহাকেও দিয়া কিনিয়া আনাইলে তাহার তৃপ্তি হইত না।

রবিবারে বিনয়কুমার আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "আমার পায়রা আনিয়াছ?" সুকুমার বলিল, "আনিয়াছি; দেখিবে চল।" পিতাপুত্রে গৃহপ্রাঙ্গনের এক প্রান্তে অবস্থিত পারাবতগৃহের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইল। নানা প্রকারের পারাবত দেখিয়া বিনয়ের বড় আনন্দ হইল। সে আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করের করতালিশব্দে পারাবতগুলি চমকিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া বিনয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

পারাবতগৃহ হইতে ফিরিবার সময় বিনয় দেখিল, গৃহের সম্মুখে রাজপথে একটি ইংরেজ বালক অশ্ব ছুটাইয়া যাইতেছে। দেখিয়া বিনয় পিতাকে বলিল, "আমার অমনি করিয়া ঘোড়ায় চড়িতে ইচ্ছা করে।" সুকুমার বলিল,

"আমি তোমার জন্য একটা সুন্দর ঘোড়া কিনিয়া আনিব। তুমি এবার আসিয়া সেই ঘোড়া চড়িবে।" বিনয়ের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার মুখে সেই হাসিটুকু দেখিবার জন্য সুকুমার আপনার সর্ব্বস্ব দিতে পারিত।

পরদিবস সুকুমার পুত্রের জন্য একটি অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিল। কিন্তু সেই দিনই তাহার জ্বর হইল। দুই দিন পরে নিউমোনিয়া প্রকাশ পাইল। নিউমোনিয়া-গ্রস্ত রোগীর নিকট অল্পবয়স্কদিগের আসা উচিত নহে জানিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে শুক্রবারে সে বিজয়চন্দ্রকে বলিল, "আজ একবার আমার শ্বশুরবাড়ীতে বলিয়া আসিও যে, রবিবারে বিনয় যেন এখানে না আইসে। আমি পীড়িত।"

৭

বিজয়চন্দ্র যখন সুকুমারের শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল, তখন বিনয়কুমার গৃহ-প্রাঙ্গনে আর কয়টি বালকবালিকার সহিত খেলা করিতেছিল। বিজয়চন্দ্রকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার ঘোড়া আনা হইয়াছে ?" বিজয় বলিল, "হইয়াছে ; কিন্তু তুমি এবার আমাদের বাড়ী যাইতে পাইবে না।" আগ্রহভরে বালক বলিল, "কেন ?" বিজয় বলিল, "সুকুমারের অসুখ হইয়াছে।" বালকের মুখ গম্ভীর হইল ; সে বলিল, "আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।"

সুকুমারের শ্বশুর যে কক্ষে বসিয়া কাজ করিতেন, বিজয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিনয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরকে সকল কথা বলিল। বিদায়কালে তিনি বলিলেন, "কাল যেন একটা সংবাদ পাই।" বিজয়চন্দ্র বিদায় লইল। বালক কিছুতেই তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না ; সে তাহার সহিত যাইবার জন্য জিদ করিতে লাগিল। শেষে বিজয়চন্দ্র বলিল, "আজ তোমার যাইবার দিন নহে। আমি ত আবার কাল আসিব ; তখন যাহা হয় হইবে।"

বালক বিজয়কে ছাড়িয়া দিল। সে দিন আর খেলা করিতে গেল না।

পর দিন প্রভাতে সুকুমারের শ্বশুরালয়ে সংবাদ দিতে আসিয়া বিজয় দেখিল, বিনয় তাহার অপেক্ষায় গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।—বালকের মুখ গম্ভীর, বিষণ্ণ। বিজয়কে দেখিয়া সে ছুটিয়া রাস্তায় গেল,—জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন ?" কোন উত্তর না দিয়া বিজয় সুকুমারের শ্বশুরের নিকট গেল। বিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সুকুমারের শ্বশুর জিজ্ঞাসা করিলে বিজয়চন্দ্র বলিল, "... বলিতেছেন —রোগীর অবস্থা Worse."

পার্শ্বের কক্ষে বিনয়ের এক মাতুল একটা অঙ্ক লইয়া ... পড়িয়াছিলেন; বালক তাঁহার কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "worse মানে কি?" তিনি বলিলেন, "খারাপ।"

বালক আসিয়া বিজয়চন্দ্রকে ধরিল—সে সুকুমারকে দেখিতে যাইবে। কেহ তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পারিল না। বালক কাঁদিতে লাগিল।

ছাড়াইবার অন্য উপায় না দেখিয়া বিজয় বলিল, "তোমার মাকে বলিয়া আইস।" সে ভাবিল—জননী পুত্রকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিবেন।

বিনয় ছুটিয়া অন্তঃপুরে জননীর নিকট গেল। সে লাবণ্যময়ীকে বলিল, "মা, আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।" লাবণ্যময়ী বলিল, "আজ তোমার সেখানে যাইতে নাই।"

বালক জননীর নিকট হইতে সরিয়া গেল। অভিমানে ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। সে বলিল, "আমি আর কখনও তোমার কাছে আসিব না, কখনও তোমাকে 'মা' বলিয়া ডাকিব না। তুমি আমাকে যত ভালবাস, আমি বাবাকে তাহার চেয়ে অনেক বেশী ভালবাসি। বাবার মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার তাঁহাকে দেখিতে দিবে না; তবে হয় ত আমি মরিবার সময় তুমি আমাকে একবার দেখিতেও আসিবে না।"

একদিন জলধরধারাপাতে যেমন পর্ব্বত-অঙ্কে সুপ্ত নির্ঝরের বারিরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তেমনি পুত্রের এই কথায় লাবণ্যময়ীর রুদ্ধ-বেদনারাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল,—তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই বালকের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে; আর আমি রাক্ষসী তাঁহার পীড়ার কথা শুনিয়াও অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইতে পারিতেছি না!" লাবণ্যময়ী আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না। সেই অশ্রুজলে স্বামীর উপর তাহার সমস্ত অভিমান, সমস্ত ক্রোধ বিধৌত হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে লাবণ্যময়ী পুত্রকে বলিল, "চল, আমিও যাইব।"

বিনয়কুমার ছুটিয়া বহির্বাটীতে গেল। বিজয় তখন কেবল রাজপথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। বিনয়কুমার তাহাকে ধরিল, বলিল, "চল; মাও যাইবে।" বিজয় ফিরিয়া আসিল।

সুকুমারের শ্বশুর জানিয়া আসিয়া বিজয়কে বলিলেন, "লাবণ্যও যাইতে চাহিতেছে।"

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমার সুকুমারকে দেখিতে যাইলে অপ্রত্যাশিত আনন্দে রোগীর পাছে অনিষ্ট হয়, এই আশঙ্কা করিয়া, বিজয়চন্দ্র সে বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে গেল। বিনয় তাহার সঙ্গে গেল;—পাছে 'বিজয় পলাইয়া যায়।

সকল কথা শুনিয়া চিকিৎসক বিজয়কে বলিলেন, "অপ্রত্যাশিত দুঃখাতিশয্যে যেরূপ অপকার হয়, অপ্রত্যাশিত আনন্দাতিশয্যে সেরূপ অপকার হয় না; বরং তাহাতে সময় সময় উপকার হইয়া থাকে। যাহা হউক, আপনি কথাপ্রসঙ্গে রোগীকে পূর্ব্বে সকল কথা জানাইয়া তবে তাঁহাকে স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন। কারণ 'সাবধানের বিনাশ নাই।' তাহা হইলে আশঙ্কার আর কোনও কারণ থাকিবে না।"

বিজয়চন্দ্র সুকুমারের শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। পুত্রকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রায় বর্ষাধিকাল পরে লাবণ্যময়ী স্বামিসন্দর্শনে চলিল।

৮

লাবণ্যময়ী ও বিনয়কুমারকে কক্ষান্তরে রাখিয়া, বিজয় ভ্রাতার কাছে আসিয়া বসিল। তাহাকে দেখিয়াই সুকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনিয়া বিনয় কি বলিল?"

বিজয় বলিল, "সে তোমার কাছে আসিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল,—কাঁদিতে লাগিল।"

সুকুমারের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। সে বলিল, "ডাক্তার কি বলিয়াছেন যে, একবার আমার কাছে আসিলেই তাহার অনিষ্ট হইবে? আমি কি মরিবার সময়ও একবার তাহাকে দেখিতে পাইব না? সে ভিন্ন জগতে আর কেহ আমাকে ভালবাসে না। সে ভিন্ন জগতে আমার আর কে আছে? তাহাকে দূরে রাখিয়া দেখাইও,—আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু মরিবার পূর্ব্বে একবার তাহাকে দেখাইও।"

বিজয় বলিল, "তুমি মরিবার কথা বলিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে?"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুকুমার বলিতে লাগিল, "আমার বাক্সে আমার উইল আছে। আমার সর্ব্বস্ব আমি বিনয়কে দিয়াছি, যাহাতে

তাহার বিদ্যাশিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত হয়, তাহা করিও। আ[illegible] বড় হইয়া যেন আমার এই গৃহে আসিয়া বাস করে। এই শূন্য গৃ[illegible] আমার বেদনাক্লিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছি। বিনয় আসিয়া আমার [illegible] গৃহে বাস করিবে, এই শূন্য গৃহে তাহার পুত্রকন্যার কলহাস্য মুখরিত হইবে, ইহাই আমার জীবনের একটা সুখের স্বপ্ন ছিল। জীবনে অনেক সুখের স্বপ্ন রচনা করিয়াছিলাম, একটিও সফল হয় নাই; বোধ করি, এ সুখস্বপ্নও সফল দেখিতে পাইব না।"

বিজয় আবার বলিল, "কেন মরিবার কথা বলিতেছ?"

সুকুমার কোনও উত্তর দিল না।

বিজয় বলিল, "সুকুমার! তোমার স্ত্রী যদি একবার তোমাকে দেখিতে চাহেন, আনিব কি?"

সুকুমার দুঃখের ম্লানহাসি হাসিল। সে বলিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? তিনি জীবনে আমাকে দেখিতে চাহেন নাই; আর আজ আমাকে দেখিতে আসিবেন! এক বার আসিলে হয় ত ভাল হইত। কেন যে এ মনোমালিন্য হইল, তাহা বুঝিতে পারি নাই। জীবনে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাই নাই, মরণের পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতাম। জানিতে পারিলে হৃদয়ের একটা ভার নামিয়া যাইত। সে যাহাই হউক, বিনয়ের বিষয়ে যাহা বলিলাম, ভুলিও না।"

এই সময় কক্ষদ্বার হইতে কে ডাকিল, "বাবা!"

সুকুমারের ম্লান পাণ্ডুর মুখে আনন্দে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বিনয় আসিয়াছে?"

বিজয়চন্দ্র বলিল, "তোমার স্ত্রী বিনয়কে লইয়া আসিয়াছেন।"

সুকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

"তোমার স্ত্রী একবার তোমার নিকটে আসুন" বলিয়া, বিজয়চন্দ্র উঠিয়া গেল।

লাবণ্যময়ীর পিত্রালয়ের দাসীকে দিয়া তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া, বিজয় বিনয়কুমারকে তাহার ঘোড়া দেখাইতে লইয়া গেল।

৯

ধীরে ধীরে আসিয়া লাবণ্যময়ী স্বামীর শিয়রের কাছে বসিল।

সুকুমার বলিল, "আজ আমার মৃত্যুকালে তুমি যে অনায়াস উপেক্ষা

ত্যাগ করিয়া একবার আমাকে দেখিতে আসিয়াছ, ইহাই আমার সৌভাগ্য। আমি মরিলে বিনয়ের সকল ভার তোমার, তোমাকেই তাহার পিতামাতা উভয়ের কার্য্য করিতে হইবে।"

সুকুমার শুনিতে পাইল, কে তাহার শিয়রে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সে বলিল, "একবার সরিয়া আসিয়া পাশে বসিবে? অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, হয় ত আর দেখিতে পাইব না।"

লাবণ্যময়ী আসিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিল। তাহার অশ্রু আর বাধা মানিল না, দুই গণ্ড বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

সুকুমার বলিল, "কেন যে তুমি আমার সহিত এমন ব্যবহার করিলে, জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার কারণ জানিতে পারি নাই। যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সে জন্ম তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি, ক্ষমা করিও।"

লাবণ্যময়ী আর থাকিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমিই অপরাধ করিয়াছি। তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে, কিন্তু আমি ত মুহূর্ত্তের জন্ম তোমাকে ভুলিতে পারি নাই! তুমি আমার সর্ব্বস্ব—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিয়াছিলাম? তুমি যাহাই কর, তুমি আমার স্বামী—ইহকালে পরকালে সর্ব্বস্ব। তুচ্ছ অভিমানে কেন এত দিন আসিয়া তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিতে পারি নাই? আমি গর্ব্বে অন্ধ হইয়া অভিমানকে প্রেমের অপেক্ষা অধিক যত্ন করিয়াছি। আজ আমি আমার ভুল বুঝিয়াছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

লাবণ্যময়ীর কথা সুকুমারের নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল। সে বলিল, "তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমি কবে তোমাকে ভুলিয়াছিলাম?"

লাবণ্যময়ী বলিল, "দাদা আসিয়া বলিয়াছিলেন যে, বিলাতে গিয়া তুমি আমাকে ভুলিয়াছিলে। তুমি যদি আর কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তবু তুমি আমার স্বামী—আমি কেন তোমার উপর রাগ করিলাম?"

সুপ্ত সিংহ যেন সহসা জাগরিত হইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। লাবণ্যময়ীর কথা শুনিয়া রোগশয্যায় শয়ান সুকুমার চঞ্চল হইয়া উঠিল, উত্তেজিতস্বরে সে বলিল, "ললিত এই কথা বলিয়াছে! যাহার জন্ম সেই সুদূরপ্রবাসে আমাকে লজ্জিত হইতে হইয়াছে, যে অর্থে আমার ব্যয়সঙ্কুলন হইত,—পাপের অপব্যয় হেতু তাহার দ্বিগুণ অর্থেও যাহার ব্যয়সঙ্কুলন হইত না,—যাহার অবৈধপ্রেমের

সাক্ষ্য অনেকগুলা পত্র এখনও আমার কাছে আছে, সেই আমার বিরুদ্ধে এই কথা বলিয়াছে! আপনার দোষ কাটাইবার জন্য মানুষ অপরের নামে এমন অপবাদও দিতে পারে! মানুষ এত নীচও হইতে পারে? আর দূরে থাকিলে নিতান্ত আপনার জনও মানুষকে এমন ভুল বুঝে!”

লাবণ্যময়ীর মুখ প্রফুল্ল হইল। তপনোদয়ে তুচ্ছ কুজ্ঝটিকা যেমন অপসৃত হইয়া যায়, আজ এই কথায় স্বামীস্ত্রীর মনোমালিন্য তেমনই দূর হইয়া গেল। সুকুমার বুঝিল, লাবণ্যময়ীর দোষ নাই, দোষী ললিতমোহন। লাবণ্যময়ী বুঝিল, সুকুমার দোষী নহে, দোষী ললিতমোহন।

তাহার পর লাবণ্যময়ীর মুখ আবার গম্ভীর হইল।

আপনার হাতে পত্নীর হাতখানি লইয়া সুকুমার পূর্ব্বের মত করিয়া বলিল, “লাবণ্য! কি ভাবিতেছ?”

এত দিন পরে স্বামীর আদরে, স্বামীর সোহাগে, লাবণ্য এবার আনন্দের কান্না কাঁদিল। সে বলিল, “ভাবিতেছি, এত দিন তোমাকে কেন এ কথা বলি নাই? কেন এ সন্দেহ, এ অভিমান, এ বেদনা লইয়া কষ্ট পাইয়াছি?” এই বলিয়া উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে লাবণ্য আবেগময় চুম্বনে রোগশয্যাশায়ী সুকুমারের পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া দিল।

* * * * * *

এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ সুকুমারের পক্ষে ঔষধের অপেক্ষা অধিক উপকারী হইল। সুকুমার শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। এই আনন্দের সুখস্মৃতি তাহার রোগশয্যার যাতনা-স্মৃতিকেও সুখময় করিয়া রাখিল।

বকুল।

হেরি অনাদৃত তোরে এ বিজন বনে,
বকুল, আকুল প্রাণ কাঁদে-রে বিরলে।
যতনে কুড়ায়ে তোরে দুলাইতে গলে
আসে না শিশুর দল, উষার কিরণে
ফিরে না বালিকা সব চপল চরণে
চিকণ মালিকাখানি পরিতে কুন্তলে,
ভরিয়া সুসাজিখানি সিক্ত পুতজলে
পুজারী লয় না গৃহে ইষ্টের পূজনে।
প্রবীণ বয়স মোর, শঙ্কিত হৃদয়ে
সদা করি ধ্যান; [illegible] এ কাননে
অতি বৃদ্ধ বিজনতার [illegible]
মনের বাসনা মনে [illegible] প্রাণ।
হায়! বাসনা জাগে তবু, [illegible]
পেতাম যদ্যপি সেই [illegible] জীবন।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং।

অল্প দিনের মধ্যে ইংরাজপাঠকসমাজে অসাধারণ প্রশংসালাভের সৌভাগ্য রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর যেমন হইয়াছে, তেমন অতি অল্প লোকেরই হয়। তাঁহার কবিতার, ছোট গল্পের, গানের ও উপন্যাসের প্রশংসার আতিশয্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। লাহোরের একখানা সংবাদপত্রের যুবক সহকারী সম্পাদক যে অল্প দিনের মধ্যেই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় এত সুখ্যাতিলাভ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ করি, কেহ কল্পনাও করেন নাই। তাঁহার এই অসাধারণ প্রশংসার কারণ আমরা ক্রমে অনুসন্ধান করিব।

লাহোরে অবস্থানকালে কিপ্‌লিং যে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক ছিলেন, তৎকালে মিষ্টার রবিন্‌সন্ সেই পত্রের সম্পাদক ছিলেন। অল্প দিন পূর্ব্বে "ম্যাক্‌লুরস্ ম্যাগাজিন" পত্রে মিষ্টার রবিন্‌সন যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিপ্‌লিংএর প্রথম রচনার বিষয় অবগত হওয়া যায়।

দশ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে, লেখকের সহিত কিপলিং যখন প্রথম পরিচিত হয়েন, তখন তাঁহার মুখ বালোচিত কোমললাবণ্যপূর্ণ; কিন্তু অধিক দিন টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া বসিতে বসিতে প্রাপ্তবয়স্কগণ যেমন একটু 'কোলকুঁজো' হইয়া পড়েন, কিপ্‌লিং তখনই সেইরূপ একটু সামান্য কুব্জ ছিলেন। তিনি তখনও চশমা ব্যবহার করিতেন। তখন তাঁহার সকল কার্য্যেই বিশেষ ব্যস্ততা লক্ষিত হইত; তাঁহার সরস কথাবার্ত্তায় সকলে সন্তুষ্ট হইত।

দশ বৎসর পূর্ব্বে।

কালি ছড়ান কিপ্‌লিংএর একটা রোগ ছিল। গ্রীষ্মকালে তিনি একটা সাদা পেণ্টলেন ও একটা পাতলা ভেষ্ট পরিয়া আফিসে কায করিতেন; দিবসের কার্য্যের পর যখন তিনি গৃহে ফিরিতেন, তখন তাঁহার পরিধেয় বসন বহু মসীচিহ্নে বিভূষিত হইত। কিপ্‌লিং আপনার পেন দোয়াতে অধিক দূর পর্য্যন্ত ডুবাইতেন, আবার তাঁহার সকল কাজেই ব্যস্ততা ছিল, কাজেই চারি দিকে কালি ছিটাইয়া পড়িত। কিপ্‌লিং কোনও কার্য্যের অনুরোধে সম্পাদকের কক্ষে প্রবেশ করিলেই, সম্পাদক তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিতেন; কারণ তিনি জানিতেন, কিপ্‌লিং সঙ্গে করিয়া এক কলম পূর্ণ করিয়া কালি আনিয়াছেন, তিনি কাছে আসিয়া স্বাভাবিক ব্যস্ততাবে টেবিলে কাগজ রাখিলে, বা কোনও কাজ করিলেই, কালি ছিটকাইয়া লেখকের গায়ে লাগিবে।

রচনার উপাদান সংগ্রহ করিতে কিপ্‌লিং কখনও শ্রম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার City of Dreadful Night কল্পিত চিত্রমাত্র নহে। উক্ত রচনার উপাদান সংগ্রহ

করিবার জন্য, গ্রীষ্মকালের ক্লেশদায়ী নিশীথে কিপ্‌লিং লাহোরের দুর্গন্ধপূর্ণ গলিতে গলিতে গুলির আড্ডায় ও পাপের গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাঁহার City of Two Creeds ও তাঁহার কল্পিত চিত্র নহে। ভাষায় চিত্রাঙ্কনীপ্রতিভা কিপ্‌লিংএর প্রথম হইতেই ছিল; তিনি তাহার বিকাশের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবাসীদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতি সম্বন্ধে কিপলিং সকল বিষয় অবগত আছেন। কিপ্‌লিংএর কবিতা আপনি আসিত। লাহোরের সাধারণ উদ্যানে ব্যাণ্ড-বাদ্য শুনিয়া তাঁহার কবিতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। একবার একটা সুর মাথায় ঢুকিলে, সে সুরের উপযোগী কথার জন্য কিপ্‌লিংকে ভাবিতে হইত না, কথা আপনি আসিত।

রচনা।

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাজে তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনীষাসম্পন্ন মহিলার অভাব নাই। মহিলাসমাজে কিপ্‌লিং বিশেষ আদৃত ছিলেন। কাজেই তাঁহার উপর মহিলাদিগের প্রভাবও অল্প ছিল না। সিমলা শৈলে কোনও সেনাধ্যক্ষের পত্নী এখনও গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, কিপ্‌লিং তাঁহার প্রথম পুস্তকের উৎসর্গপত্রে যে লিখিয়াছেন, To the Wittiest woman in india, সে তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া। কিন্তু লোকে বলে, কিপ্‌লিং আপনার জননীকেই পুস্তক উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিপ্‌লিংএর আর এক জন বান্ধবী এখন মৃতা, তিনি কোনও অ্যাংলোইণ্ডিয়ান উপন্যাস ও কবিতা-লেখকের পত্নী ছিলেন। কিপ্‌লিং ছাপাইবার পূর্ব্বে কোনও কোনও রচনা তাঁহাকে দেখাইতেন বলিয়া তিনি গর্ব্ব করিতেন। মহিলাচরিত্রে কিপ্‌লিংএর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি এই সকল মহিলার সহিত পরিচয়ের ফল।

মহিলার প্রভাব।

কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হইলে, প্রবন্ধলেখক তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠকসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার ইচ্ছা করেন। তিনি Departmental Ditties পুস্তকের আটখানি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পত্রে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু সমালোচনা হয় নাই। বোধ হয়, ইহার কারণ এই যে, কোনও বিজ্ঞাপনদাতা প্রকাশক সে গ্রন্থ সমালোচনার্থ প্রেরণ করেন নাই।

কবিতা-প্রকাশ।

এই প্রথম পুস্তক সম্বন্ধে কিপ্‌লিং স্বয়ং My First Book নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, লাহোরে সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি কবিতা লিখিতেন, এবং সংবাদপত্রেই প্রকাশ করিতেন। সংবাদপত্রে প্রবন্ধের অসংকুলান হইলে, তাঁহার নিকট কবিতা চাহিতে আসিয়া প্রেসের মানুষ বলিত, "এক আউন্স চিজ।" অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইবার পর, সেগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য অনেকে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লেখক শুনিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও কোনও কবিতা সৈনিকদিগের এতই ভাল লাগিয়াছে যে, তাহারা সেগুলি গান করে। তিনি ভাবিলেন, প্রেসের লোকদিগকে কিছু দিলেই তাহারা আফিসের কাযের পর তাঁহার পুস্তক ছাপিয়া দিবে; শেষে তাহাই হইল। কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা, ব্রাউন কাগজে বাঁধা, লাল ফিতা বাঁধা পুস্তক প্রকাশিত হইল। তিনি আপনি লেখক, আপনি প্রকাশক। ফিরাই পোষ্টকার্ডের এক দিকে পুস্তকের বিজ্ঞাপন ও অপর দিকে পুস্তক পাঠাইবার আদেশপত্র ছাপাইয়া, সেগুলি পাঠান হইল। ভারত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, এমন কি, এডেন হইতে সিঙ্গাপুর, কোয়েটা হইতে কলম্বো; সর্ব্বত্র পত্র প্রেরিত হইল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণ বিক্রীত হইয়া গেল; দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে এক জন প্রকাশক স্থির করা হইল। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানি কিছু পরিবর্দ্ধিতও হইল। তাহার পর প্রতি সংস্করণেই গ্রন্থখানি পরিবর্দ্ধিত হইয়া শেষে এ.এ.র আকার ধারণ

হইয়া প্রকাশিত হইল। কিন্তু সেই ব্রাউন কাগজে বাঁধা প্রথম অবস্থার পুস্তকখানিকেই গ্রন্থকার অধিক ভালবাসিতেন।

ইহাই কিপ্‌লিংএর প্রথম পুস্তক প্রকাশের বিবরণ। ইহার পর গ্রন্থ লিখিয়া তাঁহার অর্থ ও যশ কিছুরই অভাব হয় নাই। কিপ্‌লিং তাঁহার এক একটা দীর্ঘ গল্পে প্রতি কথায় বার আনারও অধিক হিসাবে মূল্য পাইয়াছেন। কিন্তু এ দেশে সে কথা বলিয়া আর সাহিত্যসেবী পাঠককে কষ্ট দিব না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কিপ্‌লিংএর কবিতার উপাসকের অভাব নাই। অল্প দিন হইল, খ্যাতনামা আমেরিকান ঔপন্যাসিক হাওয়েলস্‌ কোনও আমেরিকান পত্রে কিপ্‌লিংকে The laureate of that larger England whose wreath it is not for any prime minister to bestow. বলিয়াছেন। পূর্ব্বে কবিতা। কিপ্‌লিং ভারতবর্ষীয় সৈনিকদিগকেই প্রায় সঙ্গীতের বিষয়ীভূত করিতেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে "পিক্‌-মি-আপ্‌" পত্রে কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। য়ুরোপের অনেকগুলি বিখ্যাত লোকের প্রতিকৃতিতে যিনি যে বিষয় লইয়া অধিক ব্যস্ত, তাঁহার মস্তিষ্কে সেই বিষয়েরই চিত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহাতে কিপ্‌লিংএর মস্তিষ্কে এক জন ভারতবর্ষীয় সৈনিকের চিত্র প্রদত্ত হয়। নিম্নে সেই চিত্রখানি সন্নিবিষ্ট করিলাম।

কিপ্‌লিং এখন নানা বিষয়ের কবিতা লিখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতার সেই অশিক্ষিত-সৈনিক-মন-ভুলান গাম্ভীর্য্য হীনতা আজও যায় নাই। ইংরাজী পাঠক সমাজে কবি কিপ্‌লিংএর অসম্ভব আদরের একটা প্রধান কারণ, ইংরাজের জাতীয় সুখ দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, জাতীয় দুর্ব্বলতার সহিতও তাঁহার সহানুভূতি। ম্যাথু আর্ণল্ড যাহাকে Spirit of insularity and contempt for foreign ideals বলেন, তাহা ইংরাজ চরিত্রে যেমন প্রবল, তেমন আর কুত্রাপি নহে। তাই ইংরাজ এত দিন আমাদিগকে শাসন করিয়া আজও আমাদের সহিত মিশিতে পারে না, আজও আমাদের চিনিতে পারে না। সম্প্রতি পুনার ব্যাপারে ও সিডিশন আইনে তাহার প্রভূত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইহা ইংরাজের দুর্ব্বলতা; কিন্তু এই দুর্ব্বলতাকে ইংরাজ গর্ব্ব বলিয়া মনে করে। আপনার দ্বৈপায়ন স্বাতন্ত্র্য তাহার বড় গর্ব্বের ধন। কিপলিংও সেটাকে এই ভাবেই দেখিয়াছেন। প্রবাসী ইংরাজের সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—

করে বটে বাস তারা দেশ দেশান্তর;
হৃদয় তাদের কিন্তু রহে এক স্থানে;
জননীর মুখে শুনি—শিশুর অন্তর
সুদূর ইংলণ্ড তার দেশ বলি জানে।

হৃদয়ের শোণিত দিয়া ইংরাজ জলযুদ্ধে যশ কিনিয়াছে। তাই সে যশ তাহার প্রাণের অধিক প্রিয়। ইংরাজ আজও এই বলিয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে যে, জলযুদ্ধে তাহার সমান দক্ষ আর কাহারও নাই। কিরূপ দুর্মূল্যে ইংরাজ এই যশ ক্রয় করিয়াছে, সে কথায় কিপ্‌লিং লিখিয়াছেন ;—

সিন্ধুর আহার মোরা যোগায়েছি সহস্র বৎসর ;
এখনও সে ডাকিতেছে, আজও তার ভরেনি উদর ;
একটি তরঙ্গ কোথা নাহি উঠে অর্ণব জীবনে—
যেথায় ইংরাজ বীর না শুয়েছে মরণ-শয়নে।

শত শত বীর দেহ সাগরে দিয়াছি উপহার,
হয়েছে তা হাঙ্গরের, জলচর পক্ষীর আহার ;
দেহের শোণিত যদি বীরত্বের মূল্য হয়, তবে,
বীরত্বের পূর্ণ মূল্য ঢালিয়াছি আমরা অর্ণবে।

জাতীয় সুখ দুঃখ, আশা অভিলাষ, এমন কি, দুর্ব্বলতার সহিত এই সহানুভূতির জন্যই, সর্ব্বত্র গীতোপযোগী গভীরোদাত্ত সুর না থাকিলেও, কিপ্‌লিংএর কবিতা ইংরাজ পাঠক সমাজে এমন অসাধারণ আদর পাইয়াছে।

কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পেরও যথেষ্ট প্রশংসা হইয়াছে। আমাদিগের সাহিত্যে ছোট গল্প বহু অধিক দিন প্রচলিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়টি ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আবার দুইটিকে বর্দ্ধিত করিয়া উপন্যাসে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ছোট গল্প দুইটি তাঁহার উপন্যাসের পার্শ্বে নিতান্ত ম্লান। মাসিকপত্রে মাসে মাসে ছোট গল্প দিবার চেষ্টা প্রথম "সাহিত্য" হইতে আরম্ভ।

ছোট গল্প কি?

সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য আমরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে ; ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে "বুল্‌স্ আই"-লণ্ঠনের আলোক যেমন এক-স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্পরচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া, তাহাকেই সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারে সেই একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহাই সে লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, উত্থান পতন, সংঘাতময় জীবনে একটা ছোট ঘটনা, অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দানই গল্প রচনাকৌশলের কার্য্য। এই হিসাবে দেখিতে গেলে, প্রকৃত ছোট গল্পের আদর্শ ফরাসী

ছোট গল্পের আদর্শ।

সাহিত্যে পাওয়া যাইবে—ইংরেজী সাহিত্যে নহে। ফরাসী গল্প প্রকৃত শিল্প ; ইংরাজী গল্প শিল্পচাতুরীবিহীন বাক্যস্তূপমাত্র। ইংরাজী গল্প লেখকদিগের মধ্যে কেবল টমাস হার্ডি প্রভৃতি দুই চারি জন ছোট গল্পের রচনায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বহুদোষ সত্ত্বেও কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পগুলি প্রকৃতই শিল্পকার্য্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "ব্ল্যাক্‌উড্‌স ম্যাগাজিন" পত্রে কোনও লেখক কিপ্‌লিংএর ছোট গল্পের

প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কিপ্‌লিংকে Star of Indiaয় ভূষিত করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, মহারাণী যদি ভারত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে কিপ্‌লিংএর পুস্তক কয়খানি পাঠ করিলে, তাঁহাকে আর কোনও পুস্তক পাঠ করিতে হইবে না। সেগুলি একত্র করিলে একখানা বড় উপন্যাসের সমান হইবে কি না সন্দেহ; কিন্তু তাহাতেই ভারতসাম্রাজ্যসম্বন্ধীয় সকল তথ্য সঙ্কলিত হইয়াছে।

ছোট গল্পে কিপ্‌লিং।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে কোনও ফরাসী পত্রে কিপ্‌লিংএর পুস্তকের সমালোচনা করিতে গিয়া মস্যো বেণ্টজন বলিয়াছেন যে, কেবল দুই তিন বৎসর হইতে লোকে কিপ্‌লিংএর নাম শুনিতেছে। কিন্তু ব্রেট হার্টের উজ্জ্বল রচনায় ক্যালিফর্ণিয়ার প্রতি পাঠকের মনোযোগ যেমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিপ্‌লিংএর রচনায় তেমনই ভারতবর্ষের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে। ব্রেট হার্ট ও কিপ্‌লিং, উভয়েই আপন আপন বর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ পরিচিত। অদূরদর্শী স্তাবকগণ যুবক কিপ্‌লিংকে ডিকেন্সের সহিত একাসনে বসাইতে চাহে। সেটা বড় ভুল। ডিকেন্স আপনার সৃষ্ট চরিত্রে আপনার অস্তিত্ব নিমজ্জিত করিতেন; কিপ্‌লিং তাঁহার পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলির পশ্চাতে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহার অহংত্ব অত্যন্ত অধিক। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, কিপ্‌লিংএর ক্ষমতার অভাব নাই।

ফরাসী সমালোচক।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে "ফর্টনাইট্‌লি রিভিউ" পত্রে মিষ্টার ফ্রান্সিস্‌ অ্যাডাম্‌স একটি সারগর্ভ প্রবন্ধে কিপ্‌লিংএর পুস্তক সমালোচনা করেন। কিপ্‌লিংএর প্রশংসা করিয়া লেখক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, রচনার বিষয়ীভূত ভারতবাসীদিগের সহিত কিপ্‌লিংএর সহানুভূতির লেশমাত্র নাই। যেন ইংরাজ কর্তৃক বিজিত ও শাসিত হইবার জন্যই তাহাদিগের জন্ম। কিপ্‌লিং যেখানেই পারিয়াছেন, সেখানেই রূঢ় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের মত ভারতবাসীদিগের নিন্দা করিয়াছেন। লেখক বলিয়াছেন, তাঁহার চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার মত মস্তিষ্কের ক্ষমতাধিক্য থাকিলে, এক কিপ্‌লিংএর পুস্তক পাঠ করিলেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্‌ জীবনের সকল কথা জানা যাইত। লেখক আরও বলেন, কিপ্‌লিং আজকালকার ইংরাজী গদ্য ভিন্ন আর বড় কিছু জানেন না; কাজেই "কণ্টিনেণ্টাল" লেখকদিগের শিল্পকৌশল তাঁহার নিকট অজ্ঞাত রহস্যমাত্র। সমালোচকের মতে, কিপ্‌লিংএর চরিত্ররচনার ক্ষমতাও অল্প। তাঁহার Soldiers Three পুস্তকে বর্ণিত চরিত্রগুলি পুত্তলিকামাত্র। আজকাল লোকে লেখক ও শিল্পীদিগের চরিত্রচিত্রাঙ্কনী প্রতিভারই বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। এরূপ চরিত্ররচনাক্ষমতার অভাব প্রশংসার কথা নহে। কিপ্‌লিং এখনও তরুণবয়স্ক; কিন্তু তাঁহার পর পর প্রকাশিত পুস্তকে রচনাশক্তির ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয় না; ইহা আদৌ আশাপ্রদ নহে।

ইংরাজ সমালোচক।

কয় মাস পূর্ব্বে "এডিনবরা রিভিউ" পত্রে কোনও সমালোচক কিপ্‌লিংএর রচনার সমালোচনা করিয়াছিলেন। সমালোচক কিপ্‌লিংএর পর্য্যবেক্ষণশক্তির ও বর্ণনাচাতুর্য্যের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কিপ্‌লিং যাহা দেখেন, তাহারই প্রত্যেক খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বর্ণনা করিতে পারেন। কি অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজ, কি ভারতবর্ষীয় সমাজ, কি সৈনিক, কি নাবিক, কি কোনও পশু, কিপ্‌লিংএর বর্ণনায় সবই যেন চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উপস্থিত হয়। পর্য্যবেক্ষণকৌশল ও বর্ণনাশক্তির হিসাবে তাঁহার রচনার তুলনা নাই বলিলেও বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কেবল এই দুই গুণ থাকিলেই সাহিত্যসেবকের ভাগ্যে স্থায়িযশোলাভ ঘটে

"এডিনবরা রিভিউ"র সমালোচনা।

না। এখন পাঠকসমাজে কিপ্‌লিংএর রচনার প্রচুর আদর ; কিন্তু সে সকল রচনায় কোনও সার্ব্বজনীন, চিরস্থায়ী বিষয় আলোচিত হয় না। সে সকল রচনার আলোচ্য বিষয় নিতান্তই বর্ত্তমান সময়ের ; নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষণভঙ্গুর। সাহিত্য হিসাবে কিপ্‌লিংএর রচনার মূল্য অল্প। তদ্ব্যতীত কিপ্‌লিংএর রচনায় অপ্রচলিত কথা, এমন কি, সমাজের নিম্নস্তরের প্রচলিত ভাষা, অর্থাৎ Slang বহুপরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যে পুস্তকে এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে পুস্তক অধিকদিন টিকিবে কি না সন্দেহ। আমরা আজকাল এতই বাস্তবপ্রিয় বা বাস্তবপাগল হইয়া উঠিয়াছি যে, এইরূপ ভাষারও প্রশংসা করি। কিপ্‌লিংএর রচনায় কেবল বর্ত্তমান সময়ের দুই চারিটা ব্যাপার আলোচিত হয়। তাঁহার Plain Tales from the hills প্রভৃতি এখন যতই আদৃত হউক না কেন, সে আদর ক্ষণস্থায়ী ; কিছুদিন পরে লোকে আর সে সকল পুস্তক পাঠ করিবে না। কারণ, সে সকল পুস্তকে মানবচরিত্রের কোনও চিরস্থায়ী অংশ চিত্রিত হয় নাই,—তাহাতে সমাজের খেয়াল ও হুজুগ চিত্রিত হইয়াছে মাত্র। কিপ্‌লিং ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। তাঁহার রচনার বিষয় চিরদিন লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে না ; সাহিত্য হিসাবে তাঁহার রচনার মূল্য অল্প ; তিনি আজকাল একটু যশ পাইবার আশায় ক্ষুদ্র ভবিষ্যতে দীর্ঘকালস্থায়ী যশোলাভের আশাও ত্যাগ করিয়াছেন।

সমাজনীতি।

কাবুলে সামাজিক জীবন।

মহিলাচিকিৎসক কুমারী হ্যামিল্টন বহু দিন কাবুলে বাস করিয়াছেন। তিনি "লেডিজ্ পিক্‌টোরিয়াল" পত্রে কাবুল সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সকল হইতে কাবুলের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারা যায়। সেই সকল প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া আমরা পাঠকদিগকে কাবুলের সামাজিক জীবনের চিত্র প্রদান করিবার চেষ্টা করিব।

যেরূপ দাসপ্রথার উচ্ছেদ করিবার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল, কাবুলের প্রচলিত দাসপ্রথা সেরূপ নহে। কাবুলে ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীদিগের অবস্থা শোচনীয় নহে। সেখানে ধনীর গৃহিণীগণ প্রায়ই অলস, কাজেই দাসীরাই গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা। এক জন ক্রীতদাসীর উপর গৃহস্বামীর সকল ভার থাকে। তাহার বেশভূষার বাহার দেখিলে কেহ আর তাহাকে দাসী বলিয়া বুঝিতে পারে না। গৃহিণীর খাস চাকরাণীও ক্রীতদাসী। সে প্রভুর ও প্রভুপত্নীর বেশভূষার সকল ভার লয়। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, কাবুলে দাসী গৃহকর্ত্তার বেশ গুছাইয়া রাখে মাত্র। স্বামীর বেশভূষার সাহায্য করা, নমাজের পূর্ব্বে তাঁহার হস্তে ও পদে জল ঢালিয়া দেওয়া, তাঁহার নমাজের আসন পাতিয়া দেওয়া প্রভৃতি, স্বামিসোহাগিনী পত্নীর কার্য্য। লেখিকা প্রবন্ধারম্ভেই বলিয়াছেন যে, প্রতীচ্য দেশবাসিগণ প্রাচ্যদেশবাসীদিগকে ঠিক বুঝিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি একটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। লেখিকার কোনও বন্ধুর জনৈক বুদ্ধিমতী দাসী তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিত। সে বহুদিন তাঁহার নিকট ছিল, এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্তাও হইয়াছিল। তাঁহার মনোভাব বুঝিবার জন্য এক দিন লেখিকা তাহাকে বলিলেন, "আচ্ছা জিনোবিয়া, তোমার আগা যদি আবার বিবাহ করেন, তবে তুমি কি কর ?"

সে বলিল, "কি আবার করিব? এখনও যাহা করি, তখনও তাহাই করিব।"

"তখন তাঁহার এ সকল কার্য্য তাঁহার পত্নী করিবে, তুমি আর করিতে পাইবে না।"

"তাহাও হইতে পারে।"

"তোমার কি তাহা ভাল লাগে?"

"তাহাতে আর কি বিশেষ হয়?"

লেখিকা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "তোমার অবশ্য অত্যন্ত ঈর্ষা হয়? কোনও স্ত্রীলোকই অপর কোনও স্ত্রীলোককে আপনার অধিকার দিতে চাহে না।"

ভিক্টোরিয়া যেন কুপিতা হইল। সে উত্তর করিল, "যাহার বুদ্ধি আছে, সে পুরুষের জন্য কোনও স্ত্রীলোককে ঈর্ষা করে না, বা তাহার সহিত কলহ করে না। আর এক জন স্ত্রীলোক আসিলেই কি আমার প্রতি তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে? পুরুষের হৃদয় তরঙ্গিণীতুল্য। যদি এখানে একটা কুকুর, ওখানে একটা উষ্ট্র স্রোতের জলপান করে, তবে তাহাতে কি স্রোতের কোনও পরিবর্ত্তন হয়? সে জন্য কি স্রোতের গতিতে কোনও পরিবর্ত্তন হইতে পারে?"

প্রিয়তমকে আপনার অপেক্ষা এত উচ্চ মনে করিয়া আপনি অনুগত কুকুরের মত তাহার অধীন থাকিবার এই কল্পনা, ইংরাজ মহিলার নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাই কথায় বলে যে, 'যে দেশে যেমন আচার'।

বিদেশীয় লেখকগণের রচনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহম্মদের মতে মহিলাগণ পশুর মত। পুরুষের সুখসাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্যই তাহাদের জন্ম; পরলোকে মহিলার কোনও স্থান আছে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ মহম্মদ কোথাও এমন কথা বলেন নাই।

মাতা ও পুত্র।

তবে মুসলমান সমাজে মহিলার যেরূপ অনাদর, তাহাতে লোকের এ-কথায় বিশ্বাস করা আশ্চর্য্য নহে। মুসলমানগণ এখন কোরাণের ভাব গ্রহণ করিতে ত পারেই না, আবার অনেক মুসলমান কোরাণ পাঠও করে না। মুসলমানগৃহে মহিলাগণ অন্তঃপুরে অর্থাৎ "হারেমে" রক্ষিতা—সেখানে তাঁহাদের খাইবার পরিবার কষ্ট নাই সত্য, কিন্তু পশুও পশুশালায় যত্নে রক্ষিত হয়। কাবুলে পুত্র জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বালক জননীকে তাড়া দেয় ও আপনার টুপি প্রভৃতি আনিতে আদেশ করে! লেখিকার কোনও পরিচিত পরিবারে দুইটি বালক ছিল, বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। আমীর তাহাদের বড় ভালবাসিতেন। তাহাদের দুষ্টামির অন্ত ছিল না। গ্রীষ্মের শেষভাগে তাহাদের কোন-না-কোন অসুখ লাগিয়াই থাকিত। জ্বর, কাশি, বেদনা প্রভৃতি পীড়ায় তাহারা কষ্ট পাইত; ইহার কারণ সহজেই দেখা যাইত। কাবুলে বালকগণ এক ঘণ্টার অধিক অধ্যয়ন করে না। অধ্যয়নের পরেই এই দুইটি বালক বাটীর বাহির হইত—রৌদ্রে ছুটাছুটি করিত, পরস্পরকে জলে ফেলিয়া দিত, সিক্তবস্ত্র গাত্রেই শুকাইত, রৌদ্রে ঘোড়া ছুটাইত; লেখিকার গাড়ীর পশ্চাতে দৌড়িত, কাঁচা, পাকা, ডাঁসা ফল খাইত—ইত্যাদি। তাহারা যেন দুইটি আলেয়ার আলোক। বলা বাহুল্য, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার থাকিত না। তাহাদের দেখিলে কেহ কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর পুত্র বলিয়া বুঝিতে পারিত না। লেখিকা তাহাদের জননীকে বলিয়াছিলেন যে, ছেলেরা অমন করিয়া বেড়াইলে তিনি আর তাহাদের চিকিৎসা করিতে আসিবেন না। জননী উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি কি করিব বলুন? আমার স্বামী সরকারী কার্য্যে সমস্ত দিন আফিসে থাকেন। কিছু খাইয়াই বালকদ্বয় ছুটিয়া বাহির হয়। আমি লোক পাঠাই বটে, কিন্তু সে লোক উহাদের খুঁজিয়া পায় না, পাইলেই বা কে উহাদের সঙ্গে সমস্ত সহরময় ছুটিয়া বেড়াইবে?" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। একটু বড় হইলে পুত্র আর জননীকে গ্রাহ্য করে

এইরূপ অত্যাচারে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায় পুত্রগণ প্রায়ই মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়। আবার সে দেশের যুদ্ধে অনেক সময় যুবকগণই মরিয়া যায়। কাজেই কাবুলী জননীরা সন্তানের মৃত্যুতে অভ্যস্তা হইয়া পড়ে। আর বোধ করি, কাবুলী জননীর অপত্যস্নেহও কিছু অল্প। আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ধাত্রীর কাছে থাকে, তাহার পর পিতাই পুত্রদিগের পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়া থাকেন। তবে কাবুলী জননীদের সারাদিন কাটে কেমন করিয়া? অভিজাতবংশীয়াদিগের কোনও কার্য্যই নাই। তাঁহারা সন্তান পালন করেন না— লিখিতে বা পড়িতেও জানেন না। স্বামী মনে ভাবেন, পত্নী তাঁহার আশায় পথ চাহিয়া আছেন।

কিন্তু যদি "আশার নিরাশা ফলে দুঃখ কামনায়" তবে কাবুলী পত্নীর আশায় তীব্র নিরাশা ও কামনায় তীব্র দুঃখই ফলিয়া থাকে। কারণ সময় সময় এমনও হয় যে, কোনও পত্নীর পক্ষে কুড়ি একুশ দিন স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়া উঠে না।

পতিপত্নী।

লেখক আমীরের বংশসম্ভূতা কোনও রমণীর কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বামী এক দিন মস্তকে ঔষধ লেপন করিয়া দরবারে আসিয়া উপস্থিত। লেখিকা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "তোমরা স্ত্রীলোকরাই ত যত অনিষ্টের মূল।" লেখিকা বলিলেন, "কেন, আপনার কোনও পত্নী কি আপনাকে প্রহার করিয়াছেন নাকি?" সর্দ্দার কোনও উত্তর প্রদান না করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। দরবারে লেখিকা এক জন রাজকর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, এক জন সর্দ্দারকে তাঁহার পত্নী প্রহার করিয়াছেন।

আমীরের সম্মুখে কেহ মৃদুস্বরে কোনও কথা কহিলে আমীর কথাটা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা হইতেছে?" রাজকর্ম্মচারী কথাটা আরও একটু অতিরঞ্জিত করিয়া বলিলেন। সর্দ্দার তখনই আহূত হইলেন; এবার সর্দ্দারকে সব কথা বলিতে হইল। তিনি তাঁহার কোনও পত্নীর সহিত বিংশতি দিবস সাক্ষাৎ করেন নাই। একবিংশতি দিবসে পত্নীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া সর্দ্দার দেখেন যে, পত্নী তখন পোলাও আহার করিতেছেন। পলাতক ছাত্র যেমন স্কুলে গিয়া পুস্তক খুলিয়া বসে, সর্দ্দার তেমনই পত্নীর নিকটে গিয়া আহার করিতে বসিয়া গেলেন। পত্নীর মুখে ক্রোধভাব দৃষ্ট হইল না। তিনি অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বামীকে দিতে লাগিলেন; স্বামী ভাবিলেন, এবার সহজেই গোল চুকিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনও পত্নীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। অস্থি হইতে মাংস বিচ্ছিন্ন করা শেষ হইলে, পত্নী অস্থিখানা তুলিয়া স্বামীর মস্তকে প্রহার করিলেন। তাহারই ফলে সর্দ্দারকে মস্তকে ঔষধ লেপন করিয়া দরবারে আসিতে হইয়াছিল। ইহারই নাম "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল!"

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা।

১

নদিয়ার পুরে আজি আনন্দ অপার,—
নীলাচল-পরবাসী নদিয়ার প্রভু আসি'
অগণ-সমাজ মাঝে উদিলা আবার ;
হুলুধ্বনি উৎসবরব জন্মে জাগিয়া সব
দিশি দিশি সে সংবাদ করিল প্রচার।

২

অসংখ্য আইল বেড়ে বৈষ্ণবের দল ;
সঙ্কীর্ত্তনে উতরোল উঠে 'হরি হরি'-বোল,
ছাইয়া অবনী ঊর্দ্ধে উঠে কোলাহল ;—
এ সংসার পারাবার, প্রভু তাহে কর্ণধার,
কেন না নাচিবে প্রাণী উল্লাসে বিহ্বল ?

৩

সাথে ল'য়ে অনন্ত সে জনতার রাশি,
সন্ন্যাসী ভিখারী-বেশে নিজ গৃহদ্বারদেশে
বিষাদে বিকল প্রভু দাঁড়াইলা আসি ;
দেখিতে দেখিতে তাঁর দুটি পদ্ম-আঁখিতার
সহস্র স্মৃতির স্রোতে উঠে যেন ভাসি'।

৪

শৈশবের লীলাভূমি স্নেহের ভবন,—
সেই সে আঙ্গিনা মাঝে সে তুলসী-মঞ্চ রাজে,
দেবতার গৃহচূড়ে গরুড়-কেতন,—
চির জনমের তরে নিরখি' ব্যগ্রতাভরে
প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রভু মোর কহিলা তখন —

৫

"প্রণমামি জন্মভূমি, জননী আমার !
সাজিয়া সন্ন্যাসি-সাজ কত যুগ পরে আজ
মধুর মূরতি তব হেরিনু আবার !
জনমিয়া তব কোলে তোমারই প্রসাদবলে
পাইনু মা কৃষ্ণপ্রেম কামনার সার।

৬

"প্রণমামি শেষবার, বিদায় এখন !
তোমার পবিত্র ধূলি লইনু মা শিরে তুলি' ;
এই আশীর্ব্বাদ আজি কর বরিষণ,—
যেন এ প্রেমের ডোরে বাঁধি সে হৃদয়-চোরে,
পাই যেন বৃন্দাবনে কৃষ্ণ [illegible]।"

৭

সহসা করুণ কণ্ঠ উঠিল কাঁপিয়া,
উৎসারিত উৎস ছুটি' বিশাল নয়ন দুটি
বরিষার স্রোতে যেন দিল ভাসাইয়া;
বিগলিত তনু মন কাঁদিল বৈষ্ণবগণ,
কোটি কণ্ঠে 'হরি-হরি' উচ্চে উচ্চারিয়া।

৮

কাঁদিয়া লইলা প্রভু অন্তিম বিদায়;—
নদিয়ার নাট্যাগার হয় চির-অন্ধকার,
নদিয়া ভাসিয়া যায় নয়ন-ধারায়।
হেনকালে বজ্রাঘাত!— কে পড়িল অকস্মাৎ
প্রভু-পাদমূলে আসি পাগলিনীপ্রায়!

৯

নিবিড় বসনে ঢাকা আপাদ-কুন্তল;
বিমলিন বেশবাস, চিররুক্ষ কেশরাশ,
তবু সে বসনে কান্তি কাঞ্চন উজ্জ্বল,
নদিয়ার চাঁদে হায়, হেরি অস্তমিতপ্রায়
নদিয়ার লক্ষ্মী কিরে হইলা চঞ্চল?

১০

সমুখে সুন্দরী হেরি' সন্ন্যাসী নিমাই,
ধর্ম্মলোপ ভাবি' মনে রোষ করি' ভ্রূ'নয়নে
"কে তুমি?" কহিলা শুধু তাহারে সুধাই;—
স্তম্ভিত সকল রব, স্তম্ভিত বৈষ্ণব সব
সবিস্ময়ে নিনিমেষ দোঁহা পানে চাই'।

১১

বিস্ময়ে বিকল সবে, কে করে উত্তর?
কারও মুখে নাহি বাণী, নীরব সহস্র প্রাণী
দাঁড়াইয়া চিত্রে যেন আঁকা কলেবর;—
কতক্ষণে কর্ণে আসি' পশিল সুধার রাশি,
মর্ত্তে যেন নন্দনের ঝরিল নির্ঝর!

১২

"প্রথম আশ্রমে প্রিয় নিবাসে যখন
ছিলে তুমি বিষয়াস! সে গৃহ-মন্দির মাঝ
করিত যে দিবানিশি চরণ-পূজন;
পাদপদ্ম-অভিলাষী আমি সে দাসীর দাসী,
হয় ত আজিও মনে হইবে স্মরণ।"

১৩

বৈশাখী প্রভাত সম প্রফুল্ল সরস
প্রভুর আনন [illegible] হায়, ঘনমেঘে ঢেকে যায়,
উচ্ছ্[illegible]সিয়া উঠে নয়নের জল;

তবু আত্মসম্বরিয়া কহিলা পাষাণ-হিয়া,—
"কি প্রার্থনা ? সন্ন্যাসীরে করিও না ছল।"

১৪

করুণ সে বাণী-বীণা বাজিল আবার,—
"হে ঠাকুর ! আজি মোর দুঃখের কহহ ওর ;
প্রেমদানে ত্রিজগৎ করিলে উদ্ধার,
চির প্রেম-কাঙালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া অভাগিনী
পড়িয়া কি র'বে শুধু ভবের মাঝার ?"

১৫

প্রিয়ার কামনা শুনি' কহিলা নিমাই,—
"পূর্ণ হ'ক মনস্কাম,— বিষ্ণুপ্রিয়া তব নাম,
হও তুমি কৃষ্ণপ্রিয়া, এই শুধু চাই ;
জীবের সর্ব্বার্থসার কৃষ্ণ বিনা নাহি আর ;
শুন রাণী, কহি আমি কৃষ্ণের দোহাই।"

১৬

প্রভুর বচনে প্রিয়া প্রবোধ না পায় ;
পুনঃ কহে,—"হে ঠাকুর ! কহ কৃষ্ণ কত দূর ?
দাসীর পরাণ সে ত তাঁরে নাহি চায় ;
আমার নয়ন-আগে একমাত্র মূর্ত্তি জাগে,—
অন্তরে বাহিরে আমি নিরখি তোমায়।

১৭

"কিশোর শৈশব হ'তে তটিনী সমান,
সকল আকাঙ্ক্ষাচয় এক স্রোতে ক'রি লয়
যে গৌরাঙ্গ-সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে প্রাণ,
তাঁরে ত্যজি' অকস্মাৎ কোথা যেতে বল, নাথ ?
নারীর জীবন-বারি বহে কি উজান ?"

১৮

যতনে নিবারি প্রভু নয়নের জল,
প্রসন্ন-মানসে কয়, "হে সাধ্বী ! তোমারি জয় ;
সাধের সাধনা তব হউক সফল ;
যাই এবে বৃন্দাবন দেহ আজ্ঞা হৃষ্টমন,
লহ এই বিরহের সান্ত্বনা সম্বল।"

১৯

পাদুকা লইয়া প্রিয়া উঠিলা তখন,
প্রণমিয়া ধীরে ধীরে বারেক পরশি' শিরে
চুম্বিয়া বুকের 'পরে করিলা ধারণ ;
আর না ফিরিয়া চায়, রাজরাজেশ্বরীপ্রায়
উচ্চ জয়ধ্বনি মাঝে পশিলা ভবন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ ; ১৩০৫।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। জ্যৈষ্ঠ। "পুত্র-যজ্ঞ" একটি চলনসই ক্ষুদ্র গল্প। লেখক বোধ করি নূতন ব্রতী। "জুতা-আবিষ্কার" একটি অদ্ভুত ও উদ্ভট রচনা;—লেখকের বিদ্রূপরচনার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলিতে বাধ্য যে, কবির চেষ্টা "কবিত্ব" বটে। "শিক্ষাপ্রণালী" প্রবন্ধে পদে পদে লেখকের চিন্তাশীলতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত, লেখক বিস্তারিতভাবে তাহার আলোচনা করিয়া সাধারণকে উপকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। লেখক ত প্রবন্ধে পরামর্শ দিলেন, কিন্তু এখন 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে?' "বেণো জল" প্রবন্ধে লেখক ভারতে বিদেশীর পণ্যের আবির্ভাব ও দেশীয় শিল্পের অন্তর্ধানের বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। প্রবন্ধটি সর্ব্বসাধারণের আলোচনীয়। "সাহিত্যের সৌন্দর্য্য" প্রবন্ধে সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা আছে। এই নিবন্ধটির কতকটা 'কবিতা', কতকটা হেঁয়ালি, এবং সমস্তটাই আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। "ত্রিবাঙ্কুর—ভ্রমণকারীর নোট" সুপাঠ্য। "বাঙ্গালা বহুবচন" প্রবন্ধে লেখক আমাদের বহুবচনের উৎপত্তি ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিয়াছেন। "ঢাকা" একটি ভ্রমণকাহিনী—এক বিন্দু ইতিহাসের আমেজ আছে।

নব্যভারত। ষোড়শ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "কি চাই, কি পাই?" সম্পাদকের রচনা। "নব্যভারত"-সম্পাদক অনেক সময় ভুলিয়া যান যে, তাঁহার সমস্ত সুখদুঃখের সহিত পাঠকগণের বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই, এবং তাঁহার যে কাঁদুনী পাঠকদের হৃদয় বিগলিত করিতে সক্ষম, তাহা সাধারণ সমাজে নিরবচ্ছিন্ন হাস্যরসের সঞ্চার করিতে পারে। তিনি যেখানে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, অপরিচিত লোকের চক্ষে তাহাও যে ছদ্মবেশ বলিয়া প্রতীত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও সম্পাদকমহাশয়ের চিত্তে উদিত হয় না। সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছেন, "আমরা এই সাতের বৎসর কেবল ভূতের ব্যাগার খাটিয়াছি। খাটিয়া খাটিয়া দেহপাত করিয়াও যদি কিছু না পাইলাম, তবে আর কি হইল?" দুষ্ট লোকে বলে, "ভূতের ব্যাগার খাটিয়া" তিনি কিছু পাইয়াছেন, বরং লোকে প্রতি বৎসর তাঁহার এই ধরণের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সত্য সত্যই "ভূতের ব্যাগার" দিয়া থাকে। এই উন্মত্ত-প্রলপিতের প্রতিবাদ নিরর্থক ও অনাবশ্যক। "ফাহিয়ানের স্বদেশে প্রত্যাগমন" প্রবন্ধটি চিত্তাকর্ষক। আরম্ভে লেখক বলিয়াছেন, "বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তীর্থদর্শন এবং ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি চীনদেশ পরিত্যাগ করেন। তিব্বত, মধ্য এসিয়ার মরুভূমি এবং বর্ত্তমান আফগানিস্থানের চিরনীহারাবৃত দুরারোহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া পাঞ্জাব, উদ্যান, এবং যুক্তের আরও কতকগুলি রাজ্যের মধ্য দিয়া বহু ক্লেশের পর তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন তিব্বত, মধ্যএসিয়া, তাতার, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থান ভারতবর্ষেরই মত নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল দেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব। আফগানিস্থানের উত্তরপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের নানা স্থানে ফাহিয়ান্ জনস্রোতাঃ উৎসবে দেখিয়াছিলেন; সভাস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এবং তাহার উভয় পার্শ্বে দুই জন বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি পাশাপাশি স্থাপিত হইত। পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানসময়ে ইহারাই যথাক্রমে, কৃষ্ণ এবং বলরামরূপে রূপান্তরিত হইয়াছেন। ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসু পাঠক স্যামুয়েল বীল (Samuel Beal) সাহেব কর্তৃক অনূদিত

হিউয়েন্‌সঙের গ্রন্থে ফাহিয়ানের ভ্রমণবৃত্তান্ত সবিস্তার জানিতে পারিবেন। ফাহিয়ান্‌ চতুর্দ্দশ বৎসরের পর সমুদ্রপথে ভারতীয় বণিকপোতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।" শ্রীমনোরঞ্জন গুহ "দেবগৃহে কথোপকথন" প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বিবিধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম "খনিকাদিগের বিবরণ" সংগ্রহ করিতেছেন। এই মসলেম লেখকের বঙ্গ ভাষার অনুরাগ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গলাই যে বঙ্গদেশবাসীর মাতৃভাষা, এই প্রবন্ধের বিশুদ্ধ রচনায় তাহা সুপ্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য-সংবাদ" মাসটি সুপ্রযুক্ত ও অব্যর্থ হয় নাই, কিন্তু প্রবন্ধটি বিবিধ সুখপাঠ্য ও কৌতুকাবহ বিষয়ে পূর্ণ। এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিসমালোচনায় সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শ্রীপতি রায়ের "বিলাতে বড়দিন" প্রবন্ধটির বিষয় চিত্তাকর্ষক; কিন্তু ভাষা যেমন উদ্ভট, তেমনই অদ্ভুত। বিকৃত, লাঞ্ছিত ও গ্রাম্যতাদোষে দূষিত করিলেই ভাষা সহজ বা সরল হয় না। লেখক পরমনিশ্চিন্তচিত্তে বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভাষার শ্রাদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মুদ্রাদোষ দেখিয়া মনে হয়, বিলাতে বড়দিনের 'প্যান্টোমাইম্‌' দেখিয়া তিনিও মাতৃভাষা লইয়া এই নূতন 'প্যান্টোমাইম্‌' রচনা করিয়াছেন। শ্রীপতি বাবু দেশে থাকিতে বাঙ্গলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচনা করিয়া আমাদের আনন্দিত করিতেন; তাঁহার তখনকার ভাষা ত এমন ছিল না। রায় মহাশয়ের মত প্রবীণ লেখকও কি বিলাতে পা দিয়াই মোচাকে 'কেলাকা ফুল' বলিতে আরম্ভ করিলেন?

বামাবোধিনী। ৩৬ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ। "বামাবোধিনী" বিগত পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বঙ্গীয় নারীসমাজের সেবা করিয়া, এই সংখ্যায় ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা সহযোগিনীর দীর্ঘজীবন কামনা করি। উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বিশেষ অভাব।

বামাবোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "বড়লোক কে?", "অদ্ভুত বৈরনির্য্যাতন, "গ্লাডষ্টোন" প্রভৃতি প্রবন্ধ সুরচিত না হউক, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। "দেবী কৈলাসকামিনীর জীবনী" পাঠ করিলে পাঠিকাগণ উপকৃত হইবেন। এই গৃহধর্ম্মরতা কর্ত্তব্যপরায়ণা মহিলার সহজ সরল জীবনপ্রণালী আলোচনার যোগ্য।

তত্ত্ববোধিনী। জ্যৈষ্ঠ। "আত্মসংযম", "নববর্ষ উদ্বোধন" প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর প্রবন্ধ দ্বারা এবারকার "তত্ত্ববোধিনী" পরিপূর্ণ। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের উপনয়ন ও "শ্রীমন্মহর্ষিদেবের অশীতিতমজন্মোৎসবে"র স্পৃহনীয় ও মহনীয় 'তত্ত্ব' প্রকাশিত হইয়াছে। হায়, বর্ষীয়সী "তত্ত্ববোধিনীর" পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ও এখনকার ঘোর দুর্দ্দশার কথা মনে হইলে দুঃখের অবধি থাকে না।

পূর্ণিমা। ষষ্ঠ খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। "ত্রিমূর্ত্তি" একটি দার্শনিক প্রবন্ধ। "বর্ণপরিচয়" প্রবন্ধটিতে লেখক বলেন, "ধর্ম্ম স্মরণ করিবার জন্যই পাণিনিকে 'যোগ-বিয়োগ' 'কালী' করা।" আমরা তাহা জানিতাম না। এখনও ছেলেরা "ক—য়ে কৃষ্ণ গ—য়ে গণেশ" ইত্যাদি শেখে বটে, কিন্তু তাহা যে ধর্ম্মশিক্ষার রূপান্তর, পাঠক আমরা তাহাও কখনও মনে করি নাই। প্রহ্লাদ "ক—য়ে কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন, কৃষ্ণ ঠাকুর এখনও তাহার মর্য্যাদা স্মরিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কুসুমাম বর্ণশিক্ষার্থী হিন্দু ছেলেরা যে দিন পাঠশালে "ক" দেখিয়াই "কৃষ্ণ" স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণে উন্মত্ত হইবে, সে দিন আমাদেরও পাততাড়ি গুটাইতে হইবে ভাবিয়া, আমরা এখনই কৃষ্ণভজন করিতেছি।

উৎসাহ। দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "সুবাদার" প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক সুখপাঠ্য ও আলোচ্য। শ্রীযুক্ত অক্ষয় ঘোষের "সন্ন্যাসী" কৌতুকাবহ

উদ্দীপক। "হেমের অনধিকার" শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের রচিত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটির কোনও বিশেষত্ব নাই; আমাদের ভাল লাগিল না। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সে আমার জননীরে" একটি সম্ভাবপূর্ণ গান। বৈশাখ মাসের "উৎসাহে" আর একটু মাধুর্য্য আছে। "উৎসাহের" সমালোচক "প্রদীপে" প্রকাশিত শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "সজিনী" গল্পের ভাষার ভুল ধরিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি অবশ্যই সুশিক্ষিত সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করিয়া দিতে পারিতেন।" ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাবিষয়ে তাঁহার সহিত আমাদের মতভেদ নাই। কিন্তু সমালোচক মহাশয় স্বয়ং "ভারতীর" সমালোচনাস্থলে লিখিয়াছেন,—"নারী তাঁহারই পদতলগতা গললগ্নীকৃতবাসা সাচ্ছাদিতা সালঙ্কৃতা" ইত্যাদি। বোধ করি, শেষ তিনটি শব্দকে রক্ষা করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন ব্যাকরণ নাই! অন্যকে বিনামূল্যে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে 'নিজের চরকায় তেল দিলে' ভাল হইত না?

উৎসাহ। জ্যৈষ্ঠ। প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি গান—"ভিখারী"। কবিবর কি সম্প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি অভিমান করিয়া হেঁয়ালি-উপদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে রবীন্দ্রনাথের বিবিধ বিচিত্র অমর সঙ্গীতে বঙ্গভূমির কবিকুঞ্জ মুখরিত, তাঁহার সঙ্গীত-শিল্পের কি এই ক্রমবিকাশ? স্বাক্ষরের স্থলে রবীন্দ্র বাবুর নাম না থাকিলে, গানটি রবীন্দ্র বাবুর রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম না। শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্রশেঠের "রাজা রামানন্দ রায়" অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশধর রায় "ভূস্বর্গে"র পরিচয় দিয়াছেন। নববর্ষে "উৎসাহের" উন্নতির আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে,— "যথা পূর্ব্বং তথা পরম্।"

হিন্দু পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় "হিন্দু পত্রিকা"র পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ হইল। "ভাষাপরিচ্ছেদ" দুই তিন পৃষ্ঠামাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। এত অল্প মাত্রায় প্রকাশিত হইলে কত দিনে শেষ হইবে? "হিরণ্ময় পুরুষ", "মায়াবাদ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি আলোচনার যোগ্য।

হিন্দু-পত্রিকা। জ্যৈষ্ঠ। "বিধবার অনুতাপ" একটি পদ্য; এক জন বিধবা পদ্যে অনুতাপ বা নাকি সুরে ক্রন্দন করিতেছেন। "হিন্দু পত্রিকা"র এ বিড়ম্বনা কেন? "পরিব্রাজক সুরমালা"য় সুখতত্ত্বনিরূপণের চেষ্টা আছে।

ধর্ম্ম-প্রচারক। ২১শ ভাগ, প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ। বহুকাল পরে অন্নপূর্ণার চিত্র-শোভিত "ধর্ম্ম-প্রচারক" দেখিয়া কৃষ্ণানন্দ স্বামীকে মনে পড়িল। স্বামীজি চূর্ণ হইয়া যান, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান এখনও বিদ্যমান। এই সংখ্যায় "যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা"র অনুবাদে ব্যভিচারবিষয়ক দণ্ডের ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। সেকালে এখন এ বিষয়ে মহর্ষিনিক্-চারীতাদির স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং ব্যভিচারবিশেষে শতপণাদি দণ্ডের ব্যবস্থা বিলুপ্ত ও তৎপরিবর্ত্তে নূতন শাস্তি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা "ধর্ম্ম-প্রচারকের" অবিদিত নাই। তবে এখন আর এই কুৎসিত বিষয়ের প্রকাশ্য আলোচনায় ফল কি?

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় ভাগ; প্রথম সংখ্যা। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশাদি প্রচার করা তত্ত্বমঞ্জরী পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য।" মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ দেবকে 'অবতার'-রূপে যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহাদের সহিত আমাদের মতের ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই।— কিন্তু পরমহংসদেবের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলী সকলের পক্ষেই পথ্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তত্ত্বমঞ্জরী। দ্বিতীয় সংখ্যা। এই সংখ্যায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব" প্রবন্ধে পরমহংস-দেবের বিষয়বিতৃষ্ণার পরিচায়ক দুই একটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা। বৈশাখ। এই সংখ্যায় এই সাম্প্রদায়িক পত্রের সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ও অষ্টম বর্ষ আরম্ভ হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্রের, বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্বের [illegible] ইত্যাদি

প্রচারের জন্য, এই পত্রের অভ্যুদয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে মতপ্রকাশের যোগ্যতার আমাদের সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার প্রভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য যে যথেষ্ট উপকৃত, সে বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। "বাসুদেব ঘোষের পদাবলী", "উড়িষ্যা ভাষায় গৌরসঙ্গীত", "শ্রীখণ্ডের বলরাম দাস" প্রভৃতি প্রবন্ধের আলোচনায় প্রাচীনকাব্যরসপিপাসু পাঠক তৃপ্ত হইবেন।

সৎসঙ্গ। পঞ্চম-ভাগ, বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। "সৎসঙ্গ" পূর্ব্বে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। মধ্যে বহু দিন "সৎসঙ্গের" দর্শন পাই নাই। একণে বীরভূম জেলার ... হার গ্রাম হইতে পুনঃপ্রকাশিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ "রামকেলী" পাঠযোগ্য, গ্রামবিশেষের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় "বীরভূম" প্রবন্ধে উক্ত জেলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রচলিত গল্পে ও প্রবাদে প্রবন্ধের কলেবর পরিপূর্ণ না করিয়া, ঐতিহাসিক তত্ত্বের নির্ণয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলে প্রবন্ধটি আরও মনোজ্ঞ হইতে পারে। ... গোবিন্দলাল দত্ত "বৌমা" নামক একখানি তথাকথিত প্রহসনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া "হিঁদুয়ানি"র প্রচার করিতেছেন। এই পরম হিন্দু সমালোচক বঙ্গসমাজে ও বঙ্গসাহিত্যে "সীতা" ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চান না;—দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গসমাজে যে সীতার সঙ্গে শূর্পণখাও আছে, তাহাও তাঁহার ধর্ম্মদৃষ্টির অগোচর। ইঁহার মতে, বঙ্গসাহিত্যের সমস্ত নারী-চরিত্রই সীতার ছাঁচে ঢালা চাই; নহিলে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর! বঙ্কিম বাবুর চিত্রিত "বিমলা", "শৈবলিনী" প্রভৃতি স্ত্রীচরিত্র দেখিয়া ইনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছেন! গোবিন্দ বাবু অন্যত্র 'রুদ্রাক্ষমালা'র অনুসন্ধান করিবেন। বঙ্কিম বাবু তাঁহাদের জন্য তাঁহার মুক্তার মালা গাঁথিয়া যান নাই।

প্রতিনিধি। তৃতীয় খণ্ড, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। বৈশাখ; জ্যৈষ্ঠ। দুই বৎসর প্রকাশিত হইবার পর "উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি" নামক একখানি কাগজ বন্ধ হইয়া ... একণে তাহাই "প্রতিনিধি" নামে পুনঃপ্রচারিত হইতেছে। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্তের রচিত "শ্রীচৈতন্যের কবিত্ব" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "গোস্বামী প্রভুগণের নিকট শুনা যায়, মহাপ্রভুর রচিত 'শ্রীগোপালচরিত্র' তাঁহার বাল্য-কালের গ্রন্থ।" সময়ে সময়ে চৈতন্যদেব সংস্কৃত ভাষায় শ্লোকরচনা করিতেন; প্রবন্ধলেখক তন্মধ্যেও দুই চারিটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক বলেন, "তিনি 'শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি শ্লোক ...শিক্ষার জন্য রচনা করিয়াছিলেন। * * * শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে ...গত হওয়া যায় যে, শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব নীলাচলবাসকালে অধিকাংশ সময় কাব্যরসা... ...বাহিত করিতেন। মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তখনই তাহা ছন্দোবদ্ধে ... পারিষদ ও অনুচরগণকে শুনাইতেন। * * * বোধ হয় এই ... শ্রীকিশোরাষ্টক, শ্রীবিশ্বমোহনাষ্টক, শ্রীবিষ্ণুস্তবাষ্টক, শ্রী... ... শ্রীজগন্নাথাষ্টক, শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তরশত নাম প্রভৃতি কবিতা ... মুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল।"

...ণ্ড; প্রথম সংখ্যা। "সীতারাম রায়" শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের ... সীতারাম সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, আলোচ্য ... বিষয়ের প্রসঙ্গ নাই। তবে এ পুনরুক্তি কেন?

... সংখ্যা। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্তের "মহারাণী বিক্টোরিয়ার ...জ্য" ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষৎ-... ...ত প্রকাশিত ...বার তাহা পুনঃপ্রচারিত ...

প্রমীলা নাগ।

[illegible] আরও ২৲টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু

[illegible] বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর [illegible] হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে [illegible] ছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর [illegible] নে নাই। তাহারা আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার [illegible] অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার [illegible] করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁধা [illegible] অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। [illegible] পর [illegible]—তাহারা ভাবিল, "ইনি কি মানুষ?" তিনি স্বয়ং [illegible] যেন তাঁহার মুখ হইতে জোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন [illegible] সুশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে [illegible] লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে [illegible] দয়া, এত [illegible] স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের [illegible] পুত্র,—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালে প্রভাতকিরণ-মণ্ডিত [illegible] শি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ এবং [illegible] শের [illegible] সেই মধুর কথা। সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতি-[illegible] র মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়ের একই বয়স। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু চির-পরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম!
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।"

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে দুটিকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত।

এই দরিদ্র দেশে প্রজা-ভূম্যধিকারী[illegible] ছিল। এখন [illegible] আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের [illegible]ক্রম হইয়া উঠি[illegible] এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বু[illegible]দারে, দৃষ্ট হয়।

বালক বালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষণ্ণ ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার পত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

বালিকা। কি গাইব বাবা?

অনাথ। তুমি কি কীর্ত্তন জান মা?

উত্তর। জানি।

বালিকার বাবা সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার মা সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের

সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রি[illegible] বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি [illegible]োমল করুণ ক[illegible] [illegible]ণ রাগের একটি গীত গাহিতে [illegible]াগিল,—

১

বাছারে জীবন জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধেছি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোঠের বেলা ব'য়ে গেছে।

২

বেণুর স্বরে ডাকছে বলাই,
[illegible] আয় আয়রে কানাই,
তুই বিনে যে যায় না বে গাই!
তোর পানে চেয়ে আছে।

৩

বাছারে! তোর মার মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে [illegible] যায় না রাখা,
তো[illegible] মুখ দেখে বাঁচে।

মা[illegible]প্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রুজলে ছল ছল করিতে [illegible]াগিল। অনাথনাথ বলিলেন, "তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকরী সুর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল, আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।

অমিয়া সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল। [illegible]

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠি[illegible] গীত শেষ হইলে তিনি [illegible]াত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ গীতে যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ [illegible] ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ

উত্তর। পারিব। [illegible] যাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমার আদর কর[illegible]

অনাথনাথের শিশুও এক[illegible] গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

"গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে!"

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন—"সত্যি মা! তুই যাবি?"

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, "মা"—সেই মা সম্বোধনে সে কি মধুরতা, কি প্রাণের অবেগই ঢালিল। বলিল, মা! এমন করুণাসাগর দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণ সেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?

অনাথনাথ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! বাজিকর অন্ধ!"

বালিকা বলিল, "অন্ধ। অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।"

৪—রণরঙ্গিণী।

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত!

অল্প অল্প বৃষ্টিধারা ; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধরা ;
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছুই বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, "হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।" অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, "হাঁ বাবা। তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড় দুঃখ।" কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাত-কুলশীলা একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি তাহার উপস্থিত জীবন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েই পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার গোবরে বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে, বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?"

সে উত্তর করিল, "না।"

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, বোকা বাবুটির তাহার ছেলে মেয়ের উপর একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল। তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল, "আহাম্মকের কথা শুন! তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তার পর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল, "আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি এমন কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে বাবু বিশ্বাস করিবেন না। 'আহম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তখন সে বলিল, "বাবু! তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওর বুদ্ধি শুদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা। এই যে চোখ দেখছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তাহাতে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব স্বামীর। তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওকে আপনা মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া

কাল হইয়া গেল।” ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, “কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।”

একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ার মুখী! আমি আমি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাঁটার চোটে পরিচয় লইব।”

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন, “যাইও না, ব’স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দু’বার মারিয়াছ।”

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া, সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল, “মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্মে আমার যেখানে সেখানে গঞ্জনা।” বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, এবং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনা যে পোড়াকপালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না হ’লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক, মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে; তোমরা টাকা চাও টাকা দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। বাড়ী ঘর করিয়া দিব,—তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া, এক জন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।”

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভাল-বাসিত! অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতে-ছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি

হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদ গদ কণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও রোজগার করুন! বাবুর সোনার কলম, রূপার দোয়াত হউক!" তাহার মুখে বাক্য সরিল না।

বেদেনী হাতে চাঁদ পাইল; সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এ চাঁদ, পূর্ণিমার চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এঁকে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন। কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব। আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এই বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন, এ সহজ পাত্রী নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন, "বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াইতেছি! তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব।"

বেদেনী এত ক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল, "বাবু আপনি বড়লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক জন বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ঢের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা, আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন; কারণ মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব।"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্যেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা একবার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও একটা হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপর অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ঘর ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এত ক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে, এই পিশাচীর হস্ত হইতে, যেরূপে হউক, উদ্ধার করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বাজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘ-খণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণ বেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণবাত্যা (cyclone), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, আগতপ্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি দিবেন বলিয়া, বেদেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—"ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।" তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে, বালিকা তাহার নৌকায় বসিয়া আকাশ-সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত একটি গীত গাইতেছে—

১

কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে,
নাচে কালী রণরঙ্গিনী!
কালী বল, কালী বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি,
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্লাবে শ্যাম অঙ্গ শ্যাম-অবনী!

৩

দুই কর লয়, দুই বরাভয়,
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,
চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা! ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী।

৫

জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরী,
অট্ট হাস, কি উল্লাস,
ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী।

৬

জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি, সৃজিলে মানব, জননি!

ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে, উঠিছে জ্বলিয়া,
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি ;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধাব যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির,
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ ;
পর্ব্বত-প্রতিম, কি তরঙ্গমালা,
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন !
ঝটিকার সনে, যেন মহাসিন্ধু,
মাতিয়াছে মহা প্রলয় আহবে ;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণযষ্টি মত ;
পড়িছে অসংখ্য, রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া ;
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর, ঝটিকা-গর্জ্জন,
গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে,
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ ;
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
[illegible] নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত ;

পুরস্কার দিব।” কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল—“কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন্ কালে সে ছোট্টা নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।” তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—“কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?” তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া, ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গনেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল, কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার, ঘোরা নিশীথিনী,
যেন অপবাহ্ণ হইল অমার;
অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরব বিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।
ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি!
যেন ঘোরারাবী, মহারো[illegible]নী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর [illegible]

ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়-পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বলিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টা কাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, "বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল,—"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারির ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে। কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্র সহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া ভৃত্যদিগের পরিধেয়-বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা ভানুমতীর জন্যে। তিনি বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রক[illegible]কে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০৲ টাকা

৭

ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা আসি
নাচ রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি,
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড দ্বেষ,
নাশি, কর, সুর-রাজ্য অবনী।

৫—দুর্গা।

অপরাহ্ণ ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণবাত্যা (Cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকিয়া থাকিয়া এরূপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? এরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া নিতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহারা স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারির দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড় বেগে তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকাগর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই —এই ৩টা ৩॥০ টার সময়ই,—প্রায় চারিদিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাঝি[illegible] আসিয়া তাঁহাদিগকে

গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথনাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি এক ভীম কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল,—

"কি ভীষণরণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘপ্রভা সৃষ্টি-সংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ। সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত তাঁহারই অসিপ্রহার। তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, উহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধারা তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথ-নাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহারকারিণীর গ্রাসে পতিত হইয়া তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ডমালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন, এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতে-ছিল, তাহাতে তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্জ্বলিত গৃহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকার ভীষণ ক্রীড়া ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫ টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়া ছিল। ৬ টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছারি-ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য বৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া, যেন বল সঞ্চয় করিতে একটু বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে

সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং গৃহে জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্যে তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে, এবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে,—দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে,—অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অন্যগৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুই একখানি ঘর, যাহা এতক্ষণ ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু! বাহির হউন!" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন, আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া ঘরখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন-ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরব নিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া [illegible] তাহারাও "হা ঈশ্বর! হা আল্লা!" বলে আর্ত্তনাদ করিতেছে। [illegible]র আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্মরক্ষার জন্যে, আত্মীয়রক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। তাহাতে আবার রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোকে [illegible] বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে একখানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত

চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন। কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত, ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরমাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহারক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জন কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিমসমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠ তালুকা শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্গি! গর্গি!" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নী পুত্রকে লইয়া একটা চালের উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল; এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নী পুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালাখানি উল্টাইয়া দিল এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জলরাশির উপরে [illegible] উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই; তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাট শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল; তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন, তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উচ্চৈঃ চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বামহস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে, পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি

আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর, আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব। এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,—"বাবা! ভয় নাই, তুমি মাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা'?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল। নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

হেমাদ্রি।

হেমাদ্রি অতিপ্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। তিনি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক অতিবিস্তীর্ণ স্মৃতিগ্রন্থ [illegible] এই প্রশস্ত ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সমগ্র প্রতিলিপি ভারতবর্ষের [illegible] হয় নাই। এই সুবিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহে নানাবিধ বিষয় অতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির পূর্ব্বতন অসংখ্য স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থ হইতে নানা স্থল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্তী স্মৃতিকারগণ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির বিভিন্ন অংশ হইতে বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ব্রত, দান, কাল, শ্রাদ্ধ, তীর্থ, মোক্ষ ও পরিশিষ্ট নামে এই সকল খণ্ড পরিচিত। কাল ও শ্রাদ্ধের বিষয় পরিশিষ্ট খণ্ডেই বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টখণ্ডে দেবতা ও প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ও বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রথম ভাগে ব্রত, দ্বিতীয় ভাগে দান, তৃতীয় ভাগে তীর্থ ও চতুর্থ ভাগে মোক্ষ, বিস্তারিতভাবে বিবৃত হইয়াছে। *

"চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" ভিন্ন হেমাদ্রি "মুগ্ধবোধ"-কার বোপদেবের প্রণীত "মুক্তাফল" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থের টীকা এবং বাগ্‌ভটের "আয়ুর্ব্বেদরসায়ন"-নামক ভৈষজ্যপুস্তকের ভাষ্য রচনা করেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

---

* Dr. R. G. Bhandarkar's "Early History of Dekkan", P. 89.
Dr. Mittra's Notice of Sanskrit Mss, III. 349.
Proceedings of Asiatic Society of Bengal for 1884. p. 20.

কলিকাতার সুবিখ্যাত এসিয়াটিক সোসাইটীর অর্থব্যয়ে চতুর্ব্বর্গচিন্তা-মণির তিন খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'দানখণ্ড' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক, স্মৃতি-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণির প্রতি এই গ্রন্থের সম্পাদনভার অর্পিত হয়। 'দানখণ্ড' ও 'ব্রতখণ্ডের' অধিকাংশ প্রচারিত হইবার পর, ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তদনন্তর ইহার সম্পাদকতার ভার পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ ও যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্যের প্রতি ন্যস্ত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 'ব্রতখণ্ড' সমাপ্ত করিয়া, তাঁহারা 'পরিশিষ্টখণ্ডের' প্রকাশ আরম্ভ করেন। অদ্যাপি এই তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই।

হেমাদ্রি দক্ষিণাপথের অন্তর্গত দেবগিরি নগরে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবগিরির [illegible] মহারাজ কৃষ্ণদেব, মহাদেব ও রামচন্দ্র দেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত [illegible]েন। চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির 'ব্রত-খণ্ডের' আরম্ভে তিনি যাদববংশী[illegible] বিস্তারিত বিবরণ প্রদান-পূর্ব্বক 'পরিশিষ্টখণ্ডের' আরম্ভে [illegible]পরিচয় বর্ণিত করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

বংশো হিমাংশোর্যযাতেঃ প্রসিদ্ধো যস্মিন্ স রাজা যদুরাবিরাসীৎ।
বভূব যস্মিন্নসুরাবতারভারাপহারায় পুরা মুরারিঃ ॥ ৩ ॥
বংশে তস্মিন্ কংসবিধ্বংসনস্য ক্ষৌণীপালো 'ভিল্লমঃ' প্রাদুরাসীৎ।
উদ্দামদর্পরিপুসর্পবিহঙ্গরাজঃ শ্রীভিল্লমাদবনিপোঽজনি 'জৈত্রপালঃ' ॥ ৪ ॥
তস্মাদভূদভিনবস্মরচারুমূর্ত্তিঃ কীর্ত্তেঃ পদং জগতি 'সিংহণদেব'-ভূপঃ।
অভবদবনিপালো 'জৈতুগি'র্নাম তস্মাৎ অসমসমরধীরদ্বেষিভূপালকালঃ ॥ ৭ ॥
স মহীপালো জনয়াম্বভূব 'কৃষ্ণং মহাদেব'-মহীপতিং চ।
হিতায় লোকস্য যথা পয়োধিশ্চিন্তামণিং কৌস্তুভমপ্যুদারং ॥ ৮ ॥
অথ প্রভাবাতিশয়েন লব্ধং বিভজ্য লোকাদ্বিতীয়াধিপত্যং।
ত্রিবিষ্টপং শাসতি কৃষ্ণভূপে ভুবং মহাদেবনৃপাঃ প্রশাস্তি ॥ ১২ ॥
আস্তে মণ্ডিতদণ্ডকাপরিসরঃ শ্রী-সেউণাখ্যঃ পরং
দেশঃ পেশলবেশভূষণ-রুচামাধুর্য্য-ধুর্য্যাকৃতিঃ।
তস্মিন্ দেবগিরিঃ পুরী বিজয়তে ত্রৈলোক্যসারশ্রিয়াং
বিশ্রান্তিঃ সুরশালিশৈলশিখরস্পর্দ্ধিষ্ণু-সৌধাবলিঃ ॥ ১৯ ॥
জগৎত্রয়ীগীতগুণপ্রশস্তিঃ শাস্তা সমস্তাবনিমণ্ডলস্য।
শ্রীমানিমামম্বররাজধানীং সোঽয়ং মহাদেবনৃপো বিভর্ত্তি ॥ ২০ ॥
[illegible] সম্প[illegible] যশো বলমিদং সোঽয়ং প্রতাপো মহান্

এতৈকৈকং পৃথিবীভৃতো ভুবি মহাদেবস্ত লোকোত্তরং।
যস্ত শ্রীকরণাধিপঃ স্বয়ময়ং হেমাদ্রিসূরিঃ পুরঃ
প্রৌঢ়প্রাতিভ-বর্ণ্যমান-বিলসদ্-বংশো ভৃশং শোভতে ॥ ২২ ॥

ভগবান চন্দ্রমা হইতে যদুবংশ উদ্ভূত হয়। চন্দ্রের পর বুধ, পুরুরবা, আয়ু, নহুষ, যযাতি ও যদু যথাক্রমে পৈতৃক রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। এই যদু হইতে যদুবংশ আবির্ভূত হয়। যদুবংশ প্রথমতঃ মথুরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে গুজরাটের অন্তর্গত দ্বারাবতী নগরীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠাপিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ সুবাহু। তিনি [illegible] চারি পুত্রের মধ্যে স্বরাজ্য বিভক্ত করিয়া লোকান্তরিত হন। সুবাহুর [illegible] পুত্র দৃঢ়প্রহার দক্ষিণাপথের আধিপত্য লাভ করিয়া, শ্রীনগরে রাজধানী [illegible]পিত করেন। এই দৃঢ়প্রহার দেবগিরির যাদববংশের আদিপুরুষ। [illegible] পুত্র সেউনচন্দ্রের নাম অনুসারে, তাঁহার শাসিত রাজ্য সেউনদেশ [illegible] পরিচিত হয়। নাসিক হইতে দেবগিরি পর্য্যন্ত সেউনদেশ বিস্তারিত ছিল।

এই সেউনচন্দ্রের একবিংশতিম অধস্তন পুরুষ ভিল্লম। ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে (১১০৯ শকাব্দে) মহারাজ ভিল্লমের দ্বারা দেবগিরি নগরী দণ্ডকারণ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি দেবগিরিতে আপনার রাজধানীর সংস্থাপন করেন। দৃঢ়প্রহার হইতে ভিল্লম পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশতি জন যাদববংশীয় নরপতির নাম স্বরচিত ব্রতখণ্ডের আরম্ভে হেমাদ্রি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঁচ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করিয়া, ভিল্লমের ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বে প্রহারের আবির্ভাবকাল পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে জানা যাইতেছে, অনুমান ৭৪০ খৃষ্টাব্দে যাদববংশ দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ভগবান লাল ইন্দ্রাজী, যাদববংশীয় একখানি তাম্রশাসনের প্রথম বিবরণ প্রকাশ করেন।* ইহা ৯৯১ শকাব্দে (১০৬৯ খৃঃ) যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের আদেশে উৎকীর্ণ হয়। এই শাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, দৃঢ়প্রহার চন্দ্রাদিত্যপুরে রাজত্ব করিতেন। ইহা এক্ষণে চান্দোর নামে পরিচিত, এবং বর্ত্তমান নাসিক জেলায় অবস্থিত। ব্রতখণ্ডের উল্লিখিত 'শ্রীনগরী' তাম্রশাসনে 'চন্দ্রাদিত্যপুর' নামে বর্ণিত হইয়াছে। যাদবরাজ দ্বিতীয় সেউনচন্দ্রের সাহায্যে পরমর্দ্দিদেব কল্যানগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। চালুক্য সম্রাট দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্ল দেব ১০৭৬—

* Indian Antiquary for 1883 XII. 109—125.

১১২৬ খৃষ্টাব্দে (৯৯৮—১০৪৮ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কল্যাণ নগরে রাজত্ব করেন। এই চালুক্য সম্রাট বিক্রমাদিত্য কাশ্মীরের প্রমাণিক ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণীতে পরমর্দ্দিদেব নামে বর্ণিত হইয়াছেন। কাশ্মীরী পণ্ডিত বিদ্যাপতি বিহ্লণদেব এই বিক্রমাদিত্যের সভাসদ ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর কীর্ত্তি-কাহিনী 'বিক্রমাঙ্কদেবচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে বর্ণন করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর-নরপতি কলসদেব ও অনন্তদেবের সমসাময়িক ছিলেন।

কাশ্মীরেন্দ্রো বিনির্য্যাতং রাজ্ঞেঃ কলসভূপতেঃ।
[illegible] কর্ণাটেন্দ্রে পর্ম্মাড়িভূপতিঃ ॥—রাজতরঙ্গিণী ৭—১৩৫।

[illegible] বিক্রমাদিত্য ([illegible]০৭৬-১১২৬ খৃঃ) পরমর্দ্দিদেব নামে হেমাদ্রির গ্রন্থে [illegible] হইল

[illegible] মহাতুরেণ দ্বিষাং নির্জিতঃ পরমর্দ্দিদেবঃ।
[illegible] প্রদীপঃ কল্যাণরাজ্যে [illegible] স এব যেন ॥—ব্রতখণ্ড।

[illegible] সেউনচন্দ্রের [illegible]পৌত্র মল্লুগি। এই মল্লুগির পৌত্র [illegible] মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। মল্লুগির পুত্র ভিল্লমের রাজত্বকালে দেবগিরির আধিপত্য সবিশেষ বিস্তারিত হয়। ভিল্লমের পৌত্র সিংহণের অধিকার সমগ্র দক্ষিণাপথে [illegible] হয়। এই সিংহণের পৌত্র মহাদেবের মন্ত্রী হেমাদ্রি "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি"র রচনা করেন। ব্রতখণ্ডের উদ্ধৃত অংশ হইতে স্পষ্টরূপে তাহার উপলব্ধি হইতেছে।

মহারাজ মহাদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র আমণদেব পৈতৃক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমণদেবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র রামচন্দ্রদেব দেবগিরির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই রামচন্দ্রদেব দক্ষিণাপথের যাদববংশীয় শেষ হিন্দু সম্রাট। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন খিলজী অষ্ট সহস্র মুসলমান সেনা সহ অতর্কিতভাবে দেবগিরির অভিমুখে ধাবিত হন। রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, বহুমূল্য উপহারপ্রদানে বিজেতা আলাউদ্দিনের সন্তোষসাধনে বাধ্য হন। দিল্লীশ্বরকে করদানে সম্মত হইয়া, রামচন্দ্রদেব বিজয়ী মুসলমান সেনাপতির হস্ত হইতে অক্ষতশরীরে নিষ্কৃতি পান। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে রাজা রামচন্দ্রদেব দিল্লীশ্বরের বার্ষিক করপ্রেরণে বিরত হন। ১৩০৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ত্রিংশৎ সহস্র সেনার সহিত আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব পরাজিত হইয়া, বন্দিভাবে দিল্লীতে নীত হন। ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার অনুমতি পান। তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীশ্বরকে বৎসর বৎসর রীতিমত কর দিতে থাকেন।

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র শঙ্কর দেব দিল্লীতে করপ্রেরণে বিরত থাকেন। ১৩১২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি মালিক কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করেন। শঙ্করদেব যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। দেব[illegible] দিল্লীর সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়, এবং তাহার শাসনার্থ মুসলমান [illegible]নকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

১৩১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর, তাঁহার সাম্রাজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে শঙ্করদেবের ভগিনীপতি হরপাল দেব দেবগিরি হইতে মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে দূরীভূত করিয়া, পুনরায় হিন্দু অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৭ খৃঃ দিল্লীশ্বর মুবারিক খিলজী স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে হরপাল বন্দী হন। মুসলমান সম্রাটের আদেশে বিরোধী হরপালের চর্ম্ম উত্তোলিত হইয়া, অতিনৃশংসভাবে তাঁহার বধকার্য্য সম্পাদিত হয়। এইরূপে দক্ষিণাপথে হিন্দুসাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া, মুসলমান অধিকার প্রসারিত হয়।

মন্ত্রিবর হেমাদ্রি চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষখণ্ডের আরম্ভে বিস্তারিতভাবে আপনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আপনা[illegible]হারাজ

মহাদেবের পিতা ও পিতামহের উল্লেখ করিয়া, আপনার বংশের পরিচয় দিয়াছেন। বাৎস্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কামদেব। হেমাদ্রি বাসুদেবের পৌত্র ও বামনদেবের প্রপৌত্র ছিলেন। তিনি স্বয়ং মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অতিবদান্য, ধার্ম্মিক ও সাহসী ছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার গৃহে বহুতর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইতেন। ব্রাহ্মণভোজন না করাইয়া তিনি কখনও জল গ্রহণ করিতেন না। তিনি মহারাজ মহাদেবের করণেশ্বর (প্রধান মন্ত্রীর) পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহারাজ তাঁহাকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। নিম্নে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির পরিশেষ খণ্ডের আরম্ভ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সিঙ্ঘণাদভবৎ প্রৌঢ়প্রতাপানল দুর্জ্জয়ঃ। অনুজো বিজিতারাতির্জৈত্রপাল ইতীরিতঃ॥
তস্মাদপি মহাদেবঃ পালিতাশেষভূতলঃ। বিজিতাশেষদিক্‌চক্রো বিক্রমৈকরসোঽভবৎ॥
ভূপেন তেনাথ কৃতোঽধিনাথঃ ক্ষারশ্রিয়া শ্রীকরণে মনস্বী।
হেমাদ্রিনামাস্য চ বর্ণ্যমানং বংশং সমাকর্ণয়তি প্রকাশং॥
স্বাধ্যায়াধ্যয়নপ্রবীণ-ধরণীগীর্ব্বাণচূড়ামণিঃ
বংশে বৎসমুনের্মনোহরগুণগ্রামাভিরামাকৃতিঃ।
জজ্ঞে বামনসংজ্ঞকো বলিকথাগাথাসমুন্মীলিত-
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাবরুচিরাং যঃ প্রাপ লক্ষ্মীং পরাং॥
স প্রাসূত সুতং নবোজ্জ্বলকলাসম্ভারগোষ্ঠীমদং
ভূতস্ফীতগলোদ্‌গলন্নবরস-প্রহ্লাদি বেদোদয়ং।
পুণ্যাবর্ত্তনসর্গসজ্জনমনঃসন্তোষবস্যাস্পদং
শশ্বদ্‌বেদরহস্যবস্তুরসিকং শ্রীবাসুদেবাহ্বয়ং॥
আসীত্তস্মাদভিনবসুধা-সোদরালাপলীলঃ
শীলাচারপ্রবরধিষণা জোষিতাশেষলোকঃ।
সত্যাং বাচং ত্যজতি ন পুরা কাপি যঃ সঙ্কটেঽপি
প্রজ্ঞারাশিঃ সুকৃতরসিকো নামতঃ কামদেবঃ॥
তস্মাদ্‌ বিস্ময়নীয়পুণ্যচরিত্রো হেমাদ্রিনামাজনি
প্রত্যগ্রাপ্রতিমপ্রভাববিকসদ্‌ বিশ্বোত্তরশ্রীনিধিঃ।
যোঽসৌ সর্ব্বকলাবিশারদশিরোরত্নাঙ্কুরো ভাস্বরঃ
সর্ব্বশ্রীকরণেশ্বরো নৃপমহাদেবস্য মান্যোঽভবৎ॥
জ্ঞাতুং নীতিরহস্যমস্য গুরুতাং বক্তেঽহতে শিষ্যতাং
নূনং সোঽপি বৃহস্পতিঃ স চ কবির্নির্ব্বাস্যেন সংস্পৃশ্যতে।

সংস্থং চিত্রচরিত্রমাত্মমহিমা মন্ত্রীন্দ্রচূড়ামণিঃ
হেমাদ্রির্বিনিনায় বিস্ময়রসং কং ধীরধুর্য্যং নরং ॥
শাস্ত্রং তেন সমস্তার্থিনিঃশেষার্থিনিবর্ত্তকং।
প্রণীতঞ্চ চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিসমাহ্বয়ং ॥
ইহানুপূর্ব্বেণ বিনির্ম্মিতানি পঞ্চ প্রপঞ্চেন চ খণ্ডকানি।
ব্রতেষু দানেষু চ তীর্থসার্থে মোক্ষে চ শেষেঽথ তদর্থজাতে ॥
বহূনি শাস্ত্রাণি বিমৃশ্য রচ্যতে শ্রাদ্ধস্য কল্পোঽয়মতিপ্রযত্নতঃ।
ইহোপনেয়ঃ সহসা ন কেনচিৎ দোষো বরীয়ানপি বুদ্ধিশালিনা ॥
দানে দানবপুঙ্গবং বলিমথ দ্বৈপায়নং বাঙ্ময়ে
সর্ব্বানপ্যজয়ন্মুনীংস্তপসি যঃ প্রজ্ঞাপ্রকর্ষে গুরুং।
[illegible]হং প্রাবন্ততে পয়োধিতনয়াপ্রাণেশ্বরং সংস্মরন্
[illegible]দ্রিবিহিতঃ প্রয়োগমধুনা শ্রাদ্ধস্য বক্তুং সুধীঃ ॥—পরিশেষখণ্ড।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, হেমাদ্রি দেবগিরির মহারাজ মহাদেব-দেব, আমণদেব ও রামচন্দ্রদেবের মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৬০—১৩০৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই তিন জন নরপতি দেবগিরিতে রাজত্ব করেন। ইহা হইতে স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেবগিরি নগরে ব্রাহ্মণকুলে হেমাদ্রির জন্ম হয়। হেমাদ্রির ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা দেবগিরির যাদববংশীয় নৃপতিদিগের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় সংস্কৃতবিৎ উইলসন সাহেব হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধীশ্বর বলিয়া অনুমান করেন। তদনুসারে স্বসম্পাদিত 'দানখণ্ডে'র সংস্কৃত ভূমিকায় পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি হেমাদ্রিকে প্রথমতঃ দেবগিরির নরপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পরে তিনি আত্মভ্রম সংশোধিত করেন। উইলসন সাহেবের ভ্রান্ত মতের প্রতি নির্ভর করিয়া, ঐতিহাসিক রহস্যের প্রথম ভাগে, অধুনা স্বর্গগত, বিদ্যোৎসাহী ডাক্তার রামদাস সেন, হেমাদ্রিকে দেবগিরির অধিপতি বলিয়া পরিচিত করেন। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের তৃতীয় ভাগে তিনি নিজের ভ্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু রামদাস বাবু কালিদাসাদি অন্যান্য গ্রন্থকারের ন্যায় হেমাদ্রির সম্বন্ধেও নিশ্চিতরূপে কোনও কথা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। 'মুক্তাফল'-নামক গ্রন্থের পরিচয়প্রদানকালে, ডাক্তর মিত্র, হেমাদ্রিকে দেবগিরির রাজা বলিয়া ভ্রমক্রমে নির্দ্দেশ করেন। ডাক্তর জলি সাহেব হেমাদ্রিকে মহাদেবের প্রধান মন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু হেমাদ্রির সময়নির্ণয়ে ডাক্তর জলি ভ্রমে পতিত

হইয়াছেন। তাঁহার মতে, হেমাদ্রি ১২৫০ খৃষ্টাব্দে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণির রচনা করেন। পরিশেষ খণ্ডের অন্তর্গত 'কালনির্ণয়' নামক অংশের একখানি ১৫০২ শকাব্দের (১৪৮০ খৃঃ) লিখিত প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহা নাগরাক্ষরে লিখিত। ইহা হইতে হেমাদ্রির অধস্তন সময় জানা যাইতেছে।

মহারাজ মহাদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র দেবের (১২৭১—১৩০৯ খৃঃ) সময়ে হেমাদ্রি বোপদেবের প্রণীত মুক্তাফলের টীকার রচনা করেন। এই রামচন্দ্রদেব ইতিহাসে রামরাজ নামে পরিচিত হইয়াছেন। হেমাদ্রির প্রণীত এই টীকার নাম "কৈবল্যদীপিকা"। ইহাতে তিনি বোপদেব গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের ও ভক্তিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন,—

"শ্রীবোপদেবস্য নিধেগুণানাং জয়ন্তি তে তে ভুবি বাগ্‌বিলাসাঃ।
বিকুণ্ঠ্য যেষু স্বয়মীশ্বরোঽপি সর্ব্বজ্ঞশব্দং সমবৈতি কচং॥
তেন মুক্তাফলং তেনে যল্লোকমনুগৃহ্নতা।
তত্র টীকাং যথাবুদ্ধি কুর্ব্বে কৈবল্যদীপিকাং॥
হেমাদ্রিঃ কটকে চক্রে রামরাজস্য বেশ্মনি॥

ইতি শ্রীমৎপ্রৌঢ়প্রতাপচক্রবর্ত্তি-মহারাজাধিরাজ-সোমবংশোদ্ভব রামরাজমন্ত্রিবর্য্য-হেমাদ্রিদেববিরচিতা-মুক্তাফলটীকা সমাপ্তা।—কৈবল্যদীপিকা। *

হেমাদ্রির সমসাময়িক বোপদেব গোস্বামী দেবগিরির রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন। এই বোপদেব "মুগ্ধবোধ"-নামক সুবিখ্যাত ব্যাকরণের রচনা করেন। ভবিষ্যতে বোপদেবের বিবরণ পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব।

কুশীনগর।

কুশীনগর কোথায়? যেখানে ভগবান শাক্যসিংহ নির্ব্বাণনগরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেখানে অশীতিপরবৃদ্ধ বুদ্ধ বিশাল দুই শালতরুর মধ্যে রোরুদ্যমান শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা উপসেবিত হইয়া অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, সে কুশীনগর কোথায়? যে স্থানে বহু শতাব্দী পরে পরমসৌগত মহারাজ অশোক প্রকাণ্ড এক নির্ব্বাণস্তূপ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং পরে যেখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চীন, ব্রহ্ম, তিব্বত, শ্যাম, মলয় প্রভৃতি

* Dr. R. L Mittra's Notice of Sanskrit Mss.—IV, 67.

দূরবর্ত্তী দেশদেশান্তর হইতে ভগবানের অন্ত্যলীলাস্থলদর্শনার্থ সমুপাগত শত শত ভক্তের ভক্তি প্রীতি আকর্ষণ করিত, সে কুশীনগর কোথায়?

এখন সে স্থল নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ অশোক প্রায় ২০০ ফিট উচ্চ যে নির্ব্বাণস্তূপ ও বিহারাদি নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আবৃত হইয়াছে,—নির্ণয় করিবার আদৌ উপায় নাই। সে বিশাল স্তূপ, বোধ হয়, কালের করাল কবলে গ্রস্ত হইয়াছে; কতক ভগ্ন হইয়াছে; কতক মৃত্তিকায় প্রোথিত হইয়াছে; কতক নিবিড় দুর্ভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া ভীষণ হিংস্র জন্তুর লীলাভূমি হইয়াছে!

কিন্তু সে ভগ্নস্তূপরাশিই বা কোথায়? এখনও বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও পৃথিবীর জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ। এখনও দেশদেশান্তর হইতে ভক্ত সৌগতগণ ভগবানের লীলাস্থল পুণ্যভূমি ভারতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। কিন্তু কোথায় তাঁহাদের ইষ্টদেবের সমাধিশয্যা, কেহই তাহা জানেন না। কেহই জানে না,—"কোথায় জগতের চক্ষুঃ" শেষ-নিদ্রায় মুদিত হইয়াছিল, কোথায় ভারতের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়াছিল।

ভারতবাসিগণ এ পর্য্যন্ত আপনাদের পূর্ব্বতন জাতীয় গৌরবরক্ষার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেন নাই। আমরা কেবল ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিয়া মৌখিক বিলাপ পরিতাপ করি; কিন্তু যাহাতে পূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের পুনরুদ্ধার হয়, তজ্জন্য আমরা কেহই সামান্যমাত্র শ্রম ও স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিখি নাই। এক জন সহৃদয় ইংরাজ ঐতিহাসিক এ জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডের প্রত্যেক পল্লীর ইতিহাস আছে, কিন্তু সমগ্র গ্রেট্ ব্রিটেন অপেক্ষা কত গুণ বৃহৎ যে ভারতবর্ষ, তাহার ইতিহাস নাই।" * বস্তুতঃ, পূর্ব্বকীর্ত্তির পুনরুদ্ধারে ইংরাজেরা যেরূপ অকাতরে যত্ন, স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা এ দেশের লোকের অনুকরণস্থল। তাহার শতাংশের একাংশও যদি ভারতবাসীর হইত, তবে এত দিনে ভারতের সৌভাগ্যের দিন উপস্থিত হইত। এ প্রবন্ধেও যে মহানুভব বিদেশীর অদম্য উৎসাহ ও বিপুল স্বার্থত্যাগের কথা বর্ণিত হইবে, তাঁহার দৃষ্টান্তও ভারতীয়গণের সম্যক অনুকরণীয়।

প্রথমে কুশীনগরের দিকে ইউরোপীয়দের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আমরা ইউরোপীয়দের নিকট প্রত্নতত্ত্বের বিষয় শিখিয়া গুরুমারা টীকা লিখিয়া আমা-

* Sir W. W. Hunter.

দের অন্ধ আত্মাভিমানকে যতই স্ফীত করি না কেন এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশীয়ই পুরাতত্ত্বের আবিষ্কারে অগ্রণী নহেন। যাহা হউক, বলিতেছিলাম যে, কুশীনগরের উপর ইংরাজের দৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু দৃষ্টি পড়িলে কি হইবে? নির্ব্বাণনগরীর চিহ্ন যে কোথাও নাই। এত বড় বিপুল সংস্কৃত সাহিত্যেও কুশীনগরের নামমাত্র নাই। পালি সাহিত্যে ভগবানের প্রধান লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পালি সাহিত্যেও তাহার কোনও ঠিকানা মিলিল না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পণ্ডিত ও মনীষিগণ হতাশ হইলেন।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত স্তানিস্লে জুলিয়েঁ হিউঅ্যাঙ্‌স্যাঙ্গ নামক এক ভারতপর্য্যটক চৈনিক পরিব্রাজকের নাম শুনিতে পাইলেন। তিনিও আরও শুনিলেন যে, তিনি নাকি চীনভাষায় ভারতপরিভ্রমণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া, এই অদম্য উদ্যমশীল ফরাসী পণ্ডিত চীনভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। আজ কাল চীনভাষার আলোচনা সহজ হইয়াছে; লণ্ডন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষার শিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন। কিন্তু জুলিয়েনের সময়ে চীন ভাষা শিখিবার পথ এত সুগম ছিল না। বিশেষতঃ, যে ভাষার বর্ণমালা শিক্ষার্থীর বিভীষিকাস্থল, অল্প সময়ের মধ্যে সেই দুরূহতম ভাষা আয়ত্ত করিয়া কিরূপে এই অধ্যবসায়শীল পণ্ডিত নিজ ভাষায় উক্ত ভ্রমণপুস্তকের অনুবাদ করিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই পুস্তক প্রকাশিত হইলে, তমসাচ্ছন্ন ভারতের ইতিহাস-গুহা আলোকিত হইয়া উঠিল। এতকাল গাঢ়তম অন্ধকারে যে সব পুরাতত্ত্ব নিহিত ছিল, এই ভ্রমণকাহিনীর ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জ্বল আভায় তাহা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এই অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পুরাবিদেরা, ঐতিহাসিকেরা, মনীষীরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

এই অনুরাগী উৎসাহশীল প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কেবল পাঠ করিয়াই নিরস্ত হইলেন না; দলে দলে পরিব্রাজক-বর্ণিত পথে ভারতের পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারে ও অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। অনেক স্থলে হিওএন্থসাঙ্গ-বর্ণিত যে সমস্ত নগরীর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া দেখিবার প্রয়োজন হইল। ভারত গবর্মেণ্টও সাতিশয় উদারতার সহিত এই পণ্ডিতদের সাহায্যের জন্য 'আর্কিওলজিক্যাল সর্ভে' নামক বিভাগের সৃষ্টি করিলেন। ভারতের প্রাচীন নগরীসমূহের বর্ত্তমান অবস্থার নির্ণয়, প্রাচীন ও ভগ্নপ্রায় স্থাপত্য কীর্ত্তিনিচয়ের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি এই বিভাগের কার্য্য

বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। জেনারেল্ কনিংহাম এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। যদিও এই বিভাগের পণ্ডিতগণের গবেষণায় অনেক ভ্রম ঘটিয়াছে, তথাপি এই সকল ভ্রমও ক্ষমার্হ; কারণ, মনুষ্যজ্ঞানে ভ্রমই স্বাভাবিক। যাঁহারা এই বিভাগের প্রকাশিত 'আর্কিওলজিকাল সর্ভে রিপোর্টস্' পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, ভারতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকদের পক্ষে, এই পত্রে প্রকাশিত রত্নরাজি কি অমূল্য।

যে জেনারেল্ কনিংহাম্ এই বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইলেন, তিনি নিজে যেমন পণ্ডিত, তেমনই অধ্যবসায়শীল। নিজের উৎসাহ ও অধ্যবসায়ে সহকারীদিগকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন; ইঁহাদের কেমন অদম্য উৎসাহ, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহার একজন সহকারীর দৃষ্টান্তে তাহা উজ্জলরূপে প্রমাণিত হইবে। চীন পরিব্রাজকের বর্ণিত সৌন্দর্য্যললামভূতা গয়া, বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু ভগবানের লীলাস্থল কপিলাবস্তু, বৈশালী, শ্রাবস্তী, কুশীনগর ইত্যাদি নির্ণয় করিবার কোনও উপায় হইল না। একে পরিব্রাজক চৈনিক মাপ "লী"তে দূরত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, কত "লী"তে মাইল গণ্য হইবে, পণ্ডিতদের মধ্যে তাহা লইয়া অনেক বিচার হইল। শেষে সিদ্ধান্ত স্থির হইল যে, ৬ "লী"তে এক মাইল গণনা করা হউক। তাহার পর আবার এই গণনায় হিউএনৎসাঙ্গ-বর্ণিত স্থান সকল যথাযথ নির্ণীত হইল না। যেখানে পর্ব্বত বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে বিশাল নগরী; যেখানে নগরের বর্ণনা, সেখানে শস্যশ্যামল ক্ষেত্র; যেখানে অতলস্পর্শ নদীর বর্ণনা আছে, সেখানে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ পরিলক্ষিত হইল। এইরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হওয়াতে, এই মনীষিগণ বিচার করিয়া দেখিলেন যে, পরিব্রাজক পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন; তিনি কিছু ম্যাপের সরলরেখা ধরিয়া ভ্রমণ করিবার সুবিধা পান নাই। অনেক স্থলে ঘুরিয়া যাইতে হইয়াছিল। কালের মহিমায় অনেক মার্গ লুপ্ত হইয়াছে; আবার অনেক নূতন মার্গও তৎস্থানে প্রস্তুত হইয়াছে; অনেক নগরী জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে; অনেক আবার নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। সুতরাং বিভিন্নতা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু তাহাতে বুদ্ধের শেষলীলাস্থল নির্ণীত হয় না।

তাঁহারা কিন্তু নিরাশ হইলেন না। দ্বিগুণতর উৎসাহে তাঁহারা অনুসন্ধানকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের চেষ্টায় অন্ধকারে যেন কিঞ্চিৎ আলোক মিলিল! যাঁহারা ভগবানের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে

স্বীকার করেন যে, ভগবান আপনার নির্ব্বাণসময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া রাজগৃহ হইতে বৈশালীর অভিমুখে আগমন করিতেছিলেন। বৈশালীর সন্নিহিত বেলোয়া নামক স্থানে তিনি রোগাক্রান্ত হন। তথাপি তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে পরবুদ্ধ নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। অবশেষে সেই বৃদ্ধ পরিশ্রান্ত পথিক কাকুথ নদীর (কনিংহামের মতে আধুনিক বাঘিয়ান্) জলে অবগাহন পানাদি করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূরে হিরণ্যাক্ষী-নদীতীরস্থ শালবনের অভ্যন্তরে, পুষ্পিত দুই বিশাল শালতরুর মধ্যদেশে, সেই পরিশ্রান্ত রোগকাতর পথিক তাঁহার চিরবাঞ্ছিত নির্ব্বাণ লাভ করিলেন। *

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, বারাণসী বা রাজগৃহ খুঁজিয়া লওয়া দুঃসাধ্য হইল না। কিন্তু ইহার পরেই গোল। বারাণসী বা রাজগৃহ যেন নির্ণীত হইল, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী স্থান সকল নির্ণয় করিবার উপায় কি? ভগবানের অন্তিম লীলার অন্যান্য স্থান সকল কিরূপে নির্ণীত হইবে? এক উপায়, হিউয়াস্থ্সাং-বর্ণিত পথের অনুসরণ। হিউয়ান্থ্সাং কাশীনগরে আসিবার পূর্ব্বে, পিপ্পরিয়া বা পিপ্পলবন নামক এক স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন। এই পিপ্পলীবনে মৌর্য্যরাজদিগের নির্ম্মিত স্তূপ ছিল। মহারাজা অশোক এই স্তূপ ভাঙ্গিয়া সমাধিচিত্র নিষ্কাশিত করিয়া লইয়াছিলেন। ব্রহ্মদেশীয় ইতিহাসে লিখিত আছে, মৌর্য্যরাজ-বংশের ধ্বংসের সময়, পূর্ণগর্ভা কোনও মৌর্য্য-

---

* কুশীনগরের বর্ত্তমান অবস্থানের সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে এত মতভেদ ও এত কলহ দেখা যায় যে, সেই বিভিন্ন মতবাদিগণের তর্কোত্থিত ধূলিজালে সত্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এমন কি, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণসময়ের গমনপথ সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ দেখা যায়। সে সব কলহের তর্কে পাঠকদের বিরক্ত করিতে চাহি না। এই সকল বিভিন্ন মতবাদ আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথম ও প্রাচীন মত,—গোরখপুর জিলার অন্তর্গত কাশিয়াই কুশীনগর। অধ্যাপক উইলসন্ ইহার প্রতিপাদক ও জেনারেল কানিংহাম ও কারলীল প্রভৃতি এই মতের সমর্থক। দ্বিতীয় ও নব্যমত এই যে, চম্পারণ বিভাগের অন্তর্গত বেথিয়ার নিকট লোরিয়া নন্দনগড় নামক স্থানই কুশীনগর। ডাক্তার ওয়াডেল, স্মিথ্ প্রভৃতি এই মতের পরিপোষক। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশে এই প্রাচীন মত ও শেষাংশে নবীনমতের আলোচনা করিব। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত মত আছে, তাহার মধ্যে কেহ কুচবেহারে, কেহ হরিদ্বারে, কেহ কামরূপে, কুশীনগরের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ সুযুক্তির দ্বারা স্বমতের সমর্থন করিতে পারেন নাই, সুতরাং সে সব মত প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে। অতএব সে সব মতের আলোচনা নিরর্থক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

রাজ্ঞী এই পিপ্পলীবনে সদ্যঃপ্রসূত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্র নাম্নী কোনও গোপরমণী সেই অসহায় শিশুকে পালন করেন। পরে এই শিশুই চন্দ্রগুপ্ত (চন্দ্রের গুপ্ত = রক্ষিত) নাম ধারণ করিয়া, মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কুশীনগর যেমন অজ্ঞাত, পিপ্পলবনও তদ্রূপ অজ্ঞাত। এই পিপ্পলবনে যাইবার পূর্ব্বে ভগবানকে অনোমা নদী উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল। এই সেই বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রসিদ্ধ অনোমা নদী। জগতের দুঃখে দুঃখিত ভগবান সিদ্ধার্থ পৃথিবীর সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহার তীরে মহামূল্য রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, একমাত্র সহচর প্রিয় সারথি ছন্দককে বিদায় দিয়াছিলেন!—কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য সরিতের মধ্যে প্রকৃত অনোমা কিরূপে নির্ণীত হইবে? অনোমা উত্তীর্ণ হইয়া পথে রামগ্রামে আসিতে হইয়াছিল। রামগ্রাম হইতে শ্রাবস্তী। এই শ্রাবস্তী জীবিতাবস্থায় ভগবানের বড় প্রিয় স্থান ছিল। ইহা বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থস্থল। কিন্তু কুশীনগরের পথে যে সকল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানের নাম করা গেল, তাহাদের একটিরও স্থান নির্ণয় করিবার উপায় রহিল না। পরে কিরূপে ইহা নির্ণীত হইল ও কিরূপে মহাত্মা কারলীল অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া এই নির্ব্বাণমন্দিরের উদ্ধার ও পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন বারান্তরে বলিব।*

শ্রীগৌরেশ্বর গোস্বামী।

---

* এই প্রবন্ধে যে সমস্ত পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা হইল, বর্জ্জাইস অক্ষরে [illegible] ক্ষুদ্র [illegible]টি প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত হইবার ভয়ে যথাস্থানে উহাদের নাম দেওয়া হয় নাই। এ স্থলে প্রধান কতকগুলির নাম করা গেল। ১২৯০ সালের "বিভায়" মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "কুশীনগর" প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। [illegible] এমন [illegible]। প্রবন্ধ স্বল্পতায় অল্পই পাঠ করিয়াছি। প্রাচীন মতের সমালোচনায় আমরা কেবল [illegible] অনুসরণ করিয়াছি।—Arch. Survey Reports vol. XVII; Beal's Western World; Rockhill's Tibetan Buddhism; Beal's Life of Tahan Houent Sang; Monier Williams's *Buddhism*, p. 424; Hardy's *Manual of Buddhism*; Rhys Davids' *Buddhism*, p. 80; Cunningham's *Ancient Geography of India*, [illegible]; Lillie's *The Popular Life of Buddha* p. 335; &c.

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

ছোট-গল্প।

ইতিপূর্ব্বে রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর কথায় আমরা ছোট গল্প সম্বন্ধে বলিয়াছি—"কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোট গল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয় ত সে ক্ষুদ্র ঘটনাটা কয়েক ছত্রমাত্র অধিকার করিতে পারে, ছোট গল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে 'বুল্‌সআই' লণ্ঠনের আলোক যেমন এক স্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটি নাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোট গল্প রচনার কৌশল তেমনই জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দ্দিকব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে; কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোকের কার্য্য। তেমনই বিচিত্র সুখদুঃখ, হর্ষবিষাদ, উত্থানপতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনা অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্য দান করাই গল্পরচনাকৌশলের কার্য্য।"

সম্প্রতি "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী" পত্রে মিষ্টার ওয়েড্‌মোর ছোট গল্প সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

প্রবন্ধারম্ভেই লেখক বলিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল, কোনও প্রসিদ্ধ পরিহাসরসিক বলিয়াছিলেন,—জীবনের রঙ্গমঞ্চে যাহারা বিফলমনোরথ, তাহারাই নাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে বিশেষ প্রশংসিত হয়। এক জন সংবাদপত্রসেবক বলিয়াছেন,—পাঠকগণ শিক্ষা চাহে না; **ছোট গল্প ও উপন্যাস।** লিখিত বিষয়ে লেখকের বিদ্যা যত অল্প, তাহা ততই পাঠকসমাজে তত অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। থ্যাকারেও এক স্থানে বলিয়াছেন, পঞ্চাশোর্দ্ধে আর কাহারও প্রণয়ঘটিত উপন্যাস রচনা করা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, তত দিনে প্রণয়-ব্যাপারে তাঁহার কিছু অধিক অভিজ্ঞতা জন্মে। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, যাঁহারা উপন্যাসরচনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহারাই ছোট-গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত হইবেন। কথাটা কি ঠিক? কখনই নহে। সাহিত্য-শিল্প-হিসাবে ছোট গল্প উপন্যাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। ছোট গল্প নানা প্রকারের হইতে পারে। একটা কোনও বৃত্তান্ত, একটা পল্লীর গল্প, একটা চরিত্রবিবৃতি, একটা অদ্ভুত বৃত্তান্ত, একটা বর্ণনা, একটা কোনও নীচ-ব্যবসায়ীর দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী প্রভৃতি নানা বিষয় লইয়া ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু ছোট গল্প আর যাহাই হউক, উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নহে। 'সনেট' ও মহাকাব্য, এতদুভয়ে যত প্রভেদ, ছোট গল্প ও উপন্যাস, এতদুভয়েও তত প্রভেদ। এই কথাটা না বুঝাতেই অনেক খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক ছোট গল্পের রচনা নিতান্ত সহজ মনে করিয়া উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করিয়া মনে করিয়াছেন—ছোট গল্প রচনা করা হ[illegible] দুই প্রকার রচনার প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়াই তাঁহারা 'শিব গড়িতে বাঁদর গ[illegible] বসেন। খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদিগেরই যখন এমন ভ্রম হয়, তখন সাধারণ লোকের

এরূপ ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা সাহিত্যশিল্পবিচারে অক্ষম,—যাঁহাদিগের বিশ্বাস,—উপন্যাস কেবল শ্রান্তি দূর করিবার জন্যই রচিত, তাঁহারা যে সাহিত্য শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য বুঝিতে পারিবেন না, ইহা একরূপ নিশ্চিত। যাঁহারা উপন্যাসপাঠকালে চিত্রিত চরিত্রের বিশ্লেষণ প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল উপন্যাসের আখ্যানবস্তু (Plot) পাঠ করেন, তাঁহারা কিছুতেই ছোট গল্পের প্রশংসা করিতে পারিবেন না—তাঁহারা সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মাধুরী বুঝিতে পারিবেন না।

উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পে অধিক বৈচিত্র্য-বিকাশ সম্ভব। উপন্যাসের রচনাপ্রণালী ত ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতেই পারে—তদ্ভিন্ন আবার আরও কতকগুলি রচনাপ্রণালী আছে, যাহা উপন্যাসের উপযোগী না হইলেও, ছোট গল্পে প্রযোজ্য। প্রথমে আমরা উপন্যাসে ও ছোট গল্পে সাধারণতঃ-ব্যবহৃত রচনাপ্রণালীর উল্লেখ করিব। সাধারণতঃ-অনুসৃত এই প্রণালীতে লেখক বর্ণিতবিষয়াভিজ্ঞ তৃতীয় ব্যক্তির মত রচনা করেন। অস্মদ্দেশে দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আর এক প্রকার রচনাপ্রণালীও অনেক সময় উপন্যাসে ও ছোট গল্পে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। সে প্রণালীতে লেখক বর্ণিত চরিত্র সকলের মধ্যে এক জন হইয়া বর্ণনা করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিষয়বিশেষে নিপুণ লেখকের হস্তে এই রচনাপ্রণালী বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্পেই এই রচনাপ্রণালী অধিকতর সহজে প্রয়োগ করা যায়। ডিকেন্সের মত পাকা লেখকও কেবল David Copperfield গ্রন্থে এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিয়া সফল হইয়াছেন। বল্‌ওয়ার এই রচনাপ্রণালীর প্রয়োগে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষমতাবিশিষ্ট লেখকগণ এই রচনাপ্রণালী ব্যবহার করিতে গিয়া কেবল গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার প্রশংসায় গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া থাকেন। উপন্যাসে ও ছোট গল্পে আর এক প্রকার রচনাপ্রণালী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাতে গল্পের বিষয়ীভূত চরিত্র সকলের পত্রে গল্পাংশ বিবৃত হয়। সুদীর্ঘ উপন্যাসে এ প্রণালী অনেক সময় বিরক্তিকর হইয়া দাঁড়ায়;—এই প্রণালী ছোট গল্পের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইহাতে লেখকদিগের পত্রে প্রত্যেকের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে হয়। অস্মদ্দেশীয় সাহিত্যে বোধ করি ১২৯৯ বঙ্গাব্দে "সাহিত্যে" প্রকাশিত "প্রাইভেট টিউটার" নামক গল্পই এইরূপ প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম * ও * * * রচনা। অনেক সময় এই তিন প্রকার রচনাপ্রণালী মিশ্রিত করা হইয়া থাকে, তবে সেই মিশ্রণোৎপন্ন রচনাপ্রণালী উপন্যাসেরই বিশেষ উপযোগী। কেবল কথাবার্ত্তাতেও ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ রচনাপ্রণালীর অনুসরণ করিলে, নাটকের নিয়মাধীন হইতে হয়; অথচ নাটকের বিশেষ সুবিধা আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কেবল কথাবার্ত্তায় গল্প শেষ করিলে যেন কোথাও কিছু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ডায়েরী হইতে উদ্ধৃতাংশের আকারেও ছোট গল্প লেখা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে লেখকের যেমন ক্ষমতার আবশ্যক, পাঠকেরও তেমনই ক্ষমতা আবশ্যক। যে পাঠক একবারমাত্র চক্ষু বুলাইয়া পাঠ শেষ হইল মনে করেন—তাঁহার পক্ষে 'ডায়েরী'র আকারে লিখিত ছোট গল্প প্রীতিপ্রদ হইবে না।

রচনাপ্রণালী।

---

* ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, অধুনালুপ্ত "প্রবাহ" নামক মাসিকপত্রে "জয়চাঁদের চিঠি" নামক পত্রে রচিত একটি দীর্ঘ গল্প বা উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে বা পরে আর কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল কি না,—বলিতে পারি না।—"সাহিত্য"-সম্পাদক।

ছোট গল্পে যেখানে কথাবার্ত্তা প্রচলিত করিলেও চলে, সেখানেও অনেক সিদ্ধহস্ত লেখক কথাবার্ত্তা পরিহার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলজ্যাকের ছোট গল্পের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রণালী ছোট গল্পে বিশেষ চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্য্যসংবর্দ্ধক, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, অন্য সকল প্রকার রচনার ন্যায় ছোট গল্পও লেখকের প্রতিভার উপর নির্ভর করে। ডোডের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছোট গল্পটির কথাই ধরা যাউক। সেটির আখ্যানবস্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পথের দুই পার্শ্বে দুইটি পান্থনিবাস—একটি কোলাহলহীন, বিষাদময়; অপরটি শব্দমুখরিত, উন্নতিশীল। প্রাচীন পান্থনিবাসের অধিকারী নূতন পান্থনিবাসে তাঁহারই পুরাতন অতিথিদিগের সহিত আমোদে মত্ত—ব্যস্ত, হারাইয়া নূতন পান্থনিবাসের কর্ত্রীর মায়ায় মুগ্ধ। আর পথের অপর পার্শ্বে কোলাহলহীন পুরাতন পান্থনিবাসে এক জন পরিত্যক্তা রমণী শূন্যহৃদয়ে শূন্য আলয়ে দিন কাটাইতেছে। তাঁহার অন্ধকারময় জীবনে আর বিন্দুমাত্র আলোকবিকাশ নাই। এই সামান্য গল্পটিকে ডোডের রচনাকৌশল কি মধুর, কি করুণ, কি হৃদয়স্পর্শী করিয়া তুলিয়াছে!

উপন্যাসে বা ছোট গল্পে স্বভাববর্ণনা অতিবিস্তৃত হওয়া অনুচিত, ঔপন্যাসিক উদ্ভিদ-তত্ত্ববিদ নহেন। তাঁহার পক্ষে প্রত্যেক খুঁটিনাটি দেখা অনাবশ্যক।

সাহিত্যশিল্পীর পক্ষে সংক্ষেপে ভাবপ্রকাশ বিশেষ আবশ্যক। ভার্জিল হইতে ব্রাউনিং অবধি প্রধান সাহিত্য-শিল্পিগণ এ কথা ভুলেন নাই। ছোট গল্পে ইহা আরও আবশ্যক।

সংক্ষেপ।

ছোট গল্পে যেখানে কথোপকথন ব্যবহার করা হয়, সেখানে প্রত্যেক কথার বিশেষ উপযোগিতা থাকা চাই। উপন্যাসে দুইটা বাজে কথা ব্যবহার করা চলে—ছোট গল্পে তাহা নিষিদ্ধ। সাধারণ পাঠক হয় ত সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করিতে পারিবেন না; কিন্তু সমালোচকের, শিল্পীর চক্ষে তাহা ধরা পড়িবেই পড়িবে। সেই জন্য ছোট গল্প ধীরে ধীরে রচনা করা ও বারবার সংশোধন করা অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ উপন্যাসেই হউক, আর ছোট গল্পেই হউক, কথোপকথন ব্যবহার করা বড় সহজ নহে। হাস্যরসের অবতারণার সময় বরং কথোপকথন ব্যবহার করা চলে; কারণ, হাস্যরসের অবতারণায় দুই একটি বাজে বকুনিও অসঙ্গত নহে, কিন্তু গম্ভীর বিষয়ের অবতারণায় অনেক সময় কথোপকথনব্যবহারে রচনার সৌন্দর্য্যহানি হইয়া থাকে।

নাটকের মত ছোট গল্পেও প্রতি ছত্র দর্শকের বা পাঠকের মনে বিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তবে নাটকে যে প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হইলে হয়, ছোট গল্পে সে ভাবও অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-

নাটক ও ছোট গল্প।

স্থায়ী হওয়া একান্ত আবশ্যক। আবার এক হিসাবে নাটককারের অসুবিধা অধিক; কারণ, দর্শকদিগের মধ্যে সকল প্রকারের লোক থাকে; তাঁহাকে সকল দর্শকের মনস্তুষ্টিবিধান করিতে হয়। ছোট গল্পের লেখককে তাহা করিতে হয় না। তিনি ইচ্ছা করিলে কেবল সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য রচনা করিতে পারেন।

আজ কাল অনেক লেখক রচনাকৌশলের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া থাকেন; তাহা ভাল ভিন্ন মন্দ নহে; কারণ সাহিত্যে কোনও রচনা স্থায়ী করিতে হইলে, তাহা সুলিখিত হওয়া আবশ্যক। রচনাকৌশলও সাহিত্য-শিল্পের একটা প্রধান অঙ্গ। তবে যাঁহারা কথার বাহার খুঁজিতে গিয়া ভাবদৈন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, যাঁহারা ভাবার সৌন্দর্য্য বাড়াইতে গিয়া রচনা ফেনাইয়া অতিশয় বিস্তৃত করিয়া ফেলেন,—তাঁহারা প্রকৃত শিল্পীর রচনা-কৌশলে অনভিজ্ঞ।

ছোট গল্পে মৌলিকতা ও আন্তরিকতা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার আধিক্য হেতু পাপের প্রত্যেক পৈশাচিক খুঁটি নাটির বর্ণনা করেন, যাঁহাদের বর্ণিত চরিত্র পাপের পুতিগন্ধময়,—তাঁহাদের স্বপক্ষে বলিবার কোনও কথা আছে কি? সে সকল "Dyspeptic pessimist"এর বাস্তবাদর্শপ্রিয়তা রোগবিশেষ। এই বিষয়ের বিচারকালে রুড্‌ইয়ার্ড কিপ্‌লিংএর প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ফ্রান্সে এখন বাস্তবাদর্শপ্রিয়তার বিকৃতাংশ অনাবৃত। গীদে মোপার্সা আপনি এই স্বতন্ত্র পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোপার্সার জীবনে বিষাদপ্রবণতার অতিসম্পাত ছিল। তৎসত্বেও তিনি অসাধারণ প্রতিভাবলে আপনার রচিত পথ আপনার পক্ষে সুগম ও অপরের পক্ষে আলোকোজ্জল করিয়াছিলেন। তাই যাঁহারা ছোট গল্প-রচনায় তাঁহার অনুকরণ করিতেছেন, তাঁহারা সফল হইতে পারিতেছেন না।

সাধারণতঃ যুবকগণই অধিক বিষাদপ্রবণ। তাই যুবক লেখকদিগের রচনায় বিষাদের অশ্রুসলিল প্রবাহ প্রবহমান থাকে। যৌবনের পর সংসারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তবে লেখকদিগের রচনা খাঁটি হইয়া দাঁড়ায়. কিন্তু অনেক সময় তাহাতে আবার উৎসাহের অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে তেজ দেখা যায় না।

ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

সুমেরু-সন্ধান।

সুমেরু প্রদেশ এখনও আমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহার চিরতুষারাবৃত আবাসে মানবের পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় না। অল্পদিন পূর্বে নান্‌সেন সুমেরু প্রদেশে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট পিয়ারীও বিগত দ্বাদশ বৎসরে চারি বার সুমেরু-সন্ধানে গমন করিয়া, সুমেরু প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানের নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের (Northward over the 'Great Ice') বর্ণনা অবলম্বন করিয়া আমরা সুমেরু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

ধরণীর উচ্চাবচ বক্ষে সুমেরু প্রদেশের তুষার ও বরফের বিলম্বিত হারে গ্রীনল্যাণ্ড মধ্যমণিস্বরূপ। সেখানে বৈষম্যবৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। তথায় মধ্যরাত্রে সূর্য্যোদয় হয়, আবার দিবাদ্বিপ্রহরে নৈশান্ধকারব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে গগনমণ্ডল গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আকাশের মত; আবার সেখানে চিরতুষার ব্যাপ্তি। সেখানে কোনও কোনও গিরিগাত্রে প্রাচীনকালীন অগ্ন্যুৎপাত-চিহ্ন বর্ত্তমান, আবার কোনও কোনও পর্ব্বত চিরতুষারমুকুটে মণ্ডিত। গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যভাগ চিরতুষারসমাচ্ছন্ন—দৈর্ঘ্যে প্রায় দ্বাদশ শত মাইল ও প্রস্থে প্রায় পঞ্চশত মাইল। এই তুষারমরুর তুলনায় সাহারার মরুভূমি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। এখানে জীব নাই, উদ্ভিদ নাই—এককণা বালুকাও নাই। সেই বরফবিস্তারের মধ্যে কেবল তিনটি জিনিস পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, দিগন্তপ্রসারিত তুষারাচ্ছন্ন ভূমি, অন্তহীন নীল নভোমণ্ডল, আর শ্বেতশীতল সূর্য্য। এই সঙ্কটসঙ্কুল প্রদেশে, পিয়ারী ও তাঁহার পত্নী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া নানা জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়াছেন। অনদিনের অভিলবিতদর্শন সুমেরু প্রদেশে উপনীত হওয়াই তাঁহাদের অভিলাষ। সেই তুষারাচ্ছন্ন মরুভূমিতে কোথাও কোনও অসমতা লক্ষিত হয় না। যেন কোনও দানব শিল্পী [illegible] লইয়া একখানি সমতল খণ্ডে পরিণত করিয়া গিয়াছে।

এই তুষারদেশে গ্রীষ্মকালে চারি মাস কাল সূর্য্যাস্ত হয় না। [illegible] তাপে সূর্য্য-কর যেরূপ উজ্জ্বল, এ দেশে মেঘহীন আকাশে সূর্য্যকর সেই[illegible] [illegible]রকে প্রতি-ফলিত হইয়া সূর্য্যকর এত তীব্র হইয়া [illegible] [illegible]ালে কেহ পথ চলিতে আরম্ভ করিলে, কয়েক [illegible] অন্ধবৎ হইয়া পড়িবে—আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। [illegible] যাইতে হইলে, চক্ষের উপর কিছু বাঁধিতে হয়—নহিলে কেবল চক্ষের পত্রে আলো[illegible] প্রতিরোধ হয় না।

আলোকে ও আঁধারে।

আবার যখন আকাশে মেঘোদয় হয়, তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর [illegible] সূর্য্য নাই, আকাশ নাই, তুষার নাই, চক্রবাল নাই—সবই একাকার! চারি দিকে কেবল ধূসর অন্ধকার-বিস্তার। এই তুষারদেশে যখন বায়ু বহিতে আরম্ভ করে, তখন তুষারস্তূপ ইতস্ততঃ পরি-চালিত হইতে থাকে। তখন চারি দিক ভ্রাম্যমাণ তুষারে পূর্ণ হইয়া যায়, নিশ্বাসপ্রশ্বাস কষ্ট-সাধ্য হইয়া উঠে।

তুষারদেশের তুষাররাশি বিদূরিত হইবার কোনও উপায় না থাকিলে, তুষারস্তূপ ক্রমে অসম্ভব অধিক হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে সেখানে যেমন তুষাররাশি উৎপন্ন হয়, তেমনই আবার তুষাররাশি নির্গতও হইয়া যায়;—নানা কারণে এই তুষাররাশি জন্মভূমি হইতে দূরে যাইয়া পড়ে, এবং সলিলে পরিণত হয়।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চিরতুষারদেশও মানব কর্তৃক অধ্যুষিত। এই বিপদসঙ্কুল দেশে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়াও জীবিত থাকে। ইহারা সকল গণিয়া কেবল দুই শত তিপান্ন জন মাত্র। ইহাদের না আছে শাসনপ্রণালী; না আছে ধর্ম্ম; না আছে মুদ্রা; না আছে মূল্যবোধ; না আছে লিখিত ভাষা; না আছে কোনও সম্পত্তি; কেবল আছে কিছু পরিধেয়, আর আছে কয়খানি অস্ত্র! ইহারা লবণাদি না দিয়াই মাংস আহার ও রক্তপান করিয়া জীবনধারণ করে, এবং বিহগাদির চর্ম্ম পরিধান করিয়া শীতের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ইতর প্রাণিগণের সহিত ইহাদিগের কোনও প্রভেদ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা বিশেষ বুদ্ধিমান। শিশুর পক্ষে চন্দ্রপ্রাপ্তির আশা যেমন, ইহাদের পক্ষে একখণ্ড কাষ্ঠ পাইবার আশাও তেমনই দুরাশামাত্র। এক জন এস্কিমো একখণ্ড কাষ্ঠের জন্য লেখককে তাহার কুক্কুর, "স্লেজ" শকট, প্রাণিলোম, সকলই দিতে চাহিয়াছিল। আর এক জন একখানি ছুরিকার জন্য লেখককে তাহার পত্নী ও দুইটি সন্তান দিতে চাহিয়াছিল। একটি স্ত্রীলোক একটি সূচের জন্য তাঁহাকে তাহার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিল।

এস্কিমো জাতি।

ইহারা ব্যবহারে শিশুর ন্যায় সরল, আহার বিহারে পশুর মত; কিন্তু ক্ষুধা, শ্রম ও শীত সহ্য করিতে ইহাদের সমকক্ষ নাই।

লেখকের মতে, এস্কিমোগণ মঙ্গোলীয়ান;—তাহারা সম্ভবতঃ সাইবিরিয়া হইতে [illegible] প্রদেশে আসিয়াছিল। তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল, সে সম্বন্ধে তাহাদের কোনও পরি-ষ্কার সংস্কার নাই;—কেবল তাহাদের বিশ্বাস, তাহারা আরও উত্তর হইতে আসিয়াছিল। ইহাদিগের কোনও শাসনপ্রণালী নাই। প্রত্যেকেই স্বীয় পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। যাহার যেখানে ইচ্ছা, বাস করিতে পারে। কেহ সীল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোনও জীব মারিতে পারিলে, তাহা তাহার নিজ সম্পত্তি; নহিলে তাহা সাধারণের সম্পত্তি। তথাপি লোকে অপরকে যথাসম্ভব [illegible] থাকে।

আমাদের মাপ[illegible] [illegible]হাদিগের নীতির আদর্শ আদৌ উচ্চ নহে। ইহাদের ব্যব-হারে পত্নী একটা [illegible] [illegible]মত পত্নী-বিক্রয়, বদল, বাধা দেওয়া, এমন কি, ধার

কেহবা ও [illegible] "মেজ" শব্দটির যেমন আদর, পত্নীর আদরও সেইরূপ। তবে ইহারা শিশু[illegible] বালিকাদিগের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। ইহাদিগের [illegible] কোন [illegible]। [illegible]ই বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে, বাগদত্তা বালিকা [illegible] তাহাকে স্ত্রীরূপে ব্যবহার করে; তাহার পর বয়ঃক [illegible] বালিকাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করে। বিবাহের পর প্রথম দুই এক বৎসর [illegible] পত্নীর ও পতির পরিবর্ত্তন করে—যেন কেউ চাহিতেছে, [illegible]। তাহার পর স্থির হইয়া সংসারী হয়।

[illegible] ধর্ম্মবিশ্বাস বড় অদ্ভুত রকমের। ইহারা ভাল ভূত ও মন্দ ভূতে বিশ্বাস করে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইহাদিগের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কিঙ্কর সেনের গড়।

জনপ্রবাদমূলক গল্প।

অনেক দিনের কথা, বোধ হয়, আড়াই শত কি তিন শত বৎসর হইবে,—তখন মুসলমানের গৌরব-রবি ভারতের মধ্যাকাশে শোভা পাইতেছিল,—হুগলীর নিকটে একজন সম্পন্ন কায়স্থ বাস করিতেন। কোনও কারণে হুগলীর ফৌজদার তাঁহার উপর বিরক্ত হওয়াতে, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। হতভাগ্য বেচারা একটি শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে লইয়া একেবারে পথের ভিখারী হইলে কেহ কেহ তাঁহাকে পরামর্শ দিল যে, নবাব-সরকারে একবার ফৌজদারের বিপক্ষে জানাইতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু নিরুপায় কায়স্থসন্তান নীরবে আপনার কপালে হাত দিয়া বলিতেন, "যদি বিচারপ্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তাহা হইলে এমন স্থানে দাঁড়াইব যে, যাঁহার বিচারের উপর আর কেহ বিচার করিবার থাকিবে না।" সকলে মনে করিত, তিনি বাদশাহকে জানাইবার কল্পনা করিয়াছেন। কেন না, তখন দেশের লোকের কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হইত,—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" ফলতঃ, দরিদ্র, পীড়িত কায়স্থসন্তান অল্পদিনের মধ্যেই সনাথা পত্নীকে অনাথা করিয়া জগদীশ্বরের সিংহাসনের নিকট বিচারপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ ইহসংসার ত্যাগ করাতে তাঁহার আর দিল্লীশ্বরের নিকট জানাইবার সুবিধা হইল না। ইহার পর প্রায় ১২। ১৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

১

হুগলীর দক্ষিণে চন্দননগর নামক একটি ক্ষুদ্র [illegible] অতি সামান্য একখানি তৃণাচ্ছাদিত কুটীরের সম্মুখে বসি[illegible] বংশীয় তরুণ

যুবা স্বহস্তরোপিত গুটিকত বার্ত্তাকু বৃক্ষের গোড়ার ঘা[illegible] করি[illegible] এমন সময় দূরে পথে শব্দ হইল,—"মাছ [illegible]"

যুবকও উচ্চস্বরে ডাকিলেন, "কি মাছ [illegible] থি—"

ক্ষণ কাল পরে এক কৃষ্ণবর্ণা স্থূলব[illegible] ধীবরপ[illegible] অঙ্গভঙ্গী সহকারে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল, কে মাছ [illegible] এস না

যুবক উঠিয়া গিয়া এক পয়সার মাছ লইয়া বলিল, "একটু পরে এসে পয়সা নিয়ে যাস্, মা এখন স্নান করিতে [illegible] গেছেন।"

ধীবরপত্নী প্রথমে একটু ইতস্ততঃ [illegible] য়া পরে বলিল,—"দেখো বাছা, যেন আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু ব[illegible] ভাড়াভাঁড়ি কবো না।"

মৎস্যবিক্রয়কারিণী চলিয়া গেল।

ক্ষণ কাল পরে যুবক দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, মাতা আর্দ্রবসনে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছেন। মাতা, পুত্রকে তত বেলাতেও উদ্যানে কর্ম্ম করিতে দেখিয়া স্নেহমিশ্রিত রোষে বলিলেন,—

"কিঙ্কর! বেলা হ'ল, যা না, স্নান করে আয় না। রাত্তির দিন গাছের গোড়ায় বসে বসে কি হবে, যা যা, বেলা অনেক হয়েছে।"

"মা! গাছগুলাতে একবার বেগুন ধরিতে আরম্ভ হ'লে ছয় মাসের তরকারি একেবারে ঘরে বাঁধা থাক্‌বে। এক পয়সার মাছ নিয়েছি—মাছের ঝোল রাঁধ,—আমি স্নান করে আসি।"

কিঙ্কর, (যুবকের নাম কালীকিঙ্কর, কি রামকিঙ্কর, না হয় একটা কিছু হইবে, মা এবং প্রতিবাসিবর্গ তাঁহাকে কিঙ্কর বা কিঙ্কর বলে ডাকিয়াই ডাকিতেন) খণিত্র রাখিয়া হাত পা ধুইয়া স্নানে গমন করিলেন; যাইবার সময় মাতাকে মাছের দামের কথা কিছু বলিয়া গেলেন না।

মাতা যথাকথিত মাছের ঝোল রাঁধিয়া ভাত চড়াই[illegible] দিয়া কুটীরের দ্বারে বসিয়া বসিয়া অন্যমনে বোধ হয় আপনার অতীত চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই মৎস্যবিক্রয়কারিণী আসিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "মাছের পয়সা দাও।"

কিঙ্করের মাতা অন্যমনস্কা ছিলেন। হঠাৎ ধীবর-রমণীর কর্কশকণ্ঠে চমকিতা হইয়া বলিলে[illegible] গা?"

কিছু পূর্ব্বে [illegible] প্রি[illegible] সহিত তাহার বেশ এক পালা হইয়া গিয়াছিল, [illegible] ত্নী [illegible] স [illegible] ছিল; একণে কিঙ্করের

[illegible] দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল, এবং অতিশয় পরুষস্বরে কহিল, "কি গা, জান না? ন্যাকা আর কি! বেটা মাছ কিনে নবাবী করেন, আর মাগী দাম দেবার বেলা ন্যাকা হ'ন! কি গা?"

"কিঙ্কর মাছ কিনেছে, তা আমায় ত কিছু বলে যায়নি; তা' জেলেবউ! রাগ করিস্ কেন, আজ ত পয়সা নাই, আর একদিন আসিস, পয়সা নিয়ে যাস্। আজ কাছে একটি পয়সা ছিল, একজন কাণা ভিক্ষা চাইলে—তাই তাকে দিয়ে এসেছি; তা, আর একদিন আসিস্।"

অন্য দিন হইলে ধীবর-রমণী এই কথাতেই হয় ত চলিয়া যাইত, কিন্তু আজ পূর্ব্ব হইতেই সে উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছিল; সুতরাং কিঙ্করের মাতার কোনও কথা কানে তুলিল না; হাত নাড়িয়া বলিল,—

"দান করে এসেছ, খয়রাত করে এসেছ, বেশ করেছ। আমি ত আর চোখের মাথা খেয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা করতে আসিনি, আমার পাওনা পয়সা দাও, না হলে মাছ ফিরিয়ে দাও। দুয়ের এক না নিয়ে যদি আমি উঠি, তবে আমি জেলের মেয়ে নই।"

"মাছ কোথায় পাব? সে যে রেঁধে ফেলেছি।"

"সেই রাঁধা মাছই নিয়ে যাব।"

অনেক কাকুতি মিনতির পর যখন কিঙ্করের মাতা কিছুতেই ধীবরপত্নীর মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন (পাঠক! অসম্ভব মনে করিবেন না) বাস্তবিকই ঝোল হইতে মাছগুলি আনিয়া ধীবররমণীকে দিতে গেলেন। তখনও মনে মনে ভরসা ছিল, বাস্তবিক রাঁধা মাছ লইবে কি? কিন্তু ধীবরপত্নী অম্লানবদনে প্রাঙ্গণস্থ কদলীবৃক্ষ হইতে যখন একটু পত্র ছিন্ন করিয়া আনিয়া মাছ লইতে অগ্রসর হইল, তখন কিঙ্করের মাতার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল; কিন্তু তিনি ধীবরপত্নীকে এই দুর্ব্বলতা দেখিতে দিলেন না। ধীবরপত্নী মাছগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে কিঙ্কর স্নানসমাপন করিয়া আসিয়া আহারে বসিলেন। মাতা নীরবে ভাত ও মাছশূন্য মাছের ঝোল দিলেন। কিঙ্কর ভাত খাইতে খাইতে মাছের কথা জিজ্ঞাসা করিলে [illegible] পারিলেন না; গদগদ-লোচনে ধীবরপত্নীর বৃত্তান্ত [illegible] ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিঙ্কর শুনিয়া [illegible] হইলেন, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয় [illegible] অভ্যাস ছিল। তিনি [illegible] লাগিলেন,

"মা! এ ত বড় মজা! আমাদের পয়সা দিতে হ'ল না, অথচ মাছের ঝোল খাওয়া হ'ল! আর সে জেলে মাগীরও রাঁধতে হ'ল না। মাঝে থেকে রাঁধা মাছ পেয়ে গেল। একটা জেলেনীর সঙ্গে এই রকম বন্দোবস্ত করিলে মন্দ হয় না; রোজ রোজ মাছের ঝোল খাওয়া হয়!"

মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া এত দুঃখেও একবার হাসিলেন।

কিঙ্করের আহার সমাপ্ত হইল, মাতার আজ আর আহার হইবে না; কারণ, আজ একাদশী। মধ্যাহ্নে মাতাপুত্রে অনেক কথা হইল। কিঙ্করের ইচ্ছা, বিদেশে গিয়া কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টা করেন। কিন্তু মাতা কোন্ প্রাণে ছাড়িয়া দিবেন? যে আট বৎসরের পিতৃহীন শিশুকে তিনি একাকিনী পিতা ও মাতা উভয়ের স্নেহে বুকে রাখিয়া বাইশ বৎসরের করিয়াছেন, আজ কোন প্রাণে ছার পয়সার জন্য সেই পুত্রকে বিদেশে পাঠাইবেন? যদি বিদেশে বাছার পীড়া হয়, তাহা হইলে কি হইবে? কে বাছার মাথার শিওরে বসিয়া একমনে গায়ে হাত বুলাইবে? যাহার চাঁদমুখে মৃত স্বামীর প্রতিকৃতি দেখিয়া তিনি জ্বলন্ত অগ্নিতে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভে সক্ষম হইয়াছিলেন; সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে প্রিয়তমকে অনন্ত বিরহান্ধকারে ক্ষণমাত্র বিদ্যুদালোকস্বরূপ পাইয়া আবার স্বপ্নভঙ্গে গাঢ়তর অন্ধকার [illegible] যে প্রাণের বাছাকে বুকের মাঝে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিতেন; আজ কোন প্রাণে সেই কিঙ্করকে, সেই [illegible] নয়ন, দরিদ্রের মান, সম্পদের স্বাস্থ্য ও বিপদের আশাকে—প্রবাসে পাঠাইবেন? অন্যে পারে পারুক, তিনি ত কিছুতেই পারিবেন না।

কিন্তু অবশেষে তিনিও পারিলেন! বুঝিলেন, জননীর অতিরিক্ত স্নেহবর্ষণে অনেক সময় পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতি অঙ্কুর-অবস্থাতেই ভাসিয়া যায়; তাই তিনি নিজে পাষাণে বুক বাঁধিয়া অগত্যা কিঙ্করকে যাইতে দিতে সম্মত হইলেন। তিনি জানিতেন, হুগলীর ফৌজদার জীবিত থাকিতে কিঙ্করের হুগলীতে কিছুই হইবে না। সুতরাং তিনি কিঙ্করকে যাইতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পর দিন প্রভাতে কিঙ্কর যাত্রা করিবেন, স্থির হই[illegible]

অনেক সময় [illegible] দেখিতে পাই, আমাদের একটা অবশ্য-পালনীয় ব্যাপার অবাধে আমাদের [illegible] যায়, আমরা কিছুই [illegible] না; আবার অকস্মাৎ [illegible] আমাদের সমস্ত [illegible]টা যেন একেবারে আমাদের [illegible]। কিঙ্কর বাইশ

বৎসরের হইয়াছেন, কিন্তু কখনও যে তাঁহাকে মাতার স্নেহময় ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠুর সংসার-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, কি মাতা, কি পুত্র, কাহারও মনে তাহা উদিত হয় নাই। কোন রকমে কায়ক্লেশে উদরান্নের সংস্থান হইলেই যেন তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্যাপার সিদ্ধ হইল, মনে করিতেন। আজ ধীবরপত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কিঙ্কর অকস্মাৎ জানিতে পারিলেন যে, সংসারটা কেবল মাতার স্নেহের আচ্ছাদনে, বনচ্ছায়ার অন্তরাল-প্রবাহিণী নির্ঝরিণীর ন্যায় নিঃশব্দে প্রবাহিত হয় না; মধ্যে মধ্যে দারিদ্র্যের ভীষণ শৈলে প্রতিহত হইয়া বিপদসঙ্কুল হইয়া ওঠে। আজ জানিতে পারিলেন যে, এই জনাকীর্ণা বসুন্ধরার ক্রোড়ে কেবল তাঁহারা দুই জন মাতাপুত্র ব্যতীত আরও অসংখ্য নরনারী বাস করে; এবং সহস্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ, সংঘর্ষ, অনিবার্য্য। ধনবল থাকিলে এই কঠিন সংঘর্ষ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও হইতে পারে।

সমস্ত দিন কিঙ্করের যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। উদ্যোগই বা কত? দুইখানি বস্ত্র ক্ষার-জলে সিদ্ধ করিয়া মাতা উত্তমরূপে প্রক্ষালিত করিয়া দিলেন। দারিদ্র্যে পতিত হইয়া মাতাপুত্রে বড় কাহারও সংস্রব রাখিতেন না; সুতরাং বড় অধিকসংখ্যক প্রতিবাসীর নিকট বিদায় লইতে হইল না। শুনিতে পাই, অনেক বিধবার না কি একাদশীর রাত্রি আর প্রভাত হয় না। কিন্তু কিঙ্করের মাতার সেই রাত্রি মুহূর্ত্তমধ্যে শেষ হইল। প্রত্যূষে মাতার স্নেহাশ্রু ও আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত হইয়া, মাতৃচরণে প্রণামপূর্ব্বক "মধুসূদন! মধুসূদন!" স্মরণ করিতে করিতে কিঙ্কর কুটীর ত্যাগ করিলেন। পুত্র চক্ষের অন্তরাল হইবামাত্র জননী দুই হাতে হৃদয় চাপিয়া ধরিয়া কুটীরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া অশ্রুধারে ধরণী সিক্ত করিতে লাগিলেন। হায়! স্নেহময়ী মনে করিলেন, বুঝি অশ্রুজলে কঠিন মৃত্তিকা কোমল [illegible] দিলে বাছার পদে নিষ্ঠুর ধরণী [illegible] আঘাত করিতে পারিবে না,—[illegible]ার পায়ে কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না!

[illegible] বৎসর অতীত হইয়াছে। [illegible] বৎসরের মধ্যে তিন বারমাত্র পুত্রের সংবাদ [illegible] এক পয়সার পোষ্ট-কার্ড [illegible] না; দুই পয়স[illegible]-অনুসারে ডাকের খরচের [illegible]

ধিক্য হইত। [illegible] ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সংবাদ পাঠাইতে হইলে, [illegible] পঞ্চাশৎ মুদ্রা ব্যয় করিতে হইত।

মাতা প্রথম সংবাদ পাইলেন, কিঙ্কর বর্দ্ধমানে গিয়া রাজ-সরকারে কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু বড় সুবিধা করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় পত্র পাটনা হইতে, এবং প্রায়ই ঐ মর্ম্মে লিখিত। শেষ পত্র পাইলেন, কিঙ্কর দিল্লীতে গিয়া এক জন বৈশ্য সওদাগরের তরফে পাঁচ টাকা বেতনে মুহুরী নিযুক্ত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া মাতার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল।

ভীষণ দারিদ্র্যে প্রতিপালিত হওয়ায় কিঙ্কর বড় ধৈর্য্যশালী ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ও শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠবও যথেষ্ট ছিল। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তিনি স্বীয় প্রভুর বড় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িলেন। এমন কি, উভয়ে ভিন্ন বর্ণের না হইলে, প্রভুর একমাত্র কন্যা লছমনিয়ার পাণিগ্রহণও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত না।

* * * * *

বাদশাহের জন্মতিথি নরোজা উপলক্ষে আজ সমস্ত দিল্লী একটি সুসজ্জিত নাট্যশালা বলিয়া বোধ হইতেছে। চারি দিকে কেবল আমোদ, কেবল প্রমোদ, কেবল রহস্য, কেবল কলহাস্য, কেবল আতর গোলাপ, ফুলের মালা, পানের দোনা। এমন কি, আজ রাজধানীমধ্যে কাহারও উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিবারও হুকুম নাই।

কিঙ্করের প্রভুর বাটী লক্ষ্ণৌ। লক্ষ্ণৌয়ের গায়িকা ও নর্ত্তকী বড় বিখ্যাত। সেই জন্য আজ নরোজা উপলক্ষে লক্ষ্ণৌয়ের প্রধানা গায়িকা মতি বাই দিল্লীতে আসিয়া কিঙ্করের প্রভুর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছে। আজ সন্ধ্যার পর রাজ-প্রাসাদে তাহার 'মুজরা' হইবে। এ নৃত্যসভায় কিঙ্করের প্রভুর নিমন্ত্রণ ছিল।

রাজবাটীর প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে অনেকগুলি নৃত্যসভা হইয়াছে; এক এক জন ওমরাও বা উজীর এক একটি সভার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। [illegible] যাহার নৃত্য গীতে পরিতুষ্ট [illegible] আশাতীত পুরস্কার পাইবে, এবং [illegible] নৃত্যসভার অধ্যক্ষও [illegible] [illegible]ক্ষিত হইবেন।

সন্ধ্যার পর বা[illegible] মাণিক্যে অলঙ্কৃত ও মখমল [illegible] কিংখাপে সজ্জিত হইয়া, [illegible] বাসবের ন্যায়, এক নৃত্যসভা হই[illegible] অপর নৃত্যসভায় গমন করিতে[illegible] [illegible] মধ্যে মধ্যে "বহুৎ খুব!" [illegible]

"কেয়াবাৎ!" "হাজার রূপেয়া" ইত্যাদি উচ্চারণ [illegible] নর্তকীদিগকে আপ্যায়িত ও পুরস্কৃত করিতেছেন। অস্ত বিশেষ নিয়[illegible] পুরস্কার-ধ্বনি উচ্চারিত হইবামাত্র গায়িকা সেই মুহূর্ত্তে পুরস্কৃত হইতেছে। এইরূপে সম্রাট ক্রমে ক্রমে মতিজানের সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিঙ্করের প্রভু বৈশ্য সওদাগর এই সভার অধ্যক্ষ। বাদশাহকে দেখিবামাত্র তিনি নত-জানু হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বাদশাহ কিয়ৎক্ষণ মতিজানের গীত শ্রবণ করিয়া, তাঁহারই উদ্দেশ্যে সংস্থাপিত নিকটস্থ সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন। সওদাগর ও গায়িকা উভয়েই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

যখন মতিজান বাদশাহের পদতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট হইয়া জয়-জয়ন্তী আলাপ করিতে লাগিল, তখন সঙ্গীতরসজ্ঞ সম্রাটের নয়নদ্বয় হইতে দর দর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল; সমবেত সভ্যমণ্ডলী সকলেই রুদ্ধনিশ্বাসে সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতসুধা পান করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে কোনও প্রশংসাবাদ নাই। জয়জয়ন্তীর পর মতিজান "মধুরেণ সমা-পয়েৎ" ভাবিয়া খাম্বাজ ধরিল। সম্রাটের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, জয়জয়ন্তীর পর খাম্বাজ, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যেন কোনও চিরবাঞ্ছিতের যুগযুগান্তব্যাপী বিরহবেদনার অপনোদন করিয়া প্রিয়তমের সম্মিলন করিয়া দিল। বাদশাহ উল্লাসভরে উঠিয়া আপনার কণ্ঠহার মোচন করিয়া স্বয়ং গায়িকার গলদেশে লম্বিত করিয়া দিলেন, এবং নিকটস্থ অনুচরকে বলিলেন, "লাখেরাজ হাজার।"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন; মহামূল্য কণ্ঠহার, তার উপর হাজার বিঘা লাখেরাজ!

উজীর তৎক্ষণাৎ হাজার বিঘার দানপত্র লিখিয়া দিলেন, বাদশাহও তদুপরি নিজ পাঞ্জা অঙ্কিত করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতে সওদাগর-ভবনে, মতিজান স্বীয় অভাবনীয় শুভাদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে, এমন সময় কিঙ্কর গিয়া মতিজানকে যথাবিহিত সম্ভাষণ করিয়া তাহার সৌভাগ্যে হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আরও চারি পাঁচ জন লোক তথায় উপস্থিত হইল। কিঙ্কর মতিজানকে বলিলেন,

"বাইজি! আমি কখনও বাদশাহের পাঞ্জা দেখি নাই; তোমার দানপত্র-খানা দেখি—বাদশাহি পাঞ্জা কি প্রকার।"

আহ্লাদে মতি বিবি বাদশাহের পাঞ্জা-যুক্ত দানপত্র বাহির করিয়া কিঙ্করের হাতে দিল। কিঙ্কর তাহা দেখিয়া একে একে সকলেরই হস্তে এক এক-

বার দেখি... অবশেষে কিঙ্কর পুনরায় সেই দানপত্র লইয়া আদ্যো-পান্ত পাঠ করিয়া সহসা লেখনী লইয়া কি দুই চারিটি কথা দানপত্রে লিখিয়া দিলেন। এক জন দর্শক ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখিতে পাইল না।

যে দর্শক কিঙ্করের এই কার্য্য দেখিল, সে এক জন উজীরের অনুচর। তাহার প্রভু কর্ত্তৃক আনীতা গায়িকা বাদশাহের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই জন্য তাহারা কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে অনতিবিলম্বে গিয়া সমস্ত ব্যাপার স্বীয় প্রভুর নিকট বর্ণনা করিল।

যথাসময়ে এই ব্যাপার বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। অধিকন্তু, "বাদশাহী পাঞ্জার উপর কলম চালে, এমন বেয়াদবও আছে," এই বাক্যে বাদশাহ কিছু অপমান জ্ঞান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দস্তুর মত সওদাগর, মতিজান ও কিঙ্করকে তলব হইল। কি জন্য তলব, কেহ কিছুই জানে না। অনেকে মনে করিলেন যে, বাদশাহ আবার বোধ হয় মতিজানের সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন, সেই জন্য এই এত্তেলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে সওদাগরের ডাক হইবে কেন? বিশেষতঃ কিঙ্করের সহিত বাদশাহের কখনও চাক্ষুষ সন্দর্শন পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এমন কি, কিঙ্করের অস্তিত্বও বাদশাহ অবগত নহেন; তবে কেন অকস্মাৎ অসময়ে এই রাজ-আহ্বান?

কুশাগ্রধী কিঙ্কর যেন কতকটা বুঝিতে পারিলেন। বাদশাহী দানপত্রে নিজের দুই একটি শব্দযোজনা ভিন্ন বাদশাহের সহিত তাঁহার কোনও সূত্রে কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। সুতরাং সেই সূত্র লইয়া যাওয়া উচিত, এই বিবেচনায় মতিজানকে দানপত্র লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

দানপত্র লইয়া যথাসময়ে তিন জনে সম্রাটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইবা-মাত্র বাদশাহ একেবারে বলিলেন, "সেই দানপত্র কোথায়? আনিয়াছ?"

বাইজি অতি বিনীতভাবে দানপত্র প্রদান করিলে, সম্রাট বলিলেন,

"কাহার এত সাহস, কে এত বেয়াদব যে, আমার পাঞ্জার উপর কলম চালিয়াছে?"

সওদাগর কিছুই জানেন না, সুতরাং নীরব; বাইজিও স্তম্ভিত! কিঙ্কর রাজপদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,

"সাহেন-সা শাহাজাদা! এই ভৃত্য বেয়াদবি করিয়াছে, আমার প্রভু বা গায়িকা কিছুই জানেন না; তাঁহারা নিরপরাধ।"

বাদশাহ আরক্তলোচনে ডাকিলেন,—"জল্লাদ!"

সভাস্থ সকলের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল। সওদাগর ও বাইজি ভয়ে মৃতপ্রায় হইলেন। কিঙ্কর সাহসে ভর করিয়া কহিলেন,

জাঁহাপনা! প্রাণ দিব, তাহাতে ভয় পাই না। কিন্তু আমার দোষের বিচার হউক; অগ্রে দানপত্রে রাজদৃষ্টি পতিত হউক, পরে যদি বিচারে প্রাণদণ্ড হয়, সহাস্যে রাজ-ইচ্ছা সম্পাদন করিব।"

যুবকের সাহসে বাদশাহ বিস্মিত হইলেন, এবং দানপত্র উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, বাদশাহী পাঞ্জার উপর লেখা আছে,—

"বেগর্ তক্ত্ জাফ্রাণ।" *

সম্রাট দৃষ্টিমাত্রই উহার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রধান উজীরের সহিত কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন সভাসদগণ বাদশাহের মুখমণ্ডলে সন্তোষের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; বাদশাহ ক্ষণে ক্ষণে কিঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রধান উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার বাড়ী কোথায়?"

"জাঁহাপনার প্রসাদে, আমি জাঁহাপনার রাজ্য সুদূর বঙ্গদেশে ভাগীরথীর নিকটে বাস করি।"

"শোন বাঙ্গালী! তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও দূরদর্শিতা দেখিয়া বাদশাহ পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনি তোমার বেয়াদবী মাফ্ করিলেন, অধিকন্তু তোমায় পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন। তুমি কি পুরস্কার ইচ্ছা কর?"

কিঙ্কর আনন্দে হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন, পরে কথঞ্চিৎ সংবিত প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন,

"আল্লার প্রিয়তম সেবক বাদশাহের অনুগ্রহে আমি স্বধর্ম্মে ও স্বদেশে থাকিয়া বাদশাহের সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুরস্কার মনে করি।"

উজীর বাদশাহের সহিত ক্ষণকাল পরামর্শ করিয়া বলিলেন, "তুমি বাদশাহের অনুগ্রহে তোমার স্বদেশের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে; ঈশ্বর তোমাকে কর্ত্তব্যপালনের উপযুক্ত করুন।"

* অর্থাৎ, রাজসিংহাসন বা রাজবাটী, এবং জাফরাণ ক্ষেত্র ভিন্ন হাজার বিঘা। তক্ত—সিংহাসন ও জাফরাণ—জাফরাণ-ক্ষেত্র। সমস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে, যে স্থলে রাজবাটী ছিল, তাহা ও কাশ্মীরের জাফরাণ-ক্ষেত্র, এই দুই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য। যদি মতি বাই এই দুয়ের কোনও স্থান, অথবা উভয়েরই কিছু কিছু প্রার্থনা করে তাহা হইলে সম্রাটের বিশেষ ক্ষতি হইবে বোধ করিয়া, কিঙ্কর এই পদটি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

সভাস্থ সকলে রাজাদিগের এই অকস্মাৎ শুভ পরিবর্ত্তন দেখিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিঙ্কর নীরবে বাদশাহের পদতলে পতিত হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

* * * * *

সুদূর বঙ্গদেশে হুগলীর দক্ষিণে সেই ক্ষুদ্র চন্দননগরের তৃণকুটীরের দাওয়ায় বসিয়া, এক জন প্রাচীনা চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। রমণী বয়সে প্রাচীনা না হইলেও, তাঁহার শীর্ণ দেহে বার্দ্ধক্যের প্রায় সকল লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছিল। নীরবে অনেকক্ষণ সূতা কাটিয়া রমণী জীর্ণ অঞ্চলে নয়ন মুছিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,

"বাছাকে আজ প্রায় তিন বৎসর দেখি নাই, তবুও বেঁচে আছি? মাগো!—"

এমন সময় কুটীরের পার্শ্বে পদধ্বনি হইল। রমণী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বোধ হয় গোরু আসিতেছে; পরক্ষণেই দেখিতে পাইলেন, বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এক জন যুবা ও তাঁহার পশ্চাতে কয়েক জন অনুচর। রমণীর নয়ন, বোধ হয়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কিছু হীনজ্যোতি হইয়াছিল, তাই লোক দেখিয়াই বলিলেন,

"কে গা?—"

নিমেষমধ্যে যুবা বৃদ্ধা জননীর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন,

"মা মা! আমি তোমার কিঙ্কর।"

তার পর, সেই একাদশীর ভীষণ বিদায়-রজনী, আর এই মধুর সম্মিলনের প্রভাত!

* * * *

কিঙ্কর সেন যেখানে স্বীয় আবাস নির্ম্মাণ করাইয়া চতুর্দ্দিক পরিখাবদ্ধ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানকে লোকে আজিও "কিঙ্কর সেনের গড়" বলে। গড়ের চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

সাহিত্য-পঞ্জী।

কোন গ্রহ হৈল রাজা, কেবা মন্ত্রিবর,
বঙ্গ-সাহিত্যের পাঁজী, কহ, পূর্ব্বাপর।

বাঙ্গালা সাহিত্যের তরী বা তৃণ, বহু স্রোতে, বহুবিধ বাতাসে, বহু বন্দরে, উজান ও ভাটি ভাসিয়া, এই ১৩০৫ সালে, কোন পোর্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছে? তরী বা তৃণ কোন 'পাণি'তে আসিয়া পড়িয়াছে? তের শত পাঁচের পোর্ট-তত্ত্ব ও পাণি-মাহাত্ম্য কি?—পঞ্জীফল কি? পঞ্জিকাকর্ত্তাদিগের কাছে প্রথম প্রশ্ন এই।

তরী, তৃণ, তৃণতরী, তৃণের তরী, বা তৃণ হইতে পরিণত, বিবর্ত্তিত, বর্দ্ধিত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ তরণী! অথবা ইহার কিছুই নয়;—ইহা কেবল রূপক?

রূপক কি কেবল রসাত্মক? আদপেই 'রিয়ালিটি'র খাঁটি বস্তুত-ব্যঞ্জক নয়? শুধুই কি কেবল বৈজ্ঞানিক, সরস বৈজ্ঞানিক কি হইতে নাই?

তথাচ বলি, তরী অথবা তৃণ, 'শুলুফ' অথবা শৈবাল, বাঙ্গালা সাহিত্য—বাঙ্গালা ভাষা। দীন ভাবে বলিলে এবং ক্ষীণ করিয়া বলিলে তৃণ—শৈবাল। শ্রদ্ধা করিয়া, সম্ভ্রম রাখিয়া, বা সোহাগ ঢালিয়া বলিলে, তরী—তরণী। অর্থ উভয় দিকেই আসলকেই দেখায়। রূপক 'রিয়ালে'র বিপর্য্যয় নয়। রূপক রিয়ালেরই মেদ-মাংস-অস্থি-শিরা-শোণিত-গন্ধ-রস-যুক্ত রূপ। কেবল রূপ নয়; রূপক আসলের অত্যন্ত-অভিব্যক্ত আত্মা।

শুষ্ক, সিক্ত, সবুজ, যেমনই হউক, তৃণ তৃণই বটে। বাঙ্গালা সাহিত্যকে যদি তৃণ বা শৈবাল বল, তবে, তাহা না হয় সিক্ত এবং সবুজ এবং সুন্দরই বল।

কিন্তু, তরণী নানানতর। জাহাজও তরণী, ডিঙ্গিও তাই। পিনেস্, পান্সী, বোট, বজরা, বালাম, গহ্ন, সোড়ঙ্গা, সামপান, শুলুফ, স্কুনার, কত রকমেরই তরণী! বৃহৎ, অতি বৃহৎ, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রও আছে। মাঝারি আকারেরও বিস্তর। তামার, লোহার, কাঠের, বাঁশের এবং বেতের নৌকাও দেখি। সোণার তরীতে কখনও চড়ি নাই; স্বচক্ষে, সে তরী দেখি নাই। কিন্তু, তাহা, স্বপ্নভূমে ও সোহাগের চুমে নিশ্চয়ই আছে। সুন্দর, কুৎসিত, দ্রুত, অতিদ্রুত, মন্থর, অতিমন্থর তরণী। মালবোঝাই কিস্তি, ভারশূন্য ভরা ও

ভাবের জন্য, বস্তুর অভাবে, ব্যালাষ্ট-পূর্ণ তরীও জলপ্রবাহে ও কাল-প্রবাহে চলে। প্রয়োজনীয়-পণ্য-পূর্ণ তরীর ন্যায়, প্যাসেঞ্জারী নৌকাও কত! হেটো নৌকা, ঘেটো নৌকা, গহনার নৌকা বিদ্যমান। "বাবু বৈদ্যবাটী, নৈহাটী" নৌকা তোমরা দেখিয়াছ। শশা, তরমুজ, কচু, কাঁচকলা, তরী তরকারীর তরণীও তরঙ্গবক্ষে বহিয়া আসে। যে নৌকা হইতে জেলেরা জলে যায়, তাহাও বিস্তর ও বহুতর। বৈদ্যুতিক পোত হইয়াছে কি না, জানা নাই। কিন্তু বাষ্পীয় তরী বহু আকারে বিদ্যমান। এখন শ্রীমতীকে কোন শ্রেণী-ভুক্ত করিবে?

আমাদের বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যকে 'শুলুফ' বলা মন্দ নয়। শুলুফ বিলাতি জাহাজ অপেক্ষা ছোট এবং দেশী বড় কিস্তি অপেক্ষা বড়। শুলুফ সুন্দর, সুদৃশ্য ও সম্ভ্রান্ত। শুলুফ শান্ত, অথচ শৌর্য্যবন্ত। শুলুফ, হালে ও পালে চলে; কাপ্তেন, কর্ণধার, কুলি, খালাসী বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন লোকে তাহার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। শুলুফ বেদম বোঝাই খায়, বড় বড় সমুদ্র বহিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে ধায়, ব্রহ্মে, চীনে, জাপানে যায়; বিলাতে মার্কিণেও মনে করিলে, যাইতে পারে। শুলুফ সময়ে সময়ে, বিলাতি জাহাজের সঙ্গেও টক্কর দেয়; দেশী ও বিলাতি মাল গর্ভে পুরিয়া বড় বড় বাহির দরিয়া পাড়ী দিয়া আসে। শুলুফের চাল্ চটুল চঞ্চলও নয়, অতি মন্থরে মৃতও নয়; গম্ভীরে দ্রুত। পরন্তু, শুলুফ খাঁটী হিন্দুও নয়, শাক যাবনিকও নয়; দুয়েতেই মিশ্রিত। আর, উহা আদৌ বিদেশী বাহন নয়, বিশুদ্ধ দেশী বস্তু। শুলুফ খাস বাঙ্গলার খাঁটী বাঙ্গালী বাহন ও বাঙ্গালীর বাঙ্গলা হাতের গঠন। শুলুফ চাটগাঁয়ের গৌরব।

কিন্তু চাটগাঁয়ের নাম শুনিয়াই যে তুমি চমকিয়াছ, আর চোখ টিপিতেছ? চারা নাই! কিন্তু, চমকান কেন; মাথা চুলকানই বা কেন; চোখ টেপা-টিপিই বা কিসের জন্য? চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই হয়; চক্ষু মুদিয়া চিন্তা করিলেও চলে। চাটগাঁ, বাঙ্গালা সাহিত্যে, বাঙ্গালার কোনও গাঁয়েরই কম নয়। চাটগাঁ, একই নিশ্বাসে, পুরাতনে ও নূতনে, প্রায় কাহনখানেক কবির নাম করিতে পারে,—যাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী, এবং যাঁহাদের মধ্যে দেশ-বিদেশবিখ্যাত অনেকগুলি। চাটগাঁয়ের নৈসর্গিক গঠন, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, মানুষকে স্বভাবতঃ কবি করিয়া দেয়। তাই বুঝি বা "বাইশ কবি"র একত্র কোলাকুলি। কর্ণফুলীর জলের ভিতর হইতে কবিতা-কুমুদিনী কটাক্ষ করে,

ইহাঁর আঠারো রকমের আকার। ভবানীপুর, খিদিরপুর অঞ্চলে এক-রকমের আকার; শোভাবাজার বাগবাজার অঞ্চলে আর এক রকমের। এক [illegible] রোডেই, হয় ত চৌদ্দ রকমের। যোড়াসাঁকোর মোড়ের মাথায় এক [illegible] গলির ভিতর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ। পাথুরেঘাটায় আবার [illegible] আকার; বিডন ষ্ট্রীটে ও বটতলায় বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ। তার পর, কলুটোলা, কপালীটোলা অঞ্চলে অন্য কত রকম ঢঙ্। কর্ণওয়ালিসে কলেজ-ষ্ট্রীটে আবার (বটতলারই মত) রকম বিরকমের ঢপ ও ঢঙ্ খাইয়া চালোয়া মিশিয়াছে।

শ্রীমতী কোথাও সৌধপুরে প্রকাণ্ড পান্সী—পান্সীর পরে মাছরাঙ্গা রঙ্গের মিহি পাল। কোথাও মহাজনী নৌকা—রসিক নেয়ে—মাঝবনীর হাল। কোথাও চটুল চঞ্চল, একহারা অতিদ্রুত লাল ডিঙ্গি। কোথাও অতিমন্থরগতি বা একান্তগতিহীন গদুর গদু। 'শফরী-ফরফরায়তে'র সামনেই যেন আজন্ম-জঠুর পাষাণশৈল। ঠাকুরাণী কোথাও পুরাণ কাঠামে নবীন ঠাট। কোথাও জাপান-বার্নিসে শিমুল কাঠ। কোথাও বিল্বপত্রী পতাকায় [illegible]কের বোট। কোথায়ও বিবিয়ানি বাজরো—টুকটুকে ঠোঁট। কোথাও কুলের তরী—ফিরিঙ্গি দাঁড়ী। কোথাও তিল তুলসী, কোসাকুসী ও কুশাসনে আধ-ঢাকা পিয়াজ রশুনের নৌকা—নেয়ে শুঁড়ী। শ্রীমতী কোথাও সাতাইশ শতপদী সরিষার ভরা, যেন অহিফেনের নেশায় নঙ্গর ফেলিয়া নিয়তই চক্ষু মুদিয়া আছেন। আবার, কোথাও, তাড়াবোঝাই ছেটো নৌকায় বত্রিশ দাঁড় বাহিয়া, সারিগানের বাহার উড়াইতে উড়াইতে উধাও ছুটিয়াছেন। কোথাও ইহাঁর ভগ্ন কিস্তিতে ধর্ম্ম খেয়া। কোথাও বাণিজ্যের বাতাস বুঝিয়া মাল ও প্যাসেঞ্জার নেয়া। সাহিত্য-তরী কোথাও খাস অঞ্চলের 'খাজনা খেটে'। কোথাও বা বাঙ্গাল মাঝীর 'নাও'; কোথাও বাবুভেয়ের ময়ূরপংখী ভাউলে। কোথায়ও মেছুনীবেষ্টিত মাছের ডিঙ্গি। কোথাও শুঁটকী-মাছ-বোঝাই পানসিবোট। সমস্ত স্বরূপগুলি লইয়া আমরা শ্রীমতী সাহিত্য-তরীকে 'শুলুক' [illegible]িতে সাহসী হইয়াছি।

[illegible] বিন্দু রূপক। রূপক না রাখিতে চাও, খসড়াইয়া ফেল; নিঙড়াইয়া [illegible] তাহাতেও নারাজ নহি।

[illegible]ই [illegible] আবার পৌনঃপুনিক প্রশ্ন। বাঙ্গালা সাহিত্যের [illegible]রূপ, কোন্ তীর হইতে প্রথম নামিয়াছিল? সেটি কি

আর্য্য-স্বর্গের মন্দাকিনীতীর,—হিন্দুতীর্থ, সভ্য-সলিলের শুভ্র সৈকত, অথবা অনার্য্য আরণ্য পর্ব্বতের অসভ্য অজ্ঞাত কলাপাণির কুৎসিত বেলাভূমি। সেখানে কি আর্য্য পিতামহগণের পবিত্র যজ্ঞোপবীতপ্রসূ কৃষ্ণসার মৃগাদি ক্রীড়া করিত, অথবা বর্ব্বরের বন্য শূকরের পাল অষ্টপ্রহর পালে পালে চরিত? বাঙ্গালা ভাষা, সংস্কৃতের স্বর্গ হইতে, প্রাকৃতের পূত পুণ্য পীযূষ প্রবাহে, [illegible] ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, অথবা বন্য বানরের কচকচি কিচিমিচি হইতে ক্রমে কলেবর পাইয়া, সংস্কৃতের সংবাদে, সাধে এবং সোহাগে, সভ্যা ভব্যা সম্পদশালিনী হইয়াছে? ঠাকুরাণীর রূপে, লাবণ্যে, রসে, রুচিতে ত নানান জাতির, নয় শত নিরনব্বই বর্ণের, বর্ণসঙ্করের, অপসদের, অপ্সর, কিন্নর, কিরাত নিষাদের, অনেকানেক যবন, ম্লেচ্ছ ও কত মন্ত্রের সঙ্করাসঙ্কর বর্ণের শাসনচিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম কোন জীবের জিহ্বামূলে ইনি জন্মিয়াছিলেন, বা জাগিয়া উঠিয়াছিলেন? শ্রীমতী অদিতির বা দিতির দুহিতা? পুলহপুলী, অথবা প্রজাপতির পৌত্রী, কিংবা দক্ষের কন্যা? কোন-বংশ-সম্ভূতা আজকার বাবু সাহিত্যের বিবি বঙ্গভাষা?

আর্য্য ঠাকুরেরা উত্তরকুরু হইতে বঙ্গভাষা মুখে করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন, অথবা বঙ্গে আসিয়া বঙ্গভাষাকে পাইয়াছিলেন? বন্য বাঙ্গালিনী বিদেশীর শাসনে, প্রলোভনে ও প্রণয়বন্ধনে পড়িয়া, বশীভূতা, আত্মবিস্মৃতা, পুনর্গঠিতা ও স্বগোত্রবর্জ্জিতা হইয়াছিল,—বিদেশীর বিক্রমে বন্দিনী, বৈভবে বিমুগ্ধা ও বিলাসে বিচলিতা হইয়া, বাঙ্গালিনী, বিদেশীর [illegible] হইয়াছিল, দাসী হইয়া, মার্জ্জিতা, সজ্জিতা, নিজস্ববর্জ্জিতা, অনুগতা [illegible] হইয়াছিল, অথবা বাঙ্গালিনী বিদেশীর বিদেশ হইতে আনীতা, বেদমন্ত্রে বিবাহিতা দৈব পত্নী? দাও পঞ্জিকাকার! প্রথমে এই সোয়ালের জবাব।

বাঙ্গালা ভাষার বীজ বাঙ্গালায় জন্মিয়াছিল, বাঙ্গালাতেই ছিল, অথবা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল? বাঙ্গালা বলিতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী নয়, তাহা বুঝিলাম; স্বীকারই করিলাম। বিহার ও উড়িষ্যা বাদ দিয়া কেবল 'লোয়ার প্রভিন্সেস্' রাখিলাম; তাহা হইতেও আবার বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ 'ডিভিসন' বাহির করিয়া দিলাম। সাঁওতাল পরগণাও দিলাম। তবুও কি আদি বাঙ্গালা, 'প্রাইমেরি' বাঙ্গালা পাইব না! পাইবই বা কিরূপে? পশ্চিম বাঙ্গালা ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন,—পূর্ব্ববাঙ্গালা ছিল [illegible] ঙ্গ কই? বাঙ্গালী কে তখন ছিল? রাজসাহী, দিনাজপুর [illegible]

নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, জঙ্গল-মহল, রামগড়, পাচেটী, পালামো প্রভৃতি ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রকৃত বাঙ্গালা, প্রথম বাঙ্গলা, খাঁটী বাঙ্গালা নয়। পশ্চাৎ বাঙ্গলা হইয়াছে। প্রাগ্জ্যোতিষও বাঙ্গলা নয়; তাহা এখনকার আসাম। পশ্চিমেও নয়, পূর্ব্বেও নয়, উত্তরেও নয়, দক্ষিণেও নয়, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত, বায়ুতেও নয়, অধোতেও নয়, উর্দ্ধতেও নয়, বঙ্গসুন্দরী তবে ছিলেন কোথায়? সে বঙ্গ ছিল তবে এ বঙ্গের কোন অঙ্গে?

সুন্দরী কি তবে ছিলেনই না? অথবা ছিলেন কেবলমাত্র নামে? অথবা ছিলেন কেবল চাটগাঁয়ে, চাঁদপুরে, কুমিল্লায়, ত্রিপুরায়, আর ঢাকায়? কেন না, শুনি পূর্ব্ব-বঙ্গেই নাকি ছিল খাঁটী বঙ্গ, বিশুদ্ধ বঙ্গ। সেটা অবশ্য প্রাগ্‌জ্যোতিষের পশ্চিমে বটে। কিন্তু, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি তবে বঙ্গ হইল কেন? আর হইলই বা কবে? কেবল বাঙ্গালরাই যদি খাঁটি বাঙ্গালী, তবে বাঙ্গালেরা বাঙ্গালা কেন? চাটগাঁ বা চাটগেঁয়েরা ত বাঙ্গাল, বদ্ধ বাঙ্গাল। কিন্তু, নদে শান্তিপুরে পশ্চিমে সোহুরেদেরই মত চাটগেঁয়েরাও বাঙ্গালকে বাঙ্গাল বলিয়া বিদ্রূপ করে; বরং বেশী রকম করে। চাটগাঁয়ে যে সব বাঙ্গালীর চৌদ্দ পুরুষেরও বেশী বাস, যাঁরা নিজে তথাকথিত বাঙ্গালের বাঙ্গাল, তাঁরাও ত বাঙ্গালকে উঠিতে বসিতে বেত্রাঘাত করেন। একি রহস্য! চাটগাঁয়ের বহুকালের প্রবাদবাক্য,—

> "কি বলবো বাঙ্গালেরে, বুঝতে নারে ঠারে ঠুরে,
> দু চার লাথি পেলে ঘাড়ে, তবে বাঙ্গালে বুঝতে পারে।" *

এ কি বিভ্রাট! চাটগেঁয়েরা এই রূপে বাঙ্গালের বুকে মুখে লাথি মারেন। বলা বাহুল্য, পশ্চিমে বাঙ্গালী, বাঙ্গালের প্রতি এতটা বীভৎস ব্যবহার করেন না। কিন্তু, কথা এই যে, চট্টলীরাই যখন বাঙ্গালকে এমনই করিয়া লাঞ্ছনা করেন, তখন বাঙ্গাল কে, আর বাঙ্গালের উপর এই অত্যাচারই বা কেন? ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, যে সব চট্টলীদের সময় হইতে উল্লিখিত প্রবাদবাক্য চলিত হইয়াছে, তাঁহারা খাঁটি চট্টলী নহেন, পশ্চিম-বঙ্গ—পৌণ্ড্র, গঙ্গা-রাঢ়, গৌড়াদি প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া চট্টলে বসবাস করিয়াছিলেন, এবং আদিম চট্টলীদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া লাথি মারিতেছিলেন। ভাল, তাহাই যেন হইল, এবং ইহাও যেন বুঝাইল যে, পৌণ্ড্র গৌড়াদির লোক চট্টলে উপ-

* চট্টগ্রামের কথামুক্তক। চট্টগ্রাম জিলার [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মি [illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ১৮৮৭।

ত্রিবেণী অধিবাসী হইয়া বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী হইলেন। অতি উত্তম কথা। কিন্তু গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি গোটা দেশগুলা বাঙ্গালা হয় কেন, এবং সেই দেশগুলার সমস্ত লোকগুলা বাঙ্গালী হয় কেন?—যদি বাঙ্গালই বাঙ্গালী, আর পূর্ব্ব-বঙ্গই বাঙ্গালা? বঙ্গ ও বাঙ্গাল যদি এতই ঘৃণিত ও নিন্দিত, তবে গঙ্গা-তীরের ও পশ্চিমের পাঁচ সাত গণ্ডা পৃথক পৃথক প্রদেশ সটান বঙ্গ ও বাঙ্গালী হইয়া পড়ে কেন? যখন,—

"বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু।"

তখন এ দুর্গতি কেন, এবং দুর্গতির পরেও এত দৌরাত্ম্য কেন? বাঙ্গাল যদি মনুষ্যই নয়, তবে এক টানে এত কোটী মনুষ্য—সভ্য সুমার্জ্জিত মনুষ্য, অমনুষ্য বা অবুঝ বাঙ্গাল, অর্থাৎ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিয়া, তখনই আবার বাঙ্গালকে দু' পা দিয়া থেঁতলায় কেন? এ কি বিসদৃশ ব্যাপার!

বলিবে, বিশুদ্ধ সংস্কৃত-ওয়ালারা ও পুণ্যশ্লোক প্রাকৃতভাষীরা বাঙ্গালাতে আসিয়াই বাঙ্গালী হইয়াছে, আপনাদের ভাষার ঐশ্বর্য্য দিয়া বাঙ্গলা ভাষা বানাইয়াছে, অথবা অসভ্য বাঙ্গালকে আপনাদের সভ্য ভাষা দিয়াছে; বাঙ্গালকে বিজিত বশীভূত করিয়াছে, জ্ঞানবান বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মশীল করিবার জন্য, সে কাল হইতে এ কাল পর্য্যন্ত কত পাঠ পড়াইয়াছে, তথাপি বাঙ্গাল সবিশেষ শোধরাইতে পারে নাই। অতএব উক্ত সংস্কৃতের সুসভ্য ও প্রাকৃতের পরিমার্জ্জিত পয়গম্বরগণ—পয়গম্বরগণের বংশধরগণ, বঙ্গে বাস-জনিত বাঙ্গালী হইয়া গেলেও, বাঙ্গালার পূর্ব্বাধিবাসী বর্ব্বরদিগকে ও সেই বর্ব্বরদের বংশধরদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও ঘৃণা লাঞ্ছনা করিবেন বই কি? করিবারই ত কথা।

তোমার এ উক্তিতে যুক্তির একটা মহা আড়ম্বর ও আওয়াজ থাকিলেও, অজ্ঞাত আসল কাণ্ডখানা বুঝাইতে কিন্তু আটকে যায়। কৈফিয়তটাতে কোনও দিকে কুলায় না। ফলতঃ, তুমি ঐ উক্তি করিতেই পার না। কেন না, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, তাম্রলিপ্তি, গঙ্গারাঢ় গৌড়াদি যখন পৃথক পৃথক প্রদেশই হইল, তখন তথাকার অধিবাসীরা পৌণ্ড্রী, গঙ্গারাঢ়ী ও গৌড়ী না হইয়া বাঙ্গালী 'কহলায়' কেন, বাঙ্গাল ও তখনকার বাঙ্গালী যদি এতই হেয়,—এতই অশ্রদ্ধেয় হয়?

বঙ্গ কোথায় ছিল? বাঙ্গাল কাহারা? আসল বাঙ্গাল, আদিম বাঙ্গাল কই? তাহাদের কেহ কি এখন একটিও নাই? তাহারা কি ক্রমে ধ্বংস

নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে! অথবা [illegible]ভ্য উপনিবেশীদের অঙ্গে বেমালুম মিশি[illegible] গিয়াছে?

পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের বাঙ্গালীর বিবেচনায় এখন যাঁহারা বাঙ্গাল, তাঁহারাও দেখিতেছি, বাঙ্গাল-বিদ্বেষ্টা। ইহার তাৎপর্য্য কি? বাঙ্গাল কে?

পূর্ব্ব-বঙ্গের অতিপ্রান্ত সীমায় বসিয়া ইহা লেখা যাইতেছে। এখানে "বাঙ্গাল" কথাটার খুবই চলন। মুটে মজুর, চাষা ও মূর্খরাই বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণিত। তথাচ তাহাদিগকেই বা বিশুদ্ধ বাঙ্গাল বলি কেমন করিয়া? কারণ, এখানকার অধিবাসী, মুসলমান ও মগ। হিন্দু, শূদ্র, বৈশ্য, ব্রাহ্মণগণ উপনিবেশী। এখন বল, ইহাদের মধ্যে বাঙ্গাল্ কে? মগ মগই। ব্রহ্মের অধিবাসী; এখানে উপনিবেশী। অতএব নিশ্চয়ই বাঙ্গাল নয়—বাঙ্গালীও নয়। ইহাদের কথাও বাঙ্গালা নয়, কিছুই বাঙ্গালা নয়। তার পর, ম[illegible] যেমন, মুসলমানকেও প্রায় তেমনই কখনও বাঙ্গাল বা বাঙ্গালী বলিতে পার না। মগ ও মুসলমান জাতীয় উপাধিই অতি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহারা, অর্থাৎ তাহাদের অতিদূর পূর্ব্বপুরুষেরা, বঙ্গদেশবাসী নয়; সুতরাং তাহারা (এক্ষণে কৃত্রিম বাঙ্গাল হইলেও) অকৃত্রিম বাঙ্গালই নয়। মগেরা বাঙ্গালা বলে না। মুসলমানেরা বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা বা বাঙ্গালে কথা কহে বটে,—কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালী বা বাঙ্গাল একের বা দুয়ের কিছুই নয়—হইতেই পারে না। ইহারা উভয়ই উপনিবেশীদের বংশধর। হিন্দুরাও তাই, অগ্রেই বলিয়াছি। এখন বল, যে বাঙ্গালের উপর বাঙ্গালের বিদ্রূপ এবং বিদ্বেষ, সে বাঙ্গাল কই—সে বাঙ্গাল কাহারা—সে বাঙ্গাল কোথায়?

এ অঞ্চলে "কৃষ্ণনগরী" বলিয়া এক আধ-ইতর শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের জল চলে না, হুঁকা চলে। বামুনেও তাহাদের হুঁকায় মুখ দিয়া গুড়ুক ফুঁকে। কৃষ্ণনগরীরাও আসল বাঙ্গাল নয়, তাহারা বিশিষ্টরূপেই উপনিবেশী। তাহাদের সুদূর পূর্ব্বপিতামহেরা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়াছিল বলিয়াই তাহারা কৃষ্ণনগরী। "ধরণী-ঈশ্বর" কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণনগরীরা উঠিয়া আসিয়া অগ্রে যাইয়া উপনিবাস পাতিয়াছিল আরাকানে। কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগরীরা কোন জাতি ছিল, জানি না। শুনি জল-চল হিন্দু ছিল। কিন্তু, আরাকানে আসিয়া "রসলস্ব" পাইয়াছিল; বোধ হয়, কিছু ব্রহ্মাকৃত হইয়াছিল; শুনি শূকর খাইয়াছিল। ক্রমে

[illegible]হাদের [illegible] হয়। ক্রমে সে বাঁশের [illegible] [illegible]রে চলিয়া আসে। [illegible] ধাপে [illegible] অন্যান্য স্থানে আড্ডা [illegible], [illegible]নেও না [illegible] [illegible]হারা সেকালে শূকর আহার করিত। কিন্তু, এখন আর করে না। এখন [illegible]হারা বেশ [illegible], [illegible] হিঁদু। এদের বামুন আছে,—বৈদিক মন্ত্রে [illegible]র পূজা পাঠ হয়; বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সংস্কার হয়। পোরইকোয়ার বিশিষ্ট বৈদ্য-বংশ রায়-কানুনগো বাবুদের বদান্যতায় এদের হুঁকা চলিয়াছে। চাটগাঁয়ের হুঁকায় [illegible]ছুয়ানি বাধে না। এই অত্যাপাদের শ্রান্তিহর শান্তিহর আরাম-আয়েস-আবল্য-দায়ক, দেবপ্রলোভনীয় দ্রব্যটি তথায় সার্ব্বজনিক, সার্ব্বজাতিক। ইহা অবশ্যই উদারতার পরাকাষ্ঠা। এই পেয় পদার্থে প্রভেদ নাই। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র, নবশাখ, সকলেরই একই "ডাবা"। তাহার স্বর্গ-সুখ-[illegible] ছিদ্রে ন্যায়ালঙ্কার ও নরসুন্দর একত্র চঞ্চু স্পৃষ্ট করিয়া সুধা পান করে। জল-চল হিন্দু সজল হুকা ভরিয়া মুসলমানের হস্তে দেয়। মুসলমানের মুখ-স্পৃষ্ট হুকা স্পর্শ করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ প্রস্তুত করিয়া দেয়। এ বিষয়ে পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান! চাটগাঁয়ে হুঁকা—চল, আর সচল দধি। মুসলমানের পাতা ও মথা দধিতে ব্রাহ্মণভোজনও হয়। এই দুইটি দ্রব্য ব্যতীত চাটগেঁয়েরা গোঁড়া হিন্দু, গোঁড়ারও গোঁড়া। কিন্তু, আমরা, অজ্ঞাতে, বিষয়ের বহির্দ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত কৃষ্ণনগরীরাও বাঙ্গাল নয়। পুরাতন ভূগোল-পরিচয়ানুসারে তাহারাও পশ্চিমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী বটে; কেন না, নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে তাহারা উঠিয়া আসিয়াছিল।

তবে বাঙ্গাল্ কে? বাঙ্গালা কোথায়? পূর্ব্ব বঙ্গই যদি পুরাতন বাঙ্গালা হয়, তাহার পূর্ব্বাধিবাসী বিশুদ্ধ বাঙ্গাল্ ত একজনও খুঁজিয়া পাই না।

বাঁকা বাঁকা বাঙ্গালা কথা কহিলেই বাঙ্গাল হয় না। পশ্চিমে বাঙ্গালীদের সেটা বুঝিবার ভুল। এ ভুল—এই বিষম ভুল, বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে,—ইহা আশ্চর্য্য বটে!

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

[illegible] লো [illegible]

ভারতী। [illegible] আষাঢ়। [illegible] আখ্যায়িকা [illegible] অকিঞ্চিৎ-কর। বিষয়বিন্যাসে [illegible] পরিচয় নাই। লেখকের লিপিকুশলতার অভাবে বর্ণিত [illegible] নিতান্ত [illegible] ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। গঠনকৌশল এমন দুর্ব্বল যে, [illegible] রচনাপরম্পরা [illegible] করিলেই পাঠকের সম্মুখ হইতে গল্পের [illegible] যবনিকা সহসা অপসারিত হইয়া যায়, এবং তাহার ফলে অকালে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহের অবসান হইয়া থাকে। বোধ হয়, লেখক নূতন ব্রতী। তিনি আখ্যানবস্তুর রহস্যরক্ষায় ও গল্পগঠনে বিফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষা ও রচনাভঙ্গী প্রশংসনীয়। অল্প পরিসরের মধ্যে ডিটেক্‌টিভের সন্দিগ্ধ প্রকৃতি দক্ষতাসহকারে চিত্রিত হইয়াছে। মন্মথর চরিত্রও চিত্তাকর্ষক, কিন্তু ঘটনাবিন্যাসের দোষে তাহার আদ্যোপান্তে সঙ্গতি নাই। যে অতিসাবধান আত্মসংযত মন্মথ বুদ্ধিকৌশলে প্রতি পদে চতুর গোয়েন্দার অনুসন্ধান বিফল ও কৌতূহল উদ্দীপিত করিতেছে, সেই মন্মথ ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া আপনার প্রণয়দেবতার সাক্ষাৎলাভের যে উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছিল, তাহা গল্পটির উপসংহারের পক্ষে আবশ্যক [illegible], মন্মথ চরিত্রের সহিত আদৌ তাহার সামঞ্জস্য নাই। এই সকল ত্রুটির অতিক্রম করিতে পারিলে লেখক ভবিষ্যতে সফলতা লাভ করিবেন। "বর্ষামঙ্গল" একটি উৎকৃষ্ট মনোরম কবিতা। কবি সুনিপুণ তুলিকায়, উজ্জ্বলকোমল বর্ণরাগে, প্রাবৃট-লক্ষ্মীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল ঘনশ্যামল শ্রী চিত্রফলকে প্রতিফলিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে কত যুগযুগান্তের বিগত বর্ষার গান কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতে থাকে, সংস্কৃত কাব্যকাহিনীর প্রাবৃট-ঘনচ্ছায়া সুখস্বপ্নের মত হৃদয় আচ্ছন্ন করে। আমরা কবিতাটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকাকলরবে বিহরে;
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘনগৌরবে [illegible] মত্ত বরষা!

'কোথা তোরা [illegible] তরুণী পথিক-ললনা,
জনপদবধূ তড়িৎচকিত-নয়না,
মালতীমালিনী কোথা প্রিয়-পরিচারিকা,
কোথা তোরা অভিসারিকা!
ঘনবনতলে এস ঘননীলবসনা,
ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরশনা,
আনো বীণা মনোহারিকা!
কোথা বিরহিণী, কোথা তোরা অভিসারিকা!

[illegible] মৃদঙ্গ মুরজ, মুরলী মধুরা,
বাজাও শঙ্খ, হুলুরব কর বধূরা
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী,
ওগো প্রিয়সুখভাগিনী।
কুঞ্জকুটীরে, অয়ি ভাবাকুললোচনা,
ভূর্জ্জপাতায় নব গীত কর রচনা
মেঘমল্লার রাগিণী!
এসেছে বরষা, ওগো নব অনুরাগিণী!

স্নিগ্ধসজল মেঘকজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে;
শশিতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী;
কোথা তোরা পুরকামিনী!
আজিকে দুয়ার রুদ্ধ ভবনে ভবনে
জনহীন পথ কাঁদিছে ক্ষুব্ধ পবনে,
চমকে দীপ্ত দামিনী;
শূন্যশয়নে কোথা জাগে পুরকামিনী!

প্রবন্ধ। "রুদ্র মূলারের [illegible]"। "আয়েরগিরি [illegible]" কিন্তু সুপাঠ্য ও মনোজ্ঞ [illegible] কথা।

উৎসাহ। [illegible] আজকাল স্বরচিত কবিতার [illegible] প্রতি [illegible] ছেন। তাঁহার চেষ্টা [illegible] কবিতা সার্থক [illegible] হাসিক প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিশ্বরচনা" ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বিদ্যা[illegible] এই দুইটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

সৎসঙ্গ। আষাঢ়। শ্রীযুক্ত [illegible] গোপাধ্যায়ের রচিত "[illegible]ভূমি" প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ভূ-প্রদক্ষিণ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত [illegible] সেনের "হিন্দুধর্ম্ম" প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। লেখক নিজে যদিও 'গোঁড়ামী' পরিহার করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনিও 'গোঁড়ামী'র সমর্থন করেন না।

স্বাস্থ্য। আষাঢ়। আমরা দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা দেখি নাই। "স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ", "ছেলের অসুখ ও মাতার জ্ঞাতব্য", "দুগ্ধ" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি বিবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্বে পূর্ণ ও উপকারী। "প্লেগরোগ ও টীকার ফলাফল" সময়োপযোগী। আশা করি, "স্বাস্থ্য" ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

হিন্দু-পত্রিকা। আষাঢ়। "আমিষের প্রসার" ও "হিন্দু ও আর্য্য" প্রবন্ধ দুইটি পাঠযোগ্য। সম্পাদক এবার "শ্রীত্বাকাস" নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সূত্রপাত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ভাষা আর একটু সহজ হইলে ক্ষতি কি?

নির্ম্মাল্য। আষাঢ়। "আকবর সাহ" প্রবন্ধটির বিষয়গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষ-জ্ঞাতব্য বিষয়ের অভাববশতঃ নিরাশ হইতে হয়। লেখক 'বাজে বক্তৃতা' পরিত্যাগ করিয়া ঘটনাসংগ্রহে অবহিত হইলে, প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য হইতে পারে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাসের "অন্তিমে" ইতিশীর্ষক কবিতাটি সুরচিত, কিন্তু নিরাশার অন্ধকারে অত্যন্ত সমাবৃত।

কোহিনুর। প্রথম খণ্ড; প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। 'আমাদের নিবেদনে" প্রকাশ,—"হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকার্য্য এবং কলিকাতার অনাথাশ্রমের সাহায্যার্থ 'কোহিনুর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। উদ্দেশ্য মহান্; আশা করি, সম্পাদক সফল হইবেন। হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাম্য বস্তু; যিনি এ বিষয়ে কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধিলাভ করিবেন, তিনি উভয় জাতির আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। "গ্লাডষ্টোন ও তাঁহার ধর্ম্মপিপাসা" ও "মোস্‌লেম সমাজ-সংস্কার" প্রভৃতি প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট না হউক, পাঠযোগ্য। আশা করি, সম্পাদক মহাশয় প্রবন্ধনির্ব্বাচনে অধিকতর অবহিত ও উত্তরোত্তর কৃতকার্য্য হইবেন।

পুণ্য। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। "স্ত্রী-শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" প্রবন্ধে মহারাষ্ট্র দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয়ের লিপিকৌশলে ও গবেষণাগুণে "প্রাকৃত মহারাষ্ট্র" উপাদেয় হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায়ের "কর্ম্মবীর গ্লাডষ্টোন্" প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। গ্লাডষ্টোনের ছবিখানি দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মনোমত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "আমিষ ভোজন" প্রবন্ধটি আলোচনার যোগ্য। লেখক বলেন, "তিন দিক হইতে এই বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। শরীর-রক্ষার কথা, বিজ্ঞানের বিষয়; খরচের কথা, অর্থশাস্ত্রের বিষয়, তার পর ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা।" এই তিন পথে বিচার বিতর্ক করিয়া উপসংহারে

লেখক [illegible]—"মনুষ্য স্বভাবে প্রকৃতির নিয়োগে জীবরক্ষার জন্য চিরকাল পশুমাংস ভোজন করিয়া আসিতেছে। ইহাতে এক হিসাবে অধর্ম্ম নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সকল মনুষ্যের [illegible] নির্ব্বিকার চিত্তে মাংস ভোজন করিতেন; কেন না তাহাই প্রকৃতির ব্যবস্থা, তাহাই মানবের প্রাচীন ধর্ম্ম। দেবতার প্রীতির জন্য পশুবলি হইত; পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই ইতিহাস; একেশ্বরবাদী ইহুদীরাও জেহোবার মন্দিরে বিবিধ প্রাণী হত্যা করিত। এই কারণে বৈদিক যজ্ঞে হিংসার ব্যবস্থা। শস্যপূর্ণ ভারতভূমিতে কৃষিবৃত্তিপরায়ণ আর্য্যসন্তানের আর তেমন জীবহিংসার প্রয়োজন হয় নাই; জীবের প্রতি দয়াবৃত্তির স্বাভাবিক নিয়মে বিকাশ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অন্তঃকরণে নূতন ভাবের উদ্বোধন করিল। আশা করিতে পার, মনুষ্য বিজ্ঞানবলে একদিন এমন বলিষ্ঠ হইবে যেদিন আর নিষ্ঠুর হিংসার প্রয়োজন হইবে না, সেদিন সর্ব্বত্র পৃথিবীতে অহিংসা পরমধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইবে। এখনও মনুষ্যের সে অবস্থা হয় নাই। মনুষ্যকে জ্ঞানাভাবে ও শক্তির অভাবে অদ্যাপি প্রাচীন হিংস্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইয়াছে। অতীতের প্রতি ভক্তিপরায়ণ মনুসংহিতাকার মনুষ্যের প্রাচীন ধর্ম্মের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। নূতন ধর্ম্মকে আগ্রহের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রকৃতিকর্ত্তৃক বঞ্চিত দুর্ব্বল ক্ষুধার্ত্ত মানবকে এই পরমধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া নিষ্ফল। অগত্যা মনুসংহিতাকারের সহিতই বলিতে হয়,—

'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।"

"যোগিবর পওহারী বাবা" শ্রীমতী উমাশশী দেবীর রচিত। লেখিকা এই প্রবন্ধে গাজীপুরের সুপ্রসিদ্ধ পওহারী বাবার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও জীবনবৃত্ত সকলিত করিয়াছেন।

ব্রহ্মতত্ত্ব। তৃতীয় ভাগ; প্রথম সংখ্যা। আষাঢ়। "হেগেলের ভেদাভেদবাদ", "মুক্তি ও অনন্ত উন্নতি" দার্শনিকগণের উপযোগী। এই সংখ্যায় শঙ্করাচার্য্যকৃত ভগবদ্গীতা-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদের সূচনা করিয়া সম্পাদক মহাশয় ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে এই অনুবাদ জ্ঞানার্থীর উপকারে আসিবে। এই সংখ্যায় The Presuppositions of Psychology" নামক একটি ইংরাজী প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলা কাগজে ইংরাজী প্রবন্ধ কেন?

প্রদীপ। আষাঢ়। "বন্ধু-বৎসল বঙ্কিমচন্দ্র" শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর রচনা। বঙ্কিম যেমন লোকপ্রসিদ্ধ, তাঁহার কাহিনী তেমন সর্ব্বজনবিদিত নয়। বঙ্কিমের জীবনের কথা আমরা এত অল্প জানি যে, বঙ্কিম-প্রসঙ্গের কণামাত্রও আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বক্তা, তাঁহার মুখে বঙ্কিম-কাহিনী শুনিয়া সাধারণে নিঃসন্দেহ তৃপ্ত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম বাবুর ও চন্দ্রনাথ বাবুর চিত্র আছে। চিত্র দু'খানি ভাল হয় নাই। "সমর" শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ের রচিত ঐতিহাসিক সন্দর্ভ; এই সংখ্যায় সূত্রপাত হইয়াছে। "চৈতালী সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য" শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষের লিখিত। আলোচ্য প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের কৃত "চৈতালিসমালোচনা"র প্রতিবাদ। তৃতীয় প্যারায় লেখক বলিতেছেন, "সোণার তরী পাঠে আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।" এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। রমণী বাবু অনায়াসে 'নিজের ছাগল ল্যাজের দিকে কাটিতে' পারেন, তাহাতে কাহার কি আপত্তি? কিন্তু লেখক নিজে যে অধিকার সম্ভোগ করেন, অন্যকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে নিজেরের অন্তও সঙ্কুচিত নহেন। 'সোণার তরী' সম্বন্ধে লেখকের মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাই তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর "হিং টিং ছট্" নামক কবিতাটি পড়িয়া, "তর্ক-বৈচিত্র্যের" সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনে যে ভাবের 'উদ্রেক'

হইয়াছিল, তাহা রমণী বাবুর মতে "বিকৃত ব্যাখ্যা।" রবীন্দ্র বাবুর কবিতা সম্বন্ধে রমণী বাবুর সহিত যাঁহাদের মতভেদ হয়, তাঁহারাই "উহার মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।" সাহিত্য-জগতে এমন কোন বিধি নাই, যাহার বলে সকলকেই রমণীমোহন-নামক মল্লিনাথের কৃত ব্যাখ্যাই শিরোধার্য্য করি[illegible]ইবে। রমণী বাবু "সাহিত্যে"র এই নগণ্য সম্পাদকের প্রতি অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। "সাহিত্য"-সম্পাদক সম্বন্ধে লেখক দয়া করিয়া লিখিয়াছেন,—"সাহিত্য-সমাজপতি বলিয়া যাঁহারা [illegible]ত হইতে অভিলাষী, তাঁহারাই যখন সহজে এরূপ একটা কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইতে পারেন;" ইত্যাদি। লেখক কোন্ সূত্রে অবগত হইলেন যে, এই দীনতম "সাহিত্য" সম্পাদক সাহিত্য-সমাজপতি" বলিয়া পরিচিত হইতে অভিলাষী? বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন শিক্ষিত ছাত্রকে, এক জন অপরিচিত ভদ্রলোককে [illegible]গালি দিবার জন্য মিথ্যা কথার ব্যবহার করিতে দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বাবুর কাব্য, না তাঁহার নিজের সমাজ, কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন? তাঁহার দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, সাহিত্য-সম্পাদক একটি সরল কবিতার অর্থবিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। কথা দিয়াও গানটি পুনর্ব্বার পড়িয়া দেখিলাম, এবং এখনও আমার বিশ্বাস, "মম হৃদয় শয়ন মাঝে শুন মধুর মুরলী বাজে, মম অন্তরে থাকি থাকি" "কেবল কষ্টকল্পিত চর্ব্বিতচর্ব্বণ নয়, নিতান্তই হাস্যরসের উদ্দীপক"—যদিও রমণী বাবুর এই ধৃষ্টতার মত পরিমাণে তত অধিক নয়। লেখক রবীন্দ্রনাথের বিবিধ রচনা হইতে বিবিধ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। লেখক আশা করেন, তাঁহার মত সকলেই রবীন্দ্রনাথের লিখিত বিন্দু ও বিসর্গ পর্য্যন্ত অভ্রান্ত বেদবাক্য বলিয়া গ্র[illegible] নিধু বাবু গাহিয়াছিলেন,—"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে," এবং [illegible]গর্ব্বাঙ্গনে।" সমালোচক তেমনই রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা দিয়া তাঁহার [illegible]সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত যে সর্ব্ব-[illegible]না হইতে পারে, এ সম্বন্ধে যে পৃথিবীতে অন্যান্য বিবিধ মত বিদ্যমান,—[illegible] অবলম্বিত বা প্রচারিত মতের বিরুদ্ধ মত যে অন্য সমালোচকের উপর প্রভাব-[illegible]করিতে পারে, এ বিষয়ে রমণীবাবু সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি হেমেন্দ্রপ্রসাদের আরোপিত [illegible] নিরাসার্থ যুক্তির অবতারণা করেন নাই,—প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রবাবুর [illegible]মতমাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর অভিমত রমণীবাবুর পক্ষে প্রমাণ ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে—অন্যের পক্ষে নহে। এই 'সহজ' সম্ভাবনা ও 'সরল' সত্যটুকু রমণীবাবুর মস্তিষ্কে আদৌ উদিত হয় নাই, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় নহে। 'চৈতালি' সম্বন্ধে নিজের মত একান্তে রাখিয়াও অনায়াসে বলা যাইতে পারে, রমণী বাবুর কৃত প্রতিবাদের ভিত্তি নাই। তিনি বলিয়াছেন, "চৈতালির রীতিমত সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতার বহির্ভূত।" লেখকের এ কথা সত্য। লেখক প্রবন্ধারম্ভে বলিয়াছেন,—"এ দেশে রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার এখনও সমুচিত আদর হয় নাই! * * * নব্য বঙ্গে রবীন্দ্রবাবুর ভক্তের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য না হইলেও তাঁহার প্রতিভার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে।" লেখকের এই উক্তির মধ্যেও অনেকটা সত্য আছে। নহিলে 'চৈতালি'-সমালোচনার এমন যুক্তিসম্পর্কশূন্য ভক্তিমাত্রসম্বল প্রতিবাদ আমাদিগকে দেখিতে হইত না। রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ নামক সেনাপতিকে [illegible]ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া আমরা হাসিব কি কাঁদিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। [illegible]বান! রবীন্দ্রনাথকে এমন ভক্তের কবল হইতে রক্ষা কর!"

কবিতাকুঞ্জ।

কুহুরব।

নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে
শুনি তোরে শুধু মোর পড়িছে স্মরণে
বিজন যমনা তটে তমালের ছায়
দ্বাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায়;
শ্রাবণ গগন সম নীল নবঘনে
আঁখি যা'র ছেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে;
গরবি সুবাস সম বেদনা তরল
ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মরমের তল;
নিভৃতে হৃদয় দাহী অনলের প্রায়
প্রাণ যা'র ভরেছিলি রভস তৃষায়;—
হায় কোথা সে কিশোরী? কোথা সে
কিশোর?
কোথা বা ব্রজের কুঞ্জ, রজনী উজোর?
শুধু সে বিরহ-ব্যথা বজ্রের সমান
পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ!

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বর্ষান্তে।

আজ মনে পড়ে সেই হৃদয়-আকাশে
ধীরে ধীরে ফুটেছিল নবীন প্রণয়,
পূর্ণিমা নিশিতে সেই দক্ষিণা বাতাসে,
প্রাণে জেগেছিল কত আশা, কত ভয়!
তা'র পরে কত দিন গিয়াছে বহিয়া,
সুখে দুখে দু'জনার কেটেছে জীবন,
সে প্রেম অতীতে আজ গেছে মিশাইয়া
তাই সে দিনের স্মৃতি হয়েছে স্বপন।
আজ প্রাণে চেয়ে দেখি মরু চারিধার,
বিফল বাসনা কাঁদে হৃদয়-শ্মশানে;
সে প্রেম, সে সুখ, আশা, কিছু নাহি আর,
বেদনা জাগিছে শুধু কাতর পরাণে—
আজ কিছু নাহি,—ছিল সে দিন যেমন
তাই ঘৃণা আনিয়াছে প্রেমের মরণ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মৃত্যু।

সাড়া নাহি শব্দ নাহি আঁধার রজনী;
আজি মনে হয় মৃত্যু বুঝিবা এমনি!—
অস্তমিত জীবনের সায়াহ্ন-শয়নে
ঘন কৃষ্ণ পক্ষ মেলি মুদিত নয়নে
শব্দ-স্পর্শ রূপ-রস আঘ্রাণ বিহীন
আসিবে ম[illegible]শা! ম্লানজ্যোতি ক্ষীণ
নিভে যাবে [illegible]তারা!—বিস্মৃতি-সলিলে
ডুবে যাবে প্রাণ-দীপ!—অসীম নিখিলে
পড়ে র'বে ছায়াখানি! তীর তরু-তলে
নিশির শিশির সম কার আঁখিজলে
ভাসিবে নয়ন দুটি টের নাহি পাব!
অতলের তলে কোথা হ'তে কোথা যাব!—
স্বপ্ন হ'তে মৃত্যু, তার পরে জাগরণ
কাল-পারাবারে পুনঃ হইবে কখন।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ কথা।

আর কেন?—মরণের রথে
আমি যাত্রী দাঁড়ায়েছি এসে,
তুমি সুখে ফিরে যাও ঘরে,
আমি যাই অজানিত [illegible]।

আর কেন দেখাইছ [illegible]
ও আনন [illegible]
পাছে তুমি হারাও [illegible]
[illegible] দুরাশ স্বপন।

দেবী তুমি ফিরে যাও ঘরে,
সেথা তোমা ডাকে শত মুখে
অধমের ভীষণ শ্মশান
দাঁড়ায়ে দেখিবে কেন দুখে?

এক দিন বাসন্তী সন্ধ্যায়—
সে যে আরও বহুদিন গেলে,
এইখানে এস ধীরে ধীরে,
অমনি করুণ দিঠি ঢেলে।

এইখানে রেখ পা দু'খানি,
ভূ লুটিয়া পড়িবে আঁচল,
অভাগার চিতা-রজঃ মাঝে,
দিও দুই ফোঁটা আঁখিজল।

জগতে তা জানিবে না কেহ,
কেবলি জানিবে ভস্মরাশি;
তাহে—সেই চিতাদগ্ধ প্রাণ
পুলকে হইবে স্বর্গবা[illegible]

শ্রীমা[illegible]দারী বসু।

নদীতীরে।

দুরন্ত শিশুর মত খেলা-অবসানে
ঘুমায়ে পড়েছে যেন বিশাল তটিনী।
শোভিছে গগনে মেঘ রঞ্জিত বরণে;
বিহগ ফিরেছে নীড়ে, স্তব্ধ কলধ্বনি।
আর্দ্র বায়ু অলসেতে বহিছে সুধীরে,
শ্যাম সিক্ত বৃক্ষ হ'তে ঝরে বারিকণা।
সপ্তমীর অর্দ্ধচাঁদ আকাশ উপরে,"
একটি তারকা হায়! হারায় আপনা।
পর পারে সন্ধ্যালোক আসিছে ঘনায়ে,
শ্যাম তরু-শিরে স্পর্শে নীল মেঘরাশি।
মহানদী কিছু দূরে গিয়াছে মিশায়ে,
তটিনী গগনে যেন দোঁহে যায় মিশি।
একাকী দাঁড়ায়ে কূলে ভিজে আঁখিকূল
হৃদয়ে জনমে কত মোহময় ভুল।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কোকিল।

১

কেরে তুই পরী-পাখী, উঠিলি কুহরি?
শুধু তোরি তানে,
[illegible]-আনন্দ এল কি যেন মায়ায়
প্রকৃতির প্রাণে!
লতার শ্যামল-কায়
পুলক-পল্লবে হায়,
ফুল আঁখি মেলি চায় তোরি মুখ পানে!

২

সুধাসুধাকর ধরি অনন্ত নূতন
ওই কুহু-স্বর,
ধরার সৌন্দর্য্য যেন ওরি অমিয়ায়
হয় সুমধুর!
সলিল-প্লাবন সম
কল স্বর নিরুপম
ছাপি' বন, শ্রবণের ক্ষুধা করে দূর!

৩

দক্ষিণ বাতাস বহে ফুল গন্ধ নিয়ে,
নিশি ভোর ভোর,
কনক-কুন্তল-খোলা উষার নয়নে
মৃদু ঘুম-ঘোর!
আধ-জাগা শিশু-ঠোঁটে
কি সুখ-হাসিটি ফোটে,
[illegible] বকুল-ডালে 'কুহু' ডাকে তোর!

৪

রৌদ্র-পীত শস্য মাঠে চরিতেছে গাভী
দ্বিপ্রহর বেলা,
বসিয়া বাঁধের ধারে অশথ-তলায়
রাখাল একেলা;
কোথা হ'তে 'কুহু' তান
উলসিল তার প্রাণ,
বাঁশীতে ধরিল সুর ভুলে সব খেলা!

৫

মুকুলিত-আম্রবনচ্ছায়াঘন বাঁকা
গ্রামপথ দিয়ে
অলকে সাঁঝের মেলা চলে বধূ, কাঁখে
কলসীটি নিয়ে;
সহসা আড়াল থেকে,
কি 'কুহু' উঠিল্ ডেকে;
থমকে ফেলে সে বালা আপনা হারিয়ে।

৬

বিজন বসন্তরাতে সুপ্ত চন্দ্রালোকে,
মুক্ত বাতায়নে,
নবীন প্রেমিক দুটি বাঁধা বাহুপাশে
মিলন-শয়নে;
অই মৃদু 'কুহু, কুহু',
এনে দেয় মুহু মুহু,
কি সুখ-সুধার নেশা দোঁহার নয়নে।

৭

গান সাধে ঝরে যাবে শত শত পাখী
চিরদিন ধরি',
প্রকৃতি চাবে না কারে, রবে শুধু বুঝি
তোরে বুকে করি'।
তুই নন্দনের কবি,
সঙ্গীতরাজ্যের রবি,
বাঁধা এ বিশ্বের বীণা 'কুহু'-সুরে তোরি!

শ্রীবিনয়কুমারী ধর।

মানবের সুখ।

জোনাকির ক্ষীণ আলো সম
মানবের সুখ এ ধরায়;
অন্ধকারে আলো করি ক্ষণ,
অন্ধকারে অমনি মিলায়।
অন্ধকারে ওই আলো সম
কেহ ফিরে তার পানে চায়,
আঁখি মুদে মোহের তন্দ্রায়
কেহ পরে করে হায় হায়!

শ্রীকুঞ্জবিহারী বসাক।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শিশু-প্রকৃতি।

মানব-প্রকৃতির রহস্য কি জটিল! যতই আমরা সভ্য ও উন্নত হইতেছি, ততই যেন দুর্ব্বল ও অসহায় হইয়া পড়িতেছি। বাহ্য প্রকৃতিকে যতই করায়ত্ত করিয়াছি, শরীর ও মানস প্রকৃতি ততই যেন দীন হীন হইতেছে। যখন বনে বনে স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতাম, তখন প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল; তখন প্রকৃতি যেন স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। এখন প্রকৃতিকে আমার অধীন করিতে যাইয়া প্রকৃতির সে স্নেহ যেন হারাইয়াছি, প্রকৃতি আমার বিমাতা হইয়া বসিয়াছেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আগে পিতৃস্থানীয় ছিলেন, এখন কংগ্রেস করিয়া যেন তাহার বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি।

আগে জল বায়ুর পরিবর্ত্তনের সহিত আমার প্রকৃতির এত সংগ্রাম ছিল না। ক্ষুধা তৃষ্ণায় এত কাতর হইতে হইত না, রোগের সংখ্যা এত ছিল না, প্রখরতা এত তীব্র হইত না। তখন কোমল হস্তে প্রকৃতি আমাকে পালন করিয়াছিলেন। যতই বসনের বিচিত্রতা, অশনের মাধুর্য্য, ঔষধের সংখ্যা বাড়িতেছে, ততই কঠোরতর হস্তে প্রকৃতি আমাদের শাসন করিতেছেন। যখন অসহায় হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়দেশে শরণ লইয়াছিলাম, তখন প্রকৃতির আদরের সীমা ছিল না; এখন সাম্য মৈত্র স্বাধীনতা স্থাপন করিতে গিয়া, যাহা ছিল, তাহা হারাইয়াছি; যাহা ছিল না, তাহাও পাইলাম না।

বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষে মানব-সন্তান জীবমণ্ডলীর শিরোমণি, কিন্তু সদ্যোজাত মানবশিশুর ন্যায় অসহায় অবস্থায় আর কোনও জীব-সন্তান মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া সংসারসংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় না। কাহারও শীত-বাত-নিবারণের উপযোগী আচ্ছাদনে দেহ আচ্ছাদিত থাকে; কেহ আত্মরক্ষার উপযোগী আয়ুধ লইয়া জন্মগ্রহণ করে; জীবনরক্ষার উপযোগী আহারসঞ্চয়ের শক্তি অনেকের থাকে। টিকটিকী অণ্ড হইতে বাহির হইয়া, মশক-জন্মলাভ করিলেই, আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু মনুষ্যশিশুর মত নিরায়ুধ নিরা[illegible]কি আর কেহ নহে। [illegible] মানব[illegible]ের পরিমাণ নিকৃষ্ট জীবে[illegible]লেও, নিকৃষ্ট জীবশি[illegible] যথেষ্ট সঙ্গে লইয়া

[illegible]য়াছিল। এই প্রকার অসাধারণ বর্ষণে সাধারণ লোকে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় চিন্তিত হয়। কিন্তু সে চিন্তা অমূলক।

১৮৬২ ও ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্কট্লণ্ডে চারি বার মসী-বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথম বৃষ্টি ১৮৬২ অব্দের ১৪ই জানুয়ারি হয়। রেভারেণ্ড জে. রাষ্ট তাঁহার "The Scottish Black Rain showers of 1862 and 1863" নামক গ্রন্থে এই আশ্চর্য্য বৃষ্টি-চতুষ্টয়ের বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, ১৪ই জানুয়ারি প্রাতে সার্দ্ধ আট ঘটিকা পর্য্যন্ত আকাশ নির্ম্মল ছিল। নয়টার সময় গগন মেঘময় হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমময় ভয়ঙ্কর মেঘ ঘনঘটা করিয়া সমুদ্রের দিক হইতে আসিল। এবং দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই বারি-ধারার অধিকাংশ মসীময়। প্রায় দুই শত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া এই অদ্ভুত বৃষ্টি হইয়াছিল। রজকেরা বস্ত্র শুকাইতে দিয়াছিল; তাহাতে এরূপ কালীর দাগ লাগিয়াছিল যে, অতিশয় উত্তপ্ত জলে ধৌত করিয়া তবে কোন মতে সেই মসী-চিহ্ন তিরোহিত হয়। বস্ত্রে গন্ধকের গন্ধ হইয়াছিল। এক জন ফটোগ্রাফার এই বৃষ্টির জল ব্যবহার করায়, তাহার ফটোগ্রাফ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় মসী-বৃষ্টি ১লা মে কাবনিউক নামক স্থানে, তৃতীয় বৃষ্টি ২০শে মে স্লেনস্ নামক স্থানে, এবং চতুর্থ বৃষ্টি ১৮৬৩ অব্দের ২৮শে অক্টোবর পুনরায় স্লেনস্ নামক স্থানে পতিত হইয়াছিল। এই সকল বৃষ্টির পর সাগরতীরে অত্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খণ্ডও পতিত হইয়াছিল। এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব্ব বায়ু প্রবহমান ছি[illegible]। অধ্যাপক চার্লস্ টমলিন্সন্ অনুমান করেন যে, ভিসুবিয়স-গিরি-প্রক্ষিপ্ত ধূ[illegible] ও শিলাখণ্ড বায়ু[illegible]গে স্কট্লণ্ডে আনীত হইয়া, বৃষ্টির কালে সাধারণ বারি-বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অনুমানের বিশেষ কারণও আছে। কারণ, ১৮৬২ সালের ১০ই জানুয়ারি ভিসুবিয়স ধূম উদ্গীরণ করে; এবং প্রথম বৃষ্টি ১৪ই জানুয়ারি পতিত হয়। পুনরায়, ২৮শে এপ্রেলের প্রদোষকালে উক্ত আগ্নেয়গিরি হইতে ধূম নির্গত হইতে থাকে; ইহার তিন দিন পরে কারনিউকে বৃষ্টি হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ বৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোথাও কোনও অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছিল কি না, জানা যায় নাই।

ইউরোপের নানা স্থানে কথন কথন হরিদ্রা[illegible]গুলিতে পাওয়া [illegible]। এই জলেও গন্ধকের গন্ধ থাকে। জর্ম্ম[illegible]কবার এইরূপ বৃষ্টি হয়, তখন অ[illegible] সংগৃহীত জলে দেখা[illegible] কেহ কেহ

মনে করেন, ফুলের পরাগ বায়ুভরে উপরে উঠিয়া পড়িবার সময় বৃষ্টির জলে মিশ্রিত হইয়া উহাকে হরিদ্রাভ করে। ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহা বলা যায় না। কারণ, যে বায়ুর তেজে ফুলের পরাগ আকাশের দূরদেশে উত্থিত হয়, তাহার তেজে সমগ্র পুষ্প বৃন্তচ্যুত হইয়া তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প দূরও উঠিতে পারে। কিন্তু পুষ্পবৃষ্টি গল্পে ও পৌরাণিক কাহিনীতেই শুনিতে পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ দেখা যায় নাই।

১৮৪৪ অব্দের ১লা নবেম্বর প্যারি নগরে অগ্নিবৃষ্টি হয়; বৃষ্টি মৃত্তিকা স্পর্শ করিবামাত্র ধূম ও অগ্নি নির্গত হইয়া জলে ফস্‌ফরাসের বিদ্যমানতা প্রমাণিত করিয়াছিল। ১৮৪০ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর আলজিরিয়ায় যে প্রবল ঝড় হয়, সেই সময় দুই এক বিন্দু বারি কেশোপরি পতিত হইয়া উহাকে দীপ্তিমান করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৩৯ অব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার দশ ক্রোশ দক্ষিণে সজীব-মৎস্য-বৃষ্টি হয়। ঐ বৎসর মে মাসে এলাহাবাদের নিকটও মৃত মীনের বর্ষণ হইয়াছিল। Hasted's History of Kent নামক গ্রন্থে কথিত আছে যে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ষ্টান্‌ষ্টেড নামক প্রদেশে আকাশ হইতে বৃষ্টির সহিত মৎস্য পতিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও অনেক বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থকারের গ্রন্থে এই প্রকার মৎস্য-বৃষ্টির কথা পাঠ করা যায়।

মূষিক ও ভেক-বৃষ্টিই বা না হইবে কেন? নরওয়ে দেশে একবার মূষিক-বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ভেক-বৃষ্টির কথা French Academy নামক ফরাসীস্ বিজ্ঞান-সমিতির পত্রে পাঠ করা গিয়াছে। ১৮০৪ অব্দের আগষ্ট মাসে ফ্রান্সের নানা স্থানে ভেক-বৃষ্টি হইয়াছিল। লোকের মস্তকের উপর, পৃষ্ঠদেশে, বস্ত্রের মধ্যে, রমণীগণের গাউনের ভিতর খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভেক বাহির করিতে হইয়াছিল।

রুষিয়ার অন্তঃপাতী জেভ্ নামক জেলায়, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর কীট-বৃষ্টির কথা Journal de St. Petersburg নামক পত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিলাতের Royal Societyর ১৬৬১ অব্দের ২৬শে জুন তারিখের মিনিটে যে প্রকার বৃষ্টির উল্লেখ আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে সংঘটিত হইলে একপ্রকার ভালই হয়। উল্লিখিত [illegible]য়ারিক নগর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী টচব্রুক্ নামক গ্রামে [illegible] শস্য-বৃষ্টি হইয়াছিল; সেই শস্য অনেকটা

গোধূমের ন্যায়। স্যার হেন্‌রী পাকারিঙ্গের পুত্র মিঃ হেন্‌রী পাকারিঙ্গ, নভঃস্থলাগত এই শস্যের সামান্য পরিমাণ লইয়া আসিয়া ইংলণ্ডেশ্বরকে উপহার দিয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলোকন করিয়া ও উহার কাহিনী শুনিয়া অনেকে মনে করিয়াছেন যে, বাইবেলোক্ত য়িহুদী-শিবিরে ম্যানা-বৃষ্টি অমূলক নহে।

স্বভাবতঃ ভীতিব্যঞ্জক এই সকল অসাধারণ বৃষ্টির কারণ সম্যক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা, শিশু জল-বায়ু-বিজ্ঞানের এখনও হয় নাই। নিম্নলিখিত কয়েকটি মূল কারণ সচরাচর নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে;—

(১) ঘূর্ণি-বায়ু ও জলস্তম্ভ। (৩) বায়ুর উপাদান।
(২) কীটাণু ও উদ্ভিদাণু। (৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ।

(১) বিপরীত গতিবিশিষ্ট বেগবান বায়ুপ্রবাহ পরস্পর সম্মিলিত হইলে ঘূর্ণি-বায়ু উৎপন্ন হয়। বায়ুপ্রবাহদ্বয়ের গতি ও বেগ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে করিতে দুই প্রধান গতির সৃষ্টি করে—আবর্ত্তন ও ভ্রমণ। প্রথম গতির ফল ঘূর্ণন; কুম্ভকারের চক্রবৎ ভীম তেজে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রভঞ্জন মৃৎ-সংলগ্ন কত দ্রব্য লইয়া আকাশমার্গে উত্থিত হয়। কোন কোন সময় এমন বলশালী ঘূর্ণিবায়ু সংঘটিত হয়, যাহার বলে ভূপৃষ্ঠের অনেক ভারশালী দ্রব্যও গগনে উঠিয়া থাকে। দ্বিতীয় গতির ফলে ঘূর্ণিবায়ু এক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান না করিয়া, তথা হইতে অন্য স্থানে গমন করে; সঙ্গে সঙ্গে ভূপৃষ্ঠোত্তোলিত দ্রব্য-রাজি লইয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। জলের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলে, জল ও জলচর জীবকুল ও তরুলতা-পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া আকাশ-পথে ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া যায়। বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিবিধ কারণে ঘূর্ণিবায়ুর ধ্বংস হইলে তৎসহ-উত্থিত দ্রব্যরাজি আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হয়। ঘূর্ণি-বায়ুর ধ্বংস হইবার সময় আকাশের বায়ু-প্রবাহ সেই উত্তোলিত সামগ্রীনিচয় দূর দেশে লইয়া যায়; এবং বৃষ্টির সময় বৃষ্টি-কণিকার সহিত মিলন-নিবন্ধন উপযুক্ত গুরুত্ব প্রাপ্ত হইয়া, মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাবে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ছুটিয়া আইসে। যদ্যপি কীট-পতঙ্গ বা মীন-শম্বুক, অথবা জলবাসী তরুকণা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তবে সেই সেই সামগ্রীর বৃষ্টি হইয়া থাকে। বায়ুস্তরে দীর্ঘকাল অবস্থানবশতঃ সেই সকল দ্রব্যের বর্ণ ও আকারের বিভিন্নতা হইতে পারে; কাহারও কাহারও জীবননাশও বিচিত্র নহে। মানুষ ঊর্দ্ধে উঠিলেই শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে; 'অন্যে পরে কা কথা?'

উত্থিত ধূলিকণা পতনের [illegible] বারিকণার সহিত মিশ্রিত হইয়া স্বচ্ছ জলকে

বিবর্ণ করিয়া মসী বা রক্তের ন্যায় করিয়া তুলে। আমরা মনে করি, মসী-বৃষ্টি হইল—রক্ত-বৃষ্টি হইল। অধিক পরিমাণ ধূলি-কণা বারি-কণার সহিত মিলিয়া পতিত হইলে আমরা মনে করি যে, চন্দন-বৃষ্টি হইল।

(২) ঘূর্ণি-বায়ু বিনাশের পর আকাশ-পথে ভাসিতে ভাসিতে কীটাণু বারি-কণিকা আশ্রয় করিলেও উহাকে যে বিবর্ণ করিতে পারে, তাহাতে আর সংশয় নাই। আমাদের দেশের কত পুষ্করিণীর জল এই কীটাণু ও উদ্ভিদাণুর জন্য বিবর্ণ ও বিশ্রী। উচ্চ-গগনে মেঘমালায় যে কীটাণু ও উদ্ভিদাণু জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। তাহাদিগের অনেকের গঠন ও আকার এরূপ যে, যে কারণে সূক্ষ্ম জল-কণা মেঘরূপে আকাশে বিচরণ করে, সেই কারণে তাহারাও পৃথিবীর আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া কিয়ৎকাল গগনমার্গে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে।

(৩) বায়ুতে যে কেবল অঙ্গারজান, উদজান ও যবক্ষারজান আছে, তাহা নহে। প্রাচ্য পণ্ডিতগণের অধ্যবসায় ও উদ্যম দিন দিন নব নব উপাদানের আবিষ্কার করিতেছে। তাড়িতশক্তির বলে বিচ্ছিন্ন বায়বীয় উপাদান বর্ষার জলের সহিত সম্মিলনে উহার অসাধারণত্ব উৎপাদন করিতে একবারেই যে পারে না, তাহাই বা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়?

(৪) আগ্নেয়গিরির উদ্গিরণ ভূগর্ভের কত সামগ্রীকে আকাশপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়; সেই সকল সামগ্রী বায়ুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃষ্টির জল-কণায় মিশিতে পারে। নির্ম্মল জলকণার সহিত ফসফরাস প্রভৃতি মিলিত হইয়া উহাকে বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন ধাতবজলে পরিণত করিতে পারে। ফস্‌-ফরাস্‌-মিশ্রিত জলকণা দীপ্তিশালিনী হয়; গন্ধক-মিশ্রিত বারিতে উক্ত ধাতুর দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস।

ভানুমতী।

৬—রণক্ষেত্র।

চৈতন্য লাভ করিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহার উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে ধীরে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলেন। কর-প[illegible]লন করিয়া দেখিলেন,

করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে। ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও [illegible] হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সেই সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃতমানব-দেহ। এইরূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো মহিষ ছাগ, পালিত পশু পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বেদনাব্যঞ্জক চীৎকার করিল। কণ্ঠ স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে?" উত্তরে একটি যবনী-নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি কোথায়?" অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—"বলিতে পারি না।" তখন "হা আল্লা!" বলিয়া রমণী একটি বেদনা-ব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের "বোঁদা" * জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২।৩ টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী, বাটি

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বাঁধা। এ অঞ্চলে বোঁদা বলে।

ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃতদেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তস্কর নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কোন স্থান ?" সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—"দেখছ না, তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে এক শাশুড়ী পড়ে আছে।" এই বলিয়া সে একটা কর্দ্দমাক্ত স্ত্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোণার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিলে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা ধরিয়া টানিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের "বোঁধা" ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েক জন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ [illegible] হতভাগিনীকে মা! মা! বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বোঁধার আলোকে খুঁজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতেছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,—"আমি কোথায়", কেহ "আমার পুত্র কোথায়", কেহ "আমার পতি কোথায়?" তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, বসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অন্য দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথায় বা অপহৃত বস্ত্র লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঁধাও নিবিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাষ্ঠের উপর অবসন্ন অবস্থায় বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বালিকার গান যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ-না নয়নে, নাচে কালী রণ-রঙ্গিণী!"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি একটি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন। শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহ-খণ্ড ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজসপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত-মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর সরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, কেবল নর পশু পক্ষীতে, এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটিকাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাদের লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি! এ কোন্ স্থান?" বৈরাগী বলিল,—"বাবা! এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"চম্বল!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চম্বল।"

৭—প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র।

স্বর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল ফেনিল দিগন্ত প্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্ব ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেষখালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্ব্বতীরে চম্বল-গ্রাম। ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্ব্বে চম্বল-গিরিমালা। অনাথ-নাথ তবে কি সেই স্বল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্র তরঙ্গে এত দূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন করিয়া ভাসিয়া

আসি... তাই তিনি চম্বল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকাতাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া এরূপে গিরি-পাদমূলে পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে। এ কি স্বপ্ন? একি কোনও অপদেবতার খেলা? একি আরব্য-উপন্যাস? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাহার মুখে গ্রামের পরিচয়, কি বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাহা কেমন করিয়া হইবে? ঝটিকাবিধ্বস্ত হতভাগ্য নরনারী বৈরাগীকে যে এখনও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চম্বল শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভিভূত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বহুবিস্তীর্ণ শবক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয় স্বজনের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেশখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অদ্ভুত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমামণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃপাসিন্ধো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ রক্ষা কর নাই?" দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, উষালোকে যাহা আরও স্ফুটতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারি দিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নয়নেত্রে দেখা—
আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে
ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে
শ্যামশস্যসমাচ্ছন্ন, ছিল সুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—
রজনী-প্রভাতে এবে—বিস্তীর্ণ শ্মশান!

নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের;
যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—
শবাকীর্ণ প্রেতভূমি, মহারণভূমি!
শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে!
সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব!
শরতের শস্যক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—
সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি!
পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,
কীট পতঙ্গের শব, শব সংখ্যাতীত
শস্যক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে!
ভগ্নগৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,
ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—
কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে।
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
পাদপের শোচনীয় বিচিত্র বসন
বিজড়িত ডালে ডালে কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত,
শবরাশি অগণিত, শব অজানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে!
যেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে
গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই সমুদ্র প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,
জালে যেন মৎস্যগণ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি তিল স্থান তাহে নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময়!
কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,
মাতৃস্তন শিশুমুখে; কোথাও পড়িয়া

শিশু ভ্রাতা ভগ্নী ছুটি গলায় গলায়!
গলায় গলায়, বুকে বুক, মুখে মুখ,
পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী;
কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী!
কুটিসহ দৃঢ়াবদ্ধ পত্নী সহ পড়ি
কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল।
হায়! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেয়সীর, এইরূপে আপনার প্রাণ
করিয়াছে বিসর্জ্জন! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা ছুই ভুজলতা!
রমণীর কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে হায়! যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্‌। মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেতমূর্ত্তি মত
নগ্ন, কর্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন-নিমিষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর-চিন্তাতীত!
মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার
বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর!

অনাথনাথ এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায় কি জন্যে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্দ্রের

শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া নগ্নের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। গৃহস্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা জীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল, তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মুমূর্ষুকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা, আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহাশ্মশানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। কোথাও একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই;—চাল, বেড়া, খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্য্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল গ্রামে অনাথনাথের পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটীর শেষ-ভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গর্ত্তে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৪।১০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত পত্নী, পুত্র, মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—"হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে! হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত জীবিত আছে, তাহাদের কেহ বা জানুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্ত্তব্যবিমূঢ়

আত্মহারা জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অন্য জীবিত জীব জন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছু ক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন, কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত লোকের মত যথাসাধ্য আর্ত্তের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পত্নী পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্ব্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে। আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে! শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং [illegible] ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রূপে দেখ না নয়নে নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভাগ্যবতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাবপূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারৌদ্রী প্রলয়কারিণীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোর ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই শান্ত-সায়াহ্নে সমুদ্র-নিনাদে মিশ্রিত,

সমুদ্রানিলে বাহিত সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্মুখে বেদের ক্ষুদ্র পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

৮—ভগবতী।

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা-মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাসা কাপড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাস কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাহিতেছে—

তুই কর লয়, তুই বরাভয়,
লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
সদা শিব ঊর্দ্ধগ্রীব,
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথনাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র-নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া গেল। কিছু ক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালীর পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ দাদা! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।"

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও। তোমার গান আমায় বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সান্ধ্যরাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশিল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধুনিনাদমাত্র শুনা যাইতেছিল। আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু-কণ্ঠ তাঁহারই শিশুপুত্র অমিয়ের। তবে অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ্রু-নয়নে বলিলেন, "তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর ধ্বংস-ক্রীড়ায় মহা-মহীরুহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস্! দয়াময়ী মা!" অনাথনাথ কিছু ক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার হৃদয়ের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।—শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দিদি! সত্যসত্যই আমি কালী-মার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন, তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?"

বা। হাঁ অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মানুষ মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, কখনও [illegible]রেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে সেই মা? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনই আদর! তুই আমাকে কত আদর করিস্!

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল, "না ভাই! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভগীর বুকে কত ভাই মরিয়া রহিয়াছে?

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু-নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত

দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার স্বর্ণ-সম বুকে লুকাইল। বালিকা গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই! দেব-শিশু। তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালক-বালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনী-ধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্য-অনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি প্রায় বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাই-তেছে। সমুদ্র কহিতেছে, আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, পড়িতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মি-তেছে, চলিতেছে, মরিতেছে। এ সমুদ্রের কত শক্তি! কাল দেখিয়াছ, কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র; তোমার শক্তি, তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়, লীলাময় হরিকে ডাক, তাঁহার ভজনা কর।

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাহার পূজা [illegible]

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী! তুমি তোমার ভাই গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইয়াছিলে! আমাকে তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—"তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেবশিশু ছিল না। সে যে গরীব দুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। তাই ভাই

দু'জনে সুন্দর সংকীর্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি!" এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

শিশুর মুখ গম্ভীর হইল। সে অনেকক্ষণ, নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না?" শিশু কাঁদিতে লাগিল। তাহার অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণ-রুদ্ধ অশ্রু-ধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, "হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ ঢালিয়া বৃথা না ডাকিয়া থাকি, তবে অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। অমিয়! আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।"

"মা!"—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে গিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলেন,—"মা ভগবতি! তুই আমার অমিয়কে রক্ষা করিয়াছিস্, এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা করিয়াছেন।"

[illegible] বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"বাবা!" যে মহাপ্রলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায় নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে বক্ষে লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন। বালিকা সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুশীতল কৃতজ্ঞতাবারি তাঁহার চরণকমলে ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতেছিল। কিছু ক্ষণ উভয়ে নীরব। শিশু যেন কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু যেন কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃদর্শনজনিত আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার গাঢ়তর মেঘ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণ-কণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! মা—কোথায়?" প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত

হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ধৈর্য্যের বন্ধন ভাসাইয়া তাহার সমস্ত দিবসের রুদ্ধ-শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিল। বালক মুখ ঘুটিয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" বালক আবার কিছু ক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা! আমি দিদির কোলে যাইব। হাঁ বাবা! তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।"

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, "বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।"

শিশুর মুখে, তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বালিকা বার বার সেইরূপ সজল নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সান্ধ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সেই অবর্ণনীয়, অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?"

অ। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা! মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশ আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি। বড় সুন্দর দেশ। আমি দিদির কোলে শুইয়া শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেখানে কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া হাসিতেছেন। আমাকে "অমিয়! অমিয়!" বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই যাত্রার প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারি দিকে গাহিতেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর বাবা! আমাদের বাড়ীর রাধের

সেই কৃষ্ণ বসিয়া কি সুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন। মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আ! মা!

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা!" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—"উঃ! বুকে বড় ব্যথা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে, ঝটিকা-প্লাবন-সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,—"দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গায়িবি? আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও তোর সঙ্গে গাইব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয়ও তাহার অমিয়পূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল।—

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা পুত্রের এ গীতাভিনয় অনেকবার দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণ-দ্রবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রস্ফুটিত কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত শ্লথ হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না। শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল! অনাথনাথ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বালিকাও সে মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে মূর্চ্ছিত হইল। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই ... চিত্র ঢাকিয়া ফেলিল।

চুণার।

শীতের পর বসন্তের মত,—বিরহের পর মিলনের মত, কার্য্যভারপূর্ণ ক্লান্তি-কর অনেক দিনের পর পূজার অবকাশ। সেকালে যেমন প্রাবৃট-গগনে নব-ঘন দেখিলে প্রবাসী দূরগৃহে ফিরিতে ব্যাকুল হইত, একালে তেমনই পূজার অবকাশ পাইলে ভ্রূকুটীকুটিলমুখ সহর ছাড়িয়া শ্যামশোভাময় পল্লীগ্রামে যাইতে ইচ্ছা করে। এবার ভাবিয়া স্থির করিলাম, চুণারে যাইব। অন্নভুক বাঙ্গালী কোন কালেই বীর নহি—তথাপি এবার যে কথা, সেই কাজ। দ্রব্যাদি গুছা-ইয়া চুণারে উপস্থিত হইলাম।

চুণারে আমরা অনেকগুলি বাঙ্গালী জুটিয়াছিলাম—সর্ব্বসমেত আট জন। আমাদের মধ্যে বিংশতিবর্ষীয় যুবক হইতে ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, কোন স্তরেরই লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিঘ্ন হয় নাই। অবশ্য যিনি ষষ্টিবর্ষীয় বৃদ্ধ, তিনি সময় সময় আপনার বয়সোপযোগী গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু তাঁহার সাধুচেষ্টা নিতান্তই নিষ্ফল হইত।

বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমি ধারাবাহিকরূপে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়াস পাইব না; কেবল চুণারের কয়েকখানি চিত্র পাঠকের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিব।

অনেক দিন পরে পশ্চিমে যাওয়ায় চুণারের সামান্য সামান্য দ্রষ্টব্য দ্রব্য-গুলিও আমার অতি সুন্দর বোধ হইয়াছিল। চুণারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজপথটি প্রভাতী বা সান্ধ্য ভ্রমণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এক দিন প্রভাতে আমরা সেই পথে কেল্লার অভিমুখে চলিলাম। পথের বামে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবমন্দির সংস্থাপিত। সেগুলি দেখিতে বড় সুন্দর। তখন নানাবর্ণরঞ্জিত-শাটী-পরিহিতা কুলললনাগণ জাহ্নবী-সলিলে স্নানান্তে এক এক ঘটী গঙ্গোদক লইয়া একে একে সেই মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করিতেছে ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তির মস্তকে "জল চড়াইতেছে", অর্থাৎ জলপাত্রের জল ঢালিয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহারা পরমভক্তিভরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেছিল। আমি ভাবিলাম, ভক্তিই যদি মুক্তির উপায় হয়, তবে ঊন-বিংশ শতাব্দীর ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙ্গালী অপেক্ষা ইহাদের মুক্তির পথ অধিক [illegible] ও সরল। সত্যসত্যই ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের এমন সম্বন্ধ নহে যে,

বিলাসীর উপযোগী পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া প্রার্থনা-মন্দিরে সুমধুর গীত-ধ্বনির সহিত আমাদের প্রার্থনা মিশ্রিত না করিলে তিনি আমাদের অন্তরের নিবেদন গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু ভক্তির জুয়ার আমাদিগকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছে, না অবনতির দিকে অগ্রসর করিতেছে? আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন আমি আর ইংরাজরাজ্যে নাই; বহু দিন পূর্ব্বে, প্রাচীনকাব্যের বর্ণিত হিন্দু-রাজত্বকালের মধ্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। এ যেন সেই সময়ের দৃশ্য।

আমার মনে যখন এইরূপ ভাবোদয় হইতেছিল, তখন আমরা চুণারদুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। গঙ্গাবারি-বিধৌতমূলদেশ একটি অনতি-উচ্চ কিন্তু দুরারোহ শৈলশিখরে দুর্গটি নির্ম্মিত। টার্ণারের ন্যায় চিত্রকরও, বোধ করি, এ দুর্গটি অঙ্কিত করিতে ব্যগ্র হইতেন—এমনই স্থানে ইহা নির্ম্মিত। আমার গড়মান্দারণের কথা মনে পড়িল। আমার মনে হইল, কোন অনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্বকালে কোন বিরহ-বিধুরা দুর্গেশনন্দিনী এই দুর্গাভ্যন্তরে গঙ্গামুখী কোন কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কোন জগৎসিংহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। গঙ্গার তরঙ্গসঙ্গশীতল সমীরণে তাঁহার সূক্ষ্মকারুকার্য্যবহুল অঞ্চল মন্দ মন্দ আন্দোলিত হইত, আর তাঁহার মাল্যাভরণভূষিত অলক হইতে মৃদু গন্ধ উত্থিত হইয়া সমস্ত কক্ষ সৌরভে সুবাসিত করিয়া তুলিত। হায়—চুণারদুর্গ এখন কিনা জেলখানারূপে ব্যবহৃত হইতেছে! উৎসবানন্দের দিনে সেই গীতবাদ্য, দুর্গ-প্রাকারে সেই দীপমালা, দুর্গশিরে সেই অনিল-বিকম্পিত কেতন; আশঙ্কার সময় দুর্গপ্রাচীরে সশস্ত্র প্রহরীর কোষনিবদ্ধ অসির ঝনৎকার, তাহার করধৃত বর্শার ফলকে সূর্য্যকরের খেলা, সে সকলই এখন অতীতের স্বপ্নে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে যাইয়া গঙ্গাতীরে বসিতাম। চারি দিকে দৃশ্য বড় বিমোহন;—সম্মুখে জলবেণীরম্যা ভাগীরথী তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া যাইত, বামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দূরত্ব হেতু নীল দেখাইত—যেন মেঘের কোলে আরও ঘন মেঘ; পশ্চাতে সুদূরপ্রসারিত প্রান্তরে সান্ধ্যছায়া-পাতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত। আমাদের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতপটু, তাঁহারা গাহিতে আরম্ভ করিতেন। সেই কলনাদিনী নদীর তীরে সেই স্বরলহরী, আর চারি দিকের সেই মোহন দৃশ্য, যেন কোন স্বপ্নলোকের রচনা করিত। চন্দ্রোদয় হইলে আমরা ঝিল্লীরবমুখরিত প্রান্তর পার হইয়া গৃহে ফিরিতাম।

চুণার হইতে অল্প দূরে বিন্ধ্যাচলের মধ্যে "দুর্গাকোহ" নামক একটি পাহাড় আছে। সেখানে একটি মন্দিরের মধ্যে দুর্গামূর্ত্তি সংস্থাপিত। মহাষ্টমীর দিন আমরা সেই মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। ক্রমে যখন নীল পাহাড়-শ্রেণী সবুজ হইয়া আসিতে লাগিল, তখন আমরা পথশ্রম সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস, এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোনও দস্যু-দলের আরাধ্যা ছিলেন, এবং হয় ত এই দেবীর উদ্দেশে এই মন্দিরে কত নরবলি হইয়া গিয়াছে! মন্দিরটি এমনই স্থানে অবস্থিত যে, বাহির হইতে তাহার চিহ্ন-মাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না,— অত্যন্ত নিকট পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলে তবে দেখা যায়। পূর্ব্বে যে এই মন্দিরের গমন-পথ নির্ণয় করা লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখনও ভাল পথ নাই। একটা বিশুষ্কপ্রায় নির্ঝরের প্রস্তরময় বক্ষের উপর দিয়া যাইতে হয়। বর্ষাকালে গমনের পথ থাকে কি না সন্দেহ। দুই পার্শ্বে ঘন বন। বনমধ্যে শেফালিকা তরুরাজি; এই তরু-শ্রেণী লক্ষ্য করিয়া শেফালি-বিকীর্ণ বনপথে মন্দীরসমীপে উপনীত হইতে হয়। দেখিলেই একটা উপন্যাসবর্ণিত দস্যুদলের উপাসিতা দেবীর মন্দির বলিয়া মনে হয়। মন্দিরটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত,—চূড়াবিহীন। মহাষ্টমীর দিন বহু লোক সেই প্রাচীন দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতে আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য, সে দিন সেই বিজন বনে দুই চারিখানা মিষ্টান্নের ও ফুলের দোকানও বসিয়া-ছিল। মন্দিরে আসিয়াই সহসা বিগ্রহ দেখিবার সুবিধা নাই। খানিকটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আঁকা-বাঁকা পথে মন্দির-দ্বারে উপনীত হইতে হয়। দ্বারটিও অদ্ভুত রকমের—একটি মানুষ হামাগুড়ি দিয়া কোনরূপে সেই দ্বার-পথে মন্দিরাভ্যন্তরে যাইতে পারে। তখন বিগ্রহের দর্শনলাভ হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে ঘনান্ধকার। বিগ্রহের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ দেখিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনিশ্চিত যশোলাভের আশায় নিশ্চিত মৃত্যুলাভ করিতে সাহস করিল না। এই বিজন বনে নরহত্যার সংঘটন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

মন্দিরের এক জন ভৃত্যের নিকট দ্রব্যাদি রাখিয়া আমরা পার্শ্বের পাহাড়ে উঠিলাম। খানিকটা বন পার হইয়া একটা বৃক্ষবিরল স্থানে উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, এই সানুভূমিতে সময়ে সময়ে বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল [illegible] দল [illegible] ঝাঁক দৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন এ সানুভূমির শোভা কমনীয় বটে [illegible] নহে। পাহাড়ের উপর উঠিলে আর সেই মন্দির দৃষ্টিগোচর [illegible]

সানুদেশে দাঁড়াইয়া দেখিলাম,—নিম্নে শ্যামল বনগ্রাম সমভূমি বিস্তৃত, তাহার উপর দিয়া "রেলরোড" চলিয়া গিয়াছে; দূরে তরঙ্গরঙ্গিণী গঙ্গা রজতসূত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; আর তাহারই কূলে চুণার সহর,—যেন বালকের খেলা-ঘর; অপর দিকে বিন্ধ্যাচলের বৃক্ষলতাবহুল শ্যাম-শৃঙ্গচয় আপনাদের মহিমাগর্ব্বে দণ্ডায়মান। যেন কবিতার রাজ্য—যেন স্বপ্নের দেশ!

কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর ক্লান্তদেহে আমরা মন্দিরতলে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া মন্দিরপার্শ্ববাহী নির্ঝরের নির্ম্মল নীরে স্নান করিয়া, সঙ্গে যে খাবার ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিলাম না। এই নির্ঝরসংলগ্ন একটি কুণ্ড আছে, সেটি এরূপ ভাবে গঠিত যে, দারুণ গ্রীষ্মে নির্ঝর শুকাইয়া গেলেও কুণ্ডে প্রচুর জল সঞ্চিত থাকে। সুতরাং মন্দিরের পার্শ্বে প্রস্তরময়কক্ষবাসী-দিগকে কখনও জলকষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

আমরা যখন গৃহাভিমুখগামী হইলাম, তখন রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আমারা যখন সেই প্রখর-প্রভাকর-কিরণতপ্ত তালতরুসুশোভিত প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বাল্যকালে তালতরুশালী মরুমধ্যে ভ্রাম্যমাণ শ্রান্ত আরবদিগের যে সকল চিত্র দেখিয়াছিলাম, সেই সকল চিত্রের কথা মনে পড়িতে লাগিল। শ্রান্তদেহে বেলা প্রায় দুইটার সময় আমরা গৃহে ফিরিলাম।

ইহার পর দিনই আমরা চুণার ত্যাগ করি।

অভাগিনী।

১

কলিকাতার একটি বৃহৎ রঙ্গালয়ের অভিনয় শেষ হইয়া গেল। অভিনয়ের, অভিনেতৃগণের ও অভিনেত্রীদিগের সম্বন্ধে নানা আলোচনা করিতে করিতে দর্শকগণ রঙ্গালয় হইতে গ্যাসালোকে আলোকিত, পথিকসঙ্কুল রাজপথে আসিয়া পড়িল। সেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ইংরাজী-বেশধারী দুই জন বাঙ্গালী যুবক ও অর্দ্ধ-ইংরাজী-বেশধারিণী একজন বাঙ্গালী মহিলা রাজপথে দণ্ডায়মান একখানা ব্রাউনবেরি শকটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহিস [illegible] মুক্ত করিয়া দিল। তাঁহারা শকটাভ্যন্তরে উঠিতেছেন;

এমন সময় অদূরে কে বলিল, "দিদি, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, সে ঐ যায়। যত কষ্ট, যত কলঙ্ক আমার; বুঝি যত পাপও আমার। ভগবানের বিধান দেখ!"

রঙ্গালয়ের পার্শ্বেই একখানা জীর্ণ খোলার ঘরের দ্বারে দুই জন হতভাগিনী পাপের প্রলোভনস্বরূপ হইয়া সেই প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়াইয়াছিল। এক জন প্রৌঢ়া; অপর জন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা,—দেখিলে বোধ হয়, এক সময় তাহার রূপলাবণ্যের অভাব ছিল না—হয় ত তাহাই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ। এখনও তাহার মুখে রূপের অবশেষ আছে; কিন্তু পাপের ছায়াপাতে লাবণ্য বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রাবনল নয়ন কোটরগত, তাহাতে শ্রান্তির ভাব বড় পরিস্ফুট। তাহার পার্শ্বেই তাহার একটি লোমশ কুকুর দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্রাউনবেরির আরোহীদিগের মধ্যে মিষ্টার হীরালাল সান্ন্যালকে দেখাইয়া বলিল, "দিদি, যে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল—সে ঐ যায়। যত কষ্ট, যত কলঙ্ক আমার; বুঝি যত পাপও আমার। ভগবানের বিধান দেখ!" এই পরিবর্ত্তিত বেশেও সে আজ হীরালালকে চিনিতে পারিয়াছিল। বেশপরিবর্ত্তন করিয়া পুলিশের চক্ষে ধূলি দেওয়া চলে; কিন্তু যাহার সর্ব্বনাশ করা হইয়াছে, তাহাকে ভুলাইতে পারা যায় না।

অভাগিনীর কথা শুনিয়া হীরালাল মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল—সে কণ্ঠস্বর যেন সে পূর্ব্বে কোথাও শুনিয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সে তাড়াতাড়ি শকটাভ্যন্তরে উঠিয়া বসিল। গাড়ীর ভিতর ম্লান আলোকে তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে কেহ এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

শকটাসনে বসিয়া মিস্ মুখার্জ্জি বলিলেন, "এই যে সকল হতভাগিনী মদ্য-পান করিয়া প্রকাশ্য রাজপথে মাতলামী করে, পুলিশ কি ইহার কোন প্রতি-বিধান করে না?"

মিস্ মুখার্জ্জির ভ্রাতা বলিলেন, "ইহাই বর্ত্তমান কালের সভ্যতার একটা প্রধান কলঙ্ক।"

তাঁহার প্রেমিক মিষ্টার সান্ন্যাল সে বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করিল না। সে অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিল। বহুদিনপূর্ব্বপরিচিত একখানি কোমল মুখের স্মৃতি, আর আজ রঙ্গালয়-পার্শ্বে দৃষ্ট একখানি পাপছায়াব্যাপ্ত মুখের স্মৃতি তাহাকে বড় ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল।

মিস্ মুখার্জ্জির গৃহগমন-পথেই হীরালালের আবাসগৃহ। অন্য দিন হইলে সে মিস্ মুখার্জ্জিকে গৃহে রাখিয়া বিদায় লইয়া আপনার গৃহে ফিরিত। আজ সে তাহা করিল না; শারীরিক অসুস্থতার ওজর করিয়া আপনার গৃহদ্বারেই শকট হইতে অবতরণ করিল।

মিস্ মুখার্জ্জি লক্ষ্য করিলেন,—হীরালালের মুখ বড় গম্ভীর—যেন সে কোন যন্ত্রণাদায়ক চিন্তায় ক্লিষ্ট।

মিস্ মুখার্জ্জির পিতা একজন স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার। হীরালাল সম্প্রতি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। হীরালালের সহিত মিস্ মুখার্জ্জির বিবাহের কথাবার্ত্তা হইয়াছে; এখন কেবল বিবাহ-সাধনা অর্থাৎ "কোর্টশিপ" চলিতেছে; পাকাপাকি কিছুই স্থির হয় নাই।

২

সেদিন রাত্রিকালে হীরালাল ঘুমাইতে পারিল না। তাহার কেবল বোধ হইতে লাগিল, যেন সে শয্যাপার্শ্বে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে, যেন কে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। কক্ষের অন্ধকারমধ্যে সে যেন রঙ্গালয়-পার্শ্বে দৃষ্ট সেই অভাগিনীকে দেখিতে পাইতে লাগিল। হীরালাল উঠিয়া দীপ জ্বালিল—কক্ষের অন্ধকার যেন শ্বাসরোধকারী বলিয়া তাহার অনুভূত হইতেছিল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর প্রভাতে হীরালাল মাথাধরা বোধ করিতে লাগিল। স্নানাদির পর সে ভাবিল, দিনকতকের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিবে, তাহা হইলেই এ দুশ্চিন্তা দূর হইয়া যাইবে। অনেক ভাবিয়া সে স্থির করিল যে, দিনকতকের জন্য বরাহনগরে মাতুলপুত্র মহিমচন্দ্রের আতিথ্য গ্রহণ করিবে। বাল্যকালে সে মাতুলালয়ে থাকিয়াই বিদ্যার্জ্জন করিয়াছিল—তাহার পর ইংলণ্ডে প্রবাসকালেও সে মাতুলের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিল। সে মহিমচন্দ্রকে লিখিয়াছিল যে, তাহার শরীর অসুস্থ, তজ্জন্য সে দিন কতক সহর ছাড়িয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

হীরালালের পত্র পাইয়া পর দিবস মহিমচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়ার পর দেখা—মহিমচন্দ্র আসিয়াই ভ্রাতার সহিত কোলাকুলি করিলেন। যেখানে সত্যসত্যই প্রাণের টান থাকে, সেখানে বিদেশীয় বেশে বা বিজাতীয় ভাষায় মনের প্রকৃত ভাব ঢাকিয়া রাখিতে পারে না।

দুই ভ্রাতায় অনেক কথা হইল। অতীতের কথা, বর্ত্তমানের কথা—নানা-

কথার পর মহিমচন্দ্র বলিলেন, "চল, আ[illegible] যাওয়া যাউক। [illegible] পর তুমি আর আমাদের বাড়ী যাও [illegible] সে জন্য কত দুঃখ করে[illegible] যাইবে শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আন[illegible]হইয়াছি। তোমার অসুখের কথা শুনিয়া মা বড় চিন্তিতা হইয়াছেন। তোমার অসুখ হইবে না ত হইবে কাহার? শরীরের উপর কত অত্যাচার সহে বল!"

হীরালাল বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে ও কথা বলিও না। শরীরের উপর আমার কোন অত্যাচার নাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "তোমাদের সমস্ত জীবনটাই শরীরের উপর অত্যাচার। উপযুক্ত নিদ্রা হইতে না হইতে প্রভাতে উঠিয়া কিছু আহার করিয়া রোগী থাকুক আর নাই থাকুক একবার ঘুরিয়া আসিবে; তাহার পর বেলা পড়িতে না পড়িতে 'ভিজিট', 'রিটার্ণ-ভিজিট', ইত্যাদি; ইহার পর বাটীতে ফিরিয়া চখে-মুখে জল দিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতে 'ইভনিং-পার্টি' প্রভৃতি আছে; ইহার পর আবার রাত্রিতে নাচ, 'পার্টি' প্রভৃতি আছে,—গৃহে ফিরিতে রাত্রি দুইটা কি তিনটা বাজে। ইহার উপর আবার এক রাশ মাংসভক্ষণ ও মদ্যপান। শরীরে আর কত সহিবে?"

হীরালাল ভ্রাতার কথা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। সেই দিন হীরালাল ভ্রাতার সহিত তাঁহার গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রাসাদোপম গৃহে চলিয়া গেলেন।

মাতুলালয়ে আসিয়া ইংরাজী পোষাকের খোলস ত্যাগ করিয়া হীরালাল বড় আরাম বোধ করিলেন; বহুদিন মাংসাহারের পর বাঙ্গালীর ডালভাত তাঁহার নিকট অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

৩

মহিমচন্দ্র সর্ব্বপ্রযত্নে ভ্রাতার আরামবিধানে চেষ্টিত হইলেও, বরাহনগরে আসিয়া হীরালাল শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। যে দুশ্চিন্তার জন্য তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এখানেও সে চিন্তা হইতে অব্যাহতি ছিল না। চিন্তার স্থান মানব-হৃদয়ে;—স্থানপরিবর্ত্তনে সকল সময় তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। আবার এখানে তাঁহার দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল। এখানেই বিনোদিনীর সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ; এখানেই তিনি সেই সরলা প্রোষিতভর্ত্তৃকার হৃদয়ে প্রেমোদ্রেক করিয়াছিলেন; এখান হইতেই সে তাঁহার আশায় গৃহ, পরিজন সকল ত্যাগ করিয়া, পাপ-পথের পথিক হইয়াছিল। এখানে হীরালালের দুশ্চিন্তার বিশেষ কারণ ছিল।

...ত ও অপরাহ্নে বীচি... নদীবক্ষে তরণী বাহিয়া শীকরশীতল ...ন, সর্ব্বদা ভ্রাতার সহি... মধুর আলাপ, কিছুতেই তাঁহার হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার ছায়া দূর হইল ন...

একাকী থাকিলেই তাহার বোধ হইত, যেন সে কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। নিশিতে সহসা নিদ্রাভঙ্গে তাহার বোধ হইত, যেন কে প্রতি-হিংসা-জ্বালা-দীপ্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে;—সে চাহিয়া দেখিত—কোথাও কেহ নাই!

হীরালাল দিন দিন শীর্ণকায় হইতে লাগিল; আর তাহার শীর্ণ আননে চক্ষু দুইটি জ্বালাময় দীপ্তি লাভ করিতে লাগিল। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সে জীবনের সেই ভীষণ ভ্রমের কথা না ভাবিয়া থাকিতে পারিত না।—প্রথমে নদীতীরে সহসা সেই যৌবন-প্রারম্ভপদার্পিতার সহিত সাক্ষাৎ;—হৃদয়ের কোন কোণে কোথাও আরও অগ্রসর হইবার জন্য কৌতূহল;—যুবতীর হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার;—সেই জ্যোৎস্নালোকসমুজ্জ্বল নিশিতে যুবতীর সহিত সাক্ষাৎ;—তাহার জন্য যুবতীর গৃহত্যাগ—সে সকলই তাহার মনে পড়িত। যুবতী তাহার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ করিবার পর সে আর তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। তাহার পর এত বর্ষ গিয়াছে,—সে ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার পর—রঙ্গালয়-পার্শ্বে জীর্ণকুটীর-দ্বারে সেই পরিবর্ত্তিত পাপ-ছায়াব্যাপ্ত আনন!

এই সকল স্মৃতি হীরালালের হৃদয়ে ভীষণ যন্ত্রণা জ্বালাইয়া তুলিত। এই দুশ্চিন্তা-জ্বালাই নরক;—মানবের কল্পনাসৃষ্ট শারীরিকযন্ত্রণাগার নরক ইহার নিকট তুচ্ছ।

হীরালাল বরাহনগর হইতে পলাইতে চাহিল; ভাবিল, হয় ত অন্যত্র গেলে একটু সুস্থ হইতে পারিবে। কিন্তু মহিমচন্দ্র তাহাকে এত শীঘ্র যাইতে দিতে চাহিলেন না। অগত্যা হীরালাল সেখানেই রহিয়া গেল।

৪

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। এখনও নৈশ অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে নাই। বরাহনগরের প্রান্তে এক জন রমণী নদীর দিকে যাইতেছে; তাহার সঙ্গে একটি লোমশ কুক্কুর নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে। আমরা আপনার পাপে লিপ্ত হইয়াও পাপীকে ঘৃণা করি;—পাপীকে যত ঘৃণা করি, পাপকে তত ঘৃণা করি না; পশুরা বোধ করি পাপকে ঘৃণা করে, কিন্তু তাহারা আনা-

দের মত পাপীকে ঘৃণা করে না। আমরা সৃষ্টির শীর্ষস্থানে অবস্থিত,—আমরা উত্তম,—তাহারা অধম।

সেই দিন রঙ্গালয়ের অভিনয়ান্তে হীরালালকে দেখিবার পর হইতে দিন বিনোদিনী কেবল কাঁদিয়াছে, কেবল ভাবিয়াছে। পাপের প্রতি কোনও আকর্ষণই ছিল না। যখন যৌবনপ্রারম্ভে সে হীরালালকে ভালবাসিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তখন সে সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা। আসিয়া দেখিল, আর ফিরিবার উপায় নাই, বুঝিল, যে ভ্রম করিয়াছে, সমাজের চক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয়,—রমণীর পক্ষে তাহা সংশোধনের আর উপায় নাই। তাহার পর—পিচ্ছিল পাপ-পথ হইতে ফিরাইবার কেহ না থাকিলে, প্রায় কেহ ফিরিতে পারে না;—বিনোদিনীও ফিরিতে পারে নাই।

এ কয় দিন ভাবিয়া ভাবিয়া বিনোদিনী কি স্থির করিয়াছিল। যেখানে তাহার পিত্রালয় ছিল, আজ সে সেইখানে আসিতেছিল। গ্রাম-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র নালা। বর্ষার পর দুই তিন মাস তাহাতে একটু জল থাকে, তাহার পর জল শুকাইয়া গেলে তৃণগুল্মাদি জন্মে। এখনও সে নালায় একটু জল বাধিয়া ছিল। এক জন রমণী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া নালা পার হইতেছিল; জননী কৌতুকচ্ছলে পুত্রকে জলে ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, পুত্র ভয় পাইয়া জননীকে ধরিতেছিল; তখন জননী হাসিতে হাসিতে পুত্রের মুখচুম্বন করিতেছিল, শিশুও ভয় ভুলিয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া বিনোদিনী কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার ব্যর্থ নারী-জীবনে সন্তানের স্পর্শ সুখ-লাভ হয় নাই। জগতে তাহার আপনার বলিবার কেহ নাই! তাহার রুদ্ধ অপত্যস্নেহ গৃহপালিত কুক্কুরকে ভালবাসিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সন্তানের স্নেহস্পর্শলাভের জন্য তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

রমণী নালা পার হইয়া গেল।

বিনোদিনীও ধীরে ধীরে নালা পার হইল। তাহার পালিত [illegible] চীৎকার দিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নালা পার হইয়া অপর পারে উপনীত হই[illegible]

সান্ধ্য অন্ধকার চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বি[illegible] গ্রাম-প্রান্তে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িল।

৫

ক্রমে নিশা গভীর হইল; কৃষ্ণপক্ষের নবমীর চন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া রজত-কিরণ [illegible] লাগিল। বৃক্ষতল হইতে উঠিয়া বিনোদিনী গ্রামপ্রান্তে

মধ্য দিয়া গ্রামের অপর প্রান্তে নদীকূলে যেখানে তাহার পিত্রালয় ছিল, ... গেল। এখন সেখানে আর গৃহ নাই; কেবল শূন্য ভিটা সেই স্থান ...রিয়া দিতেছে। এখন বামে অদূরে সুপ্তগ্রামে সকল কোলাহল ...য়া গিয়াছে, সম্মুখে নদী মন্দস্রোতে বহিয়া যাইতেছে, দক্ষিণে ও পশ্চাতে ...বিরল প্রান্তরে ঝিল্লীরব উঠিতেছে। সেই ভিটার উপর বসিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল,—হয় ত তাহারই জন্য ঘৃণায় লজ্জায় তাহার পিতা মাতা গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন,—কোন্ বিদেশে,—আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে দূরে না জানি তাঁহাদের কি হইয়াছে! সেই শূন্য ভিটার মৃত্তিকার উপর পড়িয়া বিনোদিনী অসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে তাহার নেত্রে অশ্রু বাহির হইল—বিনোদিনী কাঁদিতে লাগিল। পিতা মাতার সেই সুখময় সংসারের কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। শৈশবের, বালিকা-বয়সের, যৌবনারম্ভের সেই সুখময় জীবনের কথা ভাবিয়া বিনোদিনী ব্যাকুলা হইয়া উঠিল। তাহার পর—এই ঘৃণিত পাপের জীবন! হীরালালের সহিত সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা তাহার মনে পড়িল—বিনোদিনী শিহরিয়া উঠিল।

বিনোদিনী সেই সকল কথা ভাবিতে লাগিল, আর বালিকা-বয়সে একবার-মাত্রদৃষ্ট স্বামীর মূর্ত্তি তাহার মনশ্চক্ষুর সমক্ষে দিব্য জ্যোতিশ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাকে মৃতা ভাবিয়া একটা শৃগাল তাহার নিকট পর্য্যন্ত আসিল; কিন্তু পার্শ্বেই কুকুরটিকে দেখিয়া চলিয়া গেল।

বিনোদিনী বহুক্ষণ কাঁদিল; কত ক্ষণ কাঁদিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই,—চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রালোক ম্লান হইয়া আসিতেছে। উঠিয়া সে অদূর-প্রবাহিতা জাহ্নবীর কূলে আসিয়া দাঁড়াইল। কুকুরটি তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল—সে এখন তাহার চরণে আপনার কোমল তনু ঘর্ষণ করিল। বিনোদিনী ... দেখিল;—সে কুকুরের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

...রটির দিকে চাহিয়া বিনোদিনী বলিল, "তোকে আর কাহার ...য়া যাইব? জগতে কাহাকেও বিশ্বাস নাই।" সে আপনার অঞ্চল ... ছিন্ন করিয়া লইল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ইষ্টকের মধ্যে একখানি কু... ...ইয়া অঞ্চলের ছিন্ন অংশ দিয়া কুকুরটির গলে বাঁধিয়া দিল; তাহার পর ...কে তুলিয়া বেগে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। শূন্যে একটি বক্র রেখা অঙ্কিত করিয়া চীৎকার করিয়া কুকুরটি জলে পড়িল;—শ... ...য়া চারি দিকে ...জল ছিটাইয়া পড়িল। হতভাগ্য মরণাহত জীব উঠিবার ... প্রাণপণ

চেষ্টা করিল; তাহার মস্তকের অগ্রভাগ জলের উপর দে[illegible]হার পর ইষ্টকের ভারে সে ডুবিয়া গেল। জলে কয়েকটি বুদ্বুদ উঠিল—কতকগুলি বৃত্ত কূলের দিকে আসিতে আসিতে ক্রমই নাদৃৎ হইতে হইতে মিলাইয়া গেল। নদীস্রোত আবার পূর্ব্বের মত বহিতে লাগিল।

বিনোদিনীর হৃদয় যন্ত্রণাকুল হইয়া উঠিল। সে নদীকূলে বসিয়া পড়িল। নদীর তরঙ্গমালা তাহার পদতল স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার অশ্রুর উৎস শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—নেত্রে আর অশ্রু আসিল না। তাহার শীর্ণ আননে অশ্রুহীন উজ্জ্বল নয়নদ্বয় সর্পিণীর মস্তকস্থিত মণির মত জ্বলিতে লাগিল। সেই ম্লানচন্দ্রালোকবিভাবিত নিশাশেষে, জন-সমাগমবিহীন প্রান্তর-প্রান্তে নদীতীরে তাহাকে যেন প্রেতলোকবাসিনী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

বিনোদিনী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল—শরীরের [illegible] বল একত্রিত করিয়া সে নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িল। চারি দিকে জল উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কতকগুলি বড় বড় তরঙ্গ উঠিয়া নদীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর আবার নদী পূর্ব্বের মত কলকলনাদে বহিতে লাগিল।

৬

পরদিন প্রভাতে মেঘমুক্ত গগনে অম্লানোজ্জ্বল সূর্য্যোদয় হইল। প্রভাতী-চা-পানের পর হীরালাল ও মহিমচন্দ্র একখানি ছোট নৌকায় গঙ্গাবক্ষে জল-ভ্রমণে বাহির হইলেন। শরতের প্রভাতে রৌদ্র উপভোগ-যোগ্য মধুর,—আশুধান্য কাটা হইয়া গিয়াছে, নদীর দুই কূলে কৃষকের গৃহে গোলা পূর্ণ—গৃহপ্রাঙ্গণে শিশুদিগের আনন্দ-কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে। তরণী উজান বহিয়া চলিতে লাগিল।

সহসা মহিমচন্দ্র দেখিলেন, দূরে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি মাঝিদিগকে একটু বেগে নৌকা বাহিতে আদেশ করিলেন। সকলে সেই ভাসমান পদার্থটার দিকে চাহিয়া রহিল। নৌকা একটু অগ্রসর হই[illegible] [illegible] যে, গঙ্গার মন্দ স্রোতে একটি শবদেহ ভাসিয়া আসিতেছে। [illegible] [illegible]কটু অগ্রসর হইলে মহিমচন্দ্র বলিলেন, "স্ত্রীলোক।"

হীরালাল চমকিয়া উঠিল। সে বলিল, "শব দেখিয়া আর কি হইবে? চল ফিরিয়া যাই।"

মহিমচন্দ্র বলিলেন, "যদি অল্পক্ষণ ডুবিয়া থাকে, তবে হয় ত [illegible] [illegible] আউক।"

কাব্যোপযোগী গুরুত্ব আদৌ অনুভব করিতেন না। কার্লাইলের Everlasting Yea বা Everlasting Nay আমাদেরই নিকট অনেক সময় অপূর্ব্ব প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা শুনিলে হয় ত উহাকে 'চবৈতুহি'-বৎ প্রত্যাখ্যান করিতেন।

সুতরাং প্রাচীনের দল কার্লাইলের অনুমোদিত পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ না হইলেও, উহা তাঁহাদের পক্ষে তাদৃশ নিন্দার কথা নহে। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা এখানে ইন্দ্রিয়পরতার সমর্থন করিতেছি না। ইন্দ্রিয়পরতা, সেকালেরই হউক বা একালেরই হউক, সর্ব্বকালেই সমান নিন্দনীয়। কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের সময়কার সমাজ ও সাধারণ মতের আলোচনা করিয়া, কবির অপরাধ তাঁহার পাঠক-বর্গের ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ সমালোচনায় কবির গৌরব কিছুমাত্র বর্দ্ধিত হয় না। আমরা বড় জোর একটু [illegible] প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি,—"আহা, ভারতচন্দ্র যদি কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ[illegible] পঙ্কিল প্রবাহে ভাসিয়া না যাইতেন!" কিন্তু ইহা করুণারই অভি[illegible]ক্তি,—হৃদয়ের স্বতঃ-উৎসারিত সাধুবাদ নহে।

প্রতিভাশালী পুরুষগণ আপন আপন সময়ের দ্বারা কিয়দংশে নিয়মিত হইলেও চিরদিন উহার অগ্রবর্ত্তী। ব্যক্তিবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠতার সম্বন্ধে সন্দিহান হইবারই কথা। সুতরাং যাঁহারা উপরি-লিখিত যুক্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া আপনাদের উপাস্য কবির জয় ঘোষণা করিতে চান, তাঁহাদের একটু সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রাচীনের দল ছাড়িয়া দিয়া, আধুনিক যুগের অগ্রণী, বঙ্গের কাব্যবীর মধুসূদনেও কার্লাইল-প্রোক্ত আধ্যাত্মিকতার কোনও সন্ধান পাই না। তবে ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, তাঁহার রচনায় পার্থিবতার বাহুল্য থাকিলেও তিনি তাঁহার মহাকাব্যে কুত্রাপি কুরুচি বা কুনীতির প্রশ্রয় দেন নাই। মেঘনাদবধ-পাঠে কাহারও হৃদয়-মন কলুষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার হস্তে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা-স্বরূপ রাম ও লক্ষ্মণের নির্য্যাতন দেখিয়া আমাদের জাতীয় ভাব সংক্ষোভিত হইলেও, আমরা তাঁহার মেঘনাদের বীরত্বে সহজেই মুগ্ধ হইয়া পড়ি। কিন্তু বঙ্গের প্রিয় কবি তাঁহার বীরাঙ্গনা-নির্ব্বাচনে যে দুই [illegible] বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাহার কোনও প্রকার মার্জ্জনা [illegible]ত পাই না। "বীরাঙ্গনা"-বর্ণিত "তারা" বা "অহল্যার" চরিত্র [illegible] [illegible]দানতার ফল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, উহারা তাঁহার পবিত্র কাব্যের [illegible]

পনের কলঙ্ক। কামুকতার পরিণাম না দেখাইয়া কেবল উহার সাফল্যমাত্র বর্ণনা করিলে কাব্যের উদ্দেশ্য একবারে বিফল হইয়া যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কবিবর হেমচন্দ্রের হৃদয়ই আধুনিক যুগের এই জীবন-সমস্যার আবর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হেমচন্দ্রের প্রথম বয়সের "চিন্তাতরঙ্গিণী" হইতে তাঁহার শেষ বয়সের "দশমহাবিদ্যা" পর্য্যন্ত পরিচয়-স্থল। এতদ্ভিন্ন বহুতর খণ্ডকবিতাতেও ইহার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাঁহার "জীবন-মরীচিকা", "গঙ্গার মূর্ত্তি" প্রভৃতি উল্লিখিত হইতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাহিত্যের সমালোচকগণ যাহাকে "The malady of the age" বলেন, কবির বাঙ্গালী যুবাও সেই পীড়ায় পীড়িত। তরুণ-বয়স্ক কবি তখন এই নবীন ব্যাধির ঔষধনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া, তাঁহার কাব্যের নায়ককে আত্মহত্যা দ্বারা ইহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "দশমহাবিদ্যার" কবি আত্ম-বিশ্বাসানুসারে এই কঠোর সমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন। তিনি আশ্বাস দিতেছেন,—

"না হও নিরাশ, ওরে ভক্তিমান!
মোচন আছে রে আপদে।"

পরন্তু—

"জীব-জন্মে ভয় কি রে? জগদম্বা জননী!

জীবজন্ম অশেষ দুঃখের নিদান, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক দিন সে অশেষ দুঃখেরও অবসান হইবে। যত দিন তাহা না হয়, এস, আমরা জীবন-মরণের অধিষ্ঠাত্রী সেই জীব-জননীর উপর নির্ভর করিয়া স্বধর্ম্ম সাধনে নিরত হই। জীবন-সমস্যার এই মীমাংসা যে অতি সহজ ও সবল, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস যে, "দশমহাবিদ্যা"-পাঠে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালী-যুবক উদ্বেল চিন্তা-সমুদ্রের কূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ জন্য আমরা কবিকে আন্তরিক প্রশংসাবাদ করিতেছি। আশা করি, তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে বিলুপ্ত হইলেও, একমাত্র "দশমহাবিদ্যা" তাঁহাকে চিরদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে অমর করিয়া রাখিবে।

হেমচন্দ্রের পর বাঙ্গালা-সাহিত্যের কবি, নবীনচন্দ্র। ইনি প্রথম জীবনে যৌবন-বৃত্তি লইয়া এত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ইহার লেখনীমুখে যৌবন ও ভোগের কথা ছাড়া আর কোনও কথাই বড় একটা শুনা যাইত না। তৎপরে ইনি "পলাশীর যুদ্ধ" ও "রঙ্গমতী" কাব্যে দেশের দুর্দ্দশায় কাঁদিয়া বীণাপাণির

চরণে পূর্ব্বকৃত অপরাধভঞ্জনের চেষ্টা করেন। সম্প্রতি ইঁহার লেখনীর গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের বরাবর এই আশা ছিল যে, নবীন বাবুর নবীন কাব্যত্রয়ে মানবের জীবন-গত বিবিধ সমস্যার এক সুসঙ্গত ও সমীচীন মীমাংসা দেখিতে পাইব। কিন্তু কবি ইহাদের ভিতর, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, বিশ্বাস ও যুক্তিমূলক এত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বের সমাবেশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের একটা সুশৃঙ্খল সমন্বয় করিতে পারা যায় না। আমরা কথাটা কেবল বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। পাঠকবর্গ যদি ইহার প্রমাণ দেখিতে চান, তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করিবেন। পণ্ডিতবরের সহিত সর্ব্বাংশে একমত হইতে না পারিলেও, আমরা তাঁহার পুস্তকখানি আগ্রহসহকারে পাঠ করিয়াছি। মূল গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করিয়া এবং পাঁড়ে মহাশয়ের সমালোচনা দেখিয়া, নবীন বাবুর শেষ বয়সের সাহিত্য-সন্তানগুলি যে কোনও কালে লোকানুরাগ উপার্জ্জন করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, কবির "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", বা "প্রভাস" বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হইলেও, এবং বাঙ্গালী পাঠকেরা চিরদিন তাঁহাকে কেবলমাত্র "পলাশীর যুদ্ধের" কবি বলিয়া পরিচিত করিলেও, কবির আক্ষেপ করিবার কোনও কারণ নাই। তিনি এই গ্রন্থত্রয়ে কৃষ্ণনাম করিবার যে অজস্র অবসর পাইয়াছেন, ইহাই [illegible] সৌভাগ্যের বিষয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিবার পূর্ব্বে কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথই বাঙ্গালার বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ কবি। কারণ, মকদ্দমার সময় অর্থসামর্থ্য থাকিলে উকীল হেম বাবুকে এখনও পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কাব্যরসের পিপাসা হইলে তন্নিবারণার্থ কবি হেমচন্দ্রের আর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যে কবি বিহারীলাল যে নূতন সুর প্রবর্ত্তিত করেন, রবীন্দ্র বাবু তাহাকেই বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন। শিষ্যের বিশালতা অবশ্য গুরুতে ছিল না। কিন্তু এই বিশালতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র বাবুর কাব্য-গ্রন্থাবলীতে কার্লাইল-উল্লিখিত জীবন-রহস্য বা Gospel-tidings এর কথা বড় বেশী শুনা যায় না। তাঁহার সুকুমার লেখনী স্ত্রীপুরুষপ্রেমের বিলাসলালসাময় বিবিধ চিত্রাঙ্কনের যেরূপ উপযোগী, অপর কোনও বিষয়ের বর্ণনায় সেরূপ নহে। আমরা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার করিতেছি না। তাঁহার পার্থিবতা যে আধ্যাত্মিকতাকে

পরাজিত করিয়াছে, কেবল সেই কথাই বলিতেছি। এখানে তিনি নিজেই নিজের নিকট পরাজিত। নতুবা, অনেক সুকবি যে বিষয়ের সান্নিধ্যে পৃথিবী ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তিনি সেখানেও আধ্যাত্মিকতার অতলতলে প্রবেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইংরাজ কবি বায়রণের সমুদ্র-সম্বোধনের সহিত আমাদের কবির "সমুদ্রের প্রতি" শীর্ষক কবিতার তুলনা করা যাইতে পারে। কাহারও মনে ক্লেশ-উৎপাদনের ভয়ে দেশীয় দৃষ্টান্ত দিলাম না; নহিলে তাহারও অভাব নাই।

আমরা নিম্নে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অস্থিরতার বর্ণনা একটু উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ পাশ ও পাশ,
চক্ষে বহে অশ্রুধারা, ঘন ঘন বহে উষ্ণ শ্বাস,
নাহি জানে কি যে চায়, নাহি জানে কিসে ঘুচে তৃষা,
আপনার মনোমাঝে আপনি সে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে।"

এ বর্ণন বড়ই করুণ, বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। "The malady of the age". এর এরূপ জীবন্ত ছবি অন্যত্র দুর্ল্লভ। কেবল, "এ পাশ ও পাশ" এই দুইটা ছন্দোহীন কথায় কিঞ্চিৎ রসভঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার করি।

হেমচন্দ্রের ন্যায় তত দূর আশান্বিত না হউন, রবীন্দ্রনাথ একবারে নিরাশাস নহেন। রবীন্দ্রনাথ "আরও কোথা? আরও কত দূর?" অথবা "হয় ত ঘুচিবে দুঃখ-নিশা" এইরূপ প্রশ্নাত্মক বা সন্দেহাত্মক বাক্যে উপসংহার করেন। হেমচন্দ্রের ন্যায় "মাভৈঃ মাভৈঃ" রবে প্রোৎসাহিত-কণ্ঠে আমাদের উদ্বেলিত হৃদয়ের উপকূলে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার সাহস হয় না। তা' না হউক, তাঁহারও গভীর অভয়-বাণী বড় অল্প উৎসাহপ্রদ নহে,—

"জীবন-কণ্টক-পথে যেতে হবে নাববে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি
সুখী করি সর্ব্বজনে। তার পরে দীর্ঘপথ-শেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্ত পদে রক্ত-সিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে

দুঃখহীন নিকেতনে। প্র[illegible]নে মন্দ হেসে
পরাবে মহিমালক্ষ্মী ভক্ত-কণ্ঠে বরমাল্যখানি,
করপদ্ম-পরশনে শান্ত হবে সর্ব্ব দুঃখগ্লানি
সর্ব্ব অমঙ্গল। লুটাইয়া রক্তিম চরণতলে
ধৌত করি দিব পদ আজন্মের রুদ্ধ অশ্রুজলে।"

যিনি এরূপ আশার কথা শুনাইতে পারেন, তিনি যে চির-নিগৃহীত বাঙ্গালীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

বায়ুর অল্পতা।

আধুনিক সভ্যতার উন্নতি এবং লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত জীবনী-শক্তিপোষক প্রাকৃতিক ভাণ্ডার ক্রমেই শূন্য হইয়া যাইতেছে। ভূগর্ভস্থ কয়লার আজকাল যে প্রকার অসম্ভব ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে অপর ব্যবস্থা না হইলে, সম্ভবতঃ ইন্ধনাভাবে অনেক কল-কারখানার কার্য্য অদূর ভবিষ্যতেই স্থগিত রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে অধিক চিন্তার বিষয় কিছুই নাই,—সর্ব্বশক্তির আধারভূত মহিমাময় সূর্য্য শক্তিহীন না হইলে, মানব বুদ্ধিপ্রভাবে সূর্য্যের নানা শক্তি, অনায়াসেই কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিবে। অধুনা সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানবিদ্গণ বলিতেছেন, আজকাল বায়ুর যে প্রকার অপব্যবহার হইতেছে, তাহাতে সম্ভবতঃ দূর ভবিষ্যতে, স্বাস্থ্যকর বায়ুর অভাবে, পৃথিবী জীবশূন্য হইবে। জগতে বায়ুর ভাণ্ডার ক্ষয়শীল,—এই জন্য এই ভয়ানক প্রশ্নটি সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ আচার্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

বায়ুর প্রধান উপাদান অক্সিজেন্ বা অম্লজান বাষ্পই জীবগণের প্রাণস্বরূপ। প্রাণিগণ শ্বাসগ্রহণকালে, অক্সিজেন্ বাষ্প শরীরস্থ করিয়া জীবনধারণ ক[illegible] এ[illegible] প্রশ্বাস কার্য্য দ্বারা কার্ব্বণিক আসিড্ নামক এক বিষাক্ত বাষ্প [illegible]বায়ুতে পরিত্যাগ করে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলেও, ঠিক্ এই প্রকার কার্য্য হয়;—অগ্নিসংস্পর্শে বায়ু বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার প্রধান উপাদান অম্লজান বহিস্তোজ্য হইয়া পড়ে,—এবং প্রাণ-বায়ুর পরিবর্ত্তে, অগ্নি উক্ত কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প উদ্গিরণ করে। অ[illegible] এই অবিরাম ক্ষয়পূরণের উপায়

আছে,—নচেৎ অল্পকাল মধ্যে জগৎ প্রাণিশূন্য হইত। অতীব ক্ষুদ্র তৃণ হইতে, বিশাল বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ উদ্ভিদ নিয়তই এই ক্ষয়পূরণ করিতেছে। উদ্ভিদগণ তাহাদের শ্বাসযন্ত্র দ্বারা জীবপ্রশ্বাসজাত সেই বিষাক্ত বাষ্প গ্রহণ করে, এবং তাহা হইতে দেহপোষক অঙ্গার নামক পদার্থ শরীরস্থ করিয়া, নির্ম্মল অক্সিজেন বাষ্প প্রশ্বাসরূপে ত্যাগ করে। এই প্রথায় বায়ুর নির্ম্মলতা রক্ষিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন,—উদ্ভিদের এই ক্ষয়পূরণশক্তির একটা সীমা আছে। পৃথিবীর লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত ধরাপৃষ্ঠস্থ নানা স্থানের বৃহৎ অরণ্য সকল যেরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে যে সেই শক্তি ক্রমেই লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—তাহা অসঙ্কোচে বলা যায়। পক্ষান্তরে, লোকবৃদ্ধি ও কলকারখানার উপদ্রবে, ক্ষয়সীমা ক্রমিক বিস্তার লাভ করিতেছে। এই জন্যই পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, দূর ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যকর বায়ুর অভাবে বর্ত্তমান সৃষ্টির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

এই প্রশ্নটি লইয়া, অনেকদিন অবধি বৈজ্ঞানিক সমাজে বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সম্প্রতি লর্ড কেল্‌ভিন্ প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ সমবেত হইয়া, পৃথিবীর সমগ্র জীব দ্বারা অম্লজান বাষ্পের কত ক্ষয় হইতেছে, তাহার একটা স্থূল হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন। স্থূলতঃ পৃথিবীতে ১৪৪ কোটি লোকের বাস। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা অহোরাত্রে প্রায় দেড় পাউণ্ড অম্লজান বাষ্প নষ্ট করে। এই অনুপাতে প্রতিবৎসর কেবল মানবজাতি দ্বারা ৪০ কোটি টন্ অক্সিজেন নষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীতে প্রায় ১০৪ কোটি গবাদি প্রাণী বর্ত্তমান; ইহাদের শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য্যে, মনুষ্যব্যয়িত অম্লজান অপেক্ষা অনেক অধিক বাষ্পের ক্ষয় হয়। এই হিসাবে প্রতি বৎসর সার্দ্ধ সাতষট্টি কোটি টন্ অম্লজান নষ্ট হইতেছে। কলকারখানার অগ্নি দ্বারা কত অম্লজানের ক্ষয় হয়, তাহারও গণনা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তিন টন্ পরিমিত পাথুরিয়া কয়লা দগ্ধ করিতে প্রায় আট টন্ অম্লজানের আবশ্যকতা হয়; সমগ্র জগতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৫০ কোটি টন্ কয়লা বা অপর ইন্ধন দগ্ধ হইয়া থাকে,—এই অনুপাতে প্রতিবৎসর অক্সিজেনের সমবেত ক্ষয় প্রায় [illegible] কোটি টন্ হইয়া পড়ে। অরণ্যাদি ধ্বংস করায়, অম্লজান-উৎপত্তির যে [illegible] হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অধিক; কিন্তু তাহার একটা স্থূল ইয়ত্তা করাও দুঃসাধ্য। লর্ড কেল্‌ভিন্ বলেন, বায়ুর এই ক্রমিক অম্লতা বৃদ্ধি পাইলে, শীঘ্রই ইহার কুফল ফলিবে—অবথা অগ্নিপ্রজ্বলন ও অরণ্যাদিধ্বংস নিবারিত না হইলে আর রক্ষা নাই।

যমজকৌতুক।

কোন কোন রমণীর গর্ভে এককালে দুইটি শিশুর জন্ম হয়। কখন কখন দুইটিই পুত্র বা কন্যা হয়; কখন একটি পুত্র এবং অন্যটি কন্যা হইয়া থাকে। মাতৃগর্ভে যমজসন্তানোৎপত্তির কোন বৈজ্ঞানিক কারণ এ পর্য্যন্ত নিঃসংশয়িত-রূপে নির্ণীত হয় নাই। আমাদের বঙ্গান্তঃপুরের মধ্যে একটা সাধারণ প্রবাদ এই যে, সতী-দাহে স্ত্রীপুরুষ একত্র ভস্মীভূত হইয়া জন্মান্তরে একত্রই মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে। এ যুক্তির খণ্ডন কিম্বা ইহার প্রতিবাদ করিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি আমাদের নাই; এবং অন্য দেশের রমণী-সমাজে এরূপ কোন অমোঘ যুক্তি আছে কি না, তাহাও আমাদের অবিদিত।

যমজের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন বিলাতী লেখকের রচনা হইতে যমজ-সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি কৌতুকজনক তথ্য সংগ্রহ করিয়া এখানে প্রকাশ করিতেছি।

যমজ সন্তানদ্বয়ের (তা পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক) স্বাস্থ্য এবং মনোভাব প্রায়ই অভিন্ন হইয়া থাকে। অনেক সময়েই দেখা যায়, এক জনের যে রোগ হয়, শীঘ্র কিম্বা বিলম্বে, অন্যটিও তাহাতে আক্রান্ত হয়; এ বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ইংলণ্ডের কোন পল্লীতে একবার দুইটি যমজের জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি তাহার পিতার সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল; কিছু দিন পরে হাম-জ্বর হইয়া সে তিন সপ্তাহকাল শয্যাগত থাকে। তাহার যে ভাই ইংলণ্ডে ছিল, অল্প-কাল পরে তাহারও হাম-জ্বর দেখা দিল। যাহা হউক, পরে এই রোগ হইতে উভয়েই আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

কয়েক মাস পরে ইংলণ্ডবাসী ভ্রাতাটি মস্তিষ্ক-রোগে আক্রান্ত হইল। এই ঘটনার অনতিবিলম্বে তাহার অভিভাবক সংবাদ পাইলেন যে, তাহার ভারত-প্রবাসী ভ্রাতারও ঠিক সেই প্রকৃতির মস্তিষ্ক-বিকার হইয়াছে। এই উভয় ভ্রাতার স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না; সাত বৎসর পরে অতিসার রোগে এক দিনেই উভয়ের মৃত্যু হয়।

লেখক বলেন, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যমজ-সন্তানদ্বয়ের উভয়েই সমরোগে আক্রান্ত হইবে, হয় ত অল্প বিস্তর পরিমাণে তাহাদের পৈতৃক

রোগের ফল হইতে পারে, কিন্তু যমজ না হইলে সন্তানগণের অন্ততঃ এক জনেরও তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা অসম্ভব নহে।

লেখক আর দুইটি যমজের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা ভাই বোন। পরস্পরের প্রতি তাহাদের অসাধারণ স্নেহ ছিল, তাহারা উভয়ে যেন এক দেহের বিভিন্ন অংশ, একজনের যে কোন পীড়া হউক, এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত ধরিলে অন্তে নিজের দেহে তাহা অনুভব করিতে পারিত। উভয়ে এক স্থানে বাস করিলেও অন্ততঃ মনে করা যাইত যে, সহানুভূতিবশে এক জন স্ব-শরীরে অন্যের অসুখ অনুভব করে। কিন্তু বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তাহাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইত না, এবং তাহারা শতাধিক মাইল ব্যবধানে বাস করিত; তাহাদের মধ্যে যে চিঠিপত্র চলিত, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত, উভয়ের শরীর এক সময়েই সুস্থ বা অসুস্থ থাকিত। এবং এক-জন অন্যকে প্রায়ই লিখিত, "আজ বোধ করি তোমার শরীর ভাল নাই।" "আমি বুঝিতে পারিতেছি, তুমি এখন আমাকে পত্র লিখিতেছ।"

ভাই লণ্ডনে থাকিত, আর ভগিনীটি কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে বাস করিত। একদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় ভাই একখানি গাড়ী হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলে। আঘাত এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, কোন সন্নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে তাহাকে কয়েক দিন শয্যাগত থাকিতে হয়। ইতি-মধ্যে তাহার বাসার ঠিকানায় তাহার ভগিনীর নিকট হইতে একখানি পত্র আসে, পত্রখানি সেই দুর্ঘটনার দিন সন্ধ্যাবেলা লেখা। অন্যান্য কথার পর সে ভাইকে লিখিয়াছে, "জন্, তুমি কি বাতের কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছ? আজ বিকাল হইতে আমার বামপদে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে, এ বেদনার কোন কারণ অনুমান করিতে পারিতেছি না, ইহা বাত নয় ত?" অবশেষে এই বালিকার পদের বেদনা এরূপ বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাকে অগত্যা শয্যাবলম্বন করিতে হইল; ভ্রাতার অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার চিত্ত অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেও এই আকস্মিক বেদনার জন্য তাহাকে দেখিতে লণ্ডনে আসিতে পারে নাই। [illegible]ক, বালিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভ্রাতার আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া [illegible] পদের বেদনার কারণ বুঝিতে পারিল; কয়েক দিন পরে উভয়ের বেদ[illegible] [illegible]রোগ্য হইয়াছিল।

[illegible] এই যমজদ্বয়ের জীবনের একটি ঘটনা অতীব বিস্ময়জনক। [illegible] কাল পরে ট্রান্সভালে ভাইটির মৃত্যু হয়। তখন সকলেই মনে করিল [illegible]

বিলম্বে হউক, তাহার ভগিনীও নিশ্চয় মারা পড়িবে। এরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। ভ্রাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বালিকার স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল; এমন কি, তাহার উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিল না। কিন্তু বালিকার মৃত্যু হইল না, সে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিল, অবশেষে খুব হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তাহার বিশ্বাস, ভ্রাতা মৃত্যুর পর তাহার রোগপ্রবণতা ও দুর্ব্বলতা গ্রহণ করিয়া নিজের স্বাস্থ্য এবং বলটুকু দান করিয়া গিয়াছে।

যমজদ্বয়ের আকারের অভিন্নতা চিরপ্রসিদ্ধ। পুত্র ও কন্যা হইলে মুখাবয়বের সৌসাদৃশ্যই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু উভয়ে যদি পুত্র বা কন্যা হয়, তাহা হইলে তাহাদের আকারগত পার্থক্যের প্রভেদ করা অনেক সময়েই দুরূহ হইয়া উঠে।

দুইটি যমজ আকারে এরূপ অভিন্ন ছিল যে, তাহাদের পিতামাতারও গোলমাল বাধিত। তাহাদের স্বরূপনির্ণয়ে যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, এ জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা স্বতন্ত্র আকার বা বর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করান হইত। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইত, এক জন অপর অপেক্ষা আধ ইঞ্চি লম্বা এবং অতি সামান্য কালো। কিন্তু এই পার্থক্য সহসা কাহারও নজরে পড়িত না, তাই তাহারা দু' ভাই পরস্পরের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক সময়ে সময়ে কৌতুক করিত। অন্য লোক দূরের কথা, ইহাতে তাহাদের আত্মীয়, প্রতিবেশী এবং পিতামাতা পর্য্যন্ত প্রতারিত হইত।

একবার দেড় মাসের জন্য ইহাদের এক জন ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং অন্যটি লিড্‌সে স্থানান্তরিত হয়। একদিন এক জন স্থানীয় রেলওয়ে-ষ্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দ্বারদেশে সম্মুখেই তাহার যমজ ভ্রাতাকে দেখিতে পায়; এই দ্বিতীয় ব্যক্তির তখন সেখানে উপস্থিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ভ্রমক্রমে হয় ত কোন বৃহৎ আয়নার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তাহারা উভয়েই যুগপৎ পশ্চাতে হটিয়া যায়!

এই ভ্রাতৃদ্বয় একবার আর এক কীর্ত্তি করিয়াছিল। তাহারা দু জনেই স্বতন্ত্র আফিসে কেরাণীগিরি করিত। এক দিন কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা পরস্পর অদল বদল করিয়া আফিসে গেল; প্রথমে কেহই তাহাদের এই ছলনা ধরিতে পারে নাই, কিন্তু দু জনের হস্তাক্ষর অভিন্ন না হওয়ায়, বিশেষতঃ এক জনের অভ্যস্ত কর্ম্মে অন্যের পারদর্শিতা না থাকায়, অবশেষে [illegible] পড়িয়া গেল। এই দুইটি প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাদের

আফিসের অধ্যক্ষ কিংবা কর্ম্মচারিগণ কখন এই রহস্যের ভেদ করিতে পারিত না।

আর একবার দুই যমজ ভগিনী লইয়া বড় গোল হইয়াছিল। তাহাদের উভয়ের মধ্যে অকৃতিগত এতই সাদৃশ্য ছিল যে, তাহাদের গর্ভধারিণী পর্য্যন্ত তাহাদের লইয়া ভয়ানক ভুল করিয়া বসিয়াছিল। এই ভ্রমও অল্প রহস্যজনক নহে।

অতি শৈশবাবস্থায় যখন তাহারা কথা কহিতে পারিত না, সেই সময়ে তাহাদের মা তাহাদিগকে ঘরে শয়ন করাইয়া কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। মা ফিরিয়া আসিয়া দেখে, শয্যা হইতে কে তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র চুরী করিয়া লইয়াছে; দেখিয়া সে চোরের সন্ধানে ছুটিল, এ দিকে মেয়ে দুটি উঠিয়া বসিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। তখন কাহারও দেহে বস্ত্র ছিল না, উভয়ের মূর্ত্তি অভিন্ন, সুতরাং মা ফিরিয়া আসিয়া দু জনের মধ্যে কোন্‌টি কে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এত দিনও এ ভ্রম নিরাকৃত হয় নাই।

কিন্তু এখানেই এই 'ভ্রান্তিবিলাসের' শেষ নহে। মনে করুন, এই বালিকাদ্বয়ের একটি নাম 'এলিস'। এলিসকে তাহার কোন আত্মীয় বড় ভালবাসিতেন; কয়েক বৎসর হইল, অষ্ট্রেলিয়ার প্রবাসে এই আত্মীয়ের মৃত্যু হইয়াছে; মৃত্যুকালে তিনি এলিসের জন্য কিছু সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন ভাবিয়া দেখুন, এ সম্পত্তি কাহার হস্তগত হইবে? যদি উভয়েই আমি 'এলিস' বলিয়া আদালতে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তরাধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করিতে হাকিমের চক্ষুঃ স্থির হইয়া যাইবে, এবং কোন উকীল ব্যারিষ্টারের কূটতর্কে তাঁহার কিছুমাত্র সাহায্য হইবার সম্ভাবনা নাই। সেকালের কাজীর বিচারেও এ রহস্যের নির্ণয় হওয়া কঠিন। লেখক বলেন, এই ঘটনাটি অবলম্বন করিয়া একখানি উৎকৃষ্ট হাস্যোদ্দীপক প্রহসনের অবতারণা হইতে পারে।

শিশু।

[স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ-রচিত।]

হৃদয়ে পাষাণ-রাশি সরাইয়া সুকোমল করে,
কে তুই নির্ঝর-ধারা ঢেলে দিলি হৃদয়-কন্দরে;
অন্ধকার জীবনের সরাইয়া গাঢ় তমোরাশি,
ঊষার আলোক প্রাণে কে তুই রে জাগাইলি আসি?
স্নেহ-করে জড়াইয়া, স্নেহ-সুধা করাইয়া পান,
কে তুই বিশ্বের প্রাণে খুলে দিলি এ নিরুদ্ধ প্রাণ?
চাহি নি সংসার পানে, নিদারুণ বিতৃষ্ণা তাহায়,
তুই আধ "মা মা" বলে সংসারেতে বাঁধিলি আমায়!
কি দিয়ে, কি হাসি দিয়ে হাসালি এ বিশুষ্ক জীবন,
কি বলে বাঁধিলি তুই এ আমার উদাসীন মন?
ওই ক্ষুদ্র মুখে তোর স্বরগের চারু ছবিখানি,
প্রশস্ত ললাট ওই প্রতিভার খনি অনুমানি।
মরি কি চাহনি চারু, চারু মুখে সোহাগের হাসি,
নবনীত কচি তনু কে বলিবে কেন ভালবাসি?
কবে কোন্ শুভক্ষণে দুখময় হতাশ জীবনে,
ফুটিলি নক্ষত্র তুই হৃদয়ের আঁধার গগনে!
শীতের দারুণ নিশি পোহাইল কিসে কোন্ দিন,
নিবিড় কুয়াসা তার আলোকেতে হয়ে গেল লীন।
পাখী-কলরবে করি পরিপূর্ণ অবনী অম্বর,
প্রভাত-আলোক নিয়ে তুই এলি উজলিতে ঘর।
থাক তবে থাক শিশু এ আঁধার বুক উজলিয়া,
ওই মুখ পানে চেয়ে এ সংসার দেখিব চাহিয়া;
ওই মুখ পানে চেয়ে বিলাইব স্নেহ ভালবাসা,
হৃদয়ে ফুটিবে পুন নির্ব্বাপিত কত সুখ আশা।
ও নিঃস্বার্থ স্নেহনীরে ভাসাইয়া এ হৃদয় মন,
ওই চারু মূর্ত্তিখানি বুকে লয়ে যাপিব জীবন।

মহারাষ্ট্র সাহিত্য।

শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষবৃত্তান্ত ;—বংশ-পত্রিকা-সমালোচন।

মহারাষ্ট্র রাজ্যের সংস্থাপক ছত্রপতি শ্রীশিবাজী মহারাজ যে ভোঁসলে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভোঁসলে বংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মহারাষ্ট্রীয় বখর-লেখকগণ, মুসলমান তওয়ারিখ-রচয়িতৃগণ ও ইংরাজ ইতিহাস-সংকলয়িতৃগণ যাহা লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোনও মহারাষ্ট্রীয় লেখক তৎসমুদয়ের সমন্বয় পূর্ব্বক ঐতিহাসিক মীমাংসা করিবার জন্ত যত্নবান্ হন নাই। এই কারণে, বর্ত্তমান প্রস্তাবলেখক বঙ্গদেশের ন্যায় দূরদেশে থাকিয়া, উক্ত মহারাষ্ট্ররাজবংশের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তদবলম্বনে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় দুইটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিচারের জন্ত মহারাষ্ট্রীয় পাঠকসমাজের সমক্ষে স্থাপিত করেন। ঐ প্রবন্ধদ্বয় পুণা হইতে প্রকাশিত "ভারতবর্ষ" নামক ঐতিহাসিক মাসিকপত্রের ৪র্থ ও ৫ম (মাঘ ও ফাল্গুনের) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৎপাঠে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক জন মহারাষ্ট্রীয় লেখক ভোঁসলে বংশের আদি বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হন। প্রথমতঃ, উক্ত পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দত্তাত্রেয় বলবন্ত পারসনীস মহাশয় ও তৎপরে "কৃ, বি, আচার্য্য কালগাঁওকর"-নামস্বাক্ষরকারী কোনও লেখক, ঐ পত্রে সমালোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কতিপয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আমরা এ স্থলে যথাক্রমে ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম প্রকটিত করিতেছি।

"ভোঁসলে বংশের আদি পুরুষ কে ?" এ সম্বন্ধে 'কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ' নামক মাসিক-পত্রের অন্যতম সম্পাদক ৺জনার্দ্দন বালাজী মোড়ক যে বংশপত্রিকার সংগ্রহ ও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে,—"ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ শিবরাও চিতোড়কর (চিতোড়ের পূর্ব্বনিবাসী) উদয়পুরে বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ছিল,—১ম রামরাও, ২য় উদয়সিংহ, ৩য় ভীমসিংহ। আকবর বাদশাহের মেওয়াড় (মিবার) আক্রমণ-কালে রামরাও ও উদয়সিংহ যুদ্ধে নিহত হন। তৃতীয় ভীমসিংহ তত্রত্য রাজা উদয়সিংহকে ভোঁস্ নামক দুর্গে লইয়া যান। এই কারণে তাঁহার 'ভোঁসলে' এই উপাধি লাভ হয়।

"ভীমসিংহের (ভোঁসলের) বংশে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের নাম-মালিকা এই,—(১ম শিবরাও, ২য় ভীমসিংহ) ৩য় বিজয়ভানু, ৪র্থ খেলকর্ণ, ৫ম জয়কর্ণ, ৬ষ্ঠ মহাকর্ণ, ৭ম রাজা শিব, ৮ম বাবাজী ভোঁসলে, ৯ম মালোজী ভোঁসলে, ১০ম রাজা শাহাজী, ১১শ ছত্রপতি শিবাজী—শকস্থাপনকর্ত্তা।"

এই বংশতালিকা পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ উদয়পুরে বাস করিতেন। তাঁহাকে "চিতোড়কর" বলায়, "পূর্ব্বে চিতোড়ে তাঁহার বসতি ছিল," এই এই তত্ত্ব সূচিত হইতেছে। যুদ্ধশেষে তিনি রাণা উদয়সিংহকে ভোঁস্ দুর্গে আশ্রয়গ্রহণে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি রাণার বিশ্বস্ত সহচর বা অনুচরবর্গের অন্যতম ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ইহার অধিক তৎসম্বন্ধে আর কোনও বৃত্তান্ত এই বংশপত্রিকা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় না।

এই বংশপত্রিকাখানি ৺মৌলিক মহাশয় কর্ত্তৃক "কাব্যেতিহাস-সংগ্রহ" পত্রে প্রকাশিত ও দুই একজন প্রথিতনামা মহারাষ্ট্রীয় লেখক কর্ত্তৃক স্বগ্রন্থে উদ্ধৃত হওয়ায়, জনসাধারণের নিকট ইহার যোগ্যতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং সেই কারণেই বোধ হয়, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রীর প্রণীত শিবাজীর জীবনীতেও উহা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এই বংশপত্রিকাটিকে অবিশ্বাসার্হ ও কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, (১ম) এই বংশতালিকাখানি অতি আধুনিক—খৃঃ ১৮৩৬ অব্দে অর্থাৎ গ্রাণ্ট ডফ্ প্রণীত History of the Marathas প্রকাশিত হইবার দশ বৎসর পরে রচিত। (২য়) ইহার রচয়িতার নাম ও তাঁহার লিখিত বিবরণের ঐতিহাসিক আধার (Authority) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। (৩য়) সাতারার রাজকীয় দপ্তরে শিবাজীর বংশধরের নিকট এ সম্বন্ধে যে সকল প্রাচীন ও অতিবিশ্বসনীয় কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত আছে, তদবলম্বনে সাতারার মহারাজের সুপ্রসিদ্ধ চিটনবীস ৺মল্লার রামরাও চিটনীস, ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে যে শিবাজীর বখর রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত বংশতালিকার সহিত সমালোচ্য তালিকার ঐকমত্য নাই। (৪র্থ) যে মেওয়াড় (মিবার) প্রদেশ হইতে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষেরা দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন, সেই মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি গ্রন্থে এ বিষয়ের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহারও সহিত ইহার বহুল বিরোধ লক্ষিত হয়। (৫ম) মহারাজ শিবাজীর পিতামহ মালোজী ভোঁসলে ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, এ কথা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। মোগল সম্রাট আকবর সাহ ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিতোড় আক্রমণ ও ধ্বংস করেন, ইহাও সুনিশ্চিত ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং আকবরের চিতোড়-আক্রমণকালে মালোজীর বয়ঃক্রম ১৫ বৎসর ছিল। কিন্তু সমালোচ্য বংশপত্রিকার লেখক বলেন, মালোজীর ৮ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী শিবরাও আকবরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। আকবর কর্ত্তৃক চিতোড়-বিধ্বংসের পর উদয়পুর স্থাপিত হয়। শিবরাওকে উদয়পুরবাসী বলায়, মালোজীর ও তাঁহার সমকালীনত্ব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। এই সকল কারণে উক্ত বংশপত্রিকার প্রতি নির্ভর করা আমরা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

কোনও কোনও বখরে নেপালের রাজা পৃথ্বীসিংহের সহিত ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। ঐ আখ্যায়িকার মূলে জনশ্রুতি কিংবদন্তী ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না। [এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর টড-প্রণীত রাজস্থানের অংশবিশেষ পাঠে অবগত হইলাম যে, ঐ আখ্যায়িকা নিতান্ত ভিত্তিশূন্য নহে। তদনুসারে নেপাল রাজবংশ ও মহারাষ্ট্র রাজবংশ একই মূল পুরুষ হইতে উৎপন্ন—উহারা একই রাজবংশের ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপিত দুইটি শাখা মাত্র। এ কথা স্বীকার করিলেও উক্ত আখ্যায়িকা হইতে শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষদিগের বিবরণ সম্যক্ অবগত হওয়া যায় না।] এ কারণে তাহার আলোচনায় লেখনীক্ষয় না করিয়া, সাতারার রাজকীয় দপ্তর হইতে প্রাপ্ত বিবরণের সত্যাসত্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

সাতারার রাজকীয় দপ্তরে শিবাজীর সময়ের অনেক আসল কাগজপত্র এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই সকল কাগজপত্রের সাহায্যে শিবাজীর দুইখানি বখর রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে যেখানি মল্লার রামরাও চিটনীস কর্ত্তৃক সাতারার মহারাজের আদেশে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত, সেইখানি অতীব বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই বখর সম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ সাহেব লিখিয়াছেন;—এই বখর Compiled from Original memoranda and originals or Copeis of many authentic papers written or transcribed by his (Mulhar Rao's) ancestors, who were all persons highly distinguished at

the courts of Raigurh, Ginjee and Satara, and Shivaji's instructions to Officers and departments are very complete and satisfactory." দ্বিতীয় বখর-খানি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৺বিষ্ণু গোপাল ভিড়ে চিটনীস কর্ত্তৃক "সাতারার দপ্তরের বিবিধ বিবরণ অবলম্বনে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কাগজ-পত্রাদির সাহায্যে রচিত।" [ইহা স্যার বার্টল ফ্রিয়ার মহোদয়ের অনুরোধে লিখিত হইয়াছিল। ইংরাজ সরকার যখন সাতারার রাজ্য খাস করেন, সেই সময় ফ্রিয়ার সাহেব তত্রত্য রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের বহু উপকরণ নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে তৎসমুহ পোতমগ্ন হইয়া সমুদ্রগ্রাসে পতিত হইয়াছে।] ভিড়ে মহোদয়-কৃত বখরে ভোঁসলে বংশের যে উৎপত্তি-বিবরণ সংকলিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে ঈষদ্ভ্রান্তি-যুক্ত হইলেও, স্থূলতঃ মল্হার রাওয়ের বিবৃত বিবরণের সহিত তাহার ঐক্য আছে। তাঁহারা উভয়েই শিশোদে-বংশোদ্ভূত চিতোড়ের মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের ঔরসপুত্র রাণা অজয়সিংহকে ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, দিল্লীশ্বর আলা-উদ্দীন সৌন্দর্য্য-সার-প্রতিমা পদ্মিনীকে লাভ করিবার দুরাশায় মত্ত হইয়া চিতোড় নগর ধ্বংস করিলে, মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের পুত্র আরসসিংহ ও সজনসিংহ (সজ্জনসিংহ) সেই দুর্ঘট বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া দাক্ষিণাত্যে আগমন করেন। কিন্তু গ্রাণ্ট ডফ্ মহোদয় চিটনীসের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন,—"From them (the Rarnas) it is *pretended* that the founder of the Maratha Nation (Shivaji), as hetherto known to us, drew his lineage."

চিটনীস-যুগলের লিখিত বিবরণ কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, তাঁহারা স্বীয় প্রভুর—মহারাষ্ট্র-রাজ্য-সংস্থাপকের ও তাঁহার বংশধরগণের—তুষ্টিসাধন ও বংশগৌরববর্দ্ধনের জন্য চিতোড়ের মহারাণার সহিত তাঁহাদিগের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন কি না, তাহার নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমে মেওয়াড়ের (মিবারের) রাজকুলাখ্যান-লেখকগণের মতামত অনুসন্ধেয়। এই কারণে ভোঁসলেগণের উৎপত্তিবিষয়ে তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম আমরা মহামতি টড সাহেবের প্রণীত "রাজস্থানের ইতিবৃত্ত" হইতে এ স্থলে সংকলন করিয়া দিতেছি।

মেওয়াড়ের (মিবারের) রাজচরিতাখ্যায়ক ভট্টগণের মতে, মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে মেওয়াড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তিনি তখনও অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন বলিয়া, তদীয় পিতৃব্য ভীমসিংহ সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অপ্রতিম সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন যেরূপে চিতোড়ের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে।

পদ্মিনীর ও চিতোরের রক্ষার জন্য শ্রীচিতোড়-ভবানীর আদেশে মহারাণা স্বীয় একাদশ পুত্র ও আত্মীয় স্বজন সহ সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। মহারাণার দ্বাদশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র রাণা অজয়সিংহ তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। এই কারণে ও পিতৃলোকের—শিশোদে-কুলের—পিণ্ডলোপ-নিবারণের জন্য মহারাণা তাঁহাকে নগনদনদী-বেষ্টিত দুর্গম "কৈলওয়াড়া" নামক প্রদেশে আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবার আদেশ করিলেন। এইরূপে প্রাণরক্ষা করা রাজপুত্রের অভিপ্রেত ছিল না; কিন্তু, তিনি এ বিষয়ে পুনঃ-পুনঃ স্বীয় অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, পরিশেষে তাঁহাকে পিত্রাদেশপালনে বাধ্য হইতে হইল। তিনি দুর্বৃত্ত আলাউদ্দীনকে তাহার অবিমৃষ্যকারিতার ও ক্রূরতার প্রতিফল দিবার জন্য পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে সসৈন্যে কৈলওয়াড়া অভিমুখে যাত্রা

হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে এই কয়টি নাম পাওয়া যায়, ১। মহারাণা সজনসিংহ, ২। দিলীপ সিংহ, ৩। সিংহাজী, ৪। ভোসাজী, ৫। দেবরাজজী, ৬। খেলকর্ণ, ৭। যালকর্ণ (টডের মাহলজী?) ৮। রাজা শিব, ৯। বাবাজী, ১০। মালোজী।

"ভারতবর্ষ" পত্রের সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া (৫ম সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—"আমরা সাতারার ছত্রপতিগণের দপ্তর হইতে দুইখানি বংশাবলী প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে প্রথমখানি প্রতাপসিংহ মহারাজ (১৮০৮ খ্রীঃ—১৮৩৯ খ্রীঃ) বহু প্রাচীন কাগজপত্র অবলম্বনে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সাতারার মহারাজগণের মধ্যে ইঁহার তুল্য ইতিহাস-রসিক নরপতি আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার রচিত বংশপত্রিকার একটি অনুলিপি বিলাতে কোর্ট অব ডিরেক্টার্সগণের নিকট প্রেরিত ও তাঁহাদিগের কর্তৃক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় বংশপত্রিকাখানি, ১৮৪৮ খৃঃ সাতরারাজ্য কোম্পানী বাহাদুর কর্তৃক স্বরাজ্যভুক্ত হইলে, সাতারার শেষ নরপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী শ্রীমতী সগুণা বাঈ তাহা পুনরুদ্ধারের আশায় ভারতেশ্বরীর নিকট যে 'মেমোরিয়াল' বা আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত গ্রথিত ছিল। এই উভয় বংশপত্রিকার মধ্যে দুই এক স্থলে নামসম্বন্ধে সামান্য অনৈক্য (তাহাও ইংরাজী বর্ণমালার বিশেষত্ব-জনিত বলিয়া বোধ হয়) ভিন্ন আর কোনও পার্থক্য নাই।" [এই বলিয়া সম্পাদক মহাশয় মহারাজ প্রতাপসিংহের রচিত বংশাবলী সমগ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।] এই বংশাবলীর সহিত চিটনীস-ধৃত বংশতালিকার বহুল ঐক্য দৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা এ স্থলে উক্ত উভয় তালিকার কেবল অনৈক্য স্থলগুলির সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি।

মহারাজ প্রতাপসিংহের বংশতালিকায় মহারাণা লক্ষ্মণসিংহের অধস্তন ৪র্থ পুরুষ সিংহজীকে "শিবাজী", ১১শ পুরুষ বরবটজীকে "বরহটুজী," ১২শ পুরুষ খেলকর্ণ বা খলাজীকে "খেলোজী" ও ১৩শ পুরুষ জয়কর্ণকে "কর্ণসিংহ" বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রথম নামটি মহারাজের বংশতালিকায় যেরূপে লিখিত আছে, তাহা নিঃসংশয়ে বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ, উহার সহিত টডের তালিকোক্ত "শিবজী" এই নামের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তা ছাড়া, মল্লার রাও চিটনীসের মূল গ্রন্থ "মোড়ী" নামক যে বর্ণমালায় লিখিত, তাহাতে "ব" ও "হ" এই দুই বর্ণের মধ্যে সাদৃশ্য এত অধিক যে, ইহার মুদ্রাঙ্কণকালে 'সিবজী' স্থলে "সিহজী" বা "সিংহজী" পঠিত ও মুদ্রিত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। এই বকার ও হকারের অত্যধিক সাদৃশ্যবশতঃ, 'বরবটজী' স্থানে 'বরহটজী', অথবা 'বরহটজী' স্থানে 'বরবটজী' হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। চিটনীসের 'খলাজী' অপেক্ষা টড ও প্রতাপসিংহের "খেলোজী" নাম সমধিক বিশুদ্ধ বোধ হয়। ইতঃপূর্ব্বে "বি, কৃ, আচার্য্য কালগাঁওকর"-নামস্বাক্ষরকারী যে লেখকের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি সোলাপুরের নিম্বালকর বংশের কোনও পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্ত এক বংশপত্রিকা "ভারতবর্ষের" ৭ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতেও খলাজীর পরিবর্ত্তে "খেলোজী" নামই দৃষ্ট হয়। খেলোজীর অপর নাম যে খলকর্ণ না হইয়া "খেলকর্ণ" ছিল, তাহা ডিড়ে প্রণীত ও ৺মোডক মহাশয়ের সংগৃহীত বংশপত্রিকা হইতে প্রতিপন্ন হয়। চিটনীসের জয়কর্ণকে প্রতাপসিংহের বংশতালিকায় "কর্ণসিংহ" বলা হইয়াছে। কিন্তু ৺মোডক ও ডিড়ে, ইঁহাদিগের উভয়ের গ্রন্থে যখন তৎপরিবর্ত্তে "জয়কর্ণ" নামই দৃষ্ট হয়, তখন চিটনীসের তালিকায় উল্লিখিত নামই বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয়।

একণে বংশতালিকার নামাবলীর সমালোচনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বখর-বর্ণিত প্রতত্ত্বসংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণের সংগ্রহে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। রাণা সজনসিংহ প্রভৃতির কর্তৃক

পিতৃরাজ্য হইতে নির্বাসিত হইবার পর তাঁহার বংশধরগণ যেরূপে মহারাষ্ট্র দেশে উপনীত ও প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার বৃত্তান্ত মল্লার রাও চিটনীসের গ্রন্থে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে।—

“মহারাণা অজয়সিংহের পুত্র সজনসিংহ পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রথমতঃ সোন্দওয়াড়া নামক প্রদেশে উপনীত হইয়া ঐ রাজ্য অধিকার করেন। তথায় তাঁহার বংশধরেরা চারি পুরুষ পর্য্যন্ত সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর ঐ প্রদেশে যবনবিপ্লব সংঘটিত হইলে, রাণা সজন সিংহের বংশের একটি শাখা-পরিবার তথায় অবস্থান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সকলে নানা দেশে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। সেই বিপৎকালে ভোঁসাজী রাণার পুত্র দেবরাজজী মহারাষ্ট্র দেশে আগমন করেন ও তাঁহার অপর পুত্র নেপাল অভিমুখে প্রস্থিত হন। মহারাষ্ট্রে আসিয়া দেবরাজজী ও তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদিগের পিতৃ-পুরুষ ভোঁসাজী রাণার নামানুসারে ‘ভোঁসলে’ এই উপাধির দ্বারা আখ্যাত হইলেন। দেশের তাৎকালিক অবস্থানুসারে সময়োচিত আত্মরক্ষণী নীতি অবলম্বন করিয়া, দেবরাজজী গঙ্গা (গোদাবরী) ও ভীমা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে পালেগারী (যাহারা আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করে, রাজাকে কর দিতে অস্বীকৃত হয়, এবং যথাসাধ্য অপরের নিকট হইতে করসংগ্রহ করিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকে মহারাষ্ট্র দেশে ‘পালেগার’ (Polygar) ও তাহাদিগের কার্য্যকে ‘পালেগারী’ বলে) করিয়া উদ্দাম স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেশে দিন দিন যবনদিগের প্রাবল্য বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাকে তাঁহাদিগের অধীনতায় সিঙ্গাপুরের পাটিলের (গ্রামরক্ষকের—গ্রামের চীফ্ ম্যাজিষ্ট্রেটের) কার্য্য গ্রহণ করিতে হইল। সিঙ্গাপুরের শিবমূর্ত্তিকে তাঁহাদিগের কুলদেবতা চিতোরের ‘একলিঙ্গ’ দেব ও তুলজাপুরের ‘ভবানী’ দেবীকে ‘শ্রীচিতোড়-ভবানী’ জ্ঞান করিয়া তিনি নিষ্ঠার সহিত, তাঁহাদিগের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বংশধরেরা ক্রমশঃ খানবট, হিংগণী, বেরুতী, দেউল গাঁও, বেরুল (ইলোরা), বাবী ও মুন্দী (প্রতিষ্ঠান) প্রভৃতি গ্রামের পাটিলের পদ ক্রয় করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা ও সম্পত্তি বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। (উল্লিখিত গ্রাম গুলি মহারাষ্ট্রের সীমান্তবর্ত্তী দৌলতাবাদের সমীপে অবস্থিত।) * * * ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পিতামহ মালোজী ভোঁসলে আহম্মদনগরের সুলতানের অনুগ্রহে পুণা অঞ্চলে জাগীর প্রাপ্ত হন। ইহার পর হইতে পুণা প্রদেশ ভোঁসলে বংশের প্রধান বাসস্থানে ও পরিশেষে মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানীতে পরিণত হয়।”

রাণা সজ্জনসিংহ দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রথম যে প্রদেশে গিয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন, যবনোপদ্রবের জন্য যে প্রদেশ হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ভোঁসাজী রাণার পুত্র দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভোঁসলে নামে পরিচিত হন, সেই “সোন্দওয়াড়া” প্রদেশ কোথায়, কোন্ অব্দে ভোঁসলে বংশের পূর্ব্বপুরুষেরা তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন; এবং কোন্ সময়েই বা তথা হইতে পলায়ন করেন, এ পর্য্যন্ত কোনও লেখক তাহার নির্ণয়ে যত্নবান্ হন নাই। আমাদের বিবেচনায়, চিতোড়ের প্রায় শত মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত “সুরাওয়াড়া”র সমীপে “সৌন্দ” নামক যে ক্ষুদ্র প্রদেশ আছে, তাহাই বখর-বর্ণিত “সোন্দওয়াড়া” হওয়া সম্ভব। “ওয়াড়া” শব্দের অর্থ গ্রাম বা নগর। রাজওয়াড়া, সোন্দওয়াড়া, মুরওয়াড়া, বালওয়াড়া প্রভৃতি তদঞ্চলস্থিত বিবিধ গ্রাম-নগর-বাচক শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, “সোন্দ” ও “সোন্দওয়াড়া” অভিন্ন, (প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানপুর, এই দুইটি যেরূপ অভিন্ন, সেইরূপ) বলিয়াই বোধ হয়। ১৩০১ খৃষ্টাব্দে হাম্বির রাজ্যারোহণ করেন। অতএব ঐ অব্দেই সজন সিংহ সোন্দওয়াড়া প্রদেশে গমন করেন, এইরূপ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। শতবর্ষে চারি পুরুষের জীবনকাল অতিবাহিত হয়,

স্বীকার করিলে, সজ্জন সিংহের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ দেবরাজজীর মহারাষ্ট্রাভিমুখে আগমনের কাল উহার এক শত বৎসর পরে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। ইতিহাসে দেখিতে পাই, গুজরাথের সুলতান আহমেদ শাহ ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ সজ্জন সিংহের পিতৃরাজ্যপরিত্যাগের ১০৪ বৎসর পরে) মালব জয় করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। বহু আয়াসে পরে তদ্বিষয়ে তাঁহার সফলতা লাভ হইয়াছিল। বোধ হয়, আহমদ শাহের এই অভিযানের সময়, মালব ও গুজরাথের মধ্যস্থানে অবস্থিত সোজওয়াড়া প্রদেশ যবনসৈন্য কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া থাকিবে, এবং সেই উপদ্রবের সময়েই দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যের অভিমুখে যাত্রা করিয়া থাকিবেন; তাহার ভ্রাতা এই সময়েই নেপাল গমন করেন।

বখরকার চিটনীস বলেন, ভোঁসাজী প্রভৃতির পুত্রপৌত্রগণ মহারাষ্ট্রে গিয়া "ভোঁসলে" উপাধি প্রাপ্ত হন। কিন্তু টডের গ্রন্থে এই প্রসিদ্ধ পুরুষের নাম দৃষ্ট হয় না। তাঁহার মতে দেবরাজজীর পিতার নাম ভোরাজী। দেবনাগরী "র" ও "স" এই দুই বর্ণের আকৃতিগত ঐক্যের বিষয় চিন্তা করিলে মনে হয়, টড সাহেব হয় ত, মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে লিখিত "ভোসজী" (মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ ভোসাজী) স্থানে "ভোরাজী" পাঠ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, দেবরাজের পিতার নাম যে ভোসাজী ছিল, ইহাই আমাদিগের নিকট সমধিক সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভোঁসলে শব্দের ব্যুৎপত্তির প্রতি ও [illegible] ও মহারাজ প্রতাপ সিংহ মহোদয় কর্তৃক সংগৃহীত বংশতালিকায় দৃষ্টিপাত করিলেও, ভোসাজী নামই বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় তালিকার সহিত রাজপুত (টডের) তালিকার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, দেবরাজজীর পরবর্ত্তী পুরুষগণের নামের সম্বন্ধে উভয় বংশতালিকার মধ্যে আর ঐকমত্য নাই। এই অনৈক্য স্থলে কোন্ তালিকার নামাবলী ঐতিহাসিক বলিয়া গণ্য করা উচিত? "আচার্য্য কালগাঁওকর" বলেন,—"দেবরাজজীর পরবর্ত্তী নাম সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় বখর-লেখকের উক্তিই সমধিক বিশ্বাসযোগ্য। কারণ, দেবরাজ ও তাঁহার বংশধরগণ উত্তর-ভারতের শেষ সীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহারাষ্ট্রের সুদূর অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিলে, মেওয়াড়ের ভাট-গণের পক্ষে তাঁহাদিগের বংশ-বিবরণ জ্ঞাত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে, মহারাষ্ট্রে আসিয়া যাঁহারা নানা স্থানে পাটিলের স্বত্বাদি ক্রয় করিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের যথাযথ বিবরণ কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করা মহারাষ্ট্রীয় লেখকগণের পক্ষে একান্ত অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেকের সময় নানা স্থানের প্রাচীনগণের মুখে শ্রুত পূর্ব্বকাহিনী ও পুরাতন বংশপত্রিকাদি সংগৃহীত ও তদব-লম্বনে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম-মালিকা প্রস্তুত হইয়া সাতারার রাজ-দপ্তরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকিবে, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ, টডের বংশ-তালিকার প্রথম ৭০টি নাম যেরূপ বিশুদ্ধ ও ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎপরবর্ত্তী পুরুষের নামগুলি সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।" আচার্য্য কালগাঁওকরের এই উক্তি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে সমর্থনীয় বোধ হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্বীয় প্রবন্ধের স্থলান্তরে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তিনি অনুমান করেন, "ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়েই, মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে ভোঁসলে বংশের উৎপত্তিকাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে। সেই মহোৎসব-কালে রাজপুতানা হইতে অনেক ভাট রায়গড়ে আগমন পূর্ব্বক উদয়পুরের রাজবংশের ও তদবলম্বনে শিবাজী মহারাজের গুণগ্রাম ও বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া, বহু পুরস্কার লাভ করিয়া থাকিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।" এইরূপ যুক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আচার্য্য

মহাশয় মেওয়াড়ের রাজকুল-প্রশস্তিব্যাখ্যানমূলক গ্রন্থসমূহে বিবৃত ভোঁসলে বংশের উৎপত্তি-বিবরণকে (সুতরাং চিটনীস-লিখিত বৃত্তান্তকেও) অনৈতিহাসিক ও পুরস্কারলুব্ধ ভাটগণের কল্পনাপ্রসূত বলিবার সাহস করিয়াছেন।

কান্‌গাঁওকর আচার্য্যের এই অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত ও আপাত-রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, আমরা উহাকে প্রকৃত ঘটনা হইতে বহুদূরবর্ত্তী বলিয়া মনে করি। কারণ, যদি শিবাজীর রাজ্যাভিষেকের সময়েই ভাটকবিগণ কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র-পতির প্রদত্ত পুরস্কারের লোভে ভোঁসলেগণের উৎপত্তিকাহিনী-সংবলিত-বংশাবলী রচিত হইয়া মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে উহার সহিত মহারাষ্ট্রীয় বখরসমূহের সম্পূর্ণ না হউক বহুল ঐক্য থাকিত—সেবরাজের পরবর্ত্তী পুরুষগণের নামাবলীর সহিত সাতারার রাজদপ্তরের প্রাচীন কাগজপত্রাবলম্বনে রচিত বংশাবলীর এত বৈসাদৃশ্য থাকিত না, আমরা এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি। শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষদিগের বংশাবলী কীর্ত্তন করিয়া যাহারা তাঁহার নিকট হইতে "বক্‌শিস্" আদায় করিয়াছিল বলিয়া আচার্য্য মহাশয় অনুমান করিয়াছেন, তাহাদের নিকট যে পুরস্কার-দাতার পিতা ও পিতামহের নাম সম্যক্ অজ্ঞাত থাকিবে, ইহা আমরা সম্ভবপর মনে করিতে পারি না। শিবাজীর পিতার নাম শাহাজী ও পিতামহের নাম মালোজী ছিল, এ কথা অনৈতিহাসিক বলিবার উপায় নাই। তাঁহারা যে সকল শৌর্য্যবীর্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ শিবাজীর শত্রুপক্ষীয় ইতিহাস-লেখকগণের "তওয়ারিখ" গ্রন্থেও বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। অথচ এই দুই জন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরপুরুষের নাম সম্বন্ধে মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি-লেখকগণ যে শোচনীয় অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহারা বলিয়াছেন, ছত্রপতি শিবাজীর পিতার নাম সজ্জাজী ও তাঁহার পিতামহের নাম "সবুজী"। (উদ্ধৃত রাজবংশ দেখুন)। শিবাজীর পিতা ও পিতামহের নাম সম্বন্ধে যাহাদের জ্ঞান এইরূপ, তাহারা বংশবর্ণনা করিয়া শিবাজীর নিকট হইতে কত 'বক্‌শিস্' আদায় করিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য! যাঁহারা সেবরাজজী ও শিবাজী ছত্রপতি এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী দ্বাদশ পুরুষের মধ্যে ছয় জনের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়াছেন, এবং অবশিষ্ট ছয় জনকে কল্পিত নামে বিভূষিত করিয়াছেন, তাঁহারা যে শিবাজীর রাজ্যাভিষেককালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নির্দ্দেশমত বংশপত্রিকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর বোধ হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যাইতে পারে। ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, বারাণসী-নিবাসী পণ্ডিত শিরোমণি গাগাভট্ট এইরূপ মীমাংসা করেন যে, যে সমস্ত রাজপুত-পরিবার দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা "মারাঠা" (এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, দাক্ষিণাত্যে "মারাঠা" শব্দ মহারাষ্ট্রবাসিমাত্রকে না বুঝাইয়া ঐ মহারাষ্ট্র দেশের কেবল ক্ষত্রিয়সমাজকে বুঝাইবার জন্যই ব্যবহৃত হইয়া থাকে,) নামে অভিহিত হইয়াছেন, এবং রাজপুতগণের ন্যায় তাঁহা-দেরও শাস্ত্রানুসারে ছত্রচামরাদি-রাজচিহ্ন-ধারণ ও রাজ্যাভিষেকাদি সংস্কার সম্পন্ন করিবার অধিকার আছে। তাঁহার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেকালের জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, কোটা, বুন্দী প্রভৃতি প্রদেশের রাজপুত নরপতিগণ যে কোনরূপ সন্দেহ বা আপত্তি উত্থাপিত করেন নাই, ইহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ, জাতি সম্বন্ধে রাজপুতজাতির বংশা-ভিমানপুষ্ট রাজপুতগণ কিরূপ শুচিবায়ী, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত রাজপুত-রাজন্যবর্গ যে সে সময়ে মারাঠাগণের অধীন ছিলেন, তাহাও নহে। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা, বিশেষতঃ মেওয়াড়ের "হিন্দুসূর্য্যগণ" যে কেন এ বিষয়ে প্রতিবাদ

করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, তদ্বংশীয়গণকে আপনাদিগের কুলাখ্যান-গ্রন্থে কোনও প্রকার অগৌরবকর কথা প্রক্ষিপ্ত করিবার অবসর কেন প্রদান করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। টড মহোদয় যে সকল উপকরণ গ্রন্থের অবলম্বন করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থই অম্বরপতি জয়সিংহ, মেওয়াড়াধিপতি রাণা রাজসিংহ ও তাঁহার পুত্রের আদেশে ও তত্ত্বাবধানে রচিত হইয়াছিল। চিতোরের রাণা-বংশের সহিত ভোঁসলেবংশের সম্বন্ধবিবরিণী আখ্যায়িকা নিরবচ্ছিন্ন কবিকল্পনা হইলে, রাণাগণের তত্ত্বাবধানে রচিত প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইত না, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

ছত্রপতি শিবাজী যে ভোঁসলে বংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা যে রাজপুতগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বংশ হইতে উৎপন্ন, উহা যে চিতোড়ের রাজবংশের বিশুদ্ধ ঔরস শাখা মাত্র, সে বিষয়ে মেওয়াড়ের ও মহারাষ্ট্রের রাজকুলাখ্যানলেখকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। এই কারণে ঐ তত্ত্বটুকু আমরা অবিসম্বাদিত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐতিহাসিক অর্শ্মি, তাঞ্জোরস্থিত শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বংশধরের দপ্তরের কাগজ-পত্র অবলম্বনে ভোঁসলেগণের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বিবরণের সহিত সাতারার মল্হার রাও চিটনীসের সঙ্কলিত বৃত্তান্তের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। ভগদাস প্রভৃতি কয়েক জন লেখকও ছত্রপতি শিবাজীকে চিতোড়ের মহারাণাদিগের ঔরস বংশধর বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। তথাপি অনেক বৈদেশিক ইতিহাসলেখক এ বিষয়ে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মিল, ডফ্, স্কট, ওয়েরিং, কর্ণেল ডো, স্কট জোনাথন, কাফি খাঁ প্রভৃতি লেখকগণ ভোঁসলে বংশের আদিপুরুষকে উদয়পুরের রাণাদিগের দাসীপুত্র বা শূদ্রোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত মহারাষ্ট্রীয় প্রবন্ধে আমরা অতিবিস্তারিতভাবে এই ভ্রান্তমতের খণ্ডন করিয়াছি। বাহুল্যভয়ে এ স্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কেবল দুই একটি কথা বলিব।

ভোঁসলে বংশকে শূদ্রোৎপন্ন বলিয়া যাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাফি খাঁ ও স্কট জোনাথনের উক্তিই বিচারযোগ্য। কারণ, ইঁহাদের গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অপর লেখকগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত। কাফি খাঁর অপেক্ষাও স্কট জোনাথনের গ্রন্থোল্লিখিত বিবরণ, শিবাজীর সমসাময়িক জনৈক হিন্দুলেখকের লেখনীপ্রসূত বলিয়া, সমধিক আলোচ্য। বুন্দেলখণ্ডে দতিয়া নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। তত্রত্য ভূপতি দলপৎ রায় দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি (সর্দ্দার) ছিলেন। তিনি সম্রাটের দাক্ষিণাত্য অভি-যানের প্রত্যেক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। সেই বুন্দেলা সর্দ্দারের অধীন জনৈক কায়স্থ (কেরাণী) পারস্য ভাষায় উক্ত অভিযানের একটি "হকীকত" বা বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া-ছিলেন। দলপৎ রায়ের পৌত্রের নিকট হইতে স্কট জোনাথন সাহেব সেই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এবং উহার ইংরাজী অনুবাদ Aurungzeb's Operations in the Deccan নামে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে শিবাজীর বংশবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"শিবাজীর প্রপিতামহ বাবা ভোঁসলা উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের (!) এক হীনজাতীয়া দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খান্দেশের সুভেদার রাজা আলিমোহনের অধীনতায় কার্য্য করিতেন। কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি অনতিদীর্ঘকালের মধ্যেই আলিমোহনের মন্ত্রী ও প্রতি-নিধি হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সুজাদারের মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি ঐ পদ ত্যাগ করিয়া পুণার নিকটস্থিত কতিপয় গ্রামের "পাটিলকী" স্বত্ব ক্রয় করেন। তাঁহার চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মালোজী ও বধজী ভোঁসলে, লুখজী যাদব রাওয়ের অধীনতায় চাকরী

গ্রহণ করিয়াছিলেন। মালোজী হইতে 'সাতারকর ভোঁসলে' ও বব্বজী হইতে 'নাগপুরকর ভোঁসলে' বংশের উৎপত্তি হয়।"

কাফির্খাঁর লিখিত বিবরণের মর্ম্মও এই উপন্যাসের প্রায় অনুরূপ। আকবর কর্তৃক যখন চিতোড় নগর বিধ্বস্ত হয়, তখন মালোজী ভোঁসলের বয়স ১৫ বৎসর ছিল, এ কথা পাঠক অবগত আছেন। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়সের সময় (অর্থাৎ চিতোড়-ধ্বংসের ১০ বৎসর পরে) মালোজী যাদব রাওয়ের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে উপন্যাসোল্লিখিত ঘটনাবলীর সংঘটন, বিশেষতঃ (মালোজীর যৌবনকালে) ভীমসিংহ নামক কোনও কল্পনাপ্রসূত নরপতি কর্তৃক মালোজীর পিতার জন্মদান (!) কিরূপে সম্ভবে, তাহা আমরা ধারণা করিতে অসমর্থ। অথচ মিল, ওয়েরিং প্রভৃতি ইতিহাসলেখকগণ এই উপন্যাসকেই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন! এই উপন্যাসে আরও অনেক ঐতিহাসিক ভ্রম আছে; স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে মোনাথপ্রদন করিলাম।

এখন তর্ক উঠিতে পারে, বুন্দেলা কারকুনের লিখিত বিবরণ যখন শিবাজীর মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই লিখিত ও উক্ত কারকুনের দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে সংগৃহীত, এবং হয় ত অওরঙ্গজেবের শিবিরে যে সব মারাঠা যোদ্ধা ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে ঐ বিবরণ সংগৃহীত, তখন তাহার মূলে কিছু সত্য নিহিত থাকা সম্ভব। অন্ততঃ ভোঁসলে-বংশের উৎপত্তি-সম্বন্ধে সেকালের লোকের মধ্যে যে কোনও প্রকার অগৌরবকর আখ্যায়িকা প্রচলিত ছিল, তাহা বুন্দেলা কর্ম্মচারী ও কাফি খাঁর গ্রন্থ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদের পক্ষপাতী, তাঁহারা অবশ্যই রাজস্থানের ভট্টলেখকগণের প্রতি অনৃতবাদিত্বের আরোপ করিবার এই সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহা আমরা জানি। কিন্তু তাঁহারা যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক একবার আমাদের সহিত মেওয়াড় প্রদেশে গমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সকল ভ্রমের নিরাস হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

টডের গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায়, মহারাণা রায়মল্ল ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে মেওয়াড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তদীয় ভ্রাতা রাণা কুম্ভ, স্বীয় পুত্র কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হইবার পর হইতে, রায়মল্লের সমূহ চেষ্টা সত্ত্বেও, মেওয়াড় রাজ্যের বিনষ্ট সুখ শান্তি পুনরাগত হইল না। রায়মল্লের পুত্রত্রয় সিংহাসনের অধিকার লইয়া যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহাতে মেওয়াড়ের অশান্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংগ্রামসিংহকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায়, পিতা রায়মল্ল কর্তৃক নির্ব্বাসিত হন, এবং পরিশেষে দেশান্তরে গিয়া স্বীয় ভগিনীর প্রদত্ত বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন ভক্ষণে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্রোহের ও পিতৃবিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করেন। অতঃপর চিতোড়ের সিংহাসনে যথাক্রমে মহারাণা সংগ্রামসিংহ ও তৎপুত্র রাণা রত্ন অধিষ্ঠিত হন। ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে রাণা রত্নের মৃত্যু হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ "বিক্রমজিৎ" রাজা হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই বিক্রমজিতের দুর্ব্যবহারে রাজপুত সর্দ্দারগণ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। সংগ্রামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের পরিত্যক্ত "দাসী" নাম্নী দাসীর গর্ভজাত "বনবীর" নামে এক পুত্র ছিল। বনবীর ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী ও কার্য্যকুশল বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বিক্রমজিতের পদচ্যুতিকালে তদীয় কনিষ্ঠ উদয়সিংহ ৫ বৎসরের বালক ছিলেন বলিয়া, সর্দ্দারগণ বনবীরের প্রতি মেওয়াড়ের শাসনদণ্ড পরিচালনের ভারার্পণ করেন। রাজ্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া বনবীরের দুর্বুদ্ধির উদয় হইল। তিনি উদয়সিংহকে বিনাশ করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ধাত্রী পান্নার অনুপম আত্মত্যাগে বালক উদয়সিংহ যেরূপে রক্ষিত হন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নহে। উদয়সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিলে, বনবীরকে

পরাজয় স্বীকার করিয়া রাজ্যত্যাগ পূর্ব্বক সপরিবারে দক্ষিণাপথাভিমুখে পলায়ন করিতে হয়। রাজপুতানার ভট্টগণের মতে, ১৩[illegible] খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটে। বনবীরের সন্তানসন্ততিগণ দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ভোঁসলে উপাধিধারণ ও কালক্রমে নাগপুরে রাজ্য সংস্থাপন করেন।"

এই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, চিতোড়ের রাজবংশের যে শাখা-পরিবারদ্বয় দুই বিভিন্ন সময়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া মহারাষ্ট্র দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ মেওয়াড়ের রাজকুলাখ্যান গ্রন্থে পৃথক্ পৃথক লিখিত আছে। পূর্ব্বে চিতোড় হইতে মহারাণাদিগের যে ঔরস-বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসতিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সহিত আপনাদিগের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিবার জন্য পশ্চাদাগত বনবীরের সন্ততিগণ ভোঁসলে উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। প্রাচীন ভোঁসলেগণ খৃঃ ১৪ শতাব্দীর প্রারম্ভে চিতোড় ত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। সুতরাং খৃঃ ১৮ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুন্দেলা কারকুন ও কাফি খাঁর গ্রন্থরচনাকালে, তাঁহাদিগের আদিবৃত্তান্ত জনসমাজের, বিশেষতঃ মোগলগণের [illegible] ভদনুগত দূরদেশস্থিত মারাঠাগণের বিশেষ পরিজ্ঞাত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না, এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারি। পক্ষান্তরে, ছত্রপতি শিবাজীর কার্য্যকলাপে ভোঁসলে নামের প্রতি সে সময়ে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ও বনবীরের বংশধরগণ অল্পদিনমাত্র মহারাষ্ট্রে আসিয়া ভোঁসলে নামে পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগের গূঢ়োৎপত্তির কাহিনীই সাধারণের মধ্যে, বিশেষতঃ সেকালের মারাঠাবিদ্বেষী মোগলগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। তদ্ভিন্ন কাফি খাঁ ও বুন্দেলা কারকুনের মত বৈদেশিক লেখকের পক্ষে প্রাচীন ও আধুনিক বা ঔরস ও কৃত্রিম ভোঁসলে শাখাদ্বয়ের মধ্যে যে প্রভেদ ছিল তাহা জানিবার সম্ভাবনাও অল্প ছিল। এই সকল কারণে তাঁহারা প্রাচীন ভোঁসলেগণের উৎপত্তির বিবরণ অবগত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া উভয় ভোঁসলেকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া নবাগত ভোঁসলেগণের গূঢ়োৎপত্তিবিষয়িণী আখ্যায়িকার সাহায্যে ছত্রপতি শিবাজী ভোঁসলের আদিপুরুষের সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সুসঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ, সাতারকর ও নাগপুরকর ভোঁসলেদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে রাজপুতানার বিশেষজ্ঞ রাজপুত লেখকগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য, অথবা বৈদেশিক বুন্দেলা কারকুন ও কাফিখাঁর ভ্রান্তিসঙ্কুল গণনায় নির্ভর করিয়া নাগপুরকর (কৃত্রিম) ভোঁসলে বংশের সহিত ছত্রপতি শিবাজীর পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধ কল্পনা করা ঐতিহাসিক-যুক্তিসঙ্গত, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

উপসংহারকালে একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগের [illegible] [illegible]ষ্ট্রীয় ভ্রাতৃগণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাষ্ট্রের সাতারা [illegible] বংশের আদিপুরুষ মেওয়াড়ের বাপ্পা রাওলের প্রতিষ্ঠিত বংশতরুর একটি প্রাচীন ও বিশুদ্ধ [illegible] শাখা হইতে সম্ভূত, এ কথা যেরূপ স্বীকার্য্য, চিতোড়ের "হিন্দু সূর্য্যগণ" প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ হইতে সমুৎপন্ন, এ কথাও সেইরূপ প্রত্যেক মহারাষ্ট্রীয়ের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। যেমন সূর্য্যকিরণের প্রচণ্ড প্রভাবে সমুদ্রের জল কিরণদিবস নভোদেশে মেঘরূপে বাস করিতে বাধ্য হইয়া কালক্রমে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে বৃষ্টিরূপে পুনরায় সমুদ্রেই নিপতিত হয়, সেইরূপ খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে শালিবাহন বংশের শাসনকালে মহারাষ্ট্র দেশে যে রাষ্ট্রীয় [illegible] প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহার অসহ্য প্রতাপে মহারাষ্ট্রের শিশোদে-উপাধি-ধারী প্রাচীন রাজবংশ স্থানভ্রষ্ট হইয়া সাতপুড়া ও বিন্ধ্যাদ্রির শৈলকাননসমাচ্ছন্ন শান্তিস্নিগ্ধ প্রদেশের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক মেওয়াড়

প্রদেশ আক্রমণ করেন; এবং আপনাদের বাহুবলে ও পবিত্রতার প্রভাবে রাজপুত জাতির শ্রদ্ধাসম্মানভাজন ও শিরোভূষণরূপে অবস্থান করিয়া, কালক্রমে যবনোপদ্রবসম্ভূত বিপ্লবের ফলে পুনরায় পিতৃভূমি মহারাষ্ট্রে সমাগত হয়েন। ফলতঃ, খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে যে রাজবংশ আত্মরক্ষার জন্য স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে সেই রাজবংশ আত্মরক্ষণমানসে পুনর্ব্বার প্রাচীনা মাতৃভূমির স্নেহতপ্ত ক্রোড়ে পুনরাগত হইয়া বাহুবলে অনবীন ছত্রপতি মার্জ্জন পূর্ব্বক স্বদেশবাসিগণের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

এই মনোরম প্রসঙ্গের সুললিত বর্ণনা মহাত্মা রামরাও চিটনীসের গ্রন্থে পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই আখ্যায়িকার সহিত মহারাষ্ট্র ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, গ্রাণ্ট ডফ মহোদয় স্বীয় ইতিহাসে উহার মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ আখ্যায়িকা নিতান্ত অলস-জনকল্পিত বলিয়া অনেকের মনে হইতে পারে; কিন্তু "মহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ" এই বাক্যানুসারে ঐ আখ্যায়িকার মূলে কোনও মহার্ঘ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। কারণ, উত্তরভারতের রাজপুতগণের মধ্যে এইরূপ এক জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র রাজবংশ হইতেই রাজপুতানার অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। কর্ণেল টড মেওয়াড়ের রাজপ্রশস্তি গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরেই লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, "চিতোড়ের মহারাণা বংশের আদিপুরুষ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রদেশে গোদাবরী-তীরে 'তিলতিলপট্টন' (অনেকের মতে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাজধানী দেবগিরি বা দৌলতাবাদেরই প্রাচীন নাম 'তিলতিলপট্টন') নামক নগরের অধিপতি ছিলেন; পরে ১৯১ বিক্রমাব্দে (১৩৫ খ্রীঃ অঃ) রাষ্ট্রবিপ্লবকালে [ডাঃ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে, শালিবাহনবংশীয় নরপতি গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি ও শ্রীপুলোমায়ি (১৩০ খৃঃ—১৫০ খ্রীঃ অঃ) মহারাষ্ট্র দেশের ক্ষত্রিয়গণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য যে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সংগ্রামকালে] স্বদেশত্যাগ পূর্ব্বক প্রথমতঃ বিন্ধ্যপ্রদেশে ও পরে মেওয়াড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন।"

রাজস্থানের ছত্রিশকুলের রাজপুতগণের উৎপত্তিবিবরণ টড সাহেবের গ্রন্থে যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐ ছত্রিশ কুলের অন্তর্গত অনেক রাজপুত পরিবার আদৌ নর্ম্মদার দক্ষিণতীরনিবাসী, এমন কি, কতিপয় পরিবার গোদাবরী নদীর তীরস্থিত "মুঙ্গী পৈঠন" (মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের রাজধানী প্রতিষ্ঠান) নগরের আদিম অধিবাসী ছিলেন। রাষ্ট্রকূট (রাঠোড়) মৌর্য্য (টড-প্রোক্ত 'মোরি') কদম্ব, মলওরাড়, শিলার প্রভৃতি উপাধিধারী, প্রাচীন প্রস্তরলিপিতে বর্ণিত মরাঠা পরিবারসমূহ রাজপুতস্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং তাঁহাদিগেরই দ্বারা "রাও," "রাণা," বাঈ ও কুলস্বামী প্রভৃতি শব্দ ঐ প্রদেশে নীত ও রাজপুতগণের মধ্যে প্রচলিত হয়, এরূপ অনুমান করিবার অনেক কারণ আছে। টডের রাজস্থান ও ডাঃ ভাণ্ডারকরের প্রণীত Early History of Deccan Down to the Mohomedan Conquest গ্রন্থ হইতে প্রমাণ তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলে, মারাঠা বংশ হইতে রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় কুল সকলের উৎপত্তিবিষয়ক পূর্ব্বোক্ত আখ্যায়িকার সত্যতা বহু পরিমাণে দৃঢ়ীভূত হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবতকার বলেন, "নন্দান্তং ক্ষত্রিয়কুলং"। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া অনেকে রাজপুতানার রাজপুত্রগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমাদের বিবেচনায়, ভাগবতকারের উক্তি (যদি নিতান্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে) কেবল আর্য্যাবর্ত্ত

সমরক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। [illegible] দেশের উপর যে মহাবলপতি নন্দের কোনও প্রভুত্ব ছিল, এ কথার প্রমাণ [illegible] মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশ কালক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবাদি ব্যাপার হেতু [illegible] হইয়া বিলুপ্তক্ষত্রিয় আর্য্যাবর্ত্তে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, চিতোড়, জয়পুর ও যোধপুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, মহারাষ্ট্রীয় বখরে ও রাজপুতানার ভট্ট-গ্রন্থে বর্ণিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, ইহা কোনও ক্রমেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। টড মহোদয় শক জাতির সহিত রাজপুতগণের যে শোণিতসম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন, তাহা কিরূপ দুর্ব্বল যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এল্‌ফিন্‌ষ্টোন সাহেবের ইতিহাস পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। মনুসংহিতাদি প্রাচীন গ্রন্থের মতে যে সকল ক্ষত্রিয় প্রাচীনকালে আর্য্য দেশে গিয়া সংস্কারবিহীন বা ব্রাত্য-অবস্থাপন্ন হইয়াছিল, তাহারা "শক জাতি" নামে পরিচিত হয়। সুতরাং রাজপুত জাতির সহিত প্রাচীন শক জাতির দুই একটা আচার ব্যবহারের যদি ঐক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাতে বিস্মিত হইবার, বা উভয় জাতির মধ্যে শোণিতসম্বন্ধ কল্পনা করিবার, কোনও কারণ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি না থাকায়, ইংরাজ লেখকগণ মারাঠা ক্ষত্রিয়দিগের কোনও কোনও আচারে, প্রাচীন শকদিগের রীতি নীতির নিদর্শন দেখিতে পাইয়া, তাঁহাদিগকেও শকবংশীয় বলিতে ত্রুটী করেন নাই। ফলতঃ, ধীরভাবে মারাঠা বখরের বৃত্তান্তের সহিত রাজপুত ভট্টগণের উক্তির ও আর্য্যশাস্ত্রাদির তুলনা পূর্ব্বক পর্য্যালোচন করিলে, টড্ প্রমুখ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের যুক্তি শিথিলমূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য।

মেরী করেলি।

ইংরাজী-সাহিত্যামোদীর নিকট মেরী করেলির নাম অপরিচিত নহে। অধুনাতন ঔপন্যাসিকদিগের মধ্যে তাঁহার নাম সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার কল্পনার বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচারিত সত্যসকলের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির আবিষ্কারকল্পে তাঁহার প্রয়াস ও সমাজের নিন্দনীয় বিষয় সকলের প্রতি তাঁহার তীব্র আক্রমণ—এই সকলই তাঁহার যশোমন্দিরের সোপান। সম্প্রতি "ষ্ট্রাণ্ড্ ম্যাগাজিন্" পত্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের যে বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

লেখক যখন মিস্ করেলির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন তিনি লণ্ডনের বাসগৃহ ছাড়িয়া ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন-এভনের নিকটবর্ত্তী উড্‌ল্যাণ্ডস্ নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। যে মাসের প্রথম দিন মিস্ করেলির জন্মদিন। লেখক সেই দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। লেখক তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী মাধুরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমোদ প্রমোদের কথায় মিস্ করেলি লেখককে বলিয়াছিলেন,—তিনি গীতবাদ্য সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন; কিন্তু কন্‌সার্ট অথবা সঙ্গীতমজলিসী তাঁহার ভাল লাগে না। মুক্ত বায়ুতে অথবা নদী বা হ্রদবক্ষেই সঙ্গীত তাঁহার সমধিক প্রিয়। তাঁহার মতে, গানের

আমোদ প্রমোদ। অপ্রত্যাশিত আকস্মিক গানের সৌন্দর্য্য ও শ্রেণীবদ্ধ আসনে উপবিষ্ট শ্রোতাগণের মধ্যে, বসিয়া সাদা টাই ও কাল কোট পরিহিত গায়কের অথবা চিক্কণ সাজসজ্জায় পরিহিতা গায়িকার উচ্চ সঙ্গীত, তাঁহার পক্ষে বিরক্তিজনক।

তাঁহার মতে ইহা সঙ্গীত-মাসের উপযু[illegible] [illegible] তিনি রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখিতেও ভালবাসেন না। থিয়েটা[illegible] [illegible]টার দেখিতে যাওয়া অপেক্ষা স্বীয় গৃহে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া [illegible] [illegible]াঠ করা তাঁহার পক্ষে অধিক প্রীতিপ্রদ। এই প্রসঙ্গে লেখক জিজ্ঞাসা [illegible] তিনি অভিনয়কে শিল্প-কলা বলিয়া মনে করেন কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলেন, যদিও অভিনয়কে শিল্প-কলা বলা যায়, তাহা হইলেও ইহা কলাবিদ্যার অতি অধঃস্তরে অবস্থিত। অভিনয় অপরের অনুকরণমাত্র, বানরেও মানুষের অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে। সুতরাং এই অনুকরণে অভিনেতা আপনাকে বানরের সমশ্রেণীস্থ করে। তিনি বাস্তব মানব ভালবাসেন, কিন্তু অনুকরণ বা 'হনুকরণ' তাঁহার নিকট বড় বিরক্তিকর।

তাঁহার প্রিয় গ্রন্থকার সম্বন্ধে মিস করেলি বলেন, তাঁহার কোন বিশেষ প্রিয় গ্রন্থকার নাই; তবে স্কট ও ডিকেন্‌স্ তিনি বিশেষ পছন্দ করেন। আধুনিক সমালোচকদের ন্যায় তিনি সমসাময়িক লেখকদিগের দোষ বাহির করিতে ভালবাসেন না। তিনি তাঁহাদের সৃষ্ট সৌন্দর্য্যেই সন্তুষ্ট। রডিয়ার্ড কিপ্‌লিংএর ছোট গল্প তাঁহার ভাল লাগে বটে, কিন্তু তিনি কিপ্‌লিংকে—অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত—কবি বলিতে স্বীকৃত নহেন। তিনি বলেন, কিপ্‌লিং নিজে বুঝেন যে, তাঁহার কবিতা কেবল ছন্দোবদ্ধ রচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মিস্ করেলি স্বীয় পুস্তকের সমালোচকদিগের সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথমে তাঁহাদের আক্রমণ করেন নাই। তাঁহারাই প্রথমে ঢিল ছুড়িয়াছিলেন। কাজেই তখন তাঁহাকে [illegible] হইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। যখন তাঁহার Romance of two Worlds পুস্তক সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিল, তখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'সাহিত্যিক' সাধারণের সহৃদয়তা ও

মিস্ করেলি ও সমালোচক।

[illegible]য় তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল ও আশা ছিল—তাঁহারা নব-ব্রতীকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। কিন্তু হায়! তাঁহার সে বিশ্বাস শীঘ্র নষ্ট হইয়া গেল। সমালোচকেরা তাঁহার পুস্তক পাঠ না করিয়াই, তাহার অতি তীব্র ও বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইল। এইখানে পাঠক, একটু রহস্য দেখুন। ইংলণ্ডে লেখককে সমালোচকদিগের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়, আর এ দেশে সমালোচককেই লেখকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হয়। অবশ্য, সাধারণে মনে করে, ধীর ও সহিষ্ণুভাবে অপরের আক্রমণ সহ্য করাই স্ত্রীলোকের কাজ—কিন্তু তাঁহার তাহা সহ্য হয় না, তিনি সে মতাবলম্বিনী নহেন। তিনি তাঁহার আপনার জন্য যত না হউক, সমগ্র নারীজাতির জন্য বাধ্য হইয়া পুরুষদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকে এত নীচমনা ও হীনচরিত্র যে, অনেক সময়ে তাঁহারা এরূপ আক্রমণের যোগ্য [illegible]। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে হইয়া[illegible] [illegible] ইহাতে একটা অবান্তর শুভ ফললাভ হইয়াছে—জনসাধারণে [illegible] [illegible] [illegible] কারসাজি অবগত হইয়াছে। কথায় কথায় তিনি Sorrows [illegible] [illegible] বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।—সে বিজ্ঞাপন এই [illegible] [illegible]লোচিত হইবার জন্য কোন সমালোচকের নিকট প্রেরিত হইবে [illegible] [illegible]চনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সাধারণের ন্যায় ক্রয় করি[illegible] [illegible]র পুস্তকালয় হইতে লইতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, [illegible] কখনও সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইবে না। পূর্ব্বে [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহার পুস্তক না পড়িয়া সমালোচনা করেন।

সুতরাং পুস্তক পাঠা[illegible]লোচনা লিখিবার কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্ভিন্ন ইহাতে তাঁহার [illegible] বাঁচিয়া যাইবে। তিনি বলেন, Barab[illegible] ও Sorrows of Satan [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিক্রীত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষ খণ্ডের উপর বিক্রয় হইয়াছে, আরও হইতেছে। ইহাদের মধ্যে Bar[illegible] সমালোচিত হইয়াছিল, আর Sorrows of Satan সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয় নাই।

আধুনিক লেখকদের সহিত পরিচয়ের কথায় তিনি বলেন,—সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার বড় কাহারও সহিত পরিচয় নাই। তবে কার্য্যোপলক্ষে Sir walter Besent ও অন্যান্য অনেকের সহিত চিঠি লেখালেখি হইয়াছে। সম্রান্ত ও সুপরিচিত লোকদের মধ্যে কেবল মৃত রাজকবি টেনিসন্ আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন ও মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমার প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে মিঃ ক্লিফোর্ড হ্যারিসনের লেখা আমার বড় ভাল লাগে। তিনি এখন সাধারণ্যে সুপরিচিত নহেন। Sorrows of Satan গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা Mevis Clare চরিত্রে আমি আপনার চিত্র আঁকিয়া[illegible] এই অলীক জনরবের মূল Review of Reviews সম্পাদক মিঃ ষ্টেড। মিঃ ষ্টেড পরে [illegible]নার এই ভ্রমের সংশোধন করিয়াছেন। মিঃ বারে My Contemporaries in Fiction নামক পুস্তকে উক্ত ভ্রমপূর্ণ জনরবের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। আমি তাঁহার কোন রচনা পড়ি নাই। তিনি যেমন আমার পুস্তক পাঠ করিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে লিখিয়াছেন, মেভিস্ ক্লেয়ারের মূল আমি নিজে, তাঁহার কোন পুস্তক পড়িয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে উক্তরূপ মত প্রকাশ করিতে পারি না। অতি অন্তরঙ্গ পরিচিত ব্যতীত অন্য কাহারও সম্বন্ধে এরূপ মত প্রকাশ করা নিতান্ত অন্যায়।

মিস্ কবেলি ও আধুনিক লেখকগণ।

মিস্ করেলি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ হইতে অনেক পত্র পাইয়া থাকেন। তাহাদের সংখ্যা দেখিয়া লেখক বিস্মিত হইয়াছিলেন। মিস বলেন,—ইহাদের উত্তর প্রত্যুত্তর লেখা আমার একটা কাজ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের জিজ্ঞাসায় তিনি বলেন, পত্রগুলি অনেক প্রকারের। ইহাদের কতকগুলি প্রণয়পত্র। সেগুলি পড়িবামাত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। অনেকে আপনার জীবনকাহিনী পত্রে ব্যক্ত করিয়া স্বীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। অবশ্য, এই সকল পত্রের উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। অনেকে আবার আমার পুস্তকের অনুবাদ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখে। আর এক সম্প্রদায়ের পত্র লেখক আছে, তাহারা বড় বিরক্তিকর। তাহারা আমার স্বাক্ষরের জন্য ব[illegible]। ইহাদের কিছুতেই হটাইবার যো নাই। আমি অনেক স্বাক্ষরহীন পত্র পাইয়া[illegible] সেগুলি প্রায়ই গালাগালি-পূর্ণ। এই সকল পত্রলেখকদের বিশ্বাস, আমি[illegible] অগ্রসর হইতেছি। কতকগুলি পত্র আমার বেশ [illegible] গ্রীষ্মকালে যখন আমি স্কটলণ্ডে বাস করিতেছিলাম, [illegible]দি পাঠাইতে আদেশ করিত[illegible] অল্প দিন হইল, কেপ[illegible] একখানি পত্র পাইয়াছি, সেখানি এইরূপ,—প্রিয় মিস্ করেলি, [illegible] একখানি পুরাতন বেহালা আমাকে পাঠাইবেন? আমার একখা[illegible]আছে; কিন্তু আমার মাতার কিনিয়া দিবার সঙ্গতি নাই, [illegible] ধরের ছবি দেখিয়াছিলাম, তা[illegible]নি বেহালা [illegible] হইতে আমি মনে করিয়াছি, আপনার নিকট একখানি[illegible]

শ্রীযুক্তা স্বর্ণ কুমারী দেবী ।

কৌমার।

...বনোদগমে যৌনসম্মিলনের আকাঙ্ক্ষা জীবমাত্রেরই ... মাত্র ... ব্যগ্রতা ও অধীরতা বিষয়ে ক্ষুৎপিপাসার অব্যবহিত নিম্নেই বোধ হয় ... দুর্দ্দমনীয়া প্রবৃত্তির স্থান। ... কাল সমাগত হইলে, এই প্রবৃত্তির উত্তে... প্রায় সকল শ্রেণীর জীবেরই পুরুষেরা অধীর, উচ্ছৃঙ্খল, উন্মত্ত, ভীষণ ... উঠে। এতন্নিবন্ধন জীব-জগতে উন্মত্ত চেষ্টা, নিদারুণ প্রতিযোগি... মরণান্তক যুদ্ধের লোহিত প্রবাহ নিরন্তর প্রবহমান। অতি শান্তপ্রকৃতি, নিরীহ, ভীরু জীবও তাহাদের সঙ্গম-ঋতুতে স্ত্রীলাভের জন্য মরিয়া হইয়া উঠে, এবং প্রাণান্তপণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করে। যে দুর্ব্বল, যে রুগ্ন, যে অন্য কোনরূপে অক্ষম, বা জীবনসংগ্রামের অনুপযোগী, তাহার ভাগ্যে... কাজেই স্ত্রীলাভ ঘটে না, বা বহুবিলম্বে ঘটে; কিন্তু সক্ষম জীব ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্মিলনে বিরত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাণিজগতে, এক মনুষ্যজাতি ... আর কোথাও নাই।

ধর্ম্মবিষয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাস, শারীরিক পবিত্রতা বিষয়ে ভ্রান্ত ... ইন্দ্রিয়জয় সম্বন্ধে বিকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, অনেক সময়ে এবং অনেক দেশে, মনুষ্য, ধর্ম্ম বা দেবোদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়া দাম্পত্যসম্বন্ধসংস্থাপনে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকিয়াছে, এবং এখনও থাকে বটে; কিন্তু প্রাপ্তযৌবনে বা তৎপূর্ব্বে দাম্পত্যসম্বন্ধসংস্থাপন করাই মনুষ্যজাতির সাধারণ ও সনাতন প্রথা।

কোন বিশেষ কারণ বা অলঙ্ঘ্য ... না থাকিলে, অসভ্য মানব যৌনসম্মিলনে কখনও বিরত হয় না। অনেক স্থলে, ইচ্ছা না থাকিলেও, সমাজনিয়মে বাধ্য হইয়া বিবাহবন্ধন বাঁধিতে হয়। বলিতে কি, ... অনেক জাতি ও সমাজ আছে, যাহাদের মধ্যে কেহ বিবাহ না ক... তাহাকে সমাজমধ্যে অপদস্থ, উপেক্ষিত ও ঘৃণিত হইয়া থাকিতে... সমাজের এক জন বলিয়া তাহাকে কেহ গণ্য করে না, এবং সামাজি... ব্যাপারে ...র মতামতও গৃহীত হয় না। ...নও সমাজ দেখিতে ... অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বি..., বয়োজ্যেষ্ঠ অবিবা... ...শেও প্রকাশ্য অবমাননা ... বিবাহ অধিকারী, ...

সেই লাঞ্ছিত পুরুষ কখনও সেই লাঞ্ছনার প্রতিবিধান বা প্রতিবাদ করিতে সাহস করে না।

বচেল সাহেব বলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্য মানব কখনও অবিবাহিত অবস্থায় জীবন যাপন করে না। মানডিকো জাতির মধ্যে কেইলিয়ে সাহেব একটিও যুবতী স্ত্রীলোক দেখিতে পান নাই, যাহার বিবাহ হয় নাই—সুরূপাই কি, আর কুরূপাই কি, সকলেই পতিযুক্তা। বার্থ সাহেব লিখিয়াছেন যে, তিনি অবিবাহিত শুনিয়া পশ্চিমপ্রদেশবাসী তুয়ারগেরা ইহা তাঁহার বিশেষ দোষের কথা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যে অবিবাহিত থাকিতে পারে, এরূপ অসম্ভব ব্যাপার তাহাদের ধারণার অতীত। ডাকেটো জাতির সম্বন্ধে প্রেস্কট সাহেব লিখিয়াছেন,—"ইহাদের মধ্যে একটিও অবিবাহিত পুরুষ আমি দেখি নাই ও থাকার কথা শুনি নাই। তাহাদের এতটা আত্মসম্মান ও স্ত্রীজাতির সম্ভ্রমবোধ আছে যে, তাহারা কেহই অবিবাহিত থাকে না।" আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের অনেক স্ত্রীলোকের বিবেচনায়, কৌমার এবং মৃত্যু একই কথা। চাক্মা জাতির সম্বন্ধে আজারা সাহেব বলেন যে, দাম্পত্য-মিলনের আবশ্যকতা অনুভব করিলেই ইহারা অবিলম্বে বিবাহ করে। ইয়াগান জাতির পুরুষদিগের মধ্যে মূক ও অসমর্থ লোক ব্যতীত আর সকলেই বিবাহ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পতিবিহীন অবস্থায় থাকে না বলিলেই হয়—বৈধব্য ঘটিলেও কালবিলম্ব না করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে। অষ্ট্রেলিয়াতে সকল বালিকারই অতি অল্প বয়সে বিবাহের কথাবার্ত্তা পাকাপাকি হইয়া যায়, এবং ইতিপূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে অবিবাহিত ষোড়শী কখনও দেখা যাইত না। ইউরোপীয় উপনিবেশসংস্থাপনের পর হইতে, ইহাদের এই চিরন্তন প্রথা ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে। উত্তর কুইন্সলণ্ডে [illegible] অনেক যুবা পুরুষকে বিবাহের জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে [illegible] কিন্তু কেহই অবিবাহিত থাকে না—অগ্র পশ্চাৎ সকলেরই বিবাহ [illegible] [illegible]তালদিগের মধ্যে অবিবাহিত পুরুষ সমাজমধ্যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই [illegible]। তাহারা তাহাকে যে নামে অভিহিত করে, তাহার অর্থ—অমানুষ [illegible]', এবং সমাজে সে শূকরের প্রায় সমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। [illegible]ফিরদিগের মধ্যে সামাজিক বা গার্হস্থ্য কোন ব্যাপারে অবিবাহিত পুরুষের [illegible] কথা চলে না। [illegible] বিবাহ না করিলে কেহ [illegible] [illegible]চিত হয় না। [illegible] বিশ্বাস করিত যে, [illegible]

যাহার মৃত্যু হয়, নাঙ্গানাঙ্গা নামক দেবতা তাহার স্বর্গগমনের পথ রোধ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অসভ্য মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক কখনও যৌনসম্মিলনে বিরত হয় না। এ কথা সাধারণতঃ সত্য হইলেও, এ নিয়মের ব্যতিক্রম-স্থল যে একেবারে নাই, এমন কথা বলা যায় না। এস্কিমো জাতির শাখা-বিশেষে এমন দুই দশটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চিরকুমারী হইয়া পুরুষোচিত বৃত্তি অবলম্বনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। পক্ষান্তরে, কানিয়াগ মুট, আলুটু এবং উত্তর আমেরিকার আরও কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, কোন কোন পুরুষকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ ধরাইয়া স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহারাও স্ত্রীজনোচিত বৃত্তি ও চিরকৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করে। কিন্তু এরূপ অস্বাভাবিকতার স্থল এত বিরল যে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে না গণিলেও চলে।

অসভ্য মানব ইচ্ছাপূর্ব্বক যৌনসম্মিলনে বিরত হয় না বটে, কিন্তু স্থল-বিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে জীবন বা জীবনের কিয়দংশ পত্নীহীন অবস্থায় যাপন করিতে হয়। যেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, সেখানে অনেক লোককে যে পত্নীহীন থাকিতে হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। যেখানে মূল্য দিয়া স্ত্রী ক্রয় করিতে হয়, সেখানে যে মূল্যসংস্থানের জন্য অনেককে স্ত্রীলাভের জন্য প্রাপ্তযৌবন হইয়াও অল্পাধিক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। যে অন্ধ, যে মূক, যে অচিকিৎস্য-রোগগ্রস্ত, যে অঙ্গহীন, যে বিকলেন্দ্রিয়, যে ক্লীব, তাহার বিবাহ হয় না, হওয়া উচিতও নহে। কিন্তু এ সকল কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য নয় বলিয়া উল্লেখমাত্র করিয়া [illegible] হইলাম।

[illegible] নিয়ম অসভ্য সমাজে, উচ্চ সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন সমাজেও সেই [illegible] দেখা যায়। চীন দেশের বিবাহপ্রণালী দেখ। ডাক্তার গ্রে লিখিয়াছেন,—"বলিষ্ঠ হউক, দুর্ব্বল হউক; সুরূপ হউক, কুরূপ হউক; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই বিবাহ করিবার জন্য পিতামাতা কর্ত্তৃক পুত্র কন্যা আদিষ্ট হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র বা কন্যার অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে, পিতামাতা তাহা দৈবনিগ্রহ বলিয়া মনে করেন। সেই জন্য, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগ হইলে, অবিলম্বে বিবাহ দিবার জন্য পিতা মাতা বড় ব্যস্ত হইয়া উঠেন। বিবাহটা এতই [illegible] যে, মৃতেরও বিবাহ হয়। যে সকল বালক বালিকার

অকালে মৃত্যু হয়, তাহাদেরও প্রেতাত্মার উদ্দেশে বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।" কৌমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর আপত্তি, মনে কর দেখি!

কোরিয়া রাজ্যে অবিবাহিত পুরুষকে কেহ 'মানুষ' বলে না। যতই কেন বয়স হউক না, সেখানে অবিবাহিত পুরুষের অভিধান—'হ্যাটো'। কথাটা চৈনিক। চীন ভাষায় ইহার অর্থ—অবিবাহযোগ্য কন্যা। পুরুষের সম্বন্ধে এ কথা ব্যবহৃত হওয়া কতটা অবজ্ঞাসূচক, মনে কর দেখি! শুদ্ধ তাহাই নহে—চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সের বিবাহিত তরুণ, অবিবাহিত প্রবীণকে প্রকাশ্য-ভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, প্রহার পর্য্যন্ত করিলেও, সেই প্রবীণ বাক্যের দ্বারাও তাহার প্রতিবাদ করিতে সমর্থ নহে। পারস্য দেশে অকলঙ্কিত-চরিত্রা বিংশতিবর্ষবয়স্কা স্ত্রীলোককে কখনও কুমারী দেখা যায় না; অবিবা-হিত প্রবীণ পুরুষও দুর্লভ। মিসর দেশে বয়ঃপ্রাপ্ত কোন পুরুষ, যুক্ত কারণ না দেখাইয়া অবিবাহিত থাকিলে, তাহাকে দুর্নামগ্রস্ত হইতে হয়। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, মুসলমানেরা বিবাহকে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে।

আমাদের সমাজে, সন্ন্যাসী ব্যতীত আর সকলের পক্ষেই বিবাহ অবশ্য-করণীয়। শুধু কর্ত্তব্য নহে; ধর্ম্ম। ইহা কেবল বিধিবিহিত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উপায়ীভূত চুক্তি নহে; ইহা একটা সংস্কার—সর্ব্বপ্রধান সংস্কার; স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র সংস্কার। সুতরাং আমাদের সমাজে (ব্রাহ্ম ও বিলাত-ফেরৎদিগকে ইহার মধ্যে ধরিতেছি না) কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই যে বিশেষ প্রতিবন্ধক ব্যতীত অবিবাহিত থাকে না, ইহা না বলিলেও চলে।

ইউরোপীয় সভ্যতার একটা ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, ইউরোপে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে; কেহ কেহ চিরজীবন থাকে। ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বাধ্যায়ীরা সোদ্বেগে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে,—এই প্রবৃত্তির বেগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; বিবাহের বয়সও বাড়িয়া যাই-তেছে; জনসংখ্যার অনুপাতে অবিবাহিতের সংখ্যাও বাড়িতেছে। তবে, নগর অঞ্চলে, এই বেগ যেরূপ প্রবল এবং ক্রমে প্রবলতর হইতেছে, পল্লী অঞ্চলে সেরূপ নহে। পল্লী অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্প [illegible] বিবাহ হইয়া থাকে, এবং অবিবাহিতের সংখ্যাও অপেক্ষাকৃত অল্প।

পল্লী-সমাজে স্ত্রীলোক সংসারযাত্রার সাহায্য [illegible] কার্য্য সকলই

তাহারা [illegible] করে—রন্ধন, বয়ন, সীবন, সন্তানপালন, বস্ত্র ধৌত প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় সকল কাজই তাহারা স্বহস্তে করে। এতদ্ব্যতীত কৃষি-ক্ষেত্রে স্বামীর সাহায্য করে, গোমেষাদিপালনের ভার গ্রহণ করে, নদী হইতে মৎস্য ধরিয়া আনয়ন করে। ইউরোপেও পল্লীবাসিনীরা লক্ষ্মীরূপিণী; সেই জন্য তাহারা অবিবাহিতা প্রায় থাকে না, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই লোকের বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। সেই জন্যই রুষিয়ার শ্রমজীবিগণ পুত্রাদির বিবাহ, যত অল্প বয়সে পারে, দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করে। তাহাদের বিবাহও যৌবনোদগমের পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

নগরাঞ্চলেও বিবাহপরাঙ্মুখতা সঙ্গতিহীন অপেক্ষা সঙ্গতিশালী সমাজেই অধিক। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে সহজেই বুঝা যায়। প্রথমতঃ, ইউরোপীয়েরা অত্যধিক ব্যক্তিগত-স্বাধীনতাপ্রিয়; কোন প্রকার বন্ধনে বাঁধা পড়িতে তাহারা সহজে চাহে না। যে সকল স্থলে বিবাহটা বন্ধনমাত্র নহে, বরং জীবনযাত্রার প্রকৃত উপায়, সে সকল স্থলে বিবাহবিষয়ে যে লোক বাধ্য, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। যে স্থলে ইহা কেবল বন্ধন, সে স্থলে যে লোক বিবাহপরাঙ্মুখ হইবে, ইহা ত পড়িয়াই আছে। অনুবাদ ঠিক হয় না বটে, তথাপি ইউরোপে যাহাদিগকে 'জেণ্টল্‌মেন্' বলে, তাহাদিগকে আমরা এই প্রবন্ধে ভদ্রসমাজই না হয় বলিলাম। ইউরোপীয় ভদ্রসমাজের রমণীরা বড় বিলাসপরায়ণা—অন্ততঃ আমরা যাহাকে বিলাস বলিয়া মনে করি, তাহাদের তাহা প্রয়োজনীয়ের মধ্যে। ইহাদিগকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিলে প্রায়শঃ সহধর্ম্মিণী, সংসারযাত্রার সঙ্গিনী, আনা হয় না; সহশায়িনী আনা হয় মাত্র। ইহারা প্রায়শঃ গৃহের লক্ষ্মী নহে; শয়নমন্দিরের অপ্সরো-মাত্র। ইহারা স্বামিগৃহে নবশোণিতসঞ্চার করে না, শোণিত শোষণ করে মাত্র। যাহারা পিতৃগৃহ হইতে যৌতুকস্বরূপ অর্থ লইয়া না আসে, তাহারা ভূতের বোঝা হইয়াই আসে। নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে রূপ যৌবনের মোহ কাটিয়া যায়। তখন ভূতের বোঝাটা বড়ই ভারি বলিয়া বোধ হয়। তাই ইউরোপীয় সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে ইহার জন্য বড় কাতর হাহাকার শুনিতে পাওয়া [illegible] ভূতের বোঝা ঘাড়ে করিবার পূর্ব্বে লোকে যে ইতস্ততঃ করিবে, [illegible] বিবেচনা করিবে, দশ দিন বিলম্ব করিবে, হয় ত জন্মের মতন পিছাইয়া প[illegible] ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

আর [illegible] কারণ আছে। ইউরোপীয়েরা অনেকটা আত্ম-স্বাচ্ছন্দ্য-

কামী, আত্মসুখপ্রিয়। আপনি ভাল খাইব, ভাল পরিব, ভাল [illegible], এতাদৃশ ভাবই তাঁহাদের স্বভাব। অমন হিমপ্রধান দেশের অধিবাসীদিগকে আত্মরক্ষার জন্ত আত্মান্বেষী হইতেই হইবে—ইহা তাহাদের দোষ বলিতেছি না। সুতরাং ইঁহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহ অধিক ব্যয়সাধ্য। বিবাহ করিলে, স্ত্রীকে নিজের ও তাহার পদোপযোগী অবস্থায় রাখা আরও ব্যয়সাধ্য। তার পর, পুত্র-কন্তাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া আরও বহুব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং ইউরোপে দেখা যায় যে, উমেদারী (Courtship) শেষ করিয়াও এবং বাগ্দত্ত হইয়াও স্ত্রী এবং পুরুষ অনেক দিন অবিবাহিত থাকে। এরূপ অবস্থায় থাকাই বিবেচকের কাজ। ইউরোপীয় 'ভদ্রসমাজের' বিবাহে যে অযথা বিলম্ব হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

আর একটা গুরুতর কথা আছে। পুরুষ এবং স্ত্রী, উভয়কেই আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করিলে, বিবাহব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটিবেই। শিক্ষিত এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আপনার মনের মতন একটা আদর্শ ঠিক করিয়া বসিয়া থাকে—বাঞ্ছনীয় সঙ্গিনী সম্বন্ধে, জীবনপ্রণালী সম্বন্ধে, সংসার-সুখ সম্বন্ধে, একটা আদর্শ গড়িয়া বসিয়া থাকে। সংসারের হিসাবে, সে কল্পনার আদর্শটা প্রায়ই বড় উচ্চ হইয়া থাকে। উচ্চ আদর্শানুরূপ স্ত্রী বা পুরুষ পৃথিবীতে সুলভ নহে। কাজেই এরূপ সমাজে বিবাহ হইতে বহুবিলম্ব হয়—স্থলবিশেষে একেবারেই হয় না। ইহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল, ইউরোপ। আমাদের দেশেও যাহারা ইউরোপীয় জীবনপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বহু প্রাচীন কাল হইতে একটা সংস্কার মনুষ্যজাতির মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। সংস্কারটা এই যে, স্ত্রীপুরুষের শারীরিক মিলন, সুতরাং বিবাহপ্রথা, অপবিত্রতা ও কলুষতার আধার। এরূপ সংস্কার কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল, তাহার বিচারের এ স্থল নহে; কিন্তু সংস্কারটা যে মনুষ্যসমাজে বহুকাল আছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এই সংস্কারবশেই বুদ্ধদেবের জন্ম স্বভাবাতিরিক্ত রূপে বিবৃত হয়। এই কারণেই যিশুখৃষ্টের গর্ভধারিণী কুমারী [illegible] ঘোষিত হইয়াছেন। এখনও যে সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকদিগের ম[illegible] নিষিদ্ধ, তাহাদের সম্বন্ধেও বলা যায় যে, এই অস্বাভাবিক নিষেধ [illegible]ত প্রাচীন সংস্কারের ফলস্বরূপ। কেন না, তত্তৎ ধর্ম্মের আদিগুরুগণ [illegible]গণের জন্ত

এমন [illegible] আজ্ঞা প্রদান করেন নাই। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-সেবা দুঃখের কারণ; অতএব ইন্দ্রিয়জয় করা কর্ত্তব্য। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা ধর্ম্মযাজক ও যাজিকাদের পক্ষে বিবাহ ব্যাপার একেবারেই নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং বহুবিবাহ পর্য্যন্ত কোথাও নিষেধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার শিষ্য সেণ্ট্ পল্ বিবাহকে 'অনিবার্য্য অমঙ্গল' বলিয়াই ধরিয়াছেন। তিনি করিন্থিয়ানদিগকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে,—"যে আপনার কুমারী কন্যাকে স্বামিসংযুক্তা করে, সে ভালই করে; কিন্তু যে না করে, সে আরও ভাল কাজ করে।" লোকে বলে, বাঁশের অপেক্ষা কঞ্চি দৃঢ় হয়। এই কথার ফলে, রোমান্ ক্যাথলিকদিগের মধ্যে ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে বিবাহটা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া জোর জবরদস্তি দ্বারা মানুষকে ধার্ম্মিক করিতে গেলে যে বিষময় ফল ফলে, ইউরোপের 'মধ্যযুগে'র সন্ন্যাসিনী-আশ্রমের (Nunnery) বৃত্তান্তে তাহা নারকী উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে পাপচিত্র আঁকিবার প্রবৃত্তি নাই; প্রয়োজনও নাই।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সেক্‌সপীয়র।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

সেক্‌স্‌পীয়র মানবতার কবি,—তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি।

মানবতা কি? এই প্রশ্নের আমরা এইরূপ উত্তর পাইয়াছি। মানবতা দেবত্ব ও পশুত্বের অদ্ভুত সমন্বয়, মানবের বিশাল সমগ্রতা; মানব-প্রকৃতি সপ্তকের প্রকাণ্ড সমষ্টি। এই মানবতার বিরাট চিত্র সেকস্‌পীয়রের কল্পনা-দর্পণে যথাযথ প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি মানবতার কবি।

এ কথা আমরা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সম্প্রতি এ কথাটা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। সেক্‌স্‌পীয়র যদি মানবতার কবি হয়েন, তবে তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনা-শক্তি। এই সিদ্ধান্তই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় [illegible] চরিত্র-চিত্রণে তিনি সিদ্ধহস্ত। বোধ হয়, জগতের কোন কবিই এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নহেন। চরিত্রাঙ্কনেই তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণ বিকাশ। সেক্‌স্‌পীয়র কি ভাবে মানব-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন?

সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে, প্রথমতঃ চমৎকৃত হইতে হয় তাঁহাদের সুসম্পূর্ণতায়। যেন তাঁহার কবিদৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির সমব্যাপক। কোন অংশ বিকৃত অপর্য্যাপ্ত অঙ্গহীন নহে। মানবতার পূর্ণ প্রতিকৃতি—মানুষের দেবত্ব ও পশুত্ব, তাহার ক্ষুদ্রতা ও মহত্ব, তাহার নীচতা ও উদারতা, তাহার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ও অবসাদময় নৈরাশ্য, সর্ব্বোৎসর্গী আত্মত্যাগ ও আত্মম্ভরী স্বার্থপরতা, বিশ্ববিজয়ী প্রেম ও মোহান্ধ ইন্দ্রিয়পরতা, উন্মুক্ত সরলতা ও সংমোহন কাপট্য—সকলই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। মনুষ্যত্বের কোন অংশ বাদ দেওয়া তিনি সঙ্গত ভাবেন নাই। সেই জন্য মানুষকে সকল অবস্থাতেই চিত্রিত করিয়াছেন—মানবের উচ্চ নীচ, উত্তম অধম, ভাল মন্দ, সকল বৃত্তিরই ছবি ফুটাইয়াছেন। * তাঁহার চক্ষে কোনটিই পরিত্যাগের যোগ্য নহে। এমন কি, যে সকল বৃত্তি মানসিক ব্যাধি, দুর্ব্বলতা অথবা ব্যামোহের ফল, সেগুলিও সমান দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ইহাকেই চরিত্রাঙ্কনের সুসম্পূর্ণতা বলিতেছি।

আর চরিত্র-চিত্র সুসম্পূর্ণ বলিয়াই কোথাও সত্যের অপলাপ হয় নাই। এমন যথাযথ চিত্রণ অন্য কবির কাব্যে দুর্লভ। মানব-প্রকৃতি বাস্তবপক্ষে যেমন, সেক্‌স্‌পীয়র তাঁহার ঠিক তেমনই ছাঁচ তুলিয়াছেন। কোথাও অতিরঞ্জিত বা বিকৃত বর্ণন করেন নাই। কোথাও একটি রেখারও সংযোগ বা বিয়োগ করেন নাই। তাঁহার লক্ষ্য স্বভাবের যথাযথ অনুকরণ, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন নহে। † দর্পণে যেমন মুখের অবিকল প্রতিবিম্ব পড়ে, তাঁহার নাটকে সেইরূপ মানব-প্রকৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি দেখিতে পাই। মনুষ্য-

* He finds in man nothing that he would care to lop off. He accepts nature & finds it beautiful in its entirety. He paints it in its littlenesses its deformities, weaknesses, its excesses, its irregularities & in its rages. He exhibits man at his meals, in bed, at play, drunk mad, and sick.

Taine's English Literature, Vol I. Shakespere.

† He sees things as they are with their ugly & beautiful details by imitative sympathy.

জীবনের কোন ব্যাপারই, কোন ঘটনাই, ছাঁটিয়া ফেলিবার যো নাই। জীবনে ঠিক যেমন ভাবে ঘটে, ভাল হউক মন্দ হউক, শ্লীল হউক অশ্লীল হউক, উচ্চ হউক নীচ হউক, সেই ভাবেই তাঁহার নাটকে চিত্রিত দেখি। অতএব তাঁহার চরিত্রচিত্রণ যে সত্যনিষ্ঠ যথাযথ হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি?

আর যথাযথ বলিয়াই সে চিত্র সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। চরিত্রের অসঙ্গতি অথবা অস্বাভাবিকতা, সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে কোথাও লক্ষিত হয় না। যাহার মুখে যে কথা সাজে না, সেক্‌স্‌পীয়র কখন তাহাকে সে কথা বলান না। যাহার দ্বারা যে কার্য্য সম্ভবে না, সেকস্‌পীয়র কখন তাহাকে সে কার্য্য করান না। প্রত্যেক চরিত্রের যাহা বীজশক্তি—যে শক্তির বশে প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক চেষ্টা নিয়মিত হয়, কল্পনা ধ্যান দ্বারা সেকস্‌পীয়র সেই শক্তির ধারণা করিয়া লয়েন, এবং তাহা হইতে প্রতি কথা, প্রতি কার্য্য, প্রতি চেষ্টার কার্য্য-কারণ-ভাব আয়ত্ত করিতে পারেন। সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র সকল বাস্তব নরনারীর ন্যায় সর্ব্বত্র সুসঙ্গত। কবি মধুসূদন বীররসের অবতার শ্রীরামচন্দ্রের মুখে—

> 'দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে;
> যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু * *
> মূর্খ যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে।'

ইত্যাদি বাক্য বসাইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস প্রেমময়ী জানকীকে পরপুরুষের প্রেম-ভিক্ষার্থিনী শূর্পণখার লজ্জাহীনতায় হাসাইয়াছেন। সেকস্‌পীয়রে আমরা কখন এরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাইব না। যে যেমনটি, সেকস্‌পীয়র তাহাকে ঠিক সেই মত কথা বলান, সেইমত কার্য্য করান, সেইমত চেষ্টায় নিযুক্ত করেন। সেকস্‌পীয়রের নাটকে যে সকল অশ্লীলতা গ্রাম্যতা অশিষ্টতার সমাবেশ দেখিতে পাই, বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সে সমস্তই চরিত্রের সঙ্গতিরক্ষার নিমিত্ত।*

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক জারভাইনস এ বিষয়ে লিখিয়াছেন, 'লোকে যাহাকে

---

* Numbers of the errors of taste in Shakespere have turned out to be striking touches of character; the esthetic deformities imputed to his poetry have proved the moral deformities of certain of his persons; and what had been denounced as a fault was found to be an excellance.—Gervinus.

রুচিভঙ্গের উদাহরণ ভাবিত, অধুনা তদ্দ্বারাই সেক্সপীয়রের চরিত্র-চিত্রণের অদ্ভুত কারিগরি সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহা তাঁহার কাব্যের অঙ্গবিকৃতি বিবেচিত হইত, তাহাই তৎসৃষ্ট চরিত্রবিশেষের সুসঙ্গত নৈতিক বিকার সাব্যস্ত হইয়াছে। আর যাহা দোষ বলিয়া নিন্দিত হইত, তাহা সম্প্রতি গুণে পরিণত হইয়াছে।'

সেকস্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রাবলীর আর একটি বিশেষত্ব, তাহাদের বৈচিত্র্য। জগতের কোন কবিই বোধ হয় এত প্রকারের চরিত্র কল্পনা করিতে পারেন নাই। বোধ হয়, এক বিধিসৃষ্টি ভিন্ন আর কোথাও এত বিবিধ বিচিত্রতা নাই। কালিদাসের দুষ্মন্ত, পুরুরবা, অগ্নিমিত্র, একই ধরণের নায়ক। মিল্‌টনের সয়তানে যে সুর, স্যাম্সনে তাহার প্রতিধ্বনিমাত্র। বাইরণের ম্যানফ্রেড, করসেয়ার, লারা, জিয়র, একই ধাতুর লোক। অথচ সেকস্‌পীয়র শত শত বিভিন্ন চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দুইটি এক প্রকৃতির ব্যক্তি নহে। প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও সকলেরই নিজ নিজ বিশেষত্ব আছে। এ বিষয়ে সেকস্‌পীয়রের কতটা কৃতিত্ব, মানব-চরিত্র বিষয়ে তাঁহার কিরূপ সূক্ষ্ম ভেদজ্ঞান, তাহার উত্তম প্রমাণ পাই 'কিং লিয়রে'। যাঁহারা সেকস্‌পীয়রের এই মহানাটক অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, একই প্রকৃতি ও অবস্থাপন্ন লিয়র ও গ্লষ্টরকে তিনি কেমন ভিন্ন ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন; একই প্রলয়ংকরী বিনাশশক্তির আধার গণারিল ও রিগন ভগিনীদ্বয়কে কেমন বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন; আর একই পিতৃপ্রেমের অবতার করডিলিয়া ও এডগারকে সমান ভাবে নির্য্যাতনগ্রস্ত করিয়াও কেমন বিচিত্রভাবে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিয়াছেন। এইরূপ সর্ব্বত্র দেখা যায়। অন্য কবিরা স্বজাতীয় চরিত্রকে সমান করেন; সেকস্‌পীয়র একাধারে সমজাতীয়তা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করেন। মারকিন সমালোচক হাড্‌সন্ যথার্থ বলিয়াছেন,—'সেকস্‌পীয়রের চরিত্রসৃষ্টিতে পুনরুক্তি দোষ নাই। স্বজাতীয় চরিত্রের মধ্যে সমানতা আছে বটে; কিন্তু কোন দুইটি চরিত্রই অস্বতন্ত্র নহে। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে।'*

ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণ-বিষয়ে যাহা বলা হইল, চিত্তগত ভাব-সমূহের

---

* There is no repetition among them; though there are some striking family resemblances, yet no two of them are individually alike.

Hudson vol. I 167.

অঙ্কন-বিষয়েও ঐ কথাই বলা যায়। একই ভাব—প্রেম, হিংসা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতির সূক্ষ্ম প্রভেদ তিনি এমন দক্ষতার সহিত ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে প্রদর্শিত করিয়াছেন, যে তাহার আলোচনায় বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া থাকা যায় না। দেস্‌দিমোনার প্রতি ওথেলোর অবিশ্বাস, ইমোজেনের প্রতি পস্‌থুমাসের অবিশ্বাস, এবং হারমিয়োনির প্রতি লিয়নটিসের অবিশ্বাস—এ তিনে কত প্রভেদ! ম্যাকবেথের লোভ, তৃতীয় রিচার্ডের লোভ ও ইয়াগোর লোভ কত বিভিন্ন! রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, ফার্ডিনন্দ মিরান্দার প্রণয়, ফ্লোরিজেল পরদিতার প্রণয়, এবং ক্রটস পারসিয়ার প্রণয় এক হইয়াও কত অন্য। এইরূপ অন্যান্য বৃত্তির সম্বন্ধেও দেখা যায়।

কোন একটি চিত্র তুলিতে ফুটাইতে হইলে, প্রথমে তাহার বিষয় হৃদয়ে ধ্যান করিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে হয়। তবে সেই চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। সেক্‌স্‌পীয়রের চিত্রফলকে আমরা যেরূপ উদ্ভাসিত চিত্রসমূহের সাক্ষাৎ পাই, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি সেই বিবিধ চিত্রের প্রতিরূপ হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাহার চিত্তে এত বিভিন্ন ব্যক্তি, বিভিন্ন ভাব, নিরুদ্বেগে একত্র বসতি করিতে পারিত, তাঁহার কি বিপুল অপক্ষপাতিতা! কি অপরিসীম উদারতা! (The perfect even handedness of Shakespere's representations) কেলিবন ও টিটেনিয়া এবং মিরন্দা; বটম ও থিসিয়স এবং প্রসপেরো; পেরোলিস ও হটস্‌পার এবং পঞ্চম হেনেরি; ডোল টিয়ারসিট ও ইসাবেলা; মিসেস্‌ কুইক্‌লি ও ভলামনিয়া;—সকলই এক মহাশিল্পীর প্রসূত। * সর্ব্বত্র সমান আলোচনা, সমান ধীর স্থির প্রশান্ত ভাব! কেহই তাঁহার সহানুভূতির সীমার বহির্ভূত নহে। এডমণ্ড ও ইয়াগোও বেধ হয় নহে। আর্য্যঋষিরা যাহাকে উপেক্ষা বলিতেন, ইংরাজিতে Tolerance শব্দে যাহার কতকটা আভাষ দেওয়া যায়, মহাকবি সেক্‌স্‌পীয়রের তাহা স্বভাবসিদ্ধ ছিল। সেই জন্য যাহাকে নৈতিক কঠোরতা—অসহিষ্ণুতা বলে, সেক্‌স্‌পীয়রে তাহার কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। ইংরাজ সমালোচক হাজলিট †

---

* With all natures he is kin. From Caliban to Titania Miranda; from Bottom to Theseus Prospero; from Parolles to Hotspur Henry; Doll Tearsheet to Isabella; Mrs Quickley to Volumnia he ranges with equal power at will—Furnival

† Shakespere was the least moral of all writers, for, morality commonly so called is made up of antipathies, [illegible] talent consisted

ঠিকই বলিয়াছেন,—'লেখকদিগের মধ্যে সেকসপীয়র সর্ব্বাপেক্ষা কমনীতিশালী। কারণ, যাহাকে নৈতিকতা বলা যায়, তাহা অসহিষ্ণুতার নামান্তর। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা মানব প্রকৃতির সহিত সর্ব্বত্র সহানুভূতিযুক্ত—উচ্চ নীচ উত্তম অধম সকল অবস্থায় সহিষ্ণু।' সেকসপীয়র জানিতেন যে, কেহই নিরবচ্ছিন্ন ভাল বা মন্দ নহে। সকলেই দোষ গুণ, উৎকর্ষ অপকর্ষ আছে।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন ;—

The web of our life is of a mingled yarn ; our virtues would be proud if our vices whipped them not ; and our faults would despair if they were not cherished by our virtues.

আমাদের জীবনপট বিমিশ্রসূত্রগ্রথিত। আমাদের গুণভাগ দোষাহত বলিয়াই গর্ব্বান্ধ হইতে পায় না। আমাদের দোষভাগও গুণপুষ্ট বলিয়াই নিরাশার বশবর্ত্তী হয় না।

সেই জন্য সেকস্পীয়র অতি বড় পাপিষ্ঠের প্রকৃতিতেও একটুক সদ্গুণের সৌরভ মিশাইয়াছেন। তাঁহার ইয়াগো ফলসট্যাফ্ ক্লিওপেটরা দানব দানবী নহে—একবারে মনুষ্যত্ববর্জ্জিত নহে। তাঁহার হ্যামলেট প্রসপেরো ইমোজেন নিখুঁত দেবত্বের অবতার নহে,—সম্পূর্ণ মানবতার অতীত নহে। অধিকাংশ কবির অবলম্বিত প্রণালী ইহার ঠিক বিপরীত। তাঁহারা হয় দেবের, না হয় দানবের সৃষ্টি করেন। নরনারী গড়িতে পারেন না।

সেকস্পীয়রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি মারলোর সৃষ্ট ব্যারাবাস বা টাম্বারলেন নিরবচ্ছিন্ন দানব। অন্য দিকে রিচার্ডসন প্রভৃতি ঔপন্যাসিকের সৃষ্ট পেমিলা বা গ্রাণ্ডিসন সম্পূর্ণতঃ দেব ; ইহাদিগের মধ্যে কেহই মানুষ নহে। দেবত্ব ও পশুত্বের যে দৈব রাসায়নিক সংযোগে মনুষ্যত্ব—সে মনুষ্যত্ব এ সকল চরিত্রে নাই। সেই জন্য ইহাদিগকে অস্বাভাবিক অপ্রকৃত মনে হয়। ইহারা যেন মাটীর প্রতিমা, অথবা প্রস্তরমূর্ত্তি। রক্তমাংসে গঠিতদেহ মানুষ মানুষী নহে। এক কথায় ইহারা নির্জ্জীব।

সেকস্পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের এক অদ্বিতীয় লক্ষণ, তাহাদের সজীবতা। তাহারা প্রত্যেকে জীবন্ত নরনারী। মাটীর প্রতিমা বা প্রস্তর মূর্ত্তি নহে। তাহারা এমন সজীব যে, মনে হয় [illegible] তাহাদের শরীর বিদ্ধ করিলে রক্ত-

in sympa[illegible] [illegible]an nature in all its shapes degrees, elevations depressions [illegible] Hazlitt, English stage.

প্রাপ্ত হইবে। * অন্য কবিরা কোন একটি ভাব বা চিত্তবৃত্তিকে মানুষের মুখস পরাইয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ করান; প্রথম দৃষ্টিতে তাহাদের মানুষ বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে, তাহারা বাস্তব নরনারী নহে; নরনারীর ছবিমাত্র। অর্থাৎ, ঐ সকল চরিত্র কাম, ক্রোধ, লোভ, দুরাকাঙ্ক্ষা বা প্রতিহিংসার সাকার মূর্ত্তি—সজীব প্রাণশালী মানুষ নহে। মারলো কবির 'ব্যারাবাস' সুধুই লোভের উপাদানে গঠিত; তাহার প্রকৃতিতে অন্য মনুষ্যবৃত্তি নাই। তাঁহার টেমারলেন নিরবচ্ছিন্ন দুরাকাঙ্ক্ষার অবতার; তাহার নির্ম্মাণে অন্য মাটির সমাবেশ নাই। বেন জনসনের বোবাডিল কেবল দেহধারী মূঢ়তা; তাহার গঠনে অন্য দোষ গুণ নাই। সেক্‌সপীয়রের নাটকে ঐ জাতীয় যে সকল চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই, তাহাদের তুলনায় ইহারা কৃত্রিম মানুষ, রক্তমাংসগঠিত নহে। সাইলক ও ব্যারাবাসে কত প্রভেদ! ক্লোটন ও বোবাডিলে কত অন্তর! ট্যামারলেন ও তৃতীয় রিচার্ডে কত ব্যবধান! একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। সেক্‌সপীয়র চরিত্রের অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। মারলো প্রভৃতি কবির প্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করেন না; বাহ্য আকারে মানুষের মত করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। সেই জন্য তাঁহাদের সৃষ্ট চরিত্র অস্থি-মজ্জা-রক্ত-মাংস-বিশিষ্ট নহে। তাহাদের ভিতর খড় মাটি বা তুষিতে পূর্ণ, এবং বাহিরটা মনুষ্যচর্ম্মাবৃত। এক কথায় সেক্‌সপীয়র চরিত্রের মূলতত্ত্ব—বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর চরিত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। অন্য কবির অবলম্বন একটি অস্থায়ী ভাব, চেষ্টা, বা চিত্তবৃত্তি। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সেক্‌সপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিপুলতা, একটা বিচিত্রতা, একটা হ্রাস বৃদ্ধি জোয়ার ভাঁটার ভাব আছে। তাহারা স্থিতিশীল, অথচ পরিণামী। তাহারা স্থির, অথচ চলিষ্ণু। তাহাদের পরিচয়ে মনে হয় যে, তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ পরিসমাপ্তি আছে। তাহারা বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ নহে। †

* 'If you prick them, they well bleed'
It would see in man not a general passion—ambition anger or love; not a pure quality happinessavarice [illegible], but a character.—Taine.

† There is a certain vital limberness and ductility in them. Thus they have to our minds a past & a present and even in [illegible] we see of them at any given moment there is involed some [illegible]th of history and prophecy,—Hudson.

সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতার একটা বিশেষ প্রমাণ এই যে, জীবন্ত নরনারীর ন্যায় তাহাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট মতান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন চরিতাখ্যায়ক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি নরদেব; কাহারও মতে তিনি শোণিতলোলুপ পিশাচ; আর কাহারও মতে তিনি ক্ষুদ্রতা ও মহত্বের অপূর্ব্ব সমন্বয়। এরূপ মতভেদ হইবার কারণ এই যে, সমগ্র নেপোলিয়নকে আমরা কেহই দেখিতে পাই না। নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও শিক্ষা অনুসারে এক জন এক দেশ, অপর জন অন্য দেশ দেখি। সেই জন্য দর্শকের মধ্যে এত মতভেদ হয়। সেক্‌স্‌পীয়র-সৃষ্ট চরিত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ দেখা যায়। এক হ্যামলেটের চরিত্র ধরুন। কোন সমালোচকের মত,—তিনি দারুণ পাষণ্ড। কেহ বা তাঁহাকে দেবত্বের এক স্ফূর্ত্তি স্বরূপ জানেন। কাহারও বিবেচনায় তিনি প্রতিকূল ঘটনা-স্রোতে ভাসমান, ইচ্ছাশক্তিহীন, দুর্ব্বল তৃণ। আর কেহ বা তাঁহাকে পুরুষকার ও ইচ্ছাশক্তির অবতার বিবেচনা করিয়াছেন। এরূপ মতভেদের একমাত্র কারণ, হ্যামলেট চরিত্রের সজীবতা। অন্য কবির রচিত চরিত্র সম্বন্ধে ত এরূপ হয় না। ব্যারাবাসকে সকলেই একবাক্যে সর্ব্বস্পৃহার প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। বোবাডিলে সকলেই মূঢ়তার চিত্র অঙ্কিত দেখেন। টেম্বারলেনে সকলেই দুরাকাঙ্ক্ষার প্রতিরূপ দেখিতে পান। জগতের নর-নারীর ন্যায় সেক্‌স্‌পীয়রের অধিকাংশ চরিত্রই জটিল—কয়েকটি চরিত্র এক-বারেই গহন। হ্যামলেট, ক্লিয়োপেটরা কনষ্টান্‌স্ প্রভৃতির রহস্যোদ্ভেদ অতীব দুঃসাধ্য। এরূপ বুঝিবেন না যে, সেক্‌স্‌পীয়রের কোন চরিত্রেরই তথ্য নির্ণয় করা যায় না। জগতে যেমন অনেক নরনারীর চরিত্রবৃত্তান্ত তাহাদের বদনে অঙ্কিত থাকে, যে দেখে, সেই বুঝিতে পারে; সেক্‌স্‌পীয়রেও সেই-রূপ নরনারীর অসদ্ভাব নাই। আবার জগতে যেমন অনেক মনুষ্য আছে, যাহাদের জীবনসমস্যার নির্ণয় করা অতি সুকঠিন ব্যাপার; সেক্‌স্‌পীয়রেও সেইরূপ আছে। এরূপ থাকিবার কারণ, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রের সজীবতা।

সেক্‌স্‌পীয়র কি ভাবে মানবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা তাহার কতকাংশের পরিচয় পাইলাম। আমরা দেখিলাম (১) তাঁহার চিত্র সুসম্পূর্ণ; বিকৃত অপর্য্যাপ্ত, বা অঙ্গহীন নহে। (২) তাঁহার চরিত্র-চিত্রণ সত্যনিষ্ঠ, যথাযথ। (৩) এবং সর্ব্বত্র জীবন্ত ও স্বাভাবিক। (৪) তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলী বিবিধ বিচিত্রতায় পূর্ণ। (৫) এবং তাহার চিত্রণে আমরা মানব-চরিত্র বিষয়ে

তাঁহার সূক্ষ্মভেদজ্ঞানের পরিচয় পাই। (৬) সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদার অপক্ষপাতিতা এবং অপরিসীম উপেক্ষাভাবে বিস্মিত হইতে হয়। (৭) এবং ধারণা হয় যে, তাঁহাতে অসহিষ্ণুতা বা নৈতিক কঠোরতার লেশমাত্র নাই! তিনি সর্ব্বত্র সমান সহানুভূতিশালী। (৮) তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রসমূহ প্রাণময় জীবন্ত নরনারী, এক কথায় তাহারা সজীব মনুষ্য। (৯) তিনি চরিত্রের বীজশক্তি আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করেন—চরিত্রের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে গড়িয়া তুলেন। (১০) সেই জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে একটা বিচিত্রতা একটা বিপুলতা একটা হ্রাস বৃদ্ধির ভাব আছে। তাহারা বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ নহে; তাহাদের জীবনের একটা ভূত ইতিহাস ও ভাবী পরিসমাপ্তি আছে। সেকসপীয়র-কৃত চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে উপরে যে সকল সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহার যাথার্থ্য অনুভব করিবার জন্য তাঁহার নাটকাবলীর পুনঃ পুনঃ আলোচনা আবশ্যক। তাহা করিলে ঐ সূত্রগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইবে। প্রবন্ধান্তরে আমি কয়েকটি চরিত্রের সবিস্তারে বিশ্লেষ করিয়া ঐ সূত্রসমূহের সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিব। তখন বোধ হয় সেকস্‌পীয়রকে 'মানবতার কবি' বলিতে কাহারও আপত্তি থাকিবে না। তিনি কোন্ প্রতিভাবলে, কি অমানুষীশক্তিপ্রভাবে মানবতার বিরাট ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন, এবং মানবতার বিপুল চিত্র তাঁহার নাটকে প্রতিফলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বুঝিতে চেষ্টা করিব। ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

রাজা বীরবল।

অদ্য এখানে যাঁহার প্রসঙ্গ করিতেছি, তিনি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার পাঁচটি নাম আমাদের পরিজ্ঞাত। যথা,—(ক) বীরবল; (খ) বীরবর; (গ) মহেশ দাস; * (ঘ) ব্রাহ্মণ দাস; † (ঙ) কব-রায়।

প্রথম ও দ্বিতীয়টি, প্রকৃতপ্রস্তাবে নাম নয়। উভয়ই তাঁহার শারীরিক বল-বিক্রমপ্রকাশক ও গুণদ্যোতক সংজ্ঞা—বিশেষণমাত্র। এক প্রকার উপাধি

* "কাদির" এই আখ্যায় প্রচারকর্ত্তা।

† ঐতিহাসিক বদাওনী, উক্ত নামে তাঁহাকে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন।

বলিয়া বুঝিলেও চলিতে পারে। "বীরবর" অর্থে শূর-শ্রেষ্ঠ। তাঁহাকেই "বীরবল" অভিধানে সম্বোধন করা যায়, যিনি বীর-বৎ বলবান্—গুণবান্। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে, "বীরবর" এবং "বীরবল" একার্থদ্যোতকও বটে।

সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণিক নিয়মানুসারে "র" এবং "ল"—আর "ড়" (ড) এবং "ল" অভিন্নার্থ, একই। * বিশদীকৃত করি।

১। "রোম"; ২। "লোম"; ৩। "ঈড়ে"; ৪। "ঈলে"।

তৃতীয় নামই, তাঁহার যথার্থ নাম। চতুর্থ সংজ্ঞা, ভক্তি ও বিনয়ের পরিচয় করিয়া দেয়। পঞ্চম বা সর্ব্বশেষ আখ্যার বিষয়, এই প্রবন্ধের উপযুক্ত স্থানে বিবৃত হইবে।

যখন যে নাম উপযোগী ও সুবিধাজনক বোধ করিব, সেই নামেই আমাদের নায়ক উল্লিখিত হইবেন।

এতক্ষণে প্রকৃত ইতিবৃত্তে উপনীত হইতেছি। দেখা যাউক, তিনি কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বিপ্র-বংশে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ জাতির মহোচ্চ—মহোন্নত—শাখা, তিনি সমলঙ্কৃত করিতে পারেন নাই। বীরবল, দ্বিজ না হউন, "দ্বিজবন্ধু" † বটেন। "দ্বিজবন্ধু" অর্থে ভূদেব-বন্ধু—ব্রাহ্মণের বান্ধব নয়। "দ্বিজবন্ধু" পারিভাষিক শব্দ। উহার অর্থ—পাণ্ডিত্যদোষ-কলুষিত নিম্ন স্তরের ভূসুর। "ভাট"-সম্প্রদায়ী পতিত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁহার উৎপত্তি হয়।

ভাটগণ, মধ্য যুগের পুরাবৃত্তবেত্তা। তাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতকারক ঐতিহাসিক। রাজা, মহারাজা, মন্ত্রী, প্রধান রাজকর্ম্মচারী, অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত বংশ, কিংবা ভদ্রমহাশয়গণের সঙ্গীত—তান, মান, সুর লয়ে—স্তুতিগীত করাই, ঐ সম্প্রদায়ের লোকের উপজীবিকা। এই জন্য তাঁহারা তেমন উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ নহেন।

কবিতায় বা গীতিকায় গুণবান্ জনগণের যশঃকীর্ত্তন, তাঁহাদের প্রধান

---

* "ড-লয়োর্-লয়োরভেদঃ"।

† "দ্বিজবন্ধুগণ" "শ্রুতির" শ্রবণ, পঠন ও পাঠনে বঞ্চিত। ঐ মহোচ্চ অধিকার তাঁহাদের নাই। প্রমাণ,—

"স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্ ॥"—ভাগবত।

কার্য্য। অদ্যাপি বঙ্গদেশেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা, ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ জীবন্মৃত অবস্থায় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহাদের উচ্ছেদ হয় নাই।

কাল্পী তাঁহার জন্মস্থান। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের শেষ সীমায় ঝান্সী। ঝান্সীর সীমাসান্নিধ্যে 'কাল্পীর' অবস্থানভূমি।

মহেশ দাসের শৈশবজীবনী, আর দারিদ্র্যকাহিনী—অভিন্ন পদার্থ। একের বর্ণনায় অভ্যন্তরে অপরটি নিহিত—লুকায়িত। কিন্তু আবাল্য বুদ্ধি তাঁহার চিরসহচরী। শৈশবের মুখচ্ছবি, মতিমত্তার মহান্ সাক্ষী। অনুভব-শক্তি প্রথম বয়স হইতে অতি প্রখরা,—নিরতিশয় মূর্ত্তিমতী।

অক্‌বরের রাজত্বের প্রথম ভাগেই—সম্রাটের দরবারে ব্রাহ্মণ দাসের প্রথমাগমন। * স্বল্প সময়ের ভিতরেই গুণগ্রাহীরা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলেন। তিনি না কি ঈশ্বরানুগৃহীত ছিলেন। তাই, প্রকৃতিপ্রাপ্ত ভগবৎপ্রদত্ত কতিপয় সদ্‌গুণে তিনি প্রথমাবধি বিভূষিত হইয়াছিলেন। পরিহাসপটুতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সঙ্গীতের সুন্দর সুরে সুশোভন স্তুতিগীতির আবৃত্তি প্রভৃতি সুকোমল সুকুমার বিবিধ গুণের জন্য তাঁহাকে লোকে আদর করিয়া অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। নৈসর্গিক সামর্থ্যের এমনই মাহাত্ম্য—এতই মহত্ত্ব ও গুরুত্ব! তাহা না হইলে কি, অপরিচিত-কুলশীল, অজ্ঞাতনামা যুবক এত অল্প দিনেই উচ্চ হইতে নীচ—তাবৎ শ্রেণীর—লোকের প্রশংসাভাজন ও প্রিয়পাত্র হইতে পারে? তাঁহার হিন্দী কবিতাও সর্ব্বসম্প্রদায়সমাদৃতা। যথার্থ গুণবানের-নিকট মহা গুণাবলীর পুরস্কার আছে। মহাসন্তুষ্ট সম্রাট্, এত-দিনের পর তাঁহাকে "কব-রায়" উপনাম উপহার দিলেন। বস্তুতঃ, ধন-রত্ন অপেক্ষা এই উপহারের মূল্য অধিক। "কবরায়" অর্থে 'রাজ-কবি'। তিনি হিন্দুজাতীয়—সুতরাং বীরবল, রাজকবি হইলেন। †

সম্রাটের এতাদৃশ শ্রেণীর হিন্দু কর্ম্মচারী অনেকে ছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্ত স্বল্প নয়। প্রসঙ্গক্রমে একটি দৃষ্টান্ত দিবার কৌতুহল জন্মিল। অক্‌বরের অনুগ্রহে "জোতিক রায়" রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিশারদ, এই মহনীয় উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছিলেন। তিনিও হিন্দুধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তি।

* বদাওনী।

† এ পর্য্যন্ত অক্‌বরের দুইটি "রাজকবি" আমাদের সমীপে সমুপনীত হইলেন,—

(ক) ফৈজি। তিনি মুসলমান। অতএব তাঁহাকে মুসলমান "রাজকবি" আখ্যায় আহ্বান করিতে হইবে। "মালিক উচুয়ারা", অপর উপাধি;—অর্থ—"কবীন্দ্র"।

(খ) অপর রাজকবি হিন্দু বীরবল।

কব-রায়, বাদশাহের বড়ই বিশ্বস্ত বান্ধব। তিনি "রাজকবি" এবং "রাজ-দূত"। উভয়েরই কার্য্যই, পরম-পূত। বিশ্বস্ত না হইলে, অন্যের উপর উল্লিখিত শেষোক্ত গুরুভার সমর্পণ করা যায় না। তাঁহার সংসর্গ, সম্রাটের পরিতৃপ্তির আধার। বীরবরের নৈসর্গিক গুণে অক্‌বর চির-আকৃষ্ট। কব-রায়, অক্‌বরের নিত্য সঙ্গী, চিরানুচর, সদাসহচর ও একান্ত অনুগত সখা। তদীয় সাহায্য ও বুদ্ধির সাহায্য, সম্রাটের সকল কাজেই গ্রাহ্য—শিরোধার্য্য।

বীরবর নগরকোট, জায়গীর স্বরূপ, সম্রাটের সকাশ হইতে সাদর উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বদাওনী, সুস্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, বীরবরের জন্যই এই অনার্য্য কার্য্যের অভিনয়। এটি অক্‌বরের অষ্টাদশ-বর্ষীয় বিষয়সংক্রান্ত ঘটনা। * অতঃপর তিনি "রাজা" এই বাঞ্ছনীয় উপাধিতে শোভিত হয়েন। এখন হইতে তিনি "রাজা" উপনাম সহ একতম প্রকৃত নামে আহূত হইবেন।

অক্‌বর কর্তৃক জয়চাঁদের অবরোধসংবাদ, "নগরকোটে" পৌঁছিলে, জয়চাঁদের অপত্য বুধচাঁদ † প্রভৃত প্রযত্ন ও অশেষ আয়াসে রাজা বীরবলকে বন্দী করিলেন। তাঁহার ধারণা ও প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পিতা ঠাকুর কারাবাসেই সংসার হইতে অবকাশ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই বিদ্রোহিতার মূলীভূত হেতু। বীর পিতার উপযুক্ত পুত্র—বীরসন্তান বুধচাঁদ বটেন। জয়চাঁদ, পুত্রের বীরোচিত কার্য্যে মহোল্লাস প্রকাশ করিতে না পারুন, মনে মনে বিলক্ষণ আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ প্রয়াসেও উহা সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না, জানি না।

রাজমণ্ডলে ও শূরসমাজে বুধচাঁদের বীরত্বের বিজয়ভেরী, শ্রবণভৈরব রবে বাজিয়া উঠিল। সর্ব্বত্র তাঁহার সম্মান ও সমাদরের ধুমধাম পড়িয়া গেল।

---

* মতান্তরে উহা সপ্তদশ সালের ঘটনা। নগরকোট-রাজ জয়চাঁদকে কোন ঘটনা উপলক্ষে রাজদরবারে বিদ্যমান থাকিতে হইয়াছিল। দৈবগতিকে সম্রাট তাঁহার উপর বিরক্ত হয়েন। তাঁহার কোপে একের সর্ব্বনাশ, অপরের মহোল্লাস। বড়লোকের কোপে সময়ে সময়ে কত শত লোকেই উপকৃত হইয়া থাকেন। জয়চাঁদ, কারাক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন; এ দিকে বীরবলের অদৃষ্টে জায়গীর-প্রাপ্তি ঘটিল।

[illegible] ক্তির পাণ্ডুলিপিতে নামটির বর্ণযোজনায় বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। বোধীচাঁদ, [illegible] বুধচাঁদ,—তিন প্রকারের বানানে নানা লোকে মতবৈষম্য প্রকটিত করিয়াছেন। [illegible] যে নামের প্রসঙ্গ করিলাম, তাহার প্রামাণিকতায় আপত্তি বা অসঙ্গতির কারণ [illegible]

বীরবর, বুধচাঁদের ষড়যন্ত্রে অবরুদ্ধ,—এই সমাচার, রাজদরবারে সম্রাটের গোচর হইবামাত্র, তদবস্থায় প্রতীকারার্থ হুসেন কুলী খাঁর উপর বীরবরের জিজ্ঞাসা পুনরারম্ভ করিবার আদেশ হইল। ইব্রাহিম কুলী খাঁর আক্রমণে হোসেন কুলী খাঁ নগরাবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, সুতরাং বীরবলকে জায়গীরের অধিকারে হতাশ হইতে হইল।

পত্তন ও আহম্মদাবাদ আক্রমণার্থ ৯৮১ হিজরী ২৪শে রবিয়াল (২য়) তারিখে রাজা বীরবল সম্রাটের সমভিব্যাহারী হইলেন।

রাজা বীরবলের বীরত্বের এক নিদর্শন দিবার অভিলাষ হইতেছে। চারি হাজার পাঁচ শত অশ্বাধ্যক্ষ জৈনখাও, যখন ইমুর্কজৈইস্গণকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া, একদা অতিরিক্ত সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন, অকবর, সে বার প্রিয়বন্ধু বীরবরকে ও হাকিম আবদুল ফৈত্তের সঙ্গে কতিপয় সেনা দ্বারা অভিযানানুকূল্যের জন্য প্রেরণ করেন। জয়শ্রীও তাঁহাদের আবির্ভাবে শত্রুপক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজদৌত্যই, তাঁহার প্রধান নিত্যকৃত্য। অকবরের একবিংশ রাজ্যাব্দের রায়লনকরণের সঙ্গে তিনি একবার দুনগরপুরে প্রেরিত হয়েন। ঐ যাত্রার উদ্দেশ্য—রায়লনকরণের কন্যাকে অকবরের অন্তঃপুরে আনয়ন। ঐ অব্দেই বীরবল ও জৈন কোকা, রাজা রায়চাঁদকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করেন। কোন্ সময় যে তাঁহাকে সম্রাটের প্রয়োজন হইবে, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। এই নিমিত্ত রাজদরবারে বীরবলের সান্নিধ্য প্রায় সর্ব্বদা আবশ্যক হইত। তবে মধ্যে মধ্যে অন্দর বাহিরেও তাঁহাকে গতিবিধি না করিতে হইত, এমন নয়। তিনি অবারিতদ্বার ছিলেন—সর্ব্বত্রই তাঁহার গতিবিধি ছিল।

আর একবার জৈনখাঁ কোকার সঙ্গে বিজর ও সয়োডের ইমুফজৈস্গণের বিপক্ষে অভিযানের প্রয়োজন হয়। আবুলফাজল্ ও বীরবর—এই বীরযুগলের মধ্যে কাহাকে নেতৃত্ব প্রদত্ত হইবে, ইহা সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিল। অবশেষে মীমাংসিত হইল, সুরতি দ্বারা নির্দ্ধারিত হউক। কিন্তু দৈবের কর্ম্ম বড়ই বিষম। শেষোক্তের নামে সুরতি পড়িল। অগত্যা একান্ত অনিচ্ছাসহকারে, নিয়ম পরতন্ত্র হইয়া, সম্রাটকে প্রিয়তম বান্ধবের সংসর্গবিচ্ছেদে সায় দিতে হইল। কেন না, নিয়মরক্ষাই—নিয়মকর্ত্তার অদ্বিতীয় কার্য্য।

ইয়ুমুফজাইস্গণের সহিত সম্রাটের যে সমর হইয়াছিল, সেই সূত্রে [illegible] পক্ষে ৮,০০০ আট সহস্র সেনা নিহত হয়। বিস্তর বীরপুরুষ রণে পৃষ্ঠ[illegible]

করেন। এই ব্রাহ্মণ মহেশদাসও প্রাণভয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছিলেন; তাহাতেও তাঁহার কিন্তু নিস্তার হয় নাই। তদবস্থাতেই, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। ৯৯৪ হিজিরায় শফর মাসে * এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। গোঁড়া-বিদ্বেষ্টা বদাওনী, গাত্রজ্বালায় লিখিয়াছিলেন,—সারমেয়শ্রেণীতে বীরবল স্থান পাইয়াছেন। এইরূপ লিপিভঙ্গীর কারণ কি? বদাওনী তাহাতে বলেন,—বীরবর, জীবৎকালে যে সকল উৎকট উৎকট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এই শোচনীয় ঘটনা তাহারই বিষময় পরিণাম। বীরবর ব্যতিরেকে অপরাপর অনেক উচ্চপদাধিষ্ঠিত রাজকর্ম্মচারীও নিধন প্রাপ্ত হন। কিন্তু অক্‌বর, বীরবরের জন্যই বিশেষ ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। সম্রাটের কাতরতার কারণ এই, তাঁহার মৃতদেহ, অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তিনি পরিশেষে নিজেই এই মনে করিয়া আত্মপ্রবোধ দেন যে, এক্ষণে বীরবর স্ববশীভূত—বিমুক্তাত্মা। সুতরাং অনলসংযোগে তাঁহার শরীরের আর অপর সৎকার বা সংস্কার নাই বা হইল? বহ্নি-স্পর্শে তাঁহার আর অধিক কি উপকারের আশা? আবুল্ ফাজলের লিখিত "মখটুবাতে" পুস্তকেও, কোন পত্রী দ্বারাও, অক্‌বরের শোকের গভীরতা ও মাত্রা অনুমিত হইতে পারে।

বদাওনীর গ্রন্থে বীরবরের উপর সম্রাটের অসাধারণ অনুরক্তি ও আসক্তির পরিচায়ক এক ঘটনা স্থান পাইয়াছে। মূল ঘটনাটা কিন্তু অমূলক।

একবার জনরব উঠিল, রাজা বীরবল, পার্ব্বত্য প্রদেশে যোগী ও সন্ন্যাসীর বেশে ঐ দুই সম্প্রদায়ে সম্মিলিত হইয়া পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সংবাদ পাইবামাত্র সম্রাট ভাবিয়া লইলেন, বুঝি বা ক্ষোভে, ভয়ে বা লজ্জায়, বীরবর আত্মসংগোপনে তৃপ্তি প্রাপ্ত হইতেছেন। অন্যবার প্রবাদ হইল,—কালিঞ্জরে (নিজ-জাইগীরে) তিনি যামিনীযোগে দৃশ্যমান হইয়া থাকেন। ইহাতে সম্রাটের শোকসিন্ধু দ্বিতীয়বার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

অক্‌বরের এক কালেক্টর বলিয়া পাঠান,—এক ক্ষৌরকার বীরবলকে স্বীয় শরীরের আহত স্থলে তৈল মর্দ্দন করিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহাকে রাজদরবারে প্রেরণ করিতে আদেশ হইল। অবশেষে মিছামিছি—একজন পথিক বীরবল বলিয়া ধৃত ও বিনাশিত হইলে পর, ঘটনায় যবনিকা-

---

* শফর, হিজিরা অব্দের দ্বিতীয় মাস।

পতন হইল। সর্ব্বশেষে সপ্রমাণ হইল,—সর্ব্বৈব অসত্য। লাভের মধ্যে কালেক্টরকে কষ্ট ভুগিতে হয়। সে না কি কারাবাসে বাস করিয়া অশেষ ক্লেশ পাইয়াছিল!

অকবর যে নব ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠিত করেন, ১৮ আঠার জন সভ্য, তাহার অন্তর্নিবিষ্ট। তন্মধ্যে ১৭ সপ্তদশ ব্যক্তি মুসলমান;—একমাত্র রাজা বীরবলই হিন্দু। সকলেই কিন্তু সুশিক্ষিত—সদ্বিদ্যাবান্।

ইহাদের সংক্ষেপে পরিচয় দিবার অভিলাষ হইতেছে। তাহাতে বিস্তর বৃত্তান্ত জানা যাইবে। ৪, ৫ এবং ৬ সংখ্যক ব্যক্তির বৃত্তান্ত, "আইন-ই-অকবরি" পুস্তকে নিবদ্ধ আছে। অবশিষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ, ঐতিহাসিক "বদাওনী" কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

অকবরের নব-ধর্ম্ম-মতে যে ১৮ আঠার সদস্য অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের বিবরণ বিবৃত হইল।

১। শেখ মুবারক;—নাগর-নিবাসী। তিনি একজন বিদ্বান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। আবুল ফাজল ও কৈজি তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র।

২। শেখ আবুল ফাজল;—শেখ মুবারকের তনয়। অকবরের প্রধান মন্ত্রী। "অকবরনামা" * নামক ভাগত্রয়বিশিষ্ট ঐতিবৃত্তিক পুস্তকরচক। উত্তম যোদ্ধা।

৩। শেখ কৈজি;—শেখ মুবারকের পুত্র। অকবরের রাজকবি।

৪। জাফরবেগ ওসেফ্ খাঁ;—কোয়াজ্উইন্ অধিবাসী। কবি, অথচ ইতিহাস-বিৎ।

৫। কোয়াসিমি কাহি;—একজন কাব্যকার।

৬। আবদুশ-শমদ্;—রাজ-চিত্রকর ও কাব্যকার।

৭। আজম খাঁ কোকা—মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কা। মক্কা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি অকবরের নব-প্রচারিত ধর্ম্মমত-সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়েন।

৮। মুল্লা শা মুহম্মদ্;—শাহাবাদবাসী। একজন ঐতিহাসিক।

৯। শুফি অহম্মদ;—বৃত্তান্ত অপ্রাপ্ত। তবে নামের অগ্রেই "শুফি" দেখিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। শদর জহাঁ;—রাজ-ব্যবহারাজীব—সম্রাটের উকীল।

১১। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত);—বিবরণ অজ্ঞাত।

১২। পুত্র (নাম অপ্রাপ্ত): বিবরণ অজ্ঞাত।

---

* ইহারই তৃতীয় ভাগ, "আইন-ই-অকবরি" সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ।

১৩। মীর শরফ ;—আমুল-নিবাসী। অকব্বর তাঁহাকে বঙ্গদেশে ঐ নব-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৪। সুলতান খওয়াজা ;—এক সদর।

১৫। মীর্জা জানী ;—সর্দ্দার—প্রধান রাজপুরুষ।

১৬। টকী ;—সুষ্টারবাসী। কবি। দ্বিশতী,—দুই শত সেনার নায়ক, এই উপাধিধারী।

১৭। শৈখজাদা গোসালা ;—বারাণসী-নিবাসী।

১৮। বীরবর ;—ইহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণনের নিমিত্তই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। সুতরাং অপর পরিচয় অনাবশ্যক।

(ক) সম্রাটের ধর্ম্মমতপরিবর্ত্তনেও, বীরবলের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা। তন্নিবন্ধন তাঁহার যে অধিক কার্য্যকারিতা ছিল, তদ্বিষয়িণী ঘটনা শুনিলে সকলেরই আমাদের বর্ণনায় উত্তম প্রতীতি জন্মিবে। বীরবলের সংসর্গে, তদীয় যুক্তিপরামর্শে, তাঁহাকে "সৌর" (সূর্য্যোপাসক) হইতে হয়। তিনিই বাদশাহের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিয়া দেন, ভাস্কর দেবতাই সকল বস্তুর আকর। শ্যামল সমতল ক্ষেত্রের শস্য-সমূহ, তুচ্ছ বা মহোচ্চ তৃণ-গুচ্ছ, পাদপরাজির ফল সকল, প্রান্তরের উদ্ভিজ্জাদির পরিপক্কতার কারণই কিরণমালী দিবাকর। ভূলোক যে আলোক পায়, তাহাও রবির কৃপায়। সর্ব্বপ্রকার জীবের জীবনই, দিনমণির অনুগ্রহসাপেক্ষ। ইত্যাদি কারণপরম্পরার জন্যেই এই জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর মধ্যমণি জ্যোতিষ্মান্ ভগবান্ ভাস্কর, শ্রদ্ধার আকর,—পূজার আস্পদ। সূর্য্য দেব, পূর্ব্ব প্রদেশে সমুদিত হয়েন, অতএব উহাই পবিত্র দিক্। পূর্ব্বাস্য হইয়া দেবদেবের বন্দন আরাধন করিলে চিত্তপ্রীতি জন্মে। পূর্ব্ব দিকের অপর অভিধা—উদয়াচল। পশ্চিম দিক্ অস্তাচল-সংজ্ঞায় বিদিত। এই জন্য অস্তাচল, দেবার্চ্চনের তত অনুকূল নহে। ধর্ম্মকর্ম্মসম্পাদনের পক্ষে পূর্ব্ব দিক্ যেমন প্রশস্ত, তদ্বিপরীত দিক্ তাদৃশ প্রশস্ত বিবেচিত হইবে কেন? রবির ন্যায় বহ্নি ও বায়ু, পাষাণ ও পাদপ, উদ্ভিজ্জ ও খনিজ পদার্থ প্রভৃতিও আমাদের আরাধ্য। গো ও গোময়, পুণ্ড্র ও যজ্ঞসূত্র, অর্থাৎ—তিলক ও উপবীতও, ঐ হেতুই অবজ্ঞেয় নয়।

বীরবরের যুক্তিতর্কমূলক ঐ মতামত, এক উপাদেয় দ্রব্য বলিয়া দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক ও তার্কিক,—সকল আলাপয় কর্তৃক এক-বাক্যে অনুমোদিত হইল।

(খ) সম্রাট্, কোন সময়ে রাজা বীরবলকে দতে উম্নার সমক্ষেই বলিলেন—"আমি যথার্থই বিস্ময়াবিষ্ট হই, বুদ্ধিমান্ লোকেও কেমন করিয়া অবাস্তব ঘটনায় বিশ্বাস করে! মুহূর্তমধ্যে শয্যাত্যাগ ও তৎক্ষণাৎ শূন্যপথে গগনমণ্ডলে গিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে ৯০,০০০ নব্বই হাজার কথা কহিয়া পুনরায় শয্যায় উপস্থিতি! শয্যা কিন্তু গাত্রোত্তাপে পূর্ব্ববৎ ঈষদুষ্ণ রহিয়াছে! এই সব অবাস্তব বিষয়ে জ্ঞানবান্ লোকে কি করিয়া বিশ্বাস করে?"

(গ) একদা ধর্ম্মান্দোলনে শভাজ অতিশয় উত্তেজিত হয়েন। তিনি ধর্ম্ম-আলোচনায় একাংশ গ্রহণ করিবামাত্র বীরবর উপহাসবচনে তাঁহাকে তিরস্কার করেন; শভাজও প্রত্যুত্তরে অপ্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু মহা-সহিষ্ণু বীরবর তাহাতে বাঙ্নিষ্পত্তিমাত্র করিলেন না। সম্রাট্ কিন্তু অসন্তুষ্ট হইয়াই বলিলেন—"বিষ্ঠাপূর্ণ পাদুকা তোমার মুখে কেমন করিয়া প্রবিষ্ট হইল?"

এই সুযোগে বদাওনী মহাশয় বীরবলকে 'নরকীয় সারমেয়' এই সুমধুর সম্বোধনে আহ্বান করিয়া মহোল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন! সমদর্শিতা, ইতিবৃত্তলেখকের এক মহাগুণ। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, বদাওনীতে সে মহাগুণের প্রত্যাশা দুরাশামাত্র।

(ঘ) আর এক ঘটনায় ধর্ম্মালোচনার আভাস পাইতেছি। দৃষ্ট হইবে, বীরবর ধর্ম্মচর্চ্চার মধ্যবিন্দু।

নাগর প্রদেশস্থ শেখ মোবারক, অকবর সমক্ষে বীরবলকে বলেন,—"আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থে যেমন স্থলবিশেষে প্রক্ষিপ্ত অংশ রহিয়াছে, আমাদের 'কোরাণেও' তাহার অভাব নাই। এই কারণনিবন্ধনই কোন জাতীয় ধর্ম্মপুস্তকে নিঃসংশয় প্রত্যয় স্থাপিত করা দুর্ঘট।" সম্রাট্ বা বীরবর, ঐ বাক্যের কোন প্রতিবাদ বা সমুত্তর করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই।

এই প্রণয়ীর প্রতি পাতশার পক্ষপাতিত্ব বড় বেশী। এক দৃষ্টান্তেই তাহা সুব্যক্ত হইবে।

কোন সময়ে সম্রাট্, স্বয়ং কতিপয় কুলটাকে প্রশ্ন করেন, কাহাদের কর্তৃক প্রথমে তাহারা অসতীর পথে পদার্পণ করিয়াছে। তাহাদের কথায় জানা গেল,—বহুবিভবশালী ব্যক্তিগণই ঐ কুকার্য্যের মূলে ছিলেন ও আছেন। তাঁহাদের কাহারও শারীরিক শাস্তি হইল,—কেহ কেহ বা তিরস্কৃত হইলেন। অন্যেরা দুর্গে অবরোধদশায় অনেক কাল যাপন করিতে বাধ্য হইলেন। কাহারও ভাগ্যে অপর গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা ঘোষিত হইল। এই অপরাধীদের

[illegible]র বীরবরও ধরা পড়েন। তিনি না কি অকবরের অভিনব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের একতম,—বিশেষতঃ তিনি আবার ধর্ম্ম-মত-চতুষ্টয়ের অনুশীলনে সিদ্ধ, সুতরাং তাঁহার দোষ, সবিশেষ বিবেচ্য। কিন্তু তাঁহার গুরু অপরাধের দণ্ডবিধান, [illegible]রীত মতই হইল।

যখন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের উপর অকবরের আজ্ঞায়, কারাদণ্ড, কায়-দণ্ড, বাগ্‌দণ্ড, অর্থদণ্ড প্রভৃতি প্রদত্ত হয়, তৎকালে কারপরগণাস্থিত জায়গীরে বীরবর অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ ব্যাপার, তাঁহার শ্রবণগোচর হইলে, তিনি যোগী সাজিবার উপক্রম করিতেছিলেন; কিন্তু অভয় পাইয়া সম্রাটের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন।

রাজা বীরবল বদান্যতায় যেরূপ খ্যাতিমান্ হন, সঙ্গীত-নৈপুণ্যেও সেই-রূপ। কবিতাপ্রণয়নেও তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য, রসাত্মক বড় বড় কবিতা, সরস বচন, হাস্যজনক রহস্য, পরিহাসোদ্দীপক কৌতুক ইত্যাদি, অদ্যাবধি হিন্দুস্থানের সহৃদয় বিবুধনিচয়ের নিকট সমাদৃত। আর তাঁহার গানের গুণ-গণনা করিয়া নিঃশেষ করা যায় না।

তাঁহার বিরোধিগণের মধ্যে ঐতিহাসিক বদাওনী, শভাজ খাঁ ও অপরাপর কতিপয় যবন ধার্ম্মিকগণই—প্রধান। তাঁহাদের বিপক্ষতাচরণের কারণ, নিদর্শন-হীন নয়। তাঁহাদের দৃঢ় সংস্কার—বীরবলের প্রভাবেই অকবরের ইস্‌লাম-ধর্ম্মে বিরতি—অনাসক্তি। তদর্থেই তাঁহারা বিজাতীয় বিদ্বেষপরায়ণ। ফলতঃ, তাঁহারা রাজাকে আদৌ ভালবাসিতেন না—বরং অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন।

"লালা" তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। অন্য পুত্রাদির পরিচয় অপরিজ্ঞাত। লালা, দ্বিশত অশ্বের অধিনায়কতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অমিতব্যয়িতা দোষে তাঁহার সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হয়। লোকে বলপূর্ব্বক তাঁহার সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলে, তিনি পথের ভিখারী হইলেন। বিত্তবঞ্চিত হইয়া সংসার তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ফকির সাজিলেন। কোথায় আমীরী, আর কোথায় ফকিরী! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! তদবধি সন্ন্যাসি-সজ্জা ও দারিদ্র্যচর্য্যা, তাঁহার অবলম্বনীয় হইল।

পার্থিব বস্তুর সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ঘুচিল। অকবরের ৪৬ রাজ্যাঙ্কে লালার সংসার-বিরক্তি। এই বৈরাগ্য, অযোগ্য কারণে কি অযোগ্য অবস্থায় সংঘটিত হয় নাই। অধীনতাত্যাগ ও স্বাধীনতাসম্ভোগ, তখন তাঁহার লক্ষ্য-স্থল হইয়াছিল। *

---

* অকবরনামা, তৃতীয় ভাগ।

জলাঞ্জলি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৃদ্ধ হরশঙ্কর পুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "হেমচন্দ্র, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি তুমি আমার একমাত্র উপযুক্ত পুত্র : তোমার উপর সংসারের ভার দিয়া আমি কাশীবাসী হইব, মনঃস্থ করিয়াছি। বিষয় সম্পত্তি যাহা কিছু রাখিয়া গেলাম, সযত্নে রক্ষা করিও ; অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিলে তোমাদেরই কষ্ট পাইতে হইবে—আমি আর কয় দিনই বা আছি। মনে সাধ ছিল—তোমাদের জন্য কত কি করিব ; কিছুই করিয়া উঠিতে পারি নাই। তোমাদের শরীর মন যাহাতে ভাল থাকে, তাহাই করিও। আর দেখও বাবা, তোমার ছোট ভগ্নী হৈমবতীর যেন কোন রকম কষ্ট না হয়—তাহার কোন কষ্টের কথা শুনিলে আমি আর এ বয়সে বাঁচিব না। বধূমাতাকে বলিয়া দিবে, তিনি যেন হৈমবতীকে আপনার মত দেখেন। জামাতা বিপিনের পড়াশুনা যাহাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিবে। নিয়ম মত চিঠিপত্র লিখিও—আর কি বলিব—তোমরা সুখে থাকিলেই—আমার সুখ।"

হৈমবতীকে জন্মদান করিয়াই হরশঙ্করের স্ত্রী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হরশঙ্কর একাধারে জনকজননী হইয়া কন্যাটিকে বুকে করিয়া [illegible] কন্যা যতই বড় হইতে লাগিল, তাহার আকৃতি প্রকৃতি [illegible] ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন এগার [illegible] বৎসর তখন মেয়েটিকে দেখিলে মনে হইত, যেন তাহার [illegible] মুখ [illegible] কে তাহার মুখে বসাইয়া দিয়াছে। চলন [illegible] অঙ্গ [illegible], কণ্ঠস্বর, হাসি, সকলই তাহার মায়ের মত [illegible] অনেক সময়ে অবাক হইয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন—কি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ;—দেখিতে দেখিতে মৃত সহধর্ম্মিণীর [illegible] সুখে দুঃখে মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত [illegible]। মাতৃহারা ক্ষুদ্র বালিকা কি মন্ত্রবলে কি বৃহৎ স্নেহ[illegible]-আকর্ষণে বৃদ্ধের সমস্ত হৃদয় কাড়িয়া লইল, তাহা জ্ঞানের অগোচর।

হৈমবতী চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করিলে তাহার বিবাহের জন্য বৃদ্ধের

বিপরীত ভাবনা উপস্থিত হইল। বিবাহান্তে কন্যা যে পরগৃহে গিয়া বাস করিবে, ইহা ভাবিলেও বৃদ্ধের কষ্ট বোধ হইত। মনে মনে স্থির প্রতিজ্ঞা করিলেন, কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে ঘরে রাখিবেন।

অনেক অনুসন্ধানের পর হরশঙ্কর এক ভদ্র গৃহস্থের রূপবান পুত্রের সহিত খুব সমারোহে কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং জামাতাকে ঘরজামাই করিয়া রাখিলেন। আহার পরিচ্ছদ সকল বিষয়ে হরশঙ্কর পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত জামাতার সমান ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পুত্রকে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পকেট-খরচা দিতেন—জামাতারও তাহাই করিয়া দিলেন।

বিবাহের দুই বৎসর পরে হৈমবতীর এক পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করিল। বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। নূতন বিষয় সম্পত্তি পাইলে লোকের মনে যত না সুখ হয়, বৃদ্ধ ততোধিক সুখী হইলেন।

কিছু বড় না হইতেই শিশু আর বুড়ার কাছ-ছাড়া হইত না—বৃদ্ধ সমস্ত ক্ষণ তাহাকে কোলে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। "এটা দাও, ওটা দাও" করিয়া ছেলেটি বৃদ্ধকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। "দাদা, গগ যাব"—অমনি গাড়ী জুতিতে বলিয়া বুলোকে (ছেলেটির আদরের নাম ছিল "বুলো") লইয়া বৃদ্ধ রাস্তায় একটু ঘুরাইয়া আনিতেন। হরশঙ্কর তামাক খাইতে বসিলে বুলো তাঁহার মুখ হইতে নল কাড়িয়া লইত—নিজে হাতে করিয়া দাদার মুখে নল পুরিয়া দিত—সে ধরিয়া থাকিবে আর দাদাকে তামাক খাইতে হইবে। শিশুর কাছে হার মানিয়া বুড়া একেবারে আত্মসমর্পণ করিলেন!

বিপিন কালেজে চলিয়া গেলে, হৈমবতী বৃদ্ধ পিতার আহারের আয়োজন করিত। কখনও কখনও সক করিয়া পিতার জন্য স্বহস্তে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আনিত। আহারের সময় ছেলেটিকে কোলে করিয়া পিতার নিকট আসিয়া বসিত। দাদা আসনে আসিয়া বসিলেই বুলো গম্ভীরভাবে বলিত, "দাদা কাবে, কাও" যেন তাহার আজ্ঞার অপেক্ষায় দাদা এতক্ষণ বসিয়াছিলেন। দাদা কিছু মুখে তুলিয়া দিলে অমনি সে তাড়াতাড়ি বলিত, "বালো"—অর্থাৎ "আরো দাও"। শিশুর আধ-আধ মিষ্ট কথাতে বৃদ্ধের নীরস প্রাণও যেন আনন্দে নৃত্য করিত।

পুত্রের নিকট হরশঙ্কর যেদিন কাশী যাইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, তাহার পরদিন যাত্রার সমস্ত আয়ো[illegible]লেন। আত্মীয় স্বজন সকলে

আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। হৈমবতী বিষাদক্লিষ্ট সরল সুন্দর মাতৃমুখে আসিয়া যখন পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন বৃদ্ধের দুই চক্ষু বাষ্পে ভরিয়া উঠিল। হৈমবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ মনের কষ্ট চাপিয়া কন্যার মস্তকের উপর শীর্ণ হাতখানি রাখিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি চিরসুখী হও, আমার এই একমাত্র প্রার্থনা।" বুলো দাদার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "আমি গগ যাব।" হৈমবতী—পাছে পিতার মনে কষ্ট হয়—ছেলেটিকে অনেক কষ্টে ভুলাইয়া লইল। বৃদ্ধ অন্ধকার মনে আস্তে আস্তে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। সোনার পুরী অন্ধকার হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরশঙ্কর চলিয়া গেলে তাঁহার অভাব হৈমবতী ও তাহার পুত্র সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিতে লাগিল। হৈমবতী নানা উপায়ে মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিত। সে মনকে বুঝাইত—পিতা সুখে থাকিলেই আমার সুখ—পশ্চিমে থাকিলে এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার শরীর ভাল থাকিবে—চিঠি-পত্রেও ত তাঁহার সংবাদ পাইব—ইত্যাদি। হাজার প্রবোধ সত্ত্বেও পিতার অদর্শনজনিত দুঃখ হৈমবতীকে ছাড়িল না। কিন্তু শিশুর কাছে প্রবোধও নাই, সান্ত্বনাও নাই; বিচারও নাই, তর্কও নাই। সে মনে করিল, হঠাৎ এ কি হইল—দাদা কই, কোথায় গেল। সকালে দাদার পরিবর্ত্তে যখন ঝি আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন সে মনে মনে ভারি অপমানিত বোধ করিল। দাদা নাই, কাহার মুখে নল পুরিয়া দিবে, কে পাখী দেখাইবে, কে 'গগ' চড়াইবে? তাহার ভারি কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া সে দাদামহাশয়ের ঘরে ঢোকে, আর "দাদা গগ গেছে, চলি গেছে" বলিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া আসে। তাহার খেলা বন্ধ হইল, খাওয়া বন্ধ হইল—সে দিন দিন যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল। শিশুরা কষ্ট হইলে কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, কেবল মনে মনে গুমরাইতে থাকে; সেই জন্য মনের কষ্টে তাহাদের শরীর একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। হৈমবতী ছেলেকে ভুলাইয়া অন্যমনস্ক করিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কিছুতেই আর দাদাকে ভুলিতে পারিল না।

ছয় মাস অতীত হইতে না হইতে হরশঙ্করের অবর্ত্তমান হেতু সংসার একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা বৃদ্ধ থাকিতে এতদিন চুপ্‌চাপ্‌ করিয়াছিল—কিছুই করিতে পারিত না; কিন্তু এক্ষণে তাহার সমস্ত রুদ্ধ আক্রোশ অতিনিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। শ্বশুর থাকিতে হৈমবতীর সর্ব্বাপেক্ষা আদর যত্ন ছিল, তাহার অপেক্ষা হৈমবতীর গহনাপত্র অনেক বেশী, সে নিঃসন্তান আর হৈমবতী পুত্রবতী—হিংসায় ক্রোধে লাবণ্য এতদিন জ্বলিয়া পুড়িত। এক্ষণে সে ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। প্রত্যেক বিষয়ে হৈমবতীর সহিত খুঁটিনাটি আরম্ভ করিল। এমন কি, নির্দ্দোষ শিশু বুলোও তাহার দুই চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইল। "মাসীমা! মাসীমা!" করিয়া বুলো লাবণ্যের কোলে উঠিতে চাহিত, কিন্তু লাবণ্য তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিত না। পাছে স্বামীর পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেই [illegible] হৈমবতী এ সকল বিষয়ে তাঁহাকে কিছুই জানিতে দিত না। নীরবে সকল [illegible]ত্যাচার সহ্য করিত। পিতাকেও এ সব বিষয়ে কিছুই লিখিত না। পথের ভিখারিণী হইলেও নিজের কষ্ট জানাইয়া পিতার মনে কষ্ট দিবে, হৈমবতীর এমন প্রকৃতিই ছিল না।

লাবণ্য হৈমবতীকে জব্দ করিবার জন্য যখন বুলোরও দুধের ভাগ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করিল, তখন হৈমবতী স্বামীকে এ সকল বিষয়ে আর না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। বিপিন শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইল, কিন্তু সে আর কি করিবে, তাহার কি ক্ষমতা—পরের অনুগ্রহে তাহার জীবনযাপন! সে কিছুই বলিল না, কেবল অক্ষমের চিরসম্বল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিবে না—ফাষ্টআর্ট্‌স্‌ পাশ করিলেই কোন উপায়ে একটা চাকরীর যোগাড় করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আলাদা হইয়া থাকিবে।

লাবণ্য স্বামীর নিকট হৈমবতীর নামে রাতদিন অভিযোগ আরম্ভ করিল। হেমচন্দ্র তাহাতে বড় একটা কান দিত না। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া ঝড় বৃষ্টির উপর্য্যুপরি আঘাতে বৃহৎ অট্টালিকাও ভূমিসাৎ হইয়া যায়—লাবণ্য জপাইতে জপাইতে ক্রমে হেমচন্দ্রের মন ভগ্নীর বিরুদ্ধে ফিরাইয়া লইল, এবং শেষে এমনি একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে হেমচন্দ্র রীতিমত ভগ্নীদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন রাত্রে হেমচন্দ্র [illegible] করিতে আসিলে [illegible]

চক্ষু মুছিতে মুছিতে আসিয়া কহিল, "ওগো, শুনেছ, পাশের বাড়ীর হালদার তার স্ত্রীকে বলেচে,—কর্ত্তা উইলে অর্দ্ধেক বিষয় ঠাকুরঝিকে লিখে দিয়েছেন। এই একটু আগে হালদারের স্ত্রী এসে আমাকে বলে গেল। তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায় বল!" শুনিয়া হেমচন্দ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইল,—"বল কি, সত্যি নাকি!" মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার অন্তর হইতে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া গেল—হৈমবতী তাহার পরম শত্রু, এবং যে কোন উপায়ে তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, ইহাই তাহার মনে জাগিতে লাগিল। মনে মনে ধিক্কার দিতে লাগিল, এত দিন কেন সে লাবণ্যের কথা শুনে নাই। রাত্রে ঘুম হইল না।

পরদিন ভোর না হইতে হইতে সরকারকে ডাকিয়া হেমচন্দ্র বলিয়া দিল, "আমার বিনা অনুমতিতে বিপিন কিংবা হৈমবতীকে এক পয়সাও দিবে না— যদি দাও, তৎক্ষণাৎ তোমায় দূর করিয়া দিব। তাহার পর হেমচন্দ্র বিপিনের মাষ্টারকে তাড়াইয়া দিল, তাহার পকেট-খরচা বন্ধ করিয়া দিল, এবং পিতাকে চিঠি লিখিল—কুসংসর্গে পড়িয়া বিপিন মাটি হইয়া যাইতেছে— পড়া শুনা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কাহারও কথা শোনে না, মদ্যপান অভ্যাস করিয়াছে। এই সকল কারণে তাহার পকেট খরচা বন্ধ করিয়া দিয়াছি ইত্যাদি। উত্তরে বৃদ্ধ হরশঙ্কর লিখিলেন, "হেমচন্দ্র, জামাতার কথা শুনিয়া যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমি ত এক্ষণে মৃত বলিলেই হয়,—তোমার উপর সমস্ত ভার দিয়াছি। তুমিই আমার স্থানীয়। যাহাতে বিপিন সৎপথে আইসে, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। দেখিও, অতি সাবধানে বিবেচনা পূর্ব্বক স্নেহের সহিত সকল কার্য্য করিবে। হৈমবতী কিংবা জামাতার মনে যাহাতে কষ্ট হয়, এমন কার্য্য কখনও করিও না।" হৈমবতী, বিপিন, কাহাকেও কিন্তু বৃদ্ধ এ সকল বিষয়ে কিছু লিখিলেন না।

হেমচন্দ্র যখন সমস্ত খরচ বন্ধ করিয়া দিল, হৈমবতী তখন আপনার গহনা বিক্রয় করিয়া আবশ্যক খরচপত্র চালাইতে লাগিল। ক্রমে সব নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একদিন অপরাহ্নে বিপিনচন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিলে, হৈমবতী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "আমার খুকোর গা যেন আগুনের মত তাতিয়াছে,—সারাক্ষণ সে কাঁদিয়া খুন হইতেছে, মাথা চালাইতেছে,—দাদাকে বল, যাহোক একটা ডাক্তারকে লইয়া আইস।" শুনিয়া বিপিন

[illegible] জল হইয়া গেল। ডাক্তারে[illegible]টের টাকা কোথায় পাইবে,—তাহাকে কি বলিবে, কে তাহার [illegible] শুনিবে! হৈমবতী তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কানের ফুল দুইটি খুলিয়া স্বামী[illegible] হাতে দিল। ঘরের মধ্যে কালেজের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চটি জুতা পায়ে বিপিন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কানের ফুল দুইটি এক জায়গায় পঞ্চমুদ্রায় বাঁধা দিয়া ডাক্তারের গৃহমুখে তীরবেগে চলিল।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। রাস্তায় একে একে গ্যাসের [illegible] জ্বালাইয়া দিল। আকাশে তারার আলো ফুটিয়া উঠিল। সহরের [illegible] কোথাও বাজ বাজাইয়া বরযাত্রী খুব সমারোহে বাহির হইয়াছে, কোথাও পাঁচ ইয়ারে মিলিয়া গলা ধরাধরি করিয়া হৃষ্টকলরবে চলিয়াছে; কোথাও গৃহপ্রকোষ্ঠ হইতে সঙ্গীতধ্বনি মুখরিত হইতেছে; কোথাও আটচালার মধ্যে কেহ ভোজবাজি তামাসা দেখাইতেছে: প্রতি পদক্ষেপে প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব দৃশ্যপট। কিন্তু বিপিনের চক্ষের সম্মুখে সকলই ভাসিয়া গেল; সে দেখিয়াও কিছু দেখিতে পাইল না। তাহার মনে শুধু জাগিতেছে আপনার দারিদ্য ও প্রিয়তম পুত্র বুলোর অসুখের কথা। সে এক [illegible] কোনও দিকে দৃক্পাত না করিয়া প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে বিপিন, ডাক্তারের বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আসিয়া শুনিল, ডাক্তার বাবু বাড়ী নাই, রোগী দেখিতে বাহির হইয়াছেন, কখন্ ফিরিবেন, তাহার ঠিক নাই। হতাশাস হইয়া বিপিন ডাক্তারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এই ডাক্তারের উপর বিপিনের [illegible] বিশ্বাস; ইনিই তাহাদের বাড়ীর সকলকে দেখিতেন। যত দেরী [illegible] লাগিল,—কালো মেঘের ন্যায় একটার পর একটা ভাবনা আসিয়া বিপিনের হৃদয়-আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। সেদিন,—একেলা হৈমবতী ছেলেটিকে লইয়া না জানি কি করিতেছে, বিনি চিকিৎসায় ছেলেটি বুঝি মারা গেল। বিপিন একবার ওঠে, একবার বসে; গাড়ীর শব্দ শুনিলেই বাহির হইয়া আইসে। রাত্রি নয়টার পর ডাক্তার বাড়ী ফিরিলেন। বিপিন ডাক্তারকে সবিশেষ জানাইল। তিনি কহিলেন, "আমি এইমাত্র আসিয়াছি, আহারাদি করিয়া খানিক পরে যাইব।" বিপিন কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পায়ে [illegible]ইয়া ধরিয়া বলিল, "ডাক্তার মহাশয়, আপনার দুটি পায়ে পড়ি দয়া করে [illegible]বারটি চলুন—বুলো যায় যায়।" ডাক্তার অগত্যা [illegible] সঙ্গে চলি[illegible]

ডাক্তারকে লইয়া বিপিন য... ফিরিল, তখন সকলে আলো নিবাইয়া যে যার ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছে... কেবল হৈমবতী একলা পুত্রের শিয়রে বসিয়া আছে। বাড়ীতে ঢুকিয়া বিপিনের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল।

রোগীকে দেখিয়া ডাক্তার বাহিরে আসিয়া বিপিনকে কহিলেন, "অবস্থা বড় ভাল দেখিলাম না, এই ঔষধ লিখিয়া দিতেছি—দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। আর সমস্ত ক্ষণ মাথায় বরফ ঘষিয়া দিবে।" এই বলিয়া প্রেসক্রিপশন্ করিয়া পকেটে চারিটি মুদ্রা পুরিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

প্রেস্‌ক্রিপসন্‌টি হাতে করিয়া বিপিন অন্ধকারে আস্তে আস্তে সিঁ... নীচে নামিয়া আসিয়া সরকারকে উঠাইয়া কহিল, "সরকার মশায়, বুলো যায় যায়, দুইটি টাকা দিয়া দয়া করে' এই ওষুধটি আনাইয়া দাও—আমি যেমন করে পারি, কাল তোমাকে টাকা ফিরাইয়া দিব। তোমায় জোড় হাত করি এইটে কর।" সরকার মশায় দুইটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে রুক্ষস্বরে উত্তর করিল, "আমি টাকা পাব কোথায় ? ঘর থেকে কি এনে দেব ! বাবু এক পয়সাও দিতে বারণ করেছেন, আমি কিছুই দিতে পারব না। তোমার জন্য আমি কি শেষে চাকরি খোয়াব !" শুনিয়া সমস্ত রক্ত বিপিনের মাথায় উঠিয়া গেল। ক্রোধে আত্মহারা হইয়া সে কাঁপিতে কাঁপিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "পাষণ্ড, নির্ম্মম, তুই কুকুরের অধম।" গোলমাল শুনিয়া হেমচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি নীচে নামিয়া আসিলে সরকার তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া দিল। শুনিয়া হেমচন্দ্র বিপিনকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিয়া গালি দিল। উত্তরে বিপিনও হেমচন্দ্রকে কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল। তখন হেমচন্দ্র বিপিনের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিল, এবং দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, বিপিনকে যেন কখনও বাড়ীতে ঢুকিতে দেওয়া না হয়।

সেই রাত্রির শেষে দুই একবার "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিয়া বুলো মায়ের কোলে চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনাহারে পুত্রশোকে স্বামীর ভাবনায় মৃতপ্রায় হইয়া হৈমবতী দুই মাস কাটাইল।

ইহার মধ্যে একদিনও বিপিন বাড়ীতে আসে নাই। তবে পাশের বাড়ীর মতি হাজরার একদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে তাহাকে হরশঙ্করের বাড়ীর দরজার কাছে

দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে কি বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

হৈমবতী মনে মনে ঠিক করিল, আর এক মাস দেখিয়া তবে পিতাকে সংবাদ দিবে।

একদিন সকাল বেলায় কাশীর বাড়ীর রকের উপর বসিয়া বৃদ্ধ হরশঙ্কর তামাক খাইতে খাইতে বাড়ীর কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশের সবইন্সপেক্টর একটি লোককে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কহিল, "মশায়, এই লোকটিকে কি চিনিতে পারেন? ইনি বিনা টিকিটে কেমন করিয়া কলিকাতা হইতে বেনারস আসিয়াছেন। ষ্টেশনে ইঁহার নিকট টিকিট চাহিলে ইনি পকেট হইতে একটি দেশেলায়ের বাক্স বাহির করিয়া দেন। পুলিশে ইঁহাকে ধরে। একজন ভদ্রলোক বলিলেন যে, 'ইনি হরশঙ্কর বাবুর জামাতা'—তাই ইনস্পেক্টর বাবু আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

শুনিয়া হরশঙ্কর কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পুলিশ কর্তৃক আনীত লোকটির মুখের কাছে মুখ আনিয়া দৃষ্টিহীন চক্ষে অনেক ক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, একি! বিপিন! এমন বেশ, এমন চেহারা কেন! কি হইয়াছে? শরীর সব ভাল ত? হৈমবতী বুলো ভাল ত!" পাছে শোক না সহ্য করিতে পারেন, তাই বুলোর মৃত্যুর কথা তাঁহাকে কেহ শুনায় নাই। বিপিন বৃদ্ধের মুখের পানে প্রায় পনের মিনিট হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া উত্তর করিল, "বুলো, ওষুধ।"

হরশঙ্করের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বিপিনের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

টিকিটের দাম দিয়া হরশঙ্কর পুলিশের লোককে বিদায় করিয়া দিলেন। তাহার পর বিপিনকে ভাল করিয়া তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া খাওয়াইলেন। বুড়ার আর সে দিন খাওয়া হইল না। সমস্ত ক্ষণ জামাতাকে কাছে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

হরশঙ্কর বিপিনকে যাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহারই উত্তরে সে বলে, "বুলো, ওষুধ।" বৃদ্ধ বিপিনের হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কিছু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, হয় ত মদ খাইয়া মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আবার ভাবিলেন, না, তাহা নহে। ঠিক খবর জানিবার জন্ম তিনি

মতি হালদারকে চিঠি লিখিলেন। উত্তরে মতি হালদার বুলৌর মৃত্যুসংবাদ, হেমচন্দ্র কর্তৃক বিপিনের গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হওয়া, সকলি খুলিয়া লিখিল।

চিঠি পাইয়া হরশঙ্কর শয্যাশায়ী হইলেন, আর উঠিবার ক্ষমতা রহিল না। দুই একদিন পরে কোন একটি নিকট আত্মীয়কে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া পাঠাইয়া তাঁহার উপর সংসারের সমস্ত ভার দিয়া, বিপিনকে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আত্মীয়টিকে মাসিক এক শত টাকা বেতনে ম্যানেজার স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। হেমচন্দ্রকে লিখিলেন, "তুমি আমার ত্যাজ্য-পুত্র হইলে, তোমার আর মুখ দেখিতে চাহি না। বিষয় সম্পত্তি সমস্ত হইতে তুমি বঞ্চিত হইলে। উইলে সমস্তই হৈমবতীকে দিলাম।" সত্য সত্যই এক উইল করিয়া সমস্ত বিষয় সম্পত্তি হৈমবতীর নামে লিখিয়া দিলেন। একটা বাক্সে পুরিয়া উইলটা হৈমবতীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধের আর বেশী দিন সংসারযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। এক মাস যাইতে না যাইতে তাঁহার কাশীলাভ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপিন যখন বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল, তাহাকে দেখিয়া হৈমবতী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। পরে যখন সংজ্ঞালাভ হইল, ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভার যখন ঈষৎ লঘু হইল, উঠিয়া স্বামীর নিকট গিয়া বসিল। তাঁহার সেই মলিন রেখাঙ্কিত মুখ, অস্থিপঞ্জরসার দেহ, অর্থহীন চাহনি দেখিয়া হৈমবতীর প্রাণ ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বিপিন অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে হৈমবতীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, যেন সে সকলই বুঝিতে পারিতেছে, কি বলিতে চাহে, কিন্তু বলিতে পারিতেছে না। অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া "বুলো, ওষুধ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। হৈমবতী আর আপনাকে রাখিতে পারিল না। স্বামীর পদতলে লুটিয়া পড়িয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল।

দিনের পর দিন যায়। মনের কষ্ট চাপিয়া হৈমবতী স্বামীর শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর আপনার ঘরে বসিয়া হৈমবতী অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছে, এমন সময়ে হেমচন্দ্র আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

দেখিল, হৈমবতী কাঁদিতেছে। অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া হেমচন্দ্র বলিল, "হৈম, না বুঝিয়া অনেক দোষ করেছি, মাপ কর্। বাবা তোকেই সর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন—আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই, আমাদের জন্তে কি কিছু সংস্থান কর্‌বিনে?" হৈম চক্ষু মুছিয়া কহিল, "দাদা, আমার আর কে আছে! বাবা ছিলেন তিনি গেলেন, বুলো বিনি চিকিৎসায় চলে গেল, স্বামীর ত এই অবস্থা। সকলি ত জলাঞ্জলি দিয়াছি, বিষয় লইয়া আর কি করিব? ওর খোরাক পোষাক চিকিৎসার জন্ত লেখাপড়া করে একটা ভাল বন্দোবস্ত করে দাও; আমি সকলি তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া বাক্স হইতে উইল বাহির করিয়া হেমচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "এই উইল ছিঁড়িয়া ফেল; তা হলেই ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হইল।"

ভগ্নীর নিঃস্বার্থপরতা দেখিয়া হেমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না।

হৈমবতী সকলে জলাঞ্জলি দিয়া শেষে কিছু দিন পরে রোগশয্যায় আপনাকেও জলাঞ্জলি দিল।

মৌর্য্য-সম্রাট অশোক।

প্রথম প্রস্তাব।

একজন জর্ম্মান লেখক বলিয়াছেন,—অধিকসংখ্যক লোক যাঁহাকে শ্রদ্ধা করে, এবং অধিকসংখ্যক লোক সসম্মানে যাঁহার নামোল্লেখ করে, তাঁহাকেই যদি অধিক যশস্বী বলিতে হয়, তবে অশোক, শার্লেমেন্ ও জুলিয়স সীজারের অপেক্ষাও অধিক যশস্বী। (১) ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গগনে অশোক প্রখর প্রভাকরের সহিত উপমেয়। কিন্তু অজ্ঞানতার অন্ধকারে ও পৌরাণিক কুজ্ঝটিকায়, তাঁহার জ্যোতিঃ ও প্রখরতা, দোষ ও গুণ, সকলই সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সেই অন্ধকার যথাসম্ভব দূর করিয়া পৌরাণিক অংশ হইতে ঐতিহাসিক অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখানই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশ আক্রমণ করেন, তখন একজন নীচকুলোদ্ভব যোদ্ধা মগধ রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া

(১) Koppen Die Religiondes Buddha.

[illegible] মগধ[illegible]হিত যুদ্ধে অপারগ হইয়া সে আলেক্জা[illegible]র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা কর[illegible]। আলেক্জাণ্ডার তাহাকে সাহায্য প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু কথিত আছে, তাহাকে বিনাশ করাই তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল। যাহা হউক, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ বৎসরে মাসি[illegible]ধিপতি বিজিত রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তখন সেই নীচকুলোদ্ভব যোদ্ধা ক্রমে ক্রমে গ্রীক্ প্রতিনিধিদিগকে পরাভূত করিয়া সমস্ত পঞ্চনদ প্রদেশ অধিকার করে। কিছু দিন পরে (সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ ৩১৫ বৎসরে) সে মগধ আক্রমণ করে। মগধের রাজা (পৌরাণিক মতে নন্দ) যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হয়েন। সেই যোদ্ধার নাম চন্দ্রগুপ্ত (গ্রীক্ Sandrakeuptos)। হিন্দু পৌরাণিক মতে তিনি নন্দের এক নীচকুলোদ্ভবা দাসীর পুত্র; চাণক্যের সাহায্যে মগধ-বিজয় ও নন্দের বিনাশ সম্পন্ন করেন। (২) বৌদ্ধ কিম্বদন্তীর মতে, চন্দ্রগুপ্ত মোরিয় নগরের রাণীর পুত্র এবং মোরিয় নগরের রাজবংশ বুদ্ধদেবের স্ববংশীয় কতকগুলি শাক্য যুবক হইতে উদ্ভূত। (৩) যাহাই হউক, চন্দ্রগুপ্ত একজন প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত একাতপত্রাধীন করেন। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দর্শনে সিরিয়ার গ্রীক্ সম্রাট সেলিউকস্ (Seleucus) মেগাস্থিনিসকে তাঁহার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই চন্দ্রগুপ্তই মৌর্য্য সম্রাটদিগের কুলপতি।

সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৯১ বৎসরে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যু হয় ও তাঁহার পুত্র পিতৃ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পৌরাণিক মতে, তাঁহার নাম বিন্দুসার; গ্রীক মতে তাঁহার নাম অমিত্র কেটিস (Amitra Chates=সংস্কৃত অমিত্রকেতু বা শত্রুবিনাশক)। গ্রীক্ বিবরণে দেখা যায় যে, সিরিয়া-রাজ দূতরূপে এণ্টিওকস্‌কে (Antiochus) ও মিসর-রাজ দ্বিতীয় টলেমি (Ptolemy II) দূতরূপে ডায়নিসিয়াস (Dionysius ও বোধ হয় বাসিলিসকেও (Basilis) তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। (৪) বিন্দুসার সম্বন্ধে যে ঐতি-হাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহা সামান্য ও অনিশ্চিত। তিনি যে পিতার অর্জ্জিত সাম্রাজ্য বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া

(২) বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটক দ্রষ্টব্য।

(৩) Beal's Si-Yu-Ki or Hiuenthsang's Travels. p. XVII and 128 note 29.

(৪) Weber's History of Indian Literature. p. 251 note.

যায় না। অধিকন্তু কিম্বদন্তীতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইলে [illegible] হয় যে, পৈতৃক সম্পত্তি সংরক্ষা করিতেই তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বৌদ্ধ কিম্বদন্তী মতে পঞ্জাবে তক্ষশীলাস্থ জনগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহবহ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্ত মগধরাজ জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসিমকে প্রেরণ করেন। সুসিম তৎকার্য্যে অপারগ হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ অশোক সসৈন্যে যাইয়া নানা উপায়ে বিদ্রোহ দমন করেন। তদবধি পিতার আদেশে পিতার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অশোক তাঁহার প্রতিনিধিরূপে পঞ্চনদ প্রদেশে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকেন। (৫)

বিন্দুসারের মৃত্যুকাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২ বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতৃসিংহাসনের জন্ত ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ হয়। অশোক তখন পঞ্চনদ প্রদেশে রাজপ্রতিনিধি। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাভূত করিয়া তিনিই সিংহাসন অধিকার করেন। পূর্ব্বে তাঁহার কি নাম ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে তাঁহার অশোক (পালী অশোক ; চীন ও-যু-কিঅ) নামেরই উল্লেখ দেখা যায়। খোদিত লিপিতে প্রিয়দর্শিন্ নামই দৃষ্ট হয়। ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনই এই রচনার আলোচ্য বিষয়। সে জীবনীর ঐতিহাসিক অংশ অশোকের নানা গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি (অনুশাসন) হইতে উদ্ধৃত হইবে।

অশোকের রাজ্যকাল চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—

১ম। রাজত্বের প্রথমাংশ নবম বৎসর পর্য্যন্ত।

২য়। রাজত্বের দ্বিতীয়াংশ (প্রথম গিরিলিপিমালা) পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত।

৩য়। রাজত্বের তৃতীয়াংশ (স্তম্ভলিপিমালা) সপ্তবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত।

৪র্থ। রাজত্বের শেষাংশ (অবশিষ্ট গিরিলিপিমালা)।

অশোকের রাজত্বের প্রথমাংশ কিম্বদন্তীজালে এরূপ বিজড়িত যে, তৎকালের বিবরণের জন্ত ঐতিহাসিককে প্রধানতঃ কিম্বদন্তীর উপরই নির্ভর করিতে হইবে। কথিত রাজত্বের প্রথমাবস্থায় তিনি অত্যন্ত নির্দ্দয় ছিলেন। শুনা যায়, অবিবেককালে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে বিনাশ করেন, এবং সাধারণ জনগণের শাসনার্থ রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে প্রাচীরবেষ্টিত একটি "নরক" (কারাগার) নির্ম্মাণ করিয়া চণ্ডালবৎ উগ্রস্বভাব এক ব্যক্তিকে তাহার রক্ষক নিযুক্ত করেন। লোক

(৫) Beal's Si-Yu-ki, Vol. I. p. 140 note 52.

ধরিয়া তাহাদিগকে তপ্ত কটাহে দগ্ধ করা ও বৃহৎ উদূখলে চূর্ণ করাই সেই প্রহরীর কার্য্য ছিল। (৬) তিনি অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এবং রাজত্বের প্রথম কয় বৎসর নানা দিগ্বিজয়ে অতিবাহিত করেন। এই দিগ্‌জয়কালীন যুদ্ধে তিনি শত্রুসেনা ও শত্রুপুরবাসীদিগকে বিনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে কলিঙ্গ যুদ্ধের বিবরণে তাহার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যায়। অশোক স্বয়ং লিখিয়াছেন,—

"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শিন্ অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে কলিঙ্গ জয় করেন। তাহাতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয়; লক্ষ লোক (যুদ্ধে) নিহত হয়; ও তাহার অনেকগুণ লোক বিনষ্ট হয়।" (৭)

প্রথম অবস্থায় অশোক যে কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এমন বোধ হয় না; হয় ত নামমাত্র হিন্দু ছিলেন। বৌদ্ধ-কিম্বদন্তীমতে, প্রথম প্রথম তিনি বৌদ্ধদিগকে উৎপীড়িত করিতেন; তাঁহারই আদেশে বুদ্ধ-গয়ার মহা-বোধিদ্রুম কর্ত্তিত হয় (৮) এবং তিনিই কপিলবস্তুর সন্নিকটস্থ রাম গ্রামে বুদ্ধদেবের স্মরণার্থ সংস্থাপিত আটটি স্তূপের মধ্যে সাতটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ প্রদান করেন। (৯) অশোক বাহিরে যেমন ছিলেন, গৃহেও তেমনই ছিলেন, তাঁহার শুদ্ধান্ত বিবাহিতা মহিষী ও অবিবাহিতা প্রণয়িনীতে পূর্ণ ছিল। তিনি মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ নং গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"পূর্ব্বে সুপাপ্যের জন্য দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শীর পাকশালায় অনুদিন বহু প্রাণিবধ হইত।" (১০) অশোক অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন। রাজ্যের নানা ভাগে গমনকালে তিনি শিকার করিয়া সময় কাটাইতেন। অষ্টম গিরিলিপিতে প্রকাশ,—"বহুদিন পূর্ব্বে দেবপ্রিয় যখন বিহারযাত্রা করিতেন, তখন মৃগয়া ও তাবৎ অন্যান্য অভিরমণীয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। (১১)

প্রথম বয়সে অশোক কিরূপ লোক ছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে

(৬) Beal's Fa-hian in Si-Yu-ki, ch XXXII and Hiuenthsang Vol. II pp. 86-7.

(৭) Dr. Buhler's Epigraphia Indica vol. II. pp. 466-7. ডাক্তার বুলারের পাঠ সমীচীন বলিয়া সাধারণতঃ তাঁহার কৃত পাঠই উদ্ধৃত করা যাইবে।

(৮) Beal—Si-yu-ki II. p. 117.

(৯) Fahian ch XXIII, XXVI.

(১০) Epigraphia Indica Vol. II. pp 448-9.

(১১) [illegible]graphia Indica Vol II. pp. 456-7.

তাঁহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। তিনি বীর্য্যবান, দুর্দ্দমনীয়চেতা, প্রভূতপরিশ্রমকুশল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক,—প্রকৃত রাজপদের যোগ্য ছিলেন। এরূপ লোক ঘটনাচক্রে মায়ামমতাহীন সুখমদমত্ত দানবও হইতে পারে, করুণাময় পরহিতব্রতী ঋষিও হইতে পারে। প্রথম অবস্থায় ঘটনাচক্রে অশোক অনেকটা দানবতুল্যই হইয়াছিলেন। এরূপ হইবার কতকগুলি কারণও দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ, তখন তাঁহার বয়স অল্প, (অভিষেককালে ত্রিংশ বর্ষের অধিক নহে, সম্ভবতঃ পঞ্চবিংশতির কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ) কাজেই বুদ্ধি অপরিপক্ক, কিন্তু ভোগাভিলাষ ও ক্ষমতাভিলাষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, অভিষেকের পূর্ব্বে কিছু দিন তিনি তক্ষশীলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন; যাঁহারা সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, বা সর্ লেপেল গ্রিফিনের রণজিৎ সিংহের জীবনীর মত পঞ্চনদ প্রদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, পঞ্চনদ প্রদেশে বা তৎপশ্চিমস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে মনুষ্য-জীবনের মূল্য অতিসামান্য বলিয়াই বিবেচিত হয়; সেখানে হত্যা, বিদ্রোহ, যুদ্ধ, ভ্রাতৃবিবাদ প্রভৃতি এমনই সাধারণ যে, কেহ প্রাণিবধে কুণ্ঠিত হয় না। এরূপ দেশের শাসনকর্ত্তার পক্ষে নির্দ্দয় হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। তৃতীয়তঃ, অশোক সহজে রাজ্যলাভ করেন নাই; দুর্জ্জয় যুদ্ধে ভ্রাতৃবর্গকে জয় করিয়া তবে পিতৃসিংহাসন স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় অশোকের ন্যায় দুর্দ্দমনীয়চেতা লোক মমতাশূন্য ও ধর্ম্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া পড়িবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ আছে কি? অশোকের জীবনের প্রথমাংশের সহিত খ্রীষ্টিয়ান সাধু সেণ্ট অগষ্টাইনের জীবনের প্রথমাংশের প্রভূত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষণে অশোকের রাজত্বের দ্বিতীয়াংশের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। এ অংশের ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে, প্রধানতঃ গিরিলিপিমালার উপর নির্ভর করিতে হইবে। প্রথম গিরিলিপিমালায় তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্তের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত স্থানসমূহের পর্ব্বতে যে সকল গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে;—

১। কাশ্মীরের পশ্চিমে সোয়াত অধিত্যকায় সাহাবাজগাড়ি;

২। পেশোয়ারের নিকট কপুর্দ্দিগিরি;

৩। গুজরাটের পশ্চিম ভাগে গিরনার;

৪। বোম্বাই প্রদেশে টানা জিলায় সুপারা;

৫। মান্দ্রাজ প্রদেশে গঞ্জাম জিলায় চিল্কা হ্রদের দক্ষিণভাগে জৌগড়;

৬। উড়িষ্যার পুরী জিলায় ভুবনেশ্বরের নিকটে চিল্কা হ্রদের উত্তরে ধউলী;

৭। উত্তর-পশ্চিমবিভাগস্থ ডেরাডুন জিলায় কানসী।

৮। মানসেরা।

ধর্ম্মলিপিগুলির সংখ্যা সর্ব্বসমেত সাধারণতঃ চতুর্দ্দশ, তবে জৌগড় ও ধউলীতে দুইটি অধিক। সুপারায় কেবল অষ্টম লিপির অর্দ্ধাংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। (১২) ধর্ম্মলিপিগুলি সম্ভবতঃ অশোকের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে খোদিত হয়। সেগুলি সর্ব্বত্রই এক প্রকারে প্রচারিত; ইহাতে অনুমান হয় যে, সেগুলি রাজধানীতে রচিত হইয়া সীমান্তবর্ত্তী সহরসমূহে প্রেরিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ লিপিতে অশোকও এ কথা কতকটা স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, পঞ্চম ও ত্রয়োদশ লিপি হইতে গিরিলিপির সময় ও অশোকের রাজ্যপরিমাণ কতকাংশে বুঝা যায়। ত্রয়োদশ লিপিতে প্রকাশ,—

"বিজয়ের মধ্যে এই (বিজয়) দেবপ্রিয় (প্রিয়দর্শী) মুখ্য বিজয় (বলিয়া মনে করেন) যথা ধর্ম্ম বিজয়; তাহা দেবপ্রিয় পাইয়াছেন। এখানে (নিজ সাম্রাজ্যে) ও সর্ব্ব অপরান্ত দেশে—ছয় শত যোজন দূরে যেখানে আংটিয়োকো নামক যোনরাজ ও সেই আংটিয়োকোর পর যেখানে চারি রাজা (আছেন) তুরময়ে নাম, আংটিকিনি নাম, মক নাম, আলিকসুদরো নাম, দক্ষিণে চোড়, পাণ্ড, তাম্বপংনিয় পর্য্যন্ত এবং হিড় রাজা ও; (১৩)

পণ্ডিতবর লাসেনের মতে (১৪)

আংটিয়োকো—দ্বিতীয় আন্টিয়োকস (Anteochus II.) সিরিয়ারাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৪৭)

তুরময়ে—দ্বিতীয় টলেমাস (Ptolemaeos II.) মিসর-রাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৪৮)

আংটিকিনি—আন্টিগোনস্ গোনেটস্ (Antegonus gonatus) মাসিডনাধিপতি (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ২৩৯)

মক—ম্যাগস্ (Magos) কিরিনি-রাজ (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ২৫৮)

---

(১২) Epigraphia Indica vol III. p. 136.

(১৩) Epigraphia indica vol II. pp. 463-5.

(১৪) Lassen's Indis. Aterthum Bd II. p. 254 f. l. c. ep. Ind. II p. 471.

আলিকসুন্দরো—অ্যালেকজাণ্ডার (Alexander) ইপায়ারস্ রাজ (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ২৬২-২৫৮)

দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মলিপি সকল খোদিত করিবার আজ্ঞাপ্রদানকালে মক ও আলিকসুন্দরো জীবিত ছিলেন। অতএব, প্রথম গিরিলিপিমালার সময় খ্রীঃ পূঃ ২৬০—৫৮ ধরা যাইতে পারে। খৃঃ পূঃ ২৫৭ পর তাহাদিগের সময় নির্দ্ধারণ করা যায় না।

এই সকল ধর্ম্মলিপি হইতে রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশোকের সাম্রাজ্য-বিস্তার অনুমান করা যায়। উত্তরে হিমাচলের পাদদেশস্থ জঙ্গল (টেরাই), পশ্চিমে ভারতভূমির বর্ত্তমান সীমা ও ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে ১৯ ডিগ্রি অক্ষরেখা বা গোদাবরীর উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্র নদ। সাম্রাজ্যসংলগ্ন নিম্নলিখিত নৃপতি ও স্বাধীন জাতিগুলির নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।—

পশ্চিমে বাহ্লিয়াধিপতি যোনরাজ আংটিয়োক ও হিড়রাজ; দক্ষিণে সত্য-পুত্র, (কঙ্কণ ?) কের-পুত্র, (মালাবার উপকূল) চোড়, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী (সিংহল)। অপরান্ত জাতি সকলের মধ্যে—যবন, কাম্বোজ, গান্ধার, রস্তিক, পিতিনিক, বিশ, বজ্রি, নাভিতি, ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দ। (১৫)

দেখা যাইতেছে, রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে বর্ত্তমান ভারতের দশ আনারও অধিক অশোকের অধীন ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন নৃপতি যে এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার মধ্যে কতটা তাঁহার পৈতৃক, এবং কতটা তাঁহার স্বোপার্জ্জিত, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

তিনি যে অভিষেকের আট বৎসর পরে (অর্থাৎ নবম বৎসরে) কলিঙ্গ জয় করেন, এ কথা তিনি স্বয়ং ত্রয়োদশ লিপিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, দাক্ষিণাত্য ভাগ ও পশ্চিম সীমান্তের কতকগুলি জনপদ অশোকই অধিকার করেন। তিনি যে রাজ্যবিস্তারে শৌর্য্য ও সমরনিপুণতা দেখাইয়া-ছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "মহালকে হি বিজিতং বহু"—মহারাজ্যে বহুদেশ জয় করিয়াছি, চতুর্দ্দশ লিপির এই গর্ব্ব ভিত্তিহীন নহে।

অশোক রাজ্যের শাসনপ্রণালী কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাজ্যের প্রধান প্রধান সহর "মহামাত্য" নামে আখ্যাত রাজ-

---

(১৫) ২য়, ৫ম ও ১৩শ লিপি দ্রষ্টব্য।

কর্ম্মচারিগণের অধীনে থাকিত। (১৬) সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করা হয়, এবং প্রত্যেক প্রদেশে [illegible] এক জন "প্রাদেশিক" নিযুক্ত ছিলেন। এই প্রাদেশিকগণ কতকটা মোগল সুবাদার বা ইংরাজ কমিশনারের মত ছিলেন। কতকগুলি প্রদেশ একত্র করিয়া এক একটি রাজ্য গঠিত হইত; রাজ্য "রাজুকের" অধীনে থাকিত। (১৭) ধউলীর ও জৌগড়ের গিরিলিপিতে প্রকাশ যে, সমগ্র সাম্রাজ্য কতকগুলি [illegible] বিভক্ত করা হয়। যথা,— পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশীলা ও তোসলি। উজ্জয়িনীর, তক্ষশীলার ও তোসলির শাসনভার এক একজন রাজবংশীয় "কুমারের" হস্তে ন্যস্ত থাকিত। (১৮) এতদ্ব্যতীত, সকল সমাচার জ্ঞাত হইবার জন্য সম্রাট "প্রতিবেদক" নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা প্রজা ও অমাত্যগণের গূঢ় কার্য্যাবলী সম্রাটকে জানাইত। (১৯) অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসর পরে (অর্থাৎ চতুর্দ্দশ বৎসরে) অশোক এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীর সৃষ্টি করেন। তাহারা "ধর্ম্মমহামাত্র" নামে অভিহিত। তাহাদিগের ক্ষমতা বিস্তার অসাধারণ। ধর্ম্মপ্রচার ও অন্যায়-সংশোধনকল্পে তাঁহারা সাম্রাজ্যের সকল জাতির ও সকল সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। [illegible] দুই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যথাযথ উপায় অবলম্বনের ক্ষমতাও তাঁহাদিগের ছিল। রাজপুত্রগণের, এমন কি, তাঁহাদিগের অবরোধবর্ত্তিনী মহিলাগণের উপরেও ইহাদিগের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণপ্রতাপে প্রযুক্ত ছিল।

ক্রমশঃ।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

---

(১৬) Dr. Grierson's translation of M. Senart's notice, Ind. Ant. 1890. pp. 83, 85, 86—7

(১৭) তৃতীয় গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(১৮) M. Senart. Ind. Ant. 189[illegible]

তোসলি সম্ভবতঃ উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকট অবস্থিত ছিল।

(১৯) ষষ্ঠ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

(২০) পঞ্চম গিরিলিপি দ্রষ্টব্য।

ভেক।

অবয়বের গঠন ও স্বভাব দেখিয়া প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জীব-জগতে মীন ও সরীসৃপের মধ্যদেশে ভেকের স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন। শৈশবে ইহারা মৎস্যের ন্যায় জলে বাস করে; জলচর জীবের ন্যায় শ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। বড় হইলে জল ছাড়িয়া স্থলে আইসে, এবং স্থলচর প্রাণিগণের ন্যায় ফুসফুস দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করে। ভেকমাতা ডিম্ব প্রসব করে। ভেকশিশু অণ্ড হইতে বাহির হইয়া ঈষৎ বক্র ও দীর্ঘ আকার ধারণ করে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের লাঙ্গূল, সম্মুখের পদদ্বয় ও সর্ব্বশেষে পশ্চাতের পদদ্বয় বহির্গত হয়। এইরূপ কিয়দ্দিবস জলবিহারের পর তাহাদিগের লাঙ্গূল খসিয়া যায়। এইরূপে শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে, উহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া ভেকরূপ ধারণ করে।

দক্ষিণ ফ্রান্স্ ও ইতালীর অনেক প্রদেশে ভেকমাংসভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে। এই জন্য, ইংরাজ জাতি সমগ্র ফরাসীদিগকে "ভেকভুক" বলিয়া গালি দিয়া থাকেন। এই ভেকভুকদিগের মধ্যে এক জন গ্রন্থকার ভেকমাংসের রসালতার উল্লেখ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ভেক নানাজাতীয়। তন্মধ্যে কোন কোন জাতীয় ভেক ভীত বা ক্রুদ্ধ হইলে শরীর হইতে এক প্রকার বিষাক্ত তরল পদার্থ বাহির করে। এই নিমিত্ত তাহারা ভেকভুকদিগের সযত্নে পরিহার্য্য।

অতিরিক্তশীতপ্রধান দেশ ভিন্ন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড় বড় সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ভেক নাই। তাহার কারণ এই যে, আমাদিগের দেশের এক জাতীয় ভেক ভিন্ন আর কোনও ভেক সমুদ্রের লবণাম্বু সহ্য করিতে পারে না; সুতরাং মহাদেশ হইতে উহাদিগের দ্বীপান্তর-প্রয়াণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। তবে, বিনা ভাড়ায় জাহাজে চড়াইয়া উহাদিগকে দ্বীপান্তরে লইয়া গেলে, উহাদিগের জাতি যায় না; বরং নূতন দেশে উপনিবেশী হইলে, ভেকজাতির বংশবৃদ্ধির ঘটাটা কিছু বাড়িয়া থাকে। এই প্রকারে মেদেরা, এজোর্স্ ও মরীচ দ্বীপে ভেকের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। ঐ সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ, পিপীলিকা প্রভৃতি কীট নষ্ট করিয়া কৃষিকার্য্যের উপকার করিবে, এই আশায় ভেকগণকে লইয়া গিয়া, এক্ষণে বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে, এদেশেও ভেকদিগের কীট-

ভোজনপ্রবৃত্তি বিদিত ছিল ; এজন্ত সংস্কৃত ভাষায় ইহাদিগের আখ্যা 'মণ্ডূক'।

যে জাতীয় ভেক যেরূপ বর্ণ-বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে বিচরণ করে, তাহাদিগের বর্ণও তদনুরূপ হইয়া থাকে। পানায় আবৃত জলে যে ভেক বিচরণ করে, তাহাদের বর্ণ হরিদ্রাভ হরিৎ; কদলীদলগত-কীটকুলভোজী ভেক স্বর্ণাভ; শৈবাল-সমাচ্ছন্ন প্রাচীরের পার্শ্বে যে ভেক নিরন্তর বিরাজ করে, তাহার বর্ণও প্রাচীরানুরূপ ধূমল। এই বর্ণবৈচিত্র্য জীবনসমরে ভেক-কুলের পরম সহায়। ইহারা বিচরণভূমির বর্ণে বর্ণ মিশাইয়া ছদ্মবেশে লুকাইয়া থাকে। ভেক-ভক্ষক কোনও প্রাণী তখন সহজে ভেককে চিনিতে পারে না; সুতরাং শত্রুর কবল হইতে বাঁচিয়া যায়। পক্ষান্তরে, যে সকল প্রাণী ভেককুলের ভক্ষ্য, তাহারাও ছদ্মবেশী ভেকদিগকে চিনিতে পারে না; সুতরাং ভেকগণ, অনায়াসে তাহাদের শিকার করিয়া জীবনধারণ করে। কিন্তু এই অঙ্গরাগ বিভিন্নতা কি তাহাদিগের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল? অথবা পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিক প্রয়াসের ফল? এই শেষোক্ত কারণে,—ক্রমবিকাশ-প্রণালীর অধ্যাপকগণ যাহাকে 'ন্যাচ্‌রাল্ সিলেক্‌শন্' বলেন—সংঘটিত বলিয়া বিবেচিত হয়। জীব-জগতে প্রাণীতে প্রাণীতে, প্রাণীতে তরুতে, এবং তরুতে তরুতে যে অবিরাম জীবনসংগ্রাম নীরবে চলিতেছে, তাহার নিমিত্ত সকলেই নিরন্তর প্রস্তুত। এই মহারণে কেহ বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ-সমরে আগুয়ান্; কেহ বা বালি-বধের ন্যায় গূঢ় নীতির অনুসরণে তৎপর; আবার কেহ বা রাক্ষসী মায়ার মোহজাল বিস্তার করিয়া শত্রুশাসনে প্রবৃত্ত। রাক্ষসী মায়ার সহিত বর্ণবৈচিত্র্যের তুলনা করা অসঙ্গত নহে। জীবন-সংগ্রাম ব্যাপারে, আমার মনে হয়, দুইটি পৃথক বুদ্ধি কার্য্য করে। ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও জাতিগত বুদ্ধি। মৃগকে ধরিবার নিমিত্ত সিংহ ধাবিত হইলে, মৃগের গুপ্তস্থানে পলায়নচেষ্টা তাহার ব্যক্তিগত বুদ্ধির ফল; এবং তাহার পদচতুষ্টয়ের দ্রুতপলায়নোপযোগিনী গঠনপ্রণালী মৃগজাতির জাতিগত বুদ্ধির ফল। জাতিগত বুদ্ধির সত্তা সেই জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির অজ্ঞাত। কথাটা শুনিতে নূতন হইলেও, সাধারণ্যে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না। আশা করি, সুধীগণ ইহার বিচার করিবেন। যাহা হউক, ভেকগণের বর্ণবৈচিত্র্য যে জীবন-সংগ্রামের জন্ত, তদ্বিষয়ে কাহারও বিমত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ভীত বা কোপান্বিত হইলে কোন কোন ভেকের গাত্র হইতে বিষাক্ত তরল পদার্থ নির্গত হয়;—তাহাও জীবনসংগ্রামের জন্ত। কারণ,

এই জাতীয় ভেককে পোষ মানাইয়া তাহাকে হস্তে ধারণ করিলে তাহার বিষ-বহিষ্করণবৃত্তি ...য় না।

বাস্তবিক ভেকও পোষ মানে। প্রাণিতত্ত্ববিৎ পোনান্ত এক পালিত ভেকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে একদা কোন কারণে এক গৃহস্থের সোপানশ্রেণীর নিম্নে আশ্রয় লইয়াছিল। গৃহবাসী দয়াপরবশ হইয়া তাহার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ক্রমে উহা এমন পোষ মানিয়াছিল যে, লোকে উহার গায়ে হাত বুলাইলেও পলাইবার চেষ্টা করিত না। পরিবার যখন ভোজনে বসিতেন, তখন তাহাকে টেবিলের মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া কীটপতঙ্গাদি প্রদত্ত হইত। যখন সকলে ভোজন ব্যাপারে প্রবৃত্ত, তখন ভেকবর কখনও অনন্যমনে কীটকুলনাশে ব্যস্ত থাকিত, কখনও বা ইতস্ততঃ স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত—বুঝি বা গৃহস্থের হাস্যকৌতুকে যোগদান করিবে। এইরূপে, মানবসহবাসে সে ছত্রিশ বৎসর বাঁচিয়াছিল। একদিন একটা কাক তাহার একটি চক্ষু বিদ্ধ না করিয়া দিলে, বোধ হয়, ভেকটি আরও অধিক দিন বাঁচিতে পারিত। নয়ননাশের পর হইতে তাহার ভোজনে অনিচ্ছা জন্মে; এবং তাহার পর সে শুকাইয়া শুকাইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

ভেকের পরমায়ু সম্বন্ধে নানা লোকে নানা জল্পনা করিতেন। পর্ব্বত কাটিতে কাটিতে জীবন্ত ভেক প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে অনুমান করিতেন যে, ভেক বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে শৈলগঠনকালে উহার অভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার বাকল্যাণ্ডের পরীক্ষায়, এরূপ অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, ভেক যে মনুষ্যের সমান বাঁচিতে পারে, তাহাতে সংশয় নাই। আহার না করিয়া ও সামান্য মাত্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাস নির্ব্বাহ করিয়াও উহারা অনেক দিন জীবনধারণ করিতে পারে। কোনও কোনও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে গভীর মৃত্তিকাতল হইতে মৃতবৎ ভেকদেহ পাওয়া যায়; তাহা জলে নিমজ্জিত করিলে উহাতে জীবনের সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ভেকদেহে মাংস ও পেশীর সহিত চর্ম্ম শিথিলভাবে সংলগ্ন থাকে; এই জন্য, ভেকগণ, মাংস ও চর্ম্মের ব্যবধানস্থলে বায়ু গ্রহণ করিয়া দেহ ইচ্ছামত স্ফীত করিতে পারে। চর্ম্মের এই প্রকার সংস্থান নিবন্ধন, প্রহারিত হইলে ভেকগণ অধিক কষ্ট অনুভব করে না। উহাদিগের অপূর্ণ মস্তিষ্ক অবলোকন করিয়া কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, ভেক আদৌ শারীরিক কষ্ট অনুভব করে না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক দয়ালু বৈজ্ঞানি-

কও ইহাদিগের শরীর খণ্ডিত করিয়া অথবা ইহাদিগের [illegible] তড়িতপ্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া, নানা প্রকার পরীক্ষা দিয়া থাকেন।

আমাদিগের দেশের কোন কোন স্থানে এক প্রকার ছোট ছোট ভেক দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও তাহাদিগের পক্ষ নাই, তথাপি তাহারা আপনাদিগের শরীর বায়ুপূর্ণ করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে এরূপ ভাবে লাফাইয়া পড়ে যে, তাহা অবলোকন করিলে মনে হয়, যেন উড়িয়া গেল। উহাদিগের লম্বা লম্বা পদপ্রান্তে সংলগ্ন হংসাদির ন্যায় সংযুক্ত নখর (?) উড্ডয়ন কার্য্যের সহায়তা করে। জীবতত্ত্বের গ্রন্থে যে উড্ডীয়মান ভেকের বিবরণ পাঠ করা যায়, তাহাদিগেরও লম্বা লম্বা সংযুক্ত নখর।

ভেক ডাকে কেন? বিশদরূপে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন হইলেও, অসঙ্কুচিতচিত্তে ইহা বলা যাইতে পারে যে, এ ডাকের সহিত প্রেমের কোন না কোন সম্বন্ধ আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির পূর্ব্বে ভেক রব করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বর্ষাকালই তাহাদিগের সঙ্গম-ঋতু। ভেকবধূগণকে ডাকিবার জন্যই ভেকবরগণ যে জলাশয় মুখরিত করেন না, তাহা কে বলিবে? বিহঙ্গিনীকে সম্ভাষণ করিবার জন্যই যখন বিহগ কাকলী-সুধাধারায় দিগন্ত প্লাবিত করে, তখন ভেকগণের রবের কারণও যে তদনুরূপ নহে, তাহা কে বলিবে?

কোন কোন জাতীয় ভেকের জিহ্বা নাই। তাহারা কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করে। ভেকদিগের স্ত্রীগণ অপেক্ষা পুরুষগণের স্বর অধিক তীব্র। কোন কোন ভেকবধূর আদৌ স্বর নাই। তাহাদিগের স্বামিগণ, বোধ হয়, সুখে ঘরকন্না করিয়া থাকে; তাহাদিগকে আদৌ গৃহিণীর বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না!

সন্তানপ্রতিপালনে কোন কোন জাতীয় ভেক-দম্পতির অসাধারণ সহিষ্ণুতা দেখা যায়। গুয়ানো ও ব্রেজিল দেশে একপ্রকার ভেক বাস করে; তাহাদিগের অণ্ড প্রসূত হইলে, পুরুষ ভেক উহা তাহার স্ত্রীর পৃষ্ঠোপরি স্থাপন করে; স্ত্রীভেক তৎক্ষণাৎ তাহা বহিয়া লইয়া জলমধ্যে গমন করে। তথায় ডিম্বগুলি তাহার পৃষ্ঠদেশে লাগিয়া গিয়া স্ফোটক উৎপন্ন হয়। সেই স্ফোটকের অভ্যন্তরে কিছু দিন থাকিয়া ডিম্বগুলি ফুটিয়া বাহির হয়। তখন ভেকমাতা জলবাস পরিহার করে। ফ্রান্স ও সুইট্‌জারলণ্ড দেশে একপ্রকার ভেক আছে; সেই জাতীয় পুরুষ ভেক স্বীয় পশ্চাদ্ভাগের পদে ডিম্ব রক্ষা করিয়া, তাহা ফুটাইয়া থাকে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে বদরিকাশ্রম।

অবসরসময়ে হিমালয়-ভ্রমণকাহিনী যে দুই একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই অনুসন্ধান করিতাম। সৌভাগ্যক্রমে Asiatic Researchesর একাদশ খণ্ডে এই বদরিকাশ্রম-ভ্রমণকাহিনী পাঠ করি। Captain Webb প্রমুখ তিন জন ইংরেজ, এই বৎসর হইতে ঠিক এক শত বৎসর পূর্ব্বে, হিমালয়-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বদরিকাশ্রমে যাহা দেখিয়াছিলেন, উল্লিখিত পত্রে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান। আজ "সাহিত্যে"র পাঠকগণের জন্য সেই ভ্রমণবৃত্তান্তের সারভাগ সঙ্কলিত করিলাম।

"বদরিনাথ সহর ও দেবমন্দির পুণ্যসলিলা অলকনন্দার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। এই সুন্দর উপত্যকা দীর্ঘে দুই ক্রোশ, এবং ইহার পরিসর কোন স্থানেই অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক নহে। এই উপত্যকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে বদরিনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যভাগ দিয়া অলকনন্দা ধীরগতিতে বহিয়া যাইতেছে। এই উপত্যকাভূমির দুই পার্শ্বে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায়, চির-তুষারমণ্ডিত নর ও নারায়ণ পর্ব্বত সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতদ্বয়ের আপাদমস্তক তুষারময়।

"বদরিনাথ সহরে সবেমাত্র কুড়ি পঁচিশখানি ক্ষুদ্র কুটীর। এই সকল কুটীরের অধিকারী—পাণ্ডাগণ এবং নারায়ণের অল্পসংখ্যক সেবায়েত। মন্দির হইতে সোপানশ্রেণী নামিয়া একেবারে অলকনন্দার জলে মগ্ন হইয়াছে। বদরিকাশ্রমের নাম শুনিলে সাধারণের মনে যে সহস্রাধিক বৎসরেরও অধিক দিনের কথা মনে হয়, পুরাকালের মুনিঋষিগণের সময়েও বদরিকাশ্রম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জনসাধারণের মনে যে দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বদরিনাথের মন্দির দর্শন করিলে আর সে বিশ্বাস থাকে না। যে মন্দিরের জন্য অগণিত অর্থরাশি সংগৃহীত হইয়া থাকে, সে মন্দির এমন সামান্য ও এত অল্প দিনের নির্ম্মিত যে, দেখিয়া ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। মন্দিরটি ৪০।৫০ ফিটের বেশী উচ্চ নহে। তবে যে সুন্দর স্থানে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহারই জন্য এই মন্দির সমস্ত উপত্যকাভূমির উপর যেন সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

"জনপ্রবাদ এই যে, বদরিনাথের মন্দির মনুষ্যহস্তনির্ম্মিত নহে; স্বয়ং স্বর্গশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দিরের নির্ম্মাতা। কিন্তু দেবহস্তের নির্ম্মিত হইলেও,

প্রবল ভূমিকম্প সহ্য করিবার ক্ষমতা মন্দিরের ছিল না। সুতরাং এখন দেবতার শিল্পচাতুর্য্যের উপর মানব শিল্পীর সাহায্যের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। তবে মানুষের হাতে পড়িয়া দেবমন্দিরের এমন জীর্ণসংস্কার হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক বলিয়া মনে হয়; তাহার প্রাচীনত্ব একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।

"নারায়ণ-দর্শনের অনুমতি পাইয়া আমরা যখন মন্দিরের বাহিরে সমাগত হইলাম, তখনও মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই। অনর্থক সেখানে দাঁড়াইয়া না থাকিয়া আমরা মন্দিরের সোপানশ্রেণী দ্বারা নীচে নামিতে লাগিলাম। অল্প দূর নীচে নামিয়াই আমরা একটি বাঁধানো কুণ্ড বা জলাধার দেখিতে পাইলাম। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রত্যেক দিকে ৩০ ফিটের অধিক হইবে না। এই কুণ্ডের আচ্ছাদনস্বরূপ একটা কাষ্ঠনির্ম্মিত ঘর আছে; কিন্তু তাহার প্রাচীর নাই, কয়েকটি কাষ্ঠের বিমের উপরে ছাদ রহিয়াছে। এই কুণ্ডের নাম তপ্তকুণ্ড। এই ভয়ানক শীতে পর্ব্বত-হৃদয় হইতে একটি গরম জলের ঝরণা বাহির হইয়াছে; মন্দিরের অধ্যক্ষগণ সেই ঝরণাকে এই কুণ্ডে প্রবাহিত করিয়াছেন। ইহারই সন্নিকটে আর একটি ঝরণার জল অতি শীতল; সে ঝরণাকেও এই কুণ্ডে প্রবাহিত করা হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত ঝরণার জল এমন গরম যে, তাহা ব্যবহারের অনুপযুক্ত; তাই ব্রাহ্মণগণ সেই উষ্ণ জলের সঙ্গে শীতল জল মিশাইয়া যাত্রিগণের স্নানের উপযুক্ত করিয়া এই কুণ্ডের নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যাত্রিগণ স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে এই কুণ্ডে স্নান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণের লজ্জাশীলতারক্ষার জন্ত কুণ্ডের কিয়দংশ কোন প্রকারে আবৃত করা মন্দিরের অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্য মনে হয় নাই। আমরা এখান হইতে বহির্গত হইয়া আরও একটু নীচে নামিলাম। সেখানে আবার আর একটি কুণ্ড; ইহার নাম সূর্য্যকুণ্ড। এ কুণ্ডের জলও গরম; কিন্তু যাত্রিগণ আর এ কুণ্ডে স্নান করে না। অলকনন্দার তুষারশীতল জলে স্নান করিয়া শীতের প্রকোপে যখন যাত্রীদের শরীর অবসন্ন হয়, তখন তাড়াতাড়ি তাহারা এই সূর্য্যকুণ্ডের উত্তপ্ত জল আপনাদের গাত্রে ছিটাইয়া দেয়। তাহাতে কতটা পুণ্য হয়, বলিতে পারি না; তবে শরীর যে একটু তাজা হয়, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সূর্য্যকুণ্ড ও তপ্তকুণ্ড ব্যতীত ব্রাহ্মণগণের প্রসাদে আরও অনেক কুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকটিতে স্নান করিলে বিভিন্ন প্রকারের পুণ্য সঞ্চিত

হইয়া থাকে। যাত্রিগণের অর্থ যত হ্রাস পাইতে থাকে, তাহাদের পুণ্যও তত অধিক সঞ্চিত হয়। গৃহে ফিরিবার সময়ে যদি হিসাব করিয়া দেখে, তাহা হইলে যাত্রিগণ অবশ্যই বুঝিতে পারে যে, এ পথ স্বর্গগমনের সরল পথ হইলেও, স্বল্পব্যয়ে এ পথে স্বর্গে যাওয়া যায় না। প্রত্যেক কুণ্ডেই ব্রাহ্মণগণ পুণ্য বিতরণ করিতেছেন বটে, কিন্তু সে পুণ্য সংগ্রহ করিবার জন্য অধিকপরিমাণ অর্থ দক্ষিণা দিতে হয়; এবং সেই অর্থের পরিমাণ যাহার যত অধিক, স্বর্গদ্বার তাহার তত নিকটবর্ত্তী। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থমহিমায় এমনই মুগ্ধ যে, তাঁহাদের তীক্ষ্ণ মস্তিষ্কে এ সব চাতুরী আদৌ উদিত হয় না।

"আমরা সোপানশ্রেণী অবতরণ করিয়া নদীর কিনারায় দাঁড়াইয়াছিলাম, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাহুল মহাশয় আমাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই রাহুল, নারায়ণের মন্দিরের প্রধান সেবায়েত। আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিলাম। তপ্ত কুণ্ডের নিকটে একটি অনাবৃত স্থানে আমাদিগের অভ্যর্থনার জন্য একখানি শুভ্রবস্ত্র আস্তীর্ণ হইয়াছিল, এবং তাহারই উপরে, একপার্শ্বে একখণ্ড সুন্দর কার্পেটের আসন রাহুল মহাশয়ের বসিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আমারা সেখানে পঁহুছিয়া দেখিলাম, তিন চারি জন চোপদার রৌপ্যনির্ম্মিত আশা সোটা হস্তে অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে স্বয়ং রাহুল মহাশয়; তাঁহার পশ্চাতে ময়ূরপুচ্ছরচিত-বীজনধারী একজন ভৃত্য; সর্ব্বশেষে নারায়ণের পূজক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। রাহুল মহাশয়ের পরিধানে সবুজ সাটিনের বস্ত্র; গায়ে তুলা-ভরা সাটীনের জামা; কটিদেশে একখণ্ড উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণের শাল কোমরবন্ধ-রূপে ব্যবহৃত; মস্তকে রক্তবসনের উষ্ণীষ এবং পদযুগলে চিত্র বিচিত্র নাগরা; তাঁহার দুই কর্ণে দুইটি প্রকাণ্ড স্বর্ণহীরবৌলি, তাহাতে বহুমূল্য হীরা ও কয়েকটি মুক্তা গ্রথিত; গলদেশে মুক্তার মালা; হস্তে বহুমূল্য মণিমুক্তাখচিত স্বর্ণবলয়; দুই হস্তের প্রায় দশটি অঙ্গুলিতেই বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক। আমরা মনে করিয়াছিলাম, জটাবল্কলধারী ভস্মবিভূষিত যোগী সন্ন্যাসী দর্শন করিব; তৎপরিবর্ত্তে বিলাসিতার চরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তীর্থশ্রেষ্ঠ বদরিনারায়ণের উপযুক্ত সেবায়েতই বটে।

"যথাযোগ্য সম্ভাষণের পরে প্রায় পনের মিনিট তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম্মকথা আদৌ নাই। তৎপরে

তিনি আমাদিগকে মন্দিরের দিকে লইয়া চলিলেন। বাহিরের গেটের নিকটে উপস্থিত হইলে আমরা পাদুকা খুলিয়া রাখিতে আদিষ্ট হইলাম। আমাদিগের তাহাতে আপত্তি ছিল না; দেবমন্দিরের অবমাননা করা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি নাই। সেই স্থানে পাদুকা রাখিয়া আমরা পাঁচ ছয়টি সোপানের উপর আরোহণ করিলাম। সম্মুখেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে সে দ্বার অতিক্রম করিতে নিষেধ করিলেন। সুতরাং আমরা সেইখানে দাঁড়াইয়াই নারায়ণ-দর্শন করিতে বাধ্য হইলাম। সেই ক্ষুদ্র দ্বারের অপর পার্শ্বেই একটি অনতিবৃহৎ প্রকোষ্ঠ; তাহার পরে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি দ্বার; সেই দ্বারের অপর পার্শ্বে মঞ্চোপরি নারায়ণ-দেব উপবিষ্ট। নারায়ণের মস্তকে একখানি ক্ষুদ্র দর্পণ। তাঁহার সম্মুখভাগে দুই তিনটি প্রদীপ ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতেছে। তাহাতে গৃহের অন্ধকার দূর হওয়া দূরে থাকুক, স্বয়ং নারায়ণের মূর্ত্তিই অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে। নারায়ণের সর্ব্বাঙ্গ স্বর্ণরৌপ্যাদিনির্ম্মিত অলঙ্কারে বিভূষিত। আমাদের মনে হইল, গৃহমধ্যে এরূপ ক্ষীণ আলোক জ্বালিবার কারণ এই যে, তাহা হইলে নারায়ণের মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য যাত্রিগণের নিকট অধিক বোধ হইবে। উজ্জ্বল দিবালোকে, অথবা প্রদীপের আলোকে সমস্ত দেখিতে পাইলে, যাত্রিগণের প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক না হইতে পারে। এই ভয়ে পূজক মহাশয়েরা গৃহ এমন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধকারে দেখিয়া যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হইল, নারায়ণ প্রায় তিন ফিট উচ্চ। সমস্ত শরীর বস্ত্রালঙ্কারে সমাবৃত। সুতরাং মুখ ও হস্তদ্বয়ের কিয়দংশ দেখিয়া যাহা বুঝিতে পারিলাম, তাহাতে বোধ হইল, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নারায়ণের মূর্ত্তি গঠিত। নারায়ণের বামে দক্ষিণে আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি বিদ্যমান, কিন্তু দ্বারের সঙ্কীর্ণতা, গৃহমধ্যের অন্ধকার ও আমাদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ, আমাদিগের ভাগ্যে তাঁহাদের সকলের দর্শনলাভ ঘটিল না।

"নারায়ণদর্শন শেষ হইলে আমরা প্রতিগমনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ একখানি প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত থালা আমাদিগের সম্মুখে আনিয়া ধরিল। বুঝিলাম, নারায়ণকে কিঞ্চিৎ দর্শনী দিতে হইবে। রাহুল মহাশয় আমাদিগকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, তাঁহার আশা ছিল, আমাদিগের নিকট হইতে প্রচুর দক্ষিণা আদায় হইবে। আমাদিগের অর্থসংস্থান তেমন অধিক ছিল না, এবং অধিকপক্ষে

স্বর্গগমনের সুগম পথের অন্বেষণও তখন তেমন আবশ্যক মনে হয় নাই। তথাপি দেবতার না হউক, সেবায়েত মহাশয়ের সন্তুষ্টির জন্ত আমরা সেই রৌপ্যপাত্রে ১০০ শত রৌপ্যমুদ্রা দর্শনী দিলাম। নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন; কিন্তু সেবায়েৎ মহাশয়গণ যতদূর প্রাপ্তির আশা করিয়াছিলেন, তাহা চরিতার্থ হয় নাই, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম।

"যে তীর্থস্থান ও দেবমন্দির দর্শন করিবার জন্ত আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা দেখিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিরাশ হইলাম। তবে আমাদের মনে একটি বিশেষ ভয় ছিল,—এতকালের মধ্যে হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি নারায়ণ-দর্শন করিতে পায় নাই; আমরা কোনও প্রকারে যদি দেবমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করি, তাহা হইলে বড়ই ক্ষোভের কারণ হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারে বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এখন আর সে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। এই পবিত্র তীর্থে আমাদের ন্যায় বিধর্ম্মীর সমাগমে নারায়ণের দেবত্বের কোনও হানি হয় নাই। একটি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আমরা তিন জন মন্দিরদ্বার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণদর্শনের অধিকার পাইয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গী মুসলমান খানসামাগণকে মন্দিরসীমাতেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণগণ আমাদের আর একটি অনুরোধ করিয়াছিলেন; আমরা যেন পুণ্য তীর্থস্থানে কোনপ্রকার জীবহত্যা না করি; আমাদের আহারের জন্ত যদি নিতান্তই জীবহত্যার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমরা যেন দূরস্থান হইতে তাহা সম্পন্ন করিয়া আনি। আমরা তীর্থসীমার মধ্যে আমাদের বস্ত্রাবাসে বসিয়া হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ করিলে, তাঁহাদের কোনও আপত্তি ছিল না। বলা বাহুল্য, আমরা যে কয় দিন বদরিকাশ্রমে ছিলাম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবহির্ভূত আচরণ যথাসম্ভব বর্জন করিয়াছিলাম।

"ভারতবর্ষের উত্তরাংশে যে সকল দেবমন্দির বর্ত্তমান, তাহার মধ্যে বদরিনাথেরই দেবোত্তর সম্পত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। গড়োয়াল ও কমায়ুনের রাজা এই পর্ব্বতপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে দেবসেবার জন্ত প্রায় সাত শত গ্রাম দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দেবতার অনেক অর্থ সঞ্চিত আছে। শ্রীনগরের রাজা বা অন্যান্ত লোকের যখন অর্থের আবশ্যক হয়, তখন তাঁহারা দুই চারিখানি গ্রাম বন্ধক রাখিয়া, নারায়ণের সঞ্চিত অর্থ হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এইপ্রকার বন্ধকী সম্পত্তিও যথেষ্ট আছে। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ

গণের হস্তেই সেবাভার ন্যস্ত আছে। নারায়ণের দেশের গ্রাম-সমূহের অবস্থা ভাল। আমরা যে সকল গ্রামের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়াছিলাম, সে সমস্ত গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। নারায়ণের সহরে দ্রব্যাদি বড়ই দুর্ম্মূল্য। দোকানঘর বেশী নাই; যে দুই একখানি আছে, তাহাতে অগ্নিমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রীত হয়। মন্দিরের দেবতাগণকে দক্ষিণান্ত করিয়া যাত্রিগণের যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই দোকানদারগণই আত্মসাৎ করে। সুতরাং যাত্রীরা বেশীদিন আর নারায়ণে বাস করিতে পায় না। শুনিয়াছি, অনেক যাত্রী ভিক্ষায় নির্ভর করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে; অথবা অনাহারে এই পর্ব্বতপথে জীবন শেষ করিয়াছে। আর একটি কথা আছে;—যে দুই চারি জন দোকানদার আছেন, তাঁহারা না কি নারায়ণের সেবায়েত-দলের ব্রাহ্মণ; তাঁহারা যাত্রীদিগকে বলেন যে, এই দোকান হইতে যে লাভ হয়, তাহা নারায়ণের সেবার জন্যই অর্পিত হয়; সুতরাং ধর্ম্মপিপাসু যাত্রিগণ অধর্ম্ম ও পাপের ভয়ে জিনিসপত্রের দরদাম করিতে পারে না। তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নারায়ণের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়া,—ভিক্ষাপাত্রহস্তে বদরিকাশ্রম ত্যাগ করে।

বদরিকাশ্রমে তিনপ্রকারে দক্ষিণা দিতে হয়। প্রথম, স্বয়ং দেবতার প্রণামী; দ্বিতীয়, তাঁহার ভোগের জন্য; তৃতীয়, রাহুল মহাশয়ের। রাহুল মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, অনেক অর্থশালী যাত্রীও দেবতাকে প্রতারিত করিবার জন্য অতিহীন ও দরিদ্রের বেশে এখানে আসিয়া থাকে, এবং অতি অল্প ব্যয়েই স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করাইয়া লয়। আমাদের কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু তীর্থস্থানে আসিয়া যে দেবতাকে ঠকাইবে, তাহা বোধ হয় না। তবে পাণ্ডামহাশয়গণের অনুচিত প্রার্থনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য একটু দরদস্তর করিলেও করিতে পারে। তবে শুনিয়াছি, এখানকার পাণ্ডাগণ অন্যান্য তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণের ন্যায় অতিশয় অর্থলোলুপ নহে। আর একটি কথাও বক্তব্য;—এখানে যাত্রিগণ দক্ষিণার পরিমাণ-অনুসারে প্রসাদ পায়। দক্ষিণদেশীয় সওদাগর ও শ্রেষ্ঠীগণই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর্শনী দিয়া থাকে, এবং তাহাদের আহারের জন্য নারায়ণের উৎকৃষ্ট প্রসাদ প্রেরিত হয়। যাহা হউক, অন্য যাত্রীরাও প্রসাদে বঞ্চিত হন না; কারণ, যদিও তাঁহারা নারায়ণের মন্দির হইতে তেমন আহারদ্রব্য পান না, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে পরলোকে স্বর্গধামে অক্ষয়সুখলাভের

নিশ্চয় [illegible] ন করিয়া দে [illegible] আমাদের জন্য স্বর্গবাস বা [illegible] সুখে আশীর্ব্বাদ হিন্দু ব্রাহ্মণগণে [illegible] অসাধ্য ব্যাপার; [illegible]গণ বা তাঁহাদের দেবতারা হিন্দুর জন্য এ সকল ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা কোন প্রকারেই তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্গগমনের ব্যবস্থাপত্র বা পরোয়ানা পাইব না; তাঁহাদের স্বর্গে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অথচ এতগুলি টাকা দক্ষিণা দিলাম, তাহার জন্য আমাদের অবশ্যই কিছু পাওয়া উচিত! পরলোকের দিকে যখন আমাদের আশা কিছুই নাই, তখন অন্ততঃ ইহলোক কিঞ্চিৎ লাভ হওয়া উচিত। রাজা মহাশয় ও তাঁহার পার্শ্বচর ব্রাহ্মণগণ এ কথা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই সেই দিন অপরাহ্ণে রাওল মহাশয় আমাদিগের পটমণ্ডপে কিছু উপহার পাঠাইয়াছিলেন। আমাদের তিন জনের জন্য উৎকৃষ্ট রক্ত রঙ্গের তিনটি মসলিনের পাগড়ী। তিনি আরও অনুরোধ করিয়াছিলেন, যেন আমরা নারায়ণের সম্মানার্থ সেই পাগড়ী মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করি। শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্মান-প্রদর্শন আর হইতে পারে না। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে নারায়ণের পুরোহিত-প্রদত্ত পবিত্র উষ্ণীষ মস্তকে পরিধান করিলাম; ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

"প্রতিদিন প্রাতঃকালে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, এবং বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যাত্রিগণ দেবদর্শন করিতে পায়। তাহার পর দেবতার মধ্যাহ্নের আহার প্রস্তুত হয় [illegible] তখন মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। দেবতা আহার করিয়া হিন্দু প্রথা অনুসারে দিবানিদ্রা [illegible] বিশ্রাম করেন। সূর্য্যাস্তের পরে আবার দ্বার উন্মুক্ত হয়। কোন কোন দিন অল্পক্ষণ পরেই দেবতার নিদ্রাভঙ্গ হয়, কোন দিন বা বিলম্ব হয়; অর্থাৎ যাত্রীর পরিমাণ অনুসারে নারায়ণকে নিয়ম আহার-নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনও ধাতুতে নির্ম্মিত পাত্রে নারায়ণের ভোগ হয় না। যখন অধিক যাত্রিসমাগম হয়, তখন দেবতার আহার ও পরিচ্ছদের বিশেষ পারিপাট্য হইয়া থাকে। তাহার পর যখন প্রখর শীত নামিয়া আইসে, যখন পর্ব্বতগাত্র শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, যখন তুষাররাশি নারায়ণের মন্দির গ্রাস করিতে অগ্রসর হয়, তখন নারায়ণকে দীর্ঘ কালের জন্য নিদ্রার অবসর দিয়া, সেবায়েতগণ যোশীমঠে পলায়ন করেন।

"ঠাকুরের অলঙ্কার, মণি মুক্তা ও স্বর্ণরৌপ্যনির্ম্মিত তৈজসপত্র সকল মন্দিরমধ্যেই একটি [illegible] গৃহে রক্ষিত [illegible]। একবার নাকি সেই ভয়ানক শীতকালে (পৌষ [illegible] মাসে বরফ [illegible] পড়িয়াছিল) [illegible] পর্ব্বত-

বাসী বয়ক কুটিয়া মন্দিরের দ্বার ভগ্ন ক…, এবং মন্দিরমধ্য হইতে রৌপ্য, জহরত প্রভৃতি এগার মন বস্তু লইয়া পলায়ন করে। শ্রীমন্দিরের দ্বার উদঘাটিত হইলে চুরীর কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল, এবং অল্পায়াসে চোরগণ ধৃত হইল। বলা বাহুল্য, এ প্রকার ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যের জন্য তাহাদের সকলেরই প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।

"এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণ দক্ষিণদেশীয়। কোনও বিবাহিত ব্যক্তি এখানে দেবসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না। এই জন্য এখানে সকলেই অবিবাহিত থাকে। কিন্তু এই কয় মাস কষ্টে সৃষ্টে এখানে অবস্থান করিয়া যখন তাঁহারা যোশীমঠে ফিরিয়া যান, তখন আর তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সংযমের দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা অল্প সময় তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম, সুতরাং তাঁহাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আমরা চিকিৎসাবিদ্যাও জানি, এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশই ঔষধের জন্য আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের ব্যাধির পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের স্বভাবেরও পরিচয় পাইয়াছিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং রাউল মহাশয় আমাদিগের নিকট হইতে যে পীড়ার জন্য ঔষধ লইয়া গেলেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেবলমাত্র নারায়ণই তাঁহার উপাস্য দেবতা নহেন; তিনি শিলাময় নারায়ণ অপেক্ষা শরীরিণী দেবীগণের সেবায় অধিকতর অনুরক্ত। বর্ত্তমান রাউলের নাম শ্রীনারায়ণ রাও, বয়স অনুমান বত্রিশ বৎসর। ইনি নেপাল দরবার কর্ত্তৃক এই পুণ্য তীর্থের সেবায়েত নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম, ধর্ম্ম বা চরিত্রের বলে এই যুবক এমন পবিত্র কার্য্যের ভার পান নাই, অর্থবলে বা অন্য উপায়ে এই কার্য্য তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। লোকটি বেশ রাজার মত সুখে আছে!

"মেঘমুক্ত দিনে এখান হইতে কেদারনাথের মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। বদরিনাথ ও কেদারনাথের মন্দির একই পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত; উভয়ের মধ্যে ১৩।১৪ মাইল ব্যবধান। কিন্তু এ পথে গমনাগমন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনও পথ নাই; সমস্ত বৎসর পর্ব্বত তুষারমণ্ডিত থাকে। সুতরাং বদরিকাশ্রম হইতে কেদারনাথে যাইতে হইলে, যাত্রিগণকে যোশীমঠ ঘুরিয়া দশ বারো দিনে তথায় যাইতে হয়। কেদারের পথ অতিভয়ানক; আজ শুনিলাম, তিন চারি শত যাত্রী এ বৎসর ঐ পথে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

হৃদয়-বীণা।

১

এ বীণা বাজে না বুঝি আর।
আজীবন প্রাণপণে
বাঁধি যারে সযতনে
সাধিনু শতেক সুরে তান,—
হায় গো! আজিকে মোর
দুঃখের নাহিক ওর,—
সে বীণা বাজে না বুঝি আর!

২

করিয়াছি কত-না যতন।—
সহিয়াছি শতবার
শোকের শাসন-ভার,
জীবনের মরণ পীড়ন।
তবু এ বুকের 'পরে
অসীম সোহাগ-ভরে
বীণাখানি করেছি বহন।

৩

চারিদিকে হাসি কোলাহল।
সুখের সরসী-পারে
প্রমোদ-প্রতিমা প্রায়
নাচে কত লহরী তরল
আমি তারি মাঝখানে
আপন মরম-পানে
বসে আছি আপনি বিহ্বল।

৪

শত লোক শত কাজে ধায়;—
রতন-ভূষণ ধন
সুখ-স্বার্থ অগণন,
শত মান-অভিমান তা'য়,
গরবে সমাজ শিরে
বিহরে বিচরে ফিরে
কুবেরের প্রহরীর প্রায়।

৫

আমি তা'র কিছুই চাহি না;—
এ সংসার যা'র লাগি'
নিশিদিন রহে জাগি
আমি তা'র কিছুই মাগি না,
শুধু নিরজনে বসি'
মানস-নিকুঞ্জে পশি'
দীন আমি বাঁধিয়াছি বীণা।

৬

রচিয়াছি নন্দন-নিলয়;—
কত মন্ত্র মহাতান
আশার আনন্দ-গান
কল্পনার কুসুম-নিচয়,—
সে সব এ ভব-বাসে
কেমনে প্রকাশি হায়?
তাই সদা মনে জাগে ভয়।

৭

বৃথা বুঝি, বৃথা এ সাধন
এই বাঁধা বীণাখানি
কে বাজাবে নাহি জানি,
কে সাধিবে প্রাণের বেদন,—
কবির হৃদয়-তার
অঙ্গুলী-আঘাতে কা'র
ঝঙ্কারিয়া করিবে ক্রন্দন!

৮

বাহিরে প্রসন্ন আকাশ,
শারদ মাধুরী মাখি'
কাননে ডাকিছে পাখী,
উথলিছে শেফালীর বাস।
এমন সরল প্রাতে
সরল প্রকৃতি সাথে
জেগে উঠে গাহিবার আশ।

৯

কোথা তুমি কমল-ভূষণা!
ভক্তের বাসনা-রাশি
বিফলে যে যায় ভাসি,
এস অয়ি সফল বাসনা!
মানসী এ বীণা মোর
কোলে তুলে দিব তোর,
এস মা গো মানস-আসনা!

গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী।

নিয়তির শাসন অনতিক্রমণীয়। নিয়তির প্রতিকূলতা করিতে সামান্য মানবের শক্তি নাই। মানুষ যাহা ভাবে, নিয়তির অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। অল্প দিন হইল, গিরিজাপ্রসন্ন, স্ব-প্রণীত গৃহলক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগের পুনর্ম্মুদ্রণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সমগ্র গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে না হইতেই, তিনি নিয়তির অপ্রতিনিষেধ্য বিধির বলে ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন।

গ্রন্থকার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অল্পদিনমাত্র কর্ম্মপ্রবণতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনী না লেখাই ভাল। কিন্তু তাঁহার জীবনে একটি বিশেষত্ব ছিল। এই বিশেষত্ব বুঝিলে মানুষ সংসারে আপনার গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে পারে। অল্পদিন মাত্র কর্ম্ম-ক্ষেত্রে থাকিলেও, গ্রন্থকার আপনার বিশেষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জীবনী কোন কোন বিষয়ে লোকের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে।

বরিশাল জেলার সিদ্ধকাটী গ্রামের বৈদ্য রায় চৌধুরী বংশ ধনে মানে প্রসিদ্ধ। ইহারা কুলগৌরবে বৈদ্যদিগের মধ্যে যেরূপ সম্মানিত, সম্পত্তি ও সৎকর্ম্মেও সেইরূপ সম্ভ্রান্ত। এই প্রসিদ্ধ বংশে সিদ্ধকাটীর নিজ বাটীতে ১২৬৮ সালের চৈত্র মাসে গিরিজাপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতামহ দুর্গাগতি রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। পিতা মথুরানাথ রায় চৌধুরীও নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্নের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর, তখন তিনি একদা ১৭।১৮ হাত উচ্চ গৃহের ছাদ হইতে নীচে পড়িয়া যান। এরূপ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাঁহার জীবনের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই। বিধাতা বোধ হয়, তাঁহার চরিত্রগত মাধুর্য্যের নিদর্শন দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন প্রথমে বাসগ্রামের বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা করেন, তৎপরে বরিশাল জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েন। বরিশালে পাঠকালে ১২৮৪ সালের আষাঢ় মাসে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার পিতামহ দেহত্যাগ করেন। এই বৎসর তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, কিন্তু উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ইহার পর তিনি কলি-কাতার সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন।

[illegible] কলেজ হইতেই এফ্. এ. পরীক্ষা দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম্. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনন্তর বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে বরিশালে, শেষে কলিকাতা হাইকোর্টে, ওকালতি আরম্ভ করেন।

গিরিজাপ্রসন্নের পঠদ্দশার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ওকালতিতে তাঁহার অনুরাগ ছিল না। অনুরাগের অভাবপ্রযুক্ত তিনি উহাতে প্রতিপত্তি লাভ করিতেও প্রয়াস পান নাই। নিজের বৈষয়িক কর্ম্মেও তাঁহার তাদৃশী আসক্তি পরিস্ফুট হয় নাই। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, নিষ্ঠাবান্ গৃহী ও নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী ছিলেন। গত বৈশাখ মাসে যখন কলিকাতায় প্লেগের আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তখন তিনি সপরিবারে বাড়ীতে গমন করেন। বাড়ীতে থাকিলেই তাঁহাকে অগত্যা বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত। ঐ সময়ে তিনি আমাদিগের নিকটে লিখিয়াছিলেন—"বৈষয়িক কর্ম্মে লিপ্ত হইলেই অনেক সময়ে মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হয়। আমাকেও এখন মনুষ্যত্বে বিসর্জ্জন দিতে হইতেছে।" ধর্ম্মনিষ্ঠার গুণে তিনি যে ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতে-ছিলেন, এই উক্তিতেই তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন বরিশালে ওকালতি করিতেছিলেন, তখন ১৩০০ সালের আশ্বিন মাসে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের পর তিনি ধর্ম্মানুশীলনে অধিকতর অভি-নিবিষ্ট হয়েন।

পঠদ্দশাতেই গিরিজাপ্রসন্ন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। বি. এ. পরীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ গৃহলক্ষ্মীর সূত্রপাত হয়। তিনি যখন বি. এল্. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তদীয় প্রধান সমালোচনা-গ্রন্থ "বঙ্কিমচন্দ্রে"র আরম্ভ হয়। প্রথমে তাঁহার একজন বন্ধু "গৃহলক্ষ্মী" লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন। শেষে তিনি স্বহস্তে সমুদায় ভার গ্রহণপূর্ব্বক উহা সাঙ্গ করিয়া তুলেন। বি. এল্. পরীক্ষার সময়ে তিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের একটি চরিত্রের বিশ্লেষণপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখেন। এইরূপে বঙ্কিম বাবুর উপ-ন্যাসগত সমুদয় চরিত্রের বিশ্লেষণে "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রস্তুত হয়। শেষবার কলি-কাতায় অবস্থিতিকালে গিরিজাপ্রসন্ন তাঁহার একজন বন্ধুর সহিত একটি ছাপাখানা করেন। শেষে তিনি স্বয়ং ছাপাখানার যাবতীয় কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এবং উহার একমাত্র স্বত্বাধিকারী হয়েন। এই সময়ে গৃহ-

লক্ষ্মীর দ্বিতীয় ভাগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় ভাগ প্রণীত ও তাঁহার ছাপা মুদ্রিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি "হিতকথা" নামে একখানি বিদ্যালয়পাঠ্য গ্রন্থেরও রচনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বলিখিত "কয়েকখানি পত্র" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ ছিল। তিনি উহার পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনপূর্ব্বক "দম্পতির পত্রালাপ" নাম দিয়া উহা পুনঃপ্রকাশিত করেন।

গৃহলক্ষ্মীর যথোচিত আদর হইয়াছে, এবং "গৃহলক্ষ্মী" অস্মৎসমাজে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর কার্য্যসাধন করিতেছে। গিরিজাপ্রসন্ন রচনাকুশল। তাঁহার রচনায় যেরূপ কোমলতা, সেইরূপ মধুরতার সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু কেবল রচনাকৌশলেই "গৃহলক্ষ্মী" সমাদৃত হয় নাই; সমাদরের অন্য কারণ আছে। সেই কারণ—গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তি। নারী-জাতিকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইতে হইলে ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপদেশ দিতে হয়। যিনি প্রগাঢ় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও পরম ভাগবত নহেন, তৎকর্ত্তৃক এই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। গিরিজাপ্রসন্ন ধর্ম্মভাবে উত্তেজিত হইয়া, প্রকৃত গৃহলক্ষ্মীর গুণাবলী দেখাইয়াছেন। "বঙ্কিমচন্দ্র" এবং "দম্পতীর পত্রালাপ"ও এইরূপ ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক। চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব কিরূপে পরিস্ফুট হয়, বঙ্কিমচন্দ্রে প্রধানতঃ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গুলির আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি সুনীতি ও ধর্ম্মভাবের দিক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার গ্রন্থাবলী তদীয় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। এই ভক্তি ও নিষ্ঠাই তাঁহার বিশেষত্ব, এবং এইরূপ বিশেষত্ব তাঁহার চরিত্রের যেরূপ উৎকর্ষের পরিচায়ক, অপরের পক্ষেও সেইরূপ সুনীতির উদ্দীপক।

গিরিজাপ্রসন্নের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া, কয়েক মাস পরে গতাসু হয়। অদৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব আবর্ত্তন দেখিয়া, তিনি অদৃষ্টপরীক্ষার জন্য জ্যোতিষের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। ফলিতজ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি কোষ্ঠী দেখিয়া, ফলাফল বলিতে পারিতেন, এবং স্বয়ং কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেও জানিতেন। তাঁহার গৃহলক্ষ্মীতে তদীয় জ্যোতির্বিদ্যা-ভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মচর্য্যায় যে সকল [illegible] অন্তঃশুদ্ধির প্রধান সাধন, গিরিজাপ্রসন্ন তৎসমুদয়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ধর্ম্মসম্মত সমস্ত আচার যথাবিধি পালন করিতেন। প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যোপাসনা, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ, মাসবিশেষে ও বারবিশেষে

হবিষ্য, একাদশী, অমাবস্যা, ইহার কোনটিই তাঁহার নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। সমগ্র গীতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি ঊষাকালে গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাদি করিয়া গীতাখানির আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিতে করিতে বাসাবাড়ীতে ফিরিতেন, তৎপরে পূজা ইত্যাদির সমাপন করিয়া, বৈষয়িক কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইতেন। স্বপাকভোজন তাঁহার একটি প্রধান নৈমিত্তিক কর্ম্ম ছিল। বৈশাখ ইত্যাদি মাসে হবিষ্যকালে তিনি স্বপাকভোজন করিতেন। উপবাস বা ব্রতাদির সংযম ও পারণ সময়েও তাঁহাকে স্বপাকভোজন করিতে দেখা যাইত। গঙ্গাস্নানে তিনি গাড়ীতে যাইতেন না, জামা ইত্যাদিরও ব্যবহার করিতেন না; নিজ হস্তে গরদের যোড় ও গামোছা লইয়া, খালিপায়ে কলিকাতা—চাঁপাতলার বাসাবাড়ী হইতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইতেন। পবিত্র ব্রহ্মচর্য্য যেন তাঁহার নিত্যসহচর ছিল। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেন না। যৌবনের মধ্যাবস্থাতেই তিনি এইরূপ আচারপরায়ণ হইয়া ভগবানে চিত্তস্থাপন করিয়াছিলেন। যে বয়সে মানুষ বিলাসী ও ভোগাভিলাষী হয়, তিনি সেই বয়সেই চিত্তসংযম ও ঈশ্বরনিষ্ঠার একশেষ দেখাইয়াছিলেন। এই সৌখীনতার সময়ে—সংসারের এই পাপপঙ্কিল ক্ষেত্রে এরূপ দৃশ্য দুর্লভ।

গুরুভক্তি, বন্ধুপ্রীতি ও স্বজনস্নেহে গিরিজাপ্রসন্নের প্রকৃতি বড় মধুর ছিল। বঙ্কিম বাবুকে তিনি গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন; নিজের প্রেস বঙ্কিম বাবুর নামে অভিহিত করিয়া, তিনি এই ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। মৃত্যুর সপ্তাহকাল পূর্ব্বে তাঁহার একজন পরম বন্ধুর একটি কন্যা সাংঘাতিক পীড়ায় দেহত্যাগ করে। বন্ধুর বাসাবাড়ী ভবানীপুরে। গিরিজাপ্রসন্ন প্রত্যহ চাঁপাতলা হইতে ভবানীপুরে যাইতেন। তিনি সমুদয় কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক রাত্রিদিন বন্ধুকন্যার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

গিরিজাপ্রসন্ন দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। তিনি যে এত শীঘ্র অনন্তপদে লীন হইবেন, ইহা তাঁহার আত্মীয়গণ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার দেহ যেরূপ সবল, সেইরূপ সুস্থ ছিল। তিনি সহসা দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুঘটনা বড় আকস্মিক—বড় শোচনীয়—বড়ই ভয়প্রদ। রোগের আতঙ্ক উপস্থিত হইলে, তিনি যে কলিকাতা হইতে সপরিবারে বাড়ী যান, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বাড়ীতে থাকিলে গঙ্গাস্নান হয় না, অধিকন্তু বৈষয়িক কর্ম্মের আতিশয্যে ধর্ম্মচর্য্যার ব্যাঘাত হয়, এই

জন্য তিনি দেশের একটি চাকরকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবণ মাসের শেষে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। শেষে তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র লেখা পড়ার জন্য বাড়ী হইতে তাঁহার নিকটে আইসে। ইতঃপূর্ব্বে সীতানাথ নামক একজন আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার্থী তাঁহার বাসাবাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ পড়িতেন; তিনিও বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া, গিরিজাপ্রসন্নের বাসায় থাকেন।

১২ই ভাদ্র (১৩০৫) সীতানাথের জ্বর হয়; ক্রমে নিউমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। চিকিৎসক রোগপরীক্ষাপূর্ব্বক উহা নিউমোনিক প্লেগ বলিয়া সন্দেহ করেন। তিনি না কি রোগীকে হাঁসপাতালেও পাঠাইতে কহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সীতানাথ রোগমুক্ত হইতে পারেন নাই। ১৫ই ভাদ্র প্রাতঃকালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। গিরিজাপ্রসন্ন সৎকারের জন্য নিমতলা শ্মশানঘাটে গমন করেন। তাঁহার এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজের বাসায় সজাতির মৃত্যু হইয়াছে, অতএব তাঁহার সৎকারের সময় নিজের উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই তিনি কর্ম্মচারীর কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

যে দিন সীতানাথের মৃত্যু হয়, সেই দিনই গিরিজাপ্রসন্ন ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও চাকরকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীতে যাত্রা করেন। কিন্তু কাল তাঁহাকে ছাড়িল না। যে সর্ব্বসংহারক রোগ সীতানাথের জীবন হরণ করিয়াছিল, বাড়ীতে ২০শে ভাদ্র গিরিজাপ্রসন্নের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সেইরূপ রোগে দেহ ত্যাগ করিল। ঐরূপ রোগে তাঁহার চাকরটিরও মৃত্যু হইল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পীড়ার সময়ে তিনিও ঐরূপ রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রাণাধিক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার মমতা ছাড়িয়া গেল। তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। ২০শে ভাদ্র রাত্রিতে তাঁহার জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেল। তৎপর দিন নিউমোনিয়া সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইল। ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল; কিন্তু জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিল না। গিরিজাপ্রসন্ন এই অবস্থায় ২২শে ভাদ্র প্রাতঃকালে তিনটি কন্যা ও একটি শিশু পুত্র রাখিয়া, অনন্তপদের ধ্যান করিতে করিতে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ছয় দিন পরে ঐ দুরন্ত রোগ তাঁহার মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী সহধর্ম্মিণীরও সর্ব্বদেবময় পতির অনুগমনের সহায় হইল। দেখিতে দেখিতে জলবিম্বগুলি একে একে অনন্ত সাগরের জলরাশিতে মিশিয়া গেল।

এখনও স্থানে স্থানে কৃত্রিমতা, শ্রুতিকঠোরতা ও দুর্ব্বোধতা পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার কবিত্বের উচ্ছ্বাস, আন্তরিকতা ও মনোহারিতা পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। মিষ্টার আর্নেল্ জনসনের 'আয়র্লণ্ড' নামক কবিতাপুস্তকে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মিষ্টার আর্থার সিমন্সের "আমোরিস ভিকটিমা" অতি কোমল ভাবে বর্ণিত হইলেও একেবারে অসার। অজ্ঞাতনামা "A. E." স্বাক্ষরকারীর "The Earth Breath" নামক পুস্তকে কবিতার সাধারণ ঐন্দ্রজালিকভাব বিশেষরূপে বিদ্যমান। ইহা কুহেলিকাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাময় সঙ্গীতের তরঙ্গের মত, পাঠককে স্বপ্নের রাজ্যে উপনীত করে। মিষ্টার থিয়োডোর ওয়াট্স্ ডান্টনের "Coming of Love" পড়িয়া লেখক বড় নিরাশ হইয়াছেন। মিষ্টার ওয়াটস্ ডান্টন্ কাব্যসমাজে মগ্ন ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে কবিতা লেখা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতায় তাঁহার নিজের প্রভাব বই অন্যের প্রভাব দৃষ্ট হয় না। মিষ্টার লুগালিয়েন ওমার খাইয়ামের কবিতার অনুবাদ, মিষ্টার আলফ্রেড অষ্টিনের "Conversion of Winckelmann" নামক একটা মনোরম কবিতা, এবং নবীন কবি মিষ্টার হেনরী নিউবোল্টের "Admirals All" নামক কবিতাও উল্লেখযোগ্য। নূতন ভাল কবিতার অভাবে, 'একাডেমী' পত্রের লেখক, পাঠককে মেরেডিথ, মিসেস্ ব্রাউনিং ও মিষ্টার অষ্টিন্ ডবসনের পুনঃপ্রকাশিত কবিতাগুলি পাঠ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

এ বৎসর উৎকৃষ্ট কবিতাও যেমন মিলে, উক্ত বর্ষের সমালোচনাও তদ্রূপ। লেখক বলেন, মিষ্টার হেন্লী কৃত বার্ন্সের সমালোচনা অত্যন্ত গবেষণাপূর্ণ। মিষ্টার হেনলীর সহিত যাঁহাদের মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহাদের নিকটেও হেন্লীর

সমালোচনা।

রচনার ওজস্বিতা পদে পদে প্রশংসিত হইবে। হেনলীর সমালোচনায় বার্ন্সের বলনাবলী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। হেন্লী, সমালোচ্য কবিতাবলীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং সাহিত্যের রাজ্যে তাহাদের একটা স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছেন। যত দিন হেন্লীর মত প্রতিভাশালী আর একজন সমালোচক বার্ন্সকে অন্য ভাবে প্রতিপন্ন করিতে না পারিবেন তত দিন বার্ন্সকে হেন্লীর বর্ণিত বার্ন্স বলিয়াই অনেকে বুঝিবেন। মিষ্টার র‍্যালে "Style" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্বীয় বক্তব্য বিষয় উপমায় অলঙ্কৃত করিয়া দৃঢ়ভাবে ও উজ্জ্বলভাবে বর্ণন করিয়াছেন। মিষ্টার র‍্যালের উপর মেরিডিথের অত্যন্ত প্রভাব।

উপন্যাস-আলোচনার প্রারম্ভে লেখক বলেন, এলিজাবেথের সময় নাটক যেমন তদানীন্তন সাহিত্যের বিশেষত্ব ছিল, তেমনই আধুনিক সাহিত্যের বিশেষত্ব—উপন্যাস। কাব্যের মত ওজোগুণযুক্ত ও হৃদয়স্পর্শী না হইলেও, উপন্যাসে উদারতা ও সার্ব্বজনীনতার অভাব নাই। এ

উপন্যাস।

বৎসর উপন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। মিষ্টার মেরিডিথের কোনও নূতন উপন্যাস প্রকাশিত না হওয়ায় লেখক বড় দুঃখিত হইয়াছেন। মিষ্টার টমাস্ হার্ডির "The well Beloved" নামক নবপ্রকাশিত উপন্যাস তাঁহার অশ্লীলতাপূর্ণ "Jude" নামক পুস্তকের ন্যায় অশ্লীল নয়। কিন্তু বক্ষ্যমাণ পুস্তকখানি উচ্চদরের উপন্যাস নহে। "St Ives" মিষ্টার ষ্টিভেন্সনের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ হইলে ইহা একখানি অত্যুৎকৃষ্ট "Romance" হইতে পারিত; কিন্তু ষ্টিভেন্সন এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তাঁহার "Romance" লিখিবার বিশেষ ইচ্ছাও ছিল না। রুডিয়ার্ড কিপ্লিংএর "Captains Couragoous" উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার হেনরী জেম্সের ক্ষমতা তাঁহার "The Spoils of

Poynten" এবং "What Maisie Knew" পুস্তকদ্বয়ে অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি জগতের কলুষিত বিষয়বাসনাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ এবং সৌন্দর্য্য ও "Unspotted Soul"কে স্বর্গের উচ্চতম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মিষ্টার গিসিং, মিষ্টার জেম্‌সের মত লিপিকুশল না হইলেও, "The Whirlpool" তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক। তাঁহার উচ্চ নৈতিক আদর্শ এবং উৎকৃষ্ট আখ্যানবস্তু বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইহাতে জীবনের মলিন-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিষ্টার গিসিং যে নিপুণ চিত্রকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। চিত্র আদর্শানুরূপ। অতঃপর লেখক অনেকগুলি উপন্যাসের কেবল নামোল্লেখ করিয়াছেন। উপন্যাস-সমালোচনার উপসংহারে লেখক বলেন যে, উপন্যাস উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইতেছে। আধুনিক সমাজের সমস্যা হইতেছে "উপন্যাস", এবং প্রহেলিকা হইতেছে "অবসাদ।"

লেখকের মতে, উপরি-উক্ত কয়েকটি বিষয় ব্যতীত সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য পুস্তক অত্যন্ত বিরল। জীবনচরিত-প্রকাশের খেয়াল আজও কমে নাই। বিক্রয়লব্ধ মুদ্রায়, অতি অল্পসংখ্যক পুস্তকেরই মুদ্রাঙ্কনব্যয়ের সঙ্কুলন হয়। বলিতে গেলে, একরূপ অকারণে অত্যন্ত সাধারণ লোকের বড় বড় জীবনচরিত অকস্মাৎ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এগুলি সাধারণতঃ আত্মীয় স্বজনের গর্ব্বপরিতৃপ্তির উপাদান। আবার যাঁহাদের জীবনচরিত বাস্তবিকই লিখিবার উপযুক্ত, তাঁহাদের জীবনের ও কার্য্যের এমন সব তুচ্ছ ঘটনা ও ভ্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয় যে, তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্টের আশা অতি অল্প।

জীবনচরিত।

ম্যাডাম ডারমেস্‌টেটারের "বেণা-চরিত" ও কাপ্তেন মেহানের "নেল্‌সনের জীবনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুত্র-লিখিত "টেনিসনের জীবনচরিত" ঘটনার অংশে অত্যুৎকৃষ্ট ও অত্যাবশ্যক। লেখকের মতে লর্ড রবার্টসের "Forty-one yeas in India" বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক।

অবশেষে লেখক বিবিধপ্রকার পুস্তকের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন। এ স্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

নব্যভারত। ভাদ্র। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রীর "বিদেশী বাঙ্গালী—পাণ্ডাচার্য্য" কৌতুহলের উদ্দীপক সুপাঠ্য রচনা। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর "সাহিত্য সংবাদ" সকলেরই পাঠ করা উচিত। এই নিবন্ধে, শব্দতত্ত্ব, ইতিহাস, ধর্ম্ম, মনন-তত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের নবাবিষ্কৃত তথ্যের ও অভিনব মতবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সমালোচনা সন্নিবিষ্ট হইতেছে। বিষয়বিবেচনায় নামটি কিন্তু অযথা হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়ালের "পঞ্চদশ বর্ষ গত" ইতিশীর্ষক কবিতাটি পরিবর্ত্তমান সংসারচক্রের অবিকল ছবি। সম্পাদক মহাশয়ের রচিত "ব্রাহ্মসমাজের দুটি রত্ন—বীর দ্বারকানাথ ও ঋষি রামতনু" পড়িয়া আমরা বিচিত্র রস উপভোগ করিয়াছি। প্রবন্ধের বিষয়ীভূত বীর ও ঋষির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিতে না পারি, সম্পাদক মহাশয়ের সাধুতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইয়াছি। কথায় বলে, 'প্রদীপের নীচেই অন্ধকার!' কথাটি নিতান্ত মিথ্যা নহে। "নব্যভারতের" সম্পাদক তাহার উত্তম উদাহরণ। তিনি যে প্রবন্ধে বীর দ্বারকানাথের